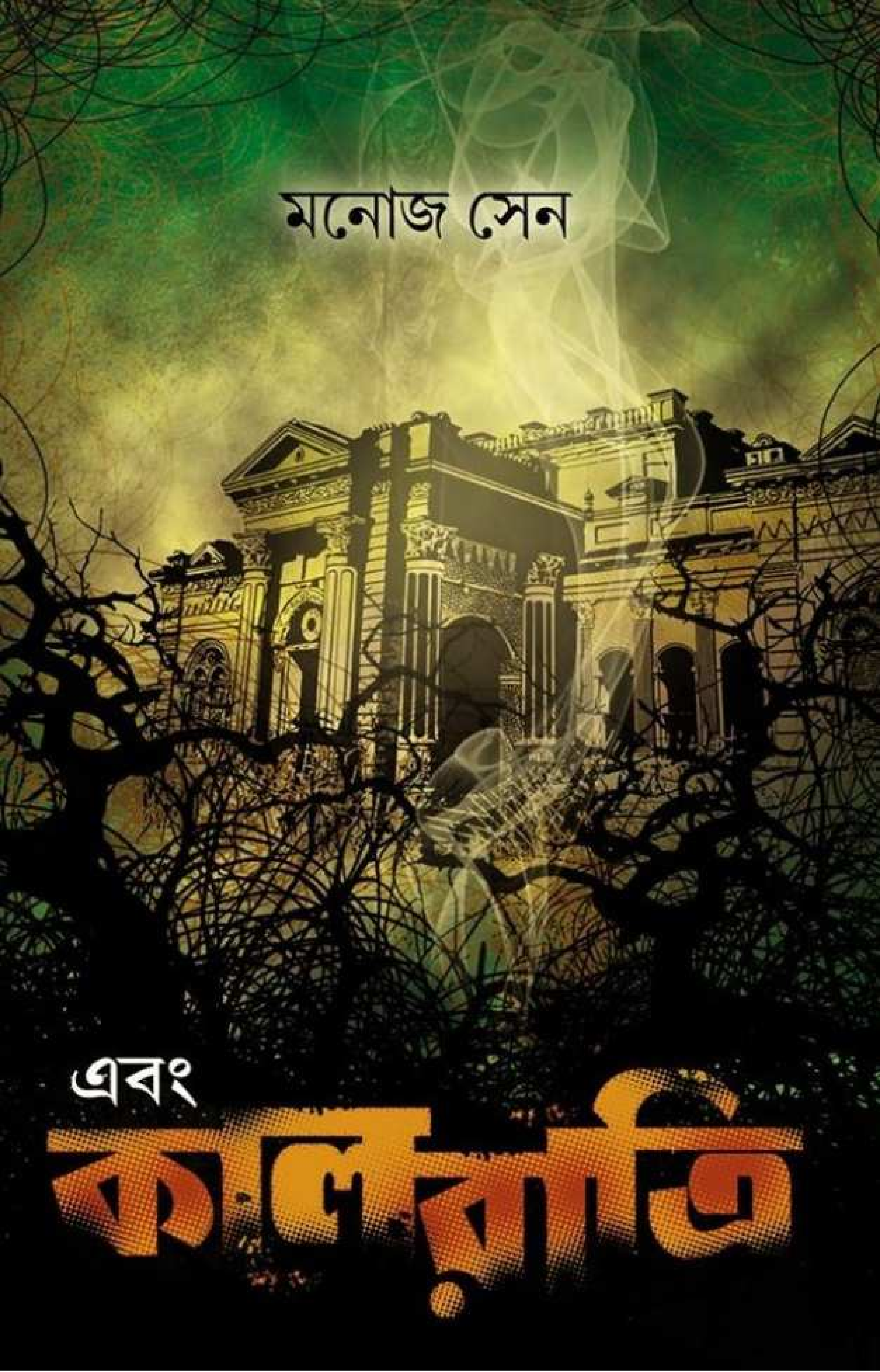
মনোজ সেন
এবং
কালরাত্রি

এতে আছে

ছুটি কাটাল অনুপম

নীলাঞ্জনছায়া

বিদেশে দৈবের বশে

ভূত বলে কিছু নেই

অখিলবাবুর মৃত্যুরহস্য

বাসুদেবের নতুন বাসা

মায়াকানন

প্রভাময়ীর প্রত্যুপকার

শিকার

সংহারক সারমেয়

স্বভাব

নিমন্ত্রণ

গঙ্গাধরের সাংবাদিকতা

মেঘমালা

পোকা

পিন্টুচরণ ও নগেন্দ্রবালা

ভূত ভবিষ্যৎ

আতঙ্কের অবসান

ইন্দ্রিয়ের ওপারে

কালরাত্রি

অঙ্ক পরীক্ষা

এবং কালরাত্রি

মনোজ সেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
শুভ্র চক্রবর্তী

বুক ফার্ম

Ebong Kalratri
by
Manoj Sen

No part of this work can be reproduced in any form without the written permission of the author and the publisher

© মনোজ সেন

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৮

গ্রন্থ পরিকল্পনা : সোনাল দাস, সুমিত সেনগুপ্ত
নামকরণ সহায়তা : অভীক সরকার
বর্ণসংস্থাপন ও ফটোশপ : প্রদীপ গরাই

মূল্য : ৩৯৯ টাকা

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক
৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত
চলভাষ : ৯৮৩১০৫৮০৪০/৯০৫১০১১৬৪৩
মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

আমার অগ্রজা

শ্রীমতী ইন্দিরা সেন-কে

গোরা

কৃতজ্ঞতা

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, অভ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, সুশান্ত রায়চৌধুরী,
শুভ্র চক্রবর্তী, সোনাল দাস, সুমিত সেনগুপ্ত,
নিরুপম মজুমদার, সোহম্ ঘোষ, 'ক্যামেরা জি'

BOOKS IN PDF

To get free e-books

Step 1

Click here

Step 2

Click here

Request or suggest book

সূচিপত্র

ছুটি কাটাল অনুপম	১১
নীলাঞ্জনছায়া	৪৭
বিদেশে দৈবের বশে	৫৮
ভূত বলে কিছু নেই	৭৩
অখিলবাবুর মৃত্যুরহস্য	৮০
বাসুদেবের নতুন বাসা	৮৭
মায়াকানন	৯৫
প্রভাময়ীর প্রত্যুপকার	১০৯
শিকার	১২৫
সংহারক সারমেয়	১৪৫
স্বভাব	১৫৭
নিমন্ত্রণ	১৬৩
গঙ্গাধরের সাংবাদিকতা	১৭৬
মেঘমালা	১৮৪
পোকা	২৩২
পিন্টুচরণ ও নগেন্দ্রবালা	২৪১
ভূত ভবিষ্যৎ	২৬৭
আতঙ্কের অবসান	২৮৩
ইন্দ্রিয়ের ওপারে	২৯৯
কালরাত্রি	৩১৯
অঙ্ক পরীক্ষা	৩৫০

বড়োদের উপযোগী অপার্থিব কাহিনি সংকলন

ভূমিকা

এই বইয়ের ভূমিকা লিখতে গেলে লেখকের, অর্থাৎ আমার, সাহিত্যজগতের যাত্রাপথ সম্পর্কে পাঠককে কিছু জানানো দরকার।

আজ থেকে প্রায় পাঁচ দশক আগে হঠাৎই আমি গোয়েন্দা গল্প লিখতে শুরু করেছিলুম। সেই সময়ে বাংলা সাহিত্যজগতের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না বললেই হয়। নেহাতই ঝোঁকের মাথায় লেখা গল্পটা ডাকে 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় পাঠিয়ে দিয়েছিলুম।

তখন আমাকে মাঝে মাঝেই দুর্গাপুরে যেতে হত। হাওড়া স্টেশনের বুকস্টল থেকে কেনা 'রোমাঞ্চ' পত্রিকা ট্রেনে সময় কাটানোর জন্য আদর্শ ছিল। তার লেখকদের মধ্যে ছিল অনেক বড়ো বড়ো নাম— শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব রায়, হিমাংশু সরকার, ডা শ্রীধর সেনাপতি ইত্যাদি আরও অনেকে।

এহেন পত্রিকায় নামগোত্রহীন আমার লেখা ছাপা হবে কি না সে-বিষয়ে আমার প্রচুর সন্দেহ ছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার, মাস-দুয়েকের মধ্যেই লেখাটা ছাপা হল। শুধু তাই নয়, কিছুদিনের মধ্যেই সম্পাদক রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় আমাকে টেলিফোন করে আরও লেখা দিতে অনুরোধের মোড়কে আদেশ দিলেন। তারপর থেকে দুই দশক ধরে আমি 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় লিখেছি বা রঞ্জিতবাবু আমার ঘাড়ে ধরে লেখা আদায় করেছেন। তাঁর অকালমৃত্যুর খবর পাওয়ার পর আমি লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলুম।

একজন আদর্শ সম্পাদক ছিলেন রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়। কত ভাবে যে আমাকে উৎসাহিত করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আমার লেখার ভুলভ্রান্তিগুলো দেখিয়ে দিয়েছেন। আমি যে সাহিত্যজগতে একেবারে আনকোরা তা জেনেও নিঃস্বার্থভাবে আমাকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। কোনোদিন আমাকে সরিয়ে রাখার বা চেপে দেওয়ার কোনোরকম চেষ্টা করেননি। বরং আমাকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁরই উপদেশ অনুসরণ করে ভূতের গল্প লিখতে

শুরু করি। আমার মতো আরও কত অজ্ঞাতকুলশীল লেখক যে রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রেরণায় সাহিত্যক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা আমার জানা নেই। আজ এই লেখার মাধ্যমে আমার জীবনের সেই সম্পাদকশ্রেষ্ঠকে আমার সশ্রদ্ধ ও সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানাচ্ছি।

এর কিছুদিন পরে অধুনা স্বর্গীয় শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড অনীশ দেব আবার আমাকে লেখার জগতে নিয়ে আসেন। আমি তাঁদের প্রতিও চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।

আজ থেকে দশ বছর আগে আমি *কালরাত্রি* নামক একটি অলৌকিক গল্পের বই প্রকাশ করেছিলুম। মাত্র পাঁচশো কপি ছাপা হয়েছিল। এরপর আর ছাপা হয়নি কারণ পরিবেশক আমাকে জানিয়েছিলেন যে সেই বইয়ের দু-একটা কপি মাত্র বিক্রি হয়েছিল। তারপরে আর কোনো বই প্রকাশ করবার উৎসাহ পাইনি।

কিছুদিন আগে হঠাৎই বুক ফার্ম-এর শ্রীশান্তনু ঘোষ আমার কাছে আসেন ও আমার যাবতীয় লেখা একাধিক বইয়ের আকারে প্রকাশ করার প্রস্তাব দেন। আমি প্রথমে রাজি হইনি, তবে তাঁর সাহিত্যে গবেষণায় গভীর আগ্রহ, কর্তব্যবোধ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রবণতা আর উৎসাহ আমার অকৃত্রিম বলে মনে হয়েছিল। সেই কারণে আমি তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দিই। যে সময়ের মধ্যে এবং যে উচ্চমানে আমার প্রথম বইটি (*৫×৫ = পঁচিশ*, পাঁচমিশেলি গল্প সংকলন) প্রকাশিত হল, তাতে আমি নিঃসন্দেহ যে আমার অনুমানে কোনো ভুল হয়নি। প্রকাশক, আলংকারিক শিল্পী শুভ্র চক্রবর্তী ও যাঁরাই এই বই প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের সকলের কাছে ঋণী রইলুম।

এখানে একথা বলে রাখা ভালো যে এই বইটি, তার পূর্বসুরি, *কালরাত্রি*র পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ। কলেবরে প্রায় দ্বিগুণ। এই বইয়ের পাঠকদের প্রশংসা এবং নিন্দা সবই শ্রীশান্তনু ঘোষের জন্য তোলা রইল।

মনোজ সেন

ছুটি কাটাল অনুপম

ছেলেবেলা থেকেই রাকাকে ভয় পেয়ে আসছে অনুপম। অথচ, শাস্ত্রমতে রাকাকে জন্মাতে দেখেছে সে। সেদিনের কথা অবশ্য ওর মনে নেই, তবে একটা দৃশ্য ওর স্পষ্ট মনে পড়ে। ষোলো নম্বর প্রভাত ঘোষ রোডের ওদের বাড়ির সামনের লনে ওরা দু-জন খেলছে। অনুপম তখন ক্লাস সিক্সে পড়ে আর রাকা ক্লাস টু-তে। স্কুল-স্কুল খেলা। রাকা টিচার আর অনুপম ছাত্র। ভীষণ কড়া টিচার রাকা। অনুপমকে নানারকম শাস্তি দিচ্ছে আর সে বেচারি সব শাস্তি মাথা পেতে নিচ্ছে। আর দোতলার বারান্দায় অনুপমের মা সেই দৃশ্য দেখে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছেন।

রাকার বাবা বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন দশ নম্বরে। মস্ত পণ্ডিত মানুষ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন আর দেশে-বিদেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। রাকার মা সেইজন্যে বছরে অনেকটা সময়ই তাঁকে ছাড়াই কাটাতে বাধ্য হতেন।

রোজ বিকেলে রাকা আসত ষোলো নম্বরের লনে খেলতে। আরও অনেক ছেলেমেয়ে আসত, তবে রাকার প্রতি অনুপমের মা-র একটা বিশেষ স্নেহ ছিল। তাঁর মেয়ে ছিল না। এই ফুটফুটে বাচ্চাটি তাঁর সেই অভাব কিছুটা পূরণ করেছিল। প্রায়ই দেখা যেত, অনুপমের মা-র পেটের ওপর বসে রাকা তাঁর দেওয়া চকোলেট চুষতে চুষতে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে আর উনি মুগ্ধ বিস্ময়ে সেসব শুনে যাচ্ছেন।

এর ফলে অনুপম আর ছোটো ভাই রূপমকে রাকার অনেক অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে হত। মাকে বলে লাভ নেই, কারণ তাঁর বিচারে রাকা সবসময়েই বেকসুর খালাস পেয়ে যেত। অনুপমের মাঝে মাঝে মনে হত ওর মা রাকাকেই ওর চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। রাকার মা শান্ত, নির্বিরোধ মানুষ। তিনি অনুপমের মা-র মনের ব্যাপারটা বুঝতেন। সেজন্যে মাঝে মাঝে 'মেয়েটাকে বেশি আস্কারা

দিও না তো, শমিতা,' বলা ছাড়া আর বিশেষ কোনো প্রতিবাদ করতেন না। তা ছাড়া, রাকা যতক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকে ততক্ষণ তিনি একটু অবসর পান— এটাও কম কথা ছিল না।

রাকা যখন আর একটু বড়ো হল, তখন তার প্রতাপ আরও বাড়ল। অনুপম তো দূরস্থান, ওর বাবা নির্মল মজুমদার পর্যন্ত তার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতেন। কে বলবে যে ভদ্রলোক একটা কোম্পানির দোর্দণ্ডপ্রতাপ জেনারেল ম্যানেজার। রাকার সামনে একেবারে কেঁচো। আর অনুপম তো অনবরত 'আঃ অনুপমদা, তুমি কিচ্ছু বোঝো না' বা 'অনুপমদা, তুমি একবারে বোকা' বা 'অনুপমদা, তুমি কিচ্ছু জানো না,' শুনতে-শুনতে একেবারে জেরবার হয়ে গেল। সবাইকে বকে, ধমকে, তরিবত শিখিয়ে মজুমদার বাড়িটা সিধে করে রাখত রাকা।

অনুপমের মাধ্যমিক পরীক্ষার কিছুদিন আগে এক রবিবার বিকেল বেলা চায়ের টেবিলে শমিতা বললেন, 'রাকা তুই তো বড়োই হয়ে গেলি প্রায়। অনুপমকে বিয়ে কর-না, তাহলে সবসময় আমাদের বাড়িতে থাকতে পারবি।'

শুনে নির্মল সমেত বাকি চারজনই প্রায় তাদের চেয়ার থেকে উলটে পড়ে যাচ্ছিল। অবশ্য চারজনের পড়ে যাওয়ার কারণ চাররকম— নির্মল শঙ্কিত, রূপম সন্দিগ্ধ, অনুপম স্তম্ভিত। আর রাকা? রাকার হাসি আর থামে না।

কোনোরকমে হাসি সামলে বলল, 'তুমি যে কী বলো মাসি! অনুপমদাকে বিয়ে করব কী! অনুপমদা তো একেবারে বাচ্চা ছেলে।'

শুনে অনুপম তো রেগেই গেল। বলল, 'ওঃ আমি আমি বাচ্চা ছেলে আর তুই বুড়ি হাবড়ি না? তোকে কে বিয়ে করছে রে? আমি জঙ্গলে গিয়ে থাকব, তবু তোকে বিয়ে করব না।'

'এঃ। জঙ্গলে গিয়ে থাকবে! সেদিন রামধনের গোরুটা মাথা নেড়েছিল বলে যা ছুট মেরেছিলে। গোরুকে যে ভয় পায় সে কখনো জঙ্গলে থাকতে পারে?'

'ভয় পাব না তো কী? আমি তো ভেবেছিলুম গোরুটা শিং নেড়ে আমাকে গুঁতো মারতে আসছে। তোর জন্যেই তো। রামধন গোয়ালার বাগান থেকে সাদা জবা চুরি করতে বলেছিলি কেন? দিইনি তোকে সেই ফুল এনে?'

নির্মল বললেন, 'তুই রামধনের বাগান থেকে ফুল চুরি করেছিস? তোকে ধরলে তো মেরে ঠ্যাং খোঁড়া করে দিত রে। আর ও-কাজ করিসনি।'

শমিতা মুচকি হেসে বললেন, 'রামধন তো এখন বুড়ো হয়ে গেছে। তুমি যখন ওর বাগান থেকে ফুল চুরি করতে তখন তো ও জোয়ান ছিল, ওর বাবাও বেঁচে ছিল। ধরা পড়লে দু-জনে মিলে তোমাকে একেবারে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়ে দিত।'

অনুপম ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বলল, 'তুমিও বাবা?'

নির্মল মুখে একটা অটল গাম্ভীর্য রাখার প্রচণ্ড প্রয়াস করতে করতে বললেন, 'উপায় ছিল না। তোর মা ওই ফুলই চাইত কিনা।'

অনুপম হাত-পা ছুঁড়ে বলল, 'আমিও তো তাই। রাকা বলল।'

রাকা মুখ ভেংচে বলল, 'এঃ রাকা বলল! জানো মাসি। সেদিন বললুম, অনুপমদা এই সুচটায় একটু সুতো ভরে দেবে? কত কী যে করল! থুতু লাগিয়ে সুতোটা ন্যাতপেতে করে দিল, দু-বার হাত থেকে সুঁচ ফেলে দিল, তারপর খোঁচা খেল, শেষটা সব ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল।'

শমিতা হাসতে হাসতে বললেন, 'ওরে, ও তো তাও চেষ্টা করেছিল। ওর বাবা হলে চেষ্টাই করত না।'

অনুপমের মাধ্যমিক পরীক্ষার পর হঠাৎ মজুমদার বাড়িতে অশান্তির কালো ছায়া ঘনিয়ে এল। অনুপম যে সব ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল তা নয়, কিন্তু এটুকু জেনেছিল যে ওর বাবার কোম্পানিতে গণ্ডগোল বেধেছে। মাঝে-মাঝেই ওঁর বাড়ি ফিরতে দেরি হতে লাগল। একদিন একদল লোক লাল ঝাণ্ডা নিয়ে এসে বাড়ির সামনে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল। ঢিল ছুড়ে জানলার কাচ ভেঙে দিল। সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। ঘন্টাখানেক বাদে পুলিশ এসে ভিড় সরাল। তার পরদিন থেকে ওর বাবা অফিসে যাওয়া বন্ধ করলেন। অনুপম শুনল ওদের কোম্পানিতে লক আউট। কিছুদিন বাদে নির্মল দিল্লি চলে গেলেন। শমিতা আর দুই ছেলেকে শ্যামপুকুরে ওদের মামাবাড়িতে রেখে গেলেন। যেদিন ফিরে এলেন, সেদিন দুপুর বেলা দুই ভাই জানতে পারল যে তারা বিদেশে যাচ্ছে বাবা-মার সঙ্গে।

শমিতা বললেন, 'তোদের বাবার কোম্পানি কলকাতার অফিস বন্ধ করে দিয়েছে। তবে ওঁকে আর তোদের সুধীরকাকুকে ওদের হংকং অফিসে ভালো পোস্টে অফার দিয়েছে। আমরা পরশু দিনই চলে যাচ্ছি। ভাগ্যিস আমাদের পাসপোর্ট করানো ছিল, তাই একসঙ্গেই যেতে পারব আমরা।'

'আমার পড়াশুনোর কী হবে?' জিগ্যেস করল অনুপম।

'তুই ওখানেই পড়বি। তোর ছোটমামাকে বলে দিচ্ছি। ও তোর রেজাল্ট বেরুলে সব কাগজপত্র ওখানে পাঠিয়ে দেবে।'

সেই রকমই হল। পরদিন সন্ধে বেলা নির্মল আর শমিতা বেরিয়ে গেলেন। অনেক রাত্রে ফিরলেন চারটে সুটকেস নিয়ে। শমিতা কাঁদছিলেন কিন্তু নির্মলের মুখ ছিল গম্ভীর, বিষণ্ণ আর চিন্তিত। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এক সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে পা বাড়াচ্ছিলেন নির্মল। তাঁর তো চিন্তিত হওয়ারই কথা।

অনুপম জানত যে, রাকারা তখন কলকাতায় নেই। একমাসের ছুটিতে ওর বাবা-মার সঙ্গে গিয়েছিল পুরী বেড়াতে। কাজেই ওকে কিছু বলে আসার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।

হংকং-এ গিয়ে শান্তশিষ্ট নিরীহ বাঙালি পরিবারটি হঠাৎ প্রচণ্ডবেগে ছুটতে শুরু করে দিল। ওদের বাবা নতুন কর্মক্ষেত্রে প্রবলভাবে নিজেকে লিপ্ত করে দিলেন। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না— তাঁকে অনেক কমবয়েসি অথচ হংকং অফিসের পুরোনো লোকেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লড়াইয়ে নামতে হয়েছিল। দুই ভাই গিয়ে ভরতি হল আন্তর্জাতিক স্কুলে। সেখানেও প্রবল প্রতিযোগিতা, নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। আর আত্মীয়-বান্ধবহীন বিদেশে একা বাড়িতে হাঁপিয়ে উঠে শমিতাও একটা চাকরি নিয়ে নিলেন। ফলে, এই নতুন পরিবেশে, নতুন জীবনযাত্রায়, কলকাতার একটি দুই বিনুনি করা, স্কার্ট পরা বারো বছরের ফর্সা গোলগাল মেয়ে কোথায় হারিয়ে গেল। মাঝে মাঝে শ্যামপুকুর থেকে অথবা দুর্গাপুরে নির্মলের দাদা-বউদির কাছ থেকে চিঠিপত্র আসে কিন্তু তাতে রাকার কোনো উল্লেখই থাকে না। আর চিঠি লেখার ব্যাপারে অনুপমের চিরকালই অনীহা। কাজেই সে যে রাকাকে চিঠি লিখবে, তাও হয়ে উঠল না। ফলে, রাকার কথা আর কারুর মনেই রইল না।

কিন্তু, সত্যিই কি তাই? স্মৃতি থেকে কিছু কি একেবারে মুছে যেতে পারে বা মুছে ফেলা যায়? স্মৃতির ভেতরে কিছু হারিয়ে গেলেই তা লুপ্ত হয়ে যাবে— এটা বোধ হয় ঠিক নয়।

হংকং থেকে এ লেভেল পাশ করে অনুপম চলে গেল ইংল্যান্ডে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার জন্য। ওর মেধা ছিল, হংকং-এর স্কুলের চাপ মেধাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। ফলে ওর পরীক্ষাগুলোর ফল বেশ ভালোই হয়েছিল। এ ছাড়া আরও একটা ব্যাপার হয়েছিল। পড়াশুনোর ফাঁকে-ফাঁকে কোনো বদ নেশার ভেতরে না-গিয়ে ও স্বাস্থ্যচর্চা শুরু করেছিল। বডি বিল্ডিং নয়— ক্যারেটে, কুংফু জাতীয় নিরস্ত্র অবস্থায় আত্মরক্ষার কৌশলগুলো রপ্ত করার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিল। ফলে ওর ভেতরে একটা শক্তির উদ্ভব হয়েছিল, যেটা বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যেত না। পেশিসর্বস্ব দৈত্যাকৃতি শরীর নয়, মাঝারি গড়নের দেহের ভেতর যে কতখানি ক্ষমতা গোপন ছিল সেটা যে ওর সঙ্গে আখড়ায় না-নেমেছে, তার পক্ষে সম্যক উপলব্ধি করা কঠিন ছিল।

বদ নেশা করুক বা না-করুক প্রকৃতি তো চুপ করে বসে থাকে না। জলে-স্থলে কত ছলে সে মায়াজাল গেঁথেই চলে, তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন কর্ম। অনুপমও সেই জালে

জড়িয়ে পড়েছিল প্রথমদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী স্বর্ণকেশী লিন্ডা লারসেন-কে দেখে স্বেদ, স্তম্ভন, মূর্ছা ইত্যাদি না-হলেও, বেশ ভালো মতোই প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। ততোধিক ভালো মতোই প্রত্যাখাতও হয়েছিল। ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি হয়েছিল যে তার দুটো ফল হয়েছিল। প্রথমত আঘাতটা খুব গভীরে পৌঁছয়নি আর দ্বিতীয়ত ঠিক নির্বেদ উপস্থিত না-হলেও দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে এদিকে ঝাঁপ মারতে যাওয়াটা যে নির্বুদ্ধিতা সেটা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল।

দিগ্বিদিকজ্ঞানলাভ মুলতুবি হয়ে গেল কয়েক মাস বাদেই। পড়াশুনোর চাপ এমন বাড়ল যে পাঠ্যক্রমের বাইরে অন্য কোনো ব্যাপারে জ্ঞানার্জনের সময়ই রইল না। সপ্তাহান্তে একটা সিনেমা হয়তো দেখা যেত, কিন্তু তাতেও বিবেকদংশনের হাত থেকে নিস্তার ছিল না।

ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এমএসসি করল অনুপম। তারপর একটা ইটালিয়ান কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে এল জাকার্তায়। এই কাজটা ওর পছন্দ হল কারণ এখান থেকে হংকং যাতায়াত করা খুব কষ্টসাধ্য বা ব্যায়সাপেক্ষ নয়। চাকরিটাও পাকা হল ছ-মাস বাদে। তার প্রায় বছর দেড়েক বাদে নির্মল ওকে ডেকে পাঠালেন।

নির্মল বললেন, 'এই ছ-মাস আগে ঘুরে গেলি। আবার তোকে ডেকে পাঠাতে বাধ্য হলুম। তোকে একবার কলকাতা যেতে হবে। ছুটি পাবি? আমি জানি, তোর এখন ভীষণ কাজের চাপ। তবুও...'

অনুপম বলল, 'ছুটি পাওয়া কঠিন হবে। তবে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। ব্যাপারটা কী? কলকাতা কেন?'

'তোর ছোটোমামার ছেলে চিঠি লিখেছে। পত্রপাঠ আমাকে যেতে বলেছে। বাড়িটা নিয়ে কোনো গণ্ডগোল বেধেছে। লিখেছে, বাবা মারা যাওয়ার পর আমি সামলাতে পারছি না।'

'কী গণ্ডগোল কিছু লিখেছে?'

'বিস্তারিত কিছু লেখেনি। কিন্তু যা লিখেছে আমি তার ঠিক মানে বুঝতে পারছি না। লিখেছে যে আমাকে নাকি বাড়িটা বিক্রি করতে হবে। নইলে নানারকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। আমার বাড়ি। আমাকে সেটা বিক্রি করতে হবে— এর অর্থ কী তা তো বুঝতে পারছি না।'

'আমার তো মনে হয় কারুর হয়তো বাড়িটা খুব পছন্দ হয়েছে। উনি ওটা কিনতে চান তাই ঝন্টুর ওপরে চাপ দিচ্ছেন। ও সেই চাপ সামলাতে পারছে না।'

'আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু ও যে লিখেছে বাড়িটা বিক্রি করতে হবে— এই করতে হবেটা কেন? কীসের এই বাধ্যবাধকতা? মনে হচ্ছে এর মধ্যে আরও ব্যাপার আছে। তাই

বলি কী, তুই যা। আমি বুড়ো হয়ে গেছি। হয়তো সবকিছু সামাল দিতে পারব না।'

'ঝামেলা যখন, তখন বাড়িটা বিক্রি করে দিলেই হয়।'

কথাটা বলামাত্র নির্মল আর শমিতা দু-জনেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। নির্মল দৃঢ় গলায় বললেন, 'না অনুপম, তা হয় না। আজ এই ন-বছর এই বিদেশে পড়ে আছি। একবারও যেতে পারিনি ঠিকই; কিন্তু স্বপ্ন দেখি যে আর পাঁচটা বছর কাটাতে পারলে রিটায়ার করে ওখানেই গিয়ে উঠব। ও-বাড়িতে আমার ঠাকুরদার কাছে শুনতুম ইতিহাসের কত গল্প, ওর লনে বাবার সঙ্গে ক্রিকেট খেলা হত, ওই বাড়িতেই তোর মাকে বিয়ে করে এনেছিলুম, তোরা বড়ো হলি। আজ সেইসব ভুলে এককথায় বাড়িটা বিক্রি করে দেব— তা হয় না। তোর যদি অসুবিধে থাকে তো বল। দরকার হলে আমি একাই যাব।'

প্রবলবেগে মাথা নেড়ে অনুপম বলল, 'না, না, আমার কোনো অসুবিধে নেই। আমি কালই জাকার্তা ফিরে গিয়ে ছুটি নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতায় রওনা হচ্ছি।'

শমিতা বললেন, 'হ্যাঁরে, তোর রাকাকে মনে আছে?'

'রাকা? হ্যাঁ মা, মনে আছে। তোমার ইচ্ছে ছিল যে ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, তাই না?'

'হ্যাঁ। তুই যাচ্ছিস যখন, তখন ওদের একবার খোঁজ করে দেখিস।'

'তা দেখব। তবে তোমার ইচ্ছেপূরণ হবে বলে তো মনে হয় না। সে যেন এতদিন তোমার জন্যে বসে আছে! কবে বিয়ে-থা হয়ে গেছে।'

'তা হোক। তবু একবার খোঁজ নিস। আর তোরও তো বিয়ের বয়েস হল। দেখিস না, ওখানে যদি কাউকে তোর পছন্দ হয়। তোকে কিছু বলতে তো সাহস হয় না। তুই বিয়ে করবি, সেটা তোর ব্যাপার। তুই যাকে খুশি বিয়ে কর, আমরা কিছুই বলব না। তবে কী জানিস, বাঙালি মেয়ে বিয়ে করলে আর কিছু না-হোক, দুটো বাংলায় কথা বলে শান্তি পাবি।'

নির্মল হাত নেড়ে বললেন, 'ঠিক বলেছ। দিনরাত এই ইংরেজি বলতে বলতে জীবনটা একেবারে মরুভূমি হয়ে গেল। সেইজন্যেই তো কলকাতার আশায় বসে আছি। রিটায়ার করে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বাজার করব, কার্তিকের দোকান থেকে জিলিপি আর সিঙাড়া কিনে খাব আর বাড়ি ফিরে মৌরলা মাছের ঝোল দিয়ে একথালা ভাত মেরে দেব। ওই হারামদাজা রূপমটা যে একটা আমেরিকান মেয়ের পেছনে দৌড়চ্ছে— দুঃখ আছে ওর কপালে।'

হংকং থেকে জাকার্তার প্লেনে বসে অনুপমের মনে অনেক দিন আগে হারিয়ে যাওয়া রাকার স্মৃতিটা উঠে এল। সেই ফর্সা মোটাসোটা মেয়েটা ওর ওপরে অনেক দৌরাত্ম্য করেছে ঠিকই কিন্তু তাতে ওর কোনোদিনই খারাপ লাগেনি। ও বরং খুশিই হত। আচ্ছা,

অনুপম কি রাকার প্রেমে পড়েছিল? প্রেম বলতে যা বোঝায় তা হয়তো সেই বয়সে ঠিক দানা বাঁধতে পারেনি, তবে রাকার প্রতি ওর যে একটা পক্ষপাতিত্ব গড়ে উঠেছিল, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। রাকা বললে যে কাজ— তা যতই কঠিন হোক না-কেন— অনুপম সানন্দে করত, অন্য কোনো মেয়ে বললে তা করত কি না সন্দেহ আছে।

রাকার এখন বয়েস কত হবে? বাইশ বোধ হয়। বিয়ে হয়ে গেছে কি না কে জানে? অনুপমকে দেখলে চিনতে পারবে কি এখন? ওর তো অনেক পরিবর্তন হয়েছে এই ক-বছরে। সেই রোগাপটকা হাফপ্যান্ট পরা মাধ্যমিকের ছাত্র আর নেই। রাকাই বা এখন কেমন হয়েছে, তেমনই মোটাসোটাই আছে? তেমনই চঞ্চল আর ফূর্তিবাজ?

এসব প্রশ্নের যে উত্তরগুলো অনুপমের জন্য অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না।

এয়ারপোর্ট থেকে ঝন্টু অনুপমকে নিয়ে তুলল শ্যামপুকুরে। সেই বিশাল বাড়িটা আজ প্রায় ফাঁকা। মামারা সকলেই গত হয়েছেন। বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। ভাইদের মধ্যে মাত্র দু-তিনজনই এ-বাড়িতে রয়েছে। বাকি সবাই বম্বে বা ব্যাঙ্গালোরে বা বিদেশে চলে গেছে, ফিরবে তার সম্ভাবনা কম।

ঝন্টু বলল, 'অনেক রাত হয়ে গেছে। তুই শুয়ে পড়। কাল সকালে তোকে প্রবলেমটা বলব।'

পরদিন সকালে প্রবলেমটা জানা গেল। ব্যাপারটা খুব গুরুতর বলে মনে হল না অনুপমের। যা ঘটছে তা হল— ষোলো নম্বর প্রভাত ঘোষ রোডের বাড়িটা হরিরাম বাজাজ বলে কলকাতার এক মস্ত প্রমোটার কিনে নিতে চান। তিনি সেখানে একটা মাল্টিস্টোরিড ফ্ল্যাট বাড়ি তুলবেন। যত ফ্ল্যাট হবে তার মধ্যে পাঁচটা দেবেন নির্মল মজুমদারকে। খুব আধুনিক বাড়ি হবে। আগাগোড়া মার্বেল, দুটো লিফ্‌ট, জেনারেটার ইত্যাদি। এক-একটা ফ্ল্যাট কমপক্ষে এগারো-শো স্কোয়ারফিট হবে। ঝন্টুর মতে এটা একটা অত্যন্ত ভালো লাভজনক প্রস্তাব। এটা অস্বীকার করাটা বোকামির চূড়ান্ত হবে।

অনুপম বলল, 'এর জন্যে তুই আমাকে ডেকে আনলি? এ ব্যাপারটা স্পষ্ট করে চিঠিতে লিখে দিলেই হত। জবাব একটাই— নির্মল মজুমদার ও-বাড়ি বিক্রি করবেন না। খামোকা আমার দশদিনের ছুটি নষ্ট হল।'

ঝন্টু বলল, 'শোন অনুপম, বিক্রি করব না বললেই হল না। তুই এই প্রোমোটারদের জানিস না। যে প্রপার্টির ওপর ওদের নজর পড়ে সেটা কবজা না-করা পর্যন্ত ওরা থামে না।'

'আমার বাড়ি। আমি যদি না-বিক্রি করি তো কী করতে পারে এরা?'

ঝন্টু হাসল। বলল, 'কী করতে পারে? কী করতে পারে না তাই জিগ্যেস কর। প্রথমত বাড়িতে, অফিসে লোক পাঠিয়ে, টেলিফোন করে ছোটোপিসি আর

পিসেমশায়ের জীবন অতিষ্ঠ করে ছাড়বে। তাতে যদি না-হয়, তখন অত্যাচার শুরু করবে। তোদের বাড়িতে আমাকে ঢুকতে তো দেবেই না, উলটে দরজা-জানলা সব খুলে নিয়ে যাবে। ইলেকট্রিক আর টেলিফোনের লাইন কেটে দেবে। আরও কত কী করবে তার সীমা নেই।'

অনুপম বলল, 'বটে! তা বাবা-মা তো থাকেন হংকং-এ সেখানে কী করতে পারে এরা?'

'আরে, হংকং তো কাছে। আমেরিকায় পর্যন্ত এদের গুণ্ডাবাহিনী আছে। এদের ক্ষমতা সম্পর্কে তোর কোনো ধারণাই নেই। দরকার হলে খুনখারাপি করতেও এরা পিছপা হয় না।'

'একটা সামান্য বাড়ির জন্যে এরা এত কিছু করবে?'

'সামান্য বাড়ি? ওই বাড়ি থেকে কত টাকা লাভ হবে কল্পনা করতে পারিস?'

'কত টাকা?'

'একটা হিসাব কর। তোদের বাড়ির জমি হল দশ কাঠার একটু বেশি। ধর দশ কাঠা। তার মানে সাত হাজার দু-শো স্কোয়ারফিট। ওই রাস্তায় ফ্লোর এরিয়া রেশিও হল তিন। তার মানে তুই যে বাড়ি তৈরি করবি ওখানে তার ফ্লোর এরিয়া হবে একুশ হাজার ছ-শো স্কোয়ারফিট। জমিটা তো কোনো দাম দিয়ে কিনছে না। তাহলে একুশ হাজার ছ-শো স্কোয়ারফিট তৈরি করতে যদি সাত-শো টাকা করে ধরিস তাহলে খরচা পড়ছে এক কোটি একান্ন লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। তোদের দেবে পাঁচটা ফ্ল্যাট মানে পাঁচ হাজার পাঁচ-শো স্কোয়ারফিট। তাহলে বিক্রি করার জন্য রইল কত? ষোলো হাজার এক-শো স্কোয়ারফিট। তোদের পাড়ায় এখন ফ্ল্যাটের দর যাচ্ছে খুব কম করে ধরলেও দু-হাজার টাকা স্কোয়ারফিট। তাহলে রোজগার হল কত টাকা? তিন কোটি বাইশ লক্ষ টাকা। প্রফিট কত? এক কোটি সত্তর লক্ষ আশি হাজার টাকা। এবার বল, এই টাকার জন্যে দু-চারটে খুন করা কি কোনো ব্যাপার?'

'তুই বললি এটা আমাদের পক্ষে লাভজনক প্রস্তাব। কীভাবে?'

'কীভাবে? পাঁচটা ফ্ল্যাটের দাম কত ভেবে দেখেছিস? এক কোটির ওপরে। কোনো ইনভেস্টমেন্ট বা ঝামেলা ছাড়াই। সেটা লাভজনক নয়?'

'ইনভেস্টমেন্ট নেই কী বলছিস? এই প্রস্তাবে রাজি হলে বাবাকে যা ইনভেস্ট করতে হবে টাকায় তার হিসাব হয় না।'

'সেটা কী?'

'সে তুই বুঝবি না। এবার তুই অফিসে যা। আমি বাড়িটা একবার দেখে আসি।'

'যা। কিন্তু ঢুকতে পাবি না। গেটে দরওয়ান বসিয়েছি। সে আমি সঙ্গে না থাকলে স্বয়ং বাজপেয়ীকেও ভেতরে ঢুকতে দেবে না। চিঠি লিখে দিলেও না। আর শোন, যেখানেই যাস ছ-টার মধ্যে এখানে ফিরে আসবি। বাজাজকে খবর দিয়েছি। সে আজ অফিসে

আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। যদি দেখাসাক্ষাৎ করতে হয় তো আজই করিয়ে দেব। ওকে যা বলার তুই-ই বলবি।'

ট্যাক্সি থেকে নেমে অনেকক্ষণ বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে রইল অনুপম। বাড়িটা যেন কারুর আশায় চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে আছে। বন্ধ দরজা-জানলাগুলোর পেছনে কত হাসি, কত গান, কত আনন্দ যে ঢাকা পড়ে আছে সেটা বাইরে থেকে দেখলে বোঝার উপায় নেই। সামনের লনে বড়ো বড়ো ঘাস গজিয়েছে, পেছনের বাগানটা শুকিয়ে গেছে, তবু যেন তার হৃদপিণ্ডটা এখনও চলমান রয়েছে। সবকিছু একেবারে মরে যায়নি। বাড়িটা যেন সেই দিনের অপেক্ষায় বসে রয়েছে যেদিন তার দরজা-জানলাগুলো আবার খুলে যাবে, ভেতরে আলো জ্বলে উঠবে, কান্নাহাসির দোল দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা পুরোদমে আবার শুরু হয়ে যাবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনুপম পেছন ফিরল। এবার যেতে হবে দশ নম্বরে। কিন্তু তার আগেই রাস্তার উলটোদিকের একটা বাড়ি থেকে একজন ভদ্রলোক ওকে ডাকলেন। পঞ্চাশের ওপরেই বয়েস হবে ভদ্রলোকের। মাথাভরতি টাক। কালো প্যান্ট, কালো টাই, সাদাশার্ট আর কালো কোট পরে ব্রিফকেস হাতে বাড়ি থেকে বেরুচ্ছিলেন। বললেন, 'আপনি অনেকক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেখছি। আপনাকে কি সুব্রত চ্যাটার্জি পাঠিয়েছেন?'

অনুপম বলল, 'তা বলতে পারেন। সুব্রত চ্যাটার্জি আমার মামাতো ভাই।'

'মামাতো ভাই? তার মানে আপনি কি নির্মলদার...?'

'বড়ো ছেলে। আমার নাম অনুপম।'

'আরে তাই তো! অনুপমই তো বটে! তুমি আমাকে চিনতে পারছ? আমি অ্যাডভোকেট পঙ্কজ পালচৌধুরি। আমাকে মনে আছে তোমার?'

'নিশ্চয়ই মনে অছে পঙ্কজকাকু। আমরা যখন বাইরে যাই, তখন আপনি অনেক রোগা ছিলেন আর মাথাভরতি ছিল...।'

'যাকগে, যাকগে। সেসব কথা মনে করিয়ে আর দুঃখ দিও না। শোনো অনুপম। তুমি কি আজ সন্ধে বেলা আমাদের বাড়িতে আসতে পারবে? অনেক দরকারি কথা বলবার ছিল তোমার সঙ্গে।'

'আজ তো পারব না কাকু। সন্ধে বেলা ঝন্টু মানে সুব্রত আমাকে নিয়ে কোথায় যাবে বলেছে।'

'তুমি কি তাহলে আজ দুটোর পর আমার সঙ্গে আলিপুর কোর্টে দেখা করতে পারবে? চার নম্বর বার লাইব্রেরি। ওখানে যাকে বলবে, সে-ই তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, তা যেতে পারি। আচ্ছা কাকু, দশ নম্বরের ব্যানার্জিদের কোনো খবর রাখেন?'

দু-জনে তখন পাশাপাশি হাঁটছিলেন। পঙ্কজ বললেন, 'তা রাখি বই কী। তবে ওদের

কোনো খবরই তো সুখের নয়। যাও না তুমি। ভারতীদি আছেন। ওঁর কাছেই সব খবর পাবে। আমি এখন তাহলে চললুম। দেরি হয়ে গেছে। তোমাদের সব খবরাখবর আজ দুপুরেই জেনে নেব, কেমন?' বলে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে তাতে উঠে পড়লেন।

কোনো খবরই সুখের নয় এ কথার অর্থ কী? চিন্তিত, শঙ্কিত মনে অনুপম গিয়ে দশ নম্বরের বেল বাজাল। যিনি দরজা খুললেন, তাঁকে দেখে অনুপম একেবারে স্তম্ভিত।

এ কী চেহারা হয়েছে ভারতীমাসির! কাঠির মতো রোগা, দু-চোখের নীচে কালো ছায়া, মাথার চুল প্রায় ন্যাড়া করে কাটা, পরনে একটা আধময়লা থান।

ঘোলাটে চোখ তুলে ভারতী বললেন, 'কে?'

অনুপম নিজের পরিচয় দেওয়ামাত্র ওকে জড়িয়ে ধরে সজোরে কেঁদে উঠলেন ভারতী। বললেন, 'অনুপম তুই! এতদিন পরে এলি? এতদিন একটা খবরও নিতে পারিসনি? বার বার ওর মুখে হাত বুলোন আর বলেন, 'ইস্‌! একেবারে শমিতার মুখটা বসানো।'

কান্নার বেগ কমলে আর ভারতীর কুশল প্রশ্ন শেষ হলে, অনুপম বলল, 'মেসোমশাই তো চলে গেছেন, বুঝতেই পারছি। কী হয়েছিল?'

ভারতী বললেন, 'সন্ন্যাস রোগ। প্রথম স্ট্রোকেই চলে গেলেন। ক্লাসে পড়াতে পড়াতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। ছাত্ররা সঙ্গেসঙ্গে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায়। জ্ঞান আর ফিরে আসেনি।'

'কবে হল এই ব্যাপার?'

'তোরা চলে যাওয়ার তিন বছর বাদে। রাকার মাধ্যমিকের তখন আর এক বছর বাকি।'

'রাকা এখন কী করছে?'

প্রশ্নটা শুনে উদ্‌ভ্রান্ত চোখে অনুপমের দিকে তাকালেন ভারতী। বললেন, 'রাকা? সেই রাকা আর নেইরে? ও শেষ হয়ে গেছে।' বলে আবার সজোরে কেঁদে উঠলেন।

'শেষ হয়ে গেছে, মানে? রাকা নেই?'

কোনোরকমে কান্না থামিয়ে ভারতী বললেন, 'না-না, বালাই ষাট। তবে না থাকারই মতো আছে। বেঁচে মরে আছে।'

'ও কোথায়? কেউ কি ওর ওপরে অত্যাচার করছে?'

'করছে বাবা। ওর ওপরে ভয়ানক অত্যাচার করছে। মেয়েটা আধমরা হয়ে রয়েছে, তাও কোনো নিস্তার নেই। আর এসব কথা কাউকে বলতে তো পারিনে। কেউ বিশ্বাস করবে না। তোকে বললুম। হয়তো তুই কিছু বুঝতে পারবি।'

'কে ওর ওপরে অত্যাচার করছে মাসিমা?'

'ওর স্বামী। আবার কে?'

'কী করেন ওর স্বামী?'

'কী আবার করবে? দু-বছর হল মরে গেছে। হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল।'

শুনে অনুপম একেবারে স্তম্ভিত। একটু সময় লাগল ওর নিজেকে সামলে নিতে। বলল, 'মরে গেছে? তবে যে বললেন, অত্যাচার করছে?'

'তাই করছে বাবা। তোর হয়তো অসম্ভব বলে মনে হতে পারে। কিন্তু, তাই হচ্ছে।'

অনুপমের মনে হল অনেক শোকতাপ পেয়ে ভদ্রমহিলার মাথাটা গেছে। খুব সন্তর্পণে বলল, 'আর একটু খোলসা করে বলবেন, মাসিমা?'

'কী আর বলব? রাকার বাবা সারাজীবন শুধু ছাত্র পড়িয়েছেন, টাকাপয়সার কথা চিন্তাই করেননি। যখন চলে গেলেন, এই বাড়িটা আর প্রভিডেন্ট ফান্ডের কিছু টাকা ছাড়া আর কিছুই রেখে যেতে পারেননি। খুব অর্থকষ্টে পড়েছিলুম তখন। দোতলাটা ভাড়া দিয়ে দিলুম। তাতে কিছুটা সাশ্রয় হল। এদিকে মেয়ে বড়ো হচ্ছে, তার বিয়ে দেব কী করে, সেই চিন্তায় অস্থির হলুম। রাকা যখন হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় পাশ করল, তখন অদ্ভুতভাবে একটা সম্বন্ধ এল। বউবাজারের নিত্যানন্দ মুখুজ্যেদের নাম শুনেছিস কি না জানি না। ওঁরা খুব শিক্ষিত পরিবার আর রঘুলাবাদের জমিদার। জমিদারি চলে গেছে কিন্তু চালচলন সেইরকম। ওঁদেরই ছোটোতরফের কৃষ্ণানন্দ মুখুজ্যের একমাত্র ছেলে নীলাঞ্জনের সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে এল ওঁদেরই আরেক তরফের এক ছেলের বউ— সুমিত্রা। সে আবার আমার দূরসম্পর্কের ননদ। পণ লাগবে না, কিছু দিতে হবে না। সে তো আমার আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার অবস্থা।'

অনুপম জিগ্যেস করল, 'কী কাজ করতেন এই নীলাঞ্জন?'

'সে লাইব্রেরিয়ানশিপ পাশ করে কী একটা কলেজের লাইব্রেরিয়ানের কাজ করত। তবে ওদের যা সম্পত্তি তাতে চাকরি না করলেও চলত। বিয়ের পর প্রথম প্রথম সব ঠিক ছিল। পরে দেখা গেল, রাকাকে নীলাঞ্জন বাপের বাড়ি আসতে দিতে চায় না। কদাচিৎ সঙ্গে করে আনে, সঙ্গে করে নিয়ে যায়। একা আসার তো প্রশ্নই ওঠে না। রাত্রেও থাকতে দিতে চায় না।

আমি প্রথম প্রথম ভাবতুম, আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার বলে হয়তো আসতে দেয় না। পরে জানতে পারলুম তা নয়। নীলাঞ্জনের ছিল প্রচণ্ড সন্দেহ বাতিক। সে সন্দেহ করত যে রাকা এমন সুন্দরী যখন তখন নিশ্চয়ই পাড়ার কোনো ছেলের সঙ্গে ভাব আছে। একা এলে বা রাত্রের অন্ধকারে ও যদি তার সঙ্গে পালিয়ে যায়। রাকার কারুর সঙ্গে ভালোবাসা আছে বা ছিল কি না জানবার জন্য প্রথম দিকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে প্রশ্ন করত, পরে সোজাসুজি, তারপরে মারধোর। ছেলেটা চাকরি ছেড়ে দিল। দিনরাত রাকাকে পাহারা দেয়। বাড়ির লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ হল। এমনকী আমার সঙ্গে কথা বললেও আড়ি পেতে শুনত।

অনেক বুঝিয়েছিলেন ওর বাবা-মা। কৃষ্ণানন্দবাবু তো অত্যন্ত ভালো লোক। ওঁর স্ত্রী প্রথমদিকে ছেলের দিকে টেনে কথা বলতেন। ছেলে যে বউকে বাপের বাড়ি যেতে দেয় না বা তার মেয়েবন্ধুদের সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করতে দেয় না আর সবসময় তার ওপর খবরদারি করে তাতে তিনি খুশিই ছিলেন। পরে উনিও ভয় পেয়ে যান। ব্যাপারটা যে স্বাভাবিক নয়, সেটা উনি বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু ওঁদের কিছু করবার ছিল না। একমাত্র ছেলে, ছোটোবেলা থেকে শুধু আদরই দিয়ে এসেছেন, শাসন করেননি। তাই এই বয়েসে সে প্রশ্নই আর উঠতে পারে না।

অথচ, রাকা কী বলত জানিস? বলত, নীলাঞ্জন মানুষ হিসেবে খারাপ ছিল না। ওর ভেতরে দয়ামায়া ছিল, অন্যের দুঃখকষ্টে বিচলিত হত, তাদের সাহায্য করত। কিন্তু রাকা যে কষ্ট পাচ্ছে, তার যে দম বন্ধ হয়ে আসছে, সেটা বুঝতেই পারত না। তার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে ওর ঘরের চৌহদ্দির বাইরের জগৎটা ভয়ানক নোংরা। সেখানে যারা ঘুরে বেড়ায় তারা সবাই মানুষের মুখোশ পরা রাক্ষস, কেউ সৎ নয়, কেউ সরল নয়। অতএব সে যা করছে সেটা রাকার ভালোর জন্যেই করছে। রাকাকে সৎপথে রাখা এবং তার শরীরটাকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব তো তার। অতএব সে সবসময় রাকাকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখাই উচিত বিবেচনা করত। রাকা বলত, এটা একটা অসুখ, মনের অসুখ।'

অনুপম জিগ্যেস করল, 'আপনি কী বলেন?'

'আমি তো বলি যে এটা ওর স্বভাব। বাবা-মা সারাজীবন পুতুপুত করে রেখেছেন আর সেইজন্যে বাইরের জগৎটা সম্পর্কে ওর মনের ভেতরে একটা অবিশ্বাস আর আতঙ্ক জন্মে গেছে। অসুখ সারানো যায়, স্বভাব সারানো যায় না। ওই যে কথায় বলে না, স্বভাব যায় না মলেও। এর মতো খাঁটি কথা আর হতে পারে না।'

'রাকা চলে এল না কেন বাড়ি ছেড়ে?'

'তার দুটো কারণ ছিল। প্রথমত ভয়ে। ও জানত যে বেরিয়ে এলে নীলাঞ্জন ঠিক আসবে পেছনে পেছনে আর হয়তো রাগে উন্মাদ হয়ে ওকে মেরে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবে। আর দ্বিতীয়ত বাড়ি ছেড়ে যাবে আর কোথায়? আমার তো এই অবস্থা। দু-জনের চলবে কী করে? রাকা যে চাকরি নেবে তার উপায় নেই। শুধু হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা পাশ করে কোনো ভদ্রস্থ চাকরি আজকাল পাওয়া যায় না। আর নীলাঞ্জন যা ভাবত তার কিছুটা তো সত্যি। একটা সহায়-সম্বলহীন সুন্দরী মেয়ে এই শহরে বেশিদিন টিকে থাকতে পারে? তাই সে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করত। যুক্তি দিয়ে তর্ক করে নীলাঞ্জনকে বোঝাতে চেষ্টা করত। কোনো লাভ হয়নি।'

'রাকা এখন কোথায় আছে?'

'ওই বাড়িতেই। যাবে কোথায়? যেখানেই যায়, ওর পেছনে পেছনে নীলাঞ্জন গিয়ে উপস্থিত হয়।'

'কী করে বোঝেন?'

'ধর, ও আমাদের এই বাড়িতে এল। পাঁচ মিনিট যেতে-না-যেতেই ওর শরীরের কোথাও, হয় পেটে, নয় পায়ে, নয়তো মাথার ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাবে। যতক্ষণ-না বাড়ি ফিরে যাবে ততক্ষণ চলতেই থাকবে।'

'ডাক্তার দেখিয়েছেন?'

'দেখিয়েছি। নানারকম টেস্ট হয়েছে। কিছু পাওয়া যায়নি। শুধু যে রাকাই যন্ত্রণা পায় তা তো নয়, অন্য লোকেও পায়। ও যদি বাজারে যায় সঙ্গে ওর শ্বশুর থাকেন, তখন যদি কেউ ওর দিকে একটু বেশি সময় তাকাল, তো ব্যস। সে লোকটা হয় পা পিছলে পড়ে হাত ভাঙবে, নয়তো বঁটিতে আঙুল কেটে রক্তারক্তি করবে, নয়তো তার মাথার ওপর টালি খসে পড়বে।'

অনুপম এবারে আর হাসি চাপতে পারল না। বলল, 'মাসিমা, এই যুগে বসে আপনি এসব কথা বিশ্বাস করেন? এক কাজ করুন। আমাকে রাকার টেলিফোন নম্বরটা দিন। আমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি।'

ভারতী বললেন, 'তা দেব। কিন্তু সাবধানে থাকিস বাবা। তুই আমার কথা বিশ্বাস করবি না, জানি। এখন দ্যাখ, যদি রাকার সঙ্গে কথা বলতে পারিস।'

'কথা বলতে পারব না বলছেন? ওকে টেলিফোন ধরতে দেবে না?'

'ওর বাড়ির লোক দেবে। নীলাঞ্জন দেবে না। চেষ্টা করে দ্যাখ।'

প্রভাত ঘোষ রোডের মধুবন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে প্রচুর পরিমাণে রাধাবল্লভী আর আলুর দম খেয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে আলিপুর কোর্টের দিকে রওনা হল অনুপম। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে ও ভাবছিল যে কী করুণ অবস্থা হয়েছে ভারতী মাসির। তাড়াহুড়ো করে রাকার বিয়েটা দিয়েই ভুল করেছিলেন ভদ্রমহিলা। ওকে অন্তত গ্র্যাজুয়েশনটা শেষ করতে দেওয়া উচিত ছিল; তাহলে হয়তো ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াত না। যেসব ঘটনাগুলো বললেন তাদের কোনোটাই অতিপ্রাকৃত বলে মনে হল না অনুপমের। এদের প্রত্যেকটারই সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বেচারি রাকা অকারণে কষ্ট পাচ্ছে। আজ সন্ধে বেলা ফোন করে দেখতে হবে ব্যাপারটার গুরুত্ব কতখানি।

আলিপুর কোর্টে অ্যাডভোকেট পঙ্কজ পালচৌধুরিকে খুঁজে বের করল অনুপম। ছোটো ছোটো নোংরা কাপে চা খেতে খেতে কথাবার্তা শুরু হল। কুশল প্রশ্নাদি শেষ করে পঙ্কজ বললেন, 'তুমি হঠাৎ এখানে এসেছ কেন? তোমাদের বাড়িটার একটা ব্যবস্থা করতে কি?'

মাথা নেড়ে অনুপম বলল, 'প্রায় ঠিকই বলেছেন। আমি এসেছি বাড়িটার কোনো ব্যবস্থা না-করতে।'

পঙ্কজ হাসলেন। বললেন, 'বুঝেছি। বাড়িটা বিক্রি করতে চাও না, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই বটে।'

'পারবে বলে মনে হয় না। তেমন-তেমন সম্পত্তি হলে যারা বাড়িতে বাস করছে তাদেরই বের করে ছাড়ছে প্রোমোটাররা। তোমরা তো প্রবাসী। আটকাতে পারবে? এরা বড়ো বিপজ্জনক লোক।'

'ঝন্টুও সে-কথাই বলছিল।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন পঙ্কজ। বললেন, 'কী করেন তোমার এই মামাতো ভাইটি?'

'একটা জুটমিলের কলকাতার হেডঅফিসে চাকরি করে। পারচেস ডিপার্টমেন্টে।'

'তোমাদের বাড়িটা কি উনিই দেখাশুনো করেন?'

'হ্যাঁ। আগে ছোটোমামা, মানে ওর বাবা করতেন। বছরখানেক আগে ছোটোমামা মারা গেছেন। এখন ও দায়িত্ব নিয়েছে।'

'দায়িত্বটা কী স্বেচ্ছায় নিয়েছেন না তোমার বাবা দিয়েছেন?'

'বাবাই দিয়েছে। ও কোনো আপত্তি করেনি।'

'তুমি হয়তো ভাবছ আমি কেন তোমাকে এত জেরা করছি, তাই না? কথাটা তোমাকে তাহলে পরিষ্কার করে বলাই ভালো। তোমার এই ভাইটি সম্পর্কে একটু সাবধানে থাকবে। বিশেষ কোনো কথা বলবে না। পেটের কথা মুখে আনবে না।'

'ঝন্টুর সম্পর্কে সাবধানে থাকতে হবে? কেন?'

'কিছু মনে কোরো না। তোমার মামা ছিলেন দেবতুল্য লোক। তোমার ভাইটি কিন্তু তা নয়। তার নানারকম বদ নেশা আছে। সেসব খবর তোমার সমস্ত জানা তো সম্ভব নয়।'

'আপনি জানলেন কী করে?'

'তার জন্য কষ্ট করতে হয়েছে। তোমার ছোটোমামা গত হওয়ার পর একজন খুব সৎ আর ভদ্র প্রোমোটারকে নিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করেছিলুম। অত্যন্ত অভদ্রভাবে উনি আমাদের প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়েছিলেন। এমনকী আমি নির্মলদার ঠিকানা চেয়েছিলুম। তা-ও দেননি। অথচ, এই মাসতিনেক আগে সেই ভদ্রলোকই একটা বিরাট গাড়িতে করে হরিরাম বাজাজকে এনে বাড়িটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখালেন।'

'এই লেনদেনে ঝন্টুর কিছু প্রাপ্তিযোগ আছে, এই তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। সেইজন্যেই বলছি, শুধু একজনের কথায় নেচো না। ভালো করে বাজিয়ে নাও। তোমার ওই বাড়ি কিন্তু সোনার খনি।'

'ওটা আমাদের বসত বাড়ি।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। তবে সোনার খনির ওপরে বাড়ি থাকলে সেটা কি রাখা চলে? তবে হ্যাঁ, বিক্রি যদি নেহাত-ই না-করতে চাও এবং বাড়িটা বাঁচাতে চাও, তাহলে ওই সুব্রত চ্যাটার্জির ওপর নির্ভর কোরো না। হরিরাম তোমাদের কিছুতেই টিঁকতে দেবে না। বরং অন্য কোনো রাস্তার কথা ভাবো।'

'কে এই হরিরাম বাজাজ? একে আপনি চেনেন?'

'আমি আলিপুর কোর্টের উকিল। আমি ওকে চিনব না? হাড়ে-হাড়ে চিনি। এই কোর্টেই ওর নামে অন্তত পঞ্চাশটা কেস ঝুলছে। কাউকে টাকা নিয়ে ফ্ল্যাট দেয়নি। কোথাও একই ফ্ল্যাট তিনজনকে বেচেছে, কোথাও কর্পোরেশনের স্যাংশনের বাইরে কনস্ট্রাকশন করেছে, কোথাও ফ্ল্যাটে হেন দেব-তেন দেব বলে একগাদা টাকা নিয়ে সে-সব না-দিয়ে ভুসিমাল দিয়েছে। ওর কি গুণের কোনো শেষ আছে? কিন্তু কেউ ওর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারছে না। এত টাকা লোকটার। আইনের ও থোড়াই কেয়ার করে। যে ওর ল্যাজে পা দিয়েছে তাকে খুন করতেও ওর কোনো দ্বিধা নেই। করেছেও অনেক।'

'এ তো ভয়ানক লোক দেখছি। ঝন্টু আমাকে হিসাব করে দেখাল যে আমাদের জমি থেকে প্রায় এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকার প্রফিট ওঠানো যেতে পারে।'

পঙ্কজ বাধা দিয়ে বললেন, 'এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা ওর হাতের ময়লা। ও অন্তত পাঁচ কোটি টাকা ফায়দা ওঠাবে ওখান থেকে। সিমেন্ট সরাবে, লোহা সরাবে, আমা ইঁট লাগাবে, ওঁচা টালি লাগাবে। তা ছাড়া, লেনদেনে যে কত কিছু করবে তার ইয়ত্তা নেই।'

'চমৎকার। আপনি তাহলে কী করতে বলেন?'

'দ্যাখো, বাড়িটা যদি বাঁচাতে চাও তাহলে হয় তোমরা এসে থাকো, তা না-হলে একজন কেয়ারটেকার বসাও। যেমন-তেমন কেয়ারটেকার হলে চলবে না। তাকে হরিরামের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মতো শক্তিমান হতে হবে। যাতে কেউ তাকে একটা চড় মারলে, সে উলটে পাঁচটা চড় কষাতে পারে।

'এরকম লোক আমি পাব কোথায়? আমি তো এখানে কাউকেই চিনি না।'

'আমাকে তো চেনো। আমি তোমাকে লোক দেব। নির্মলদার বাড়িটা রক্ষা করা আমারও কর্তব্য। আমার সন্ধানে এরকম কয়েক জন আছে। তারা আমার অত্যন্ত অনুগত। তাদের আমি কোনো-না-কোনো সময়ে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিলুম। এখন তারা আমার কথায় ওঠে-বসে। তোমার বাবা যখনই কলকাতায় আসবেন তখনই ওরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। আর যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার। এখন যা ছিরি হয়েছে ওই বাড়ির! ঘাস কাটা হয় না, বাগানটা যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে। আমি এসব একেবারে পালটে দেব। নির্মলদা একটা ঝকঝকে বাড়িতে ফিরে আসবেন।'

অনুপম যখন শ্যামপুকুরে ফিরল তখন পাঁচটা বাজে। ঝন্টুর ফিরতে তখনও দেরি

আছে। ওর রান্নার লোক সাধুচরণের দেওয়া এককাপ চা নিয়ে টেলিফোনের সামনে বসল অনুপম। রাকাকে ফোন করাটা সেরে নেওয়া দরকার।

ফোন ধরল একটি নারীকণ্ঠ। প্রশ্ন হল, 'কাকে চান?'

অনুপম বলল, 'আমি কি একটু রাকার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

পুনরায় প্রশ্ন হল, 'কে আপনি?'

'আমি প্রভাত ঘোষ রোডের নির্মল মজুমদারের ছেলে অনুপম মজুমদার।'

টেলিফোনের ওপাশে যেন এক-শোটা সেতারের ঝংকার উঠল, 'অনুপমদা। তুমি কোত্থেকে?'

তার পরেই গলাটা ভারী হয়ে এল, 'আমরা তো ভেবেছিলুম তুমি বুঝি একেবারে হারিয়েই গেছ। আমার ফোন নম্বর পেলে কোত্থেকে? কবে এসেছ?'

'তোর মা-র সঙ্গে দেখা করেছি আজ। উনি নম্বরটা দিলেন। এসেছি কাল রাত্রে।'

'সব শুনেছ?'

'হ্যাঁ। শুনেছি। তবে সবটা কি না জানি না। যা শুনেছি, সেটা কিন্তু মোটেই আনন্দজনক নয়।'

'আনন্দ? আমার জীবন থেকে সব আনন্দ চলে গেছে, অনুপমদা। একটা অন্ধকূপের মধ্যে পড়ে আছি। মাসি কেমন আছেন? মেসোমশাই? তোমরা?'

'আমরা ভালো আছি।' বলতে-বলতেই ফোনের মধ্যে একটা শব্দ শুরু হল। অনেকটা করাতকলে কাঠ চেরার আওয়াজের মতো। প্রথমে আস্তে, ধীরে ধীরে তার তীব্রতা বাড়তে লাগল।

অনুপম বলল, 'এঃ! তোদের কলকাতার টেলিফোন একেবারেই যাচ্ছেতাই। এমন শব্দ হচ্ছে।'

গলা তুলে রাকা বলল, 'কলকাতার টেলিফোনের দোষ নেই, অনুপমদা। ওটা আমার পরলোকগত স্বামীর কীর্তি। উনি আমাকে পরপুরুষের হাত থেকে রক্ষা করছেন।'

হঠাৎ অনুপমের মাথায় একটা প্ল্যান এল। বলল, 'সেটা কোনো অন্যায় কাজ করছেন বলে তো মনে হয় না। সব স্বামীর, তা তিনি জীবিতই হন বা পরলোকগত হন, কর্তব্য হল তাঁদের স্ত্রীদের বদলোকেদের হাত থেকে রক্ষা করা। তোর স্বামী তো আমাকে চেনেন না। কাজেই তিনি যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে তোকে বাধা দেন, তাহলে ভুল কাজ কিছু তো করছেন না।'

অদ্ভুতভাবে তৎক্ষণাৎ কাজ হল। আওয়াজের তীব্রতাটা কমে এল অনেকটা।

রাকা বলল, 'না ভুল কাজ করছেন না! আমি তো একটা মানুষ, এইভাবে একটা বন্দী জন্তুর মতো বেঁচে থাকা সম্ভব?'

আওয়াজটা আবার বাড়তে শুরু করল।

অনুপম বলল, 'তোর অসুবিধে হয়তো হচ্ছে। কিন্তু এ ছাড়া উপায় কী বল? দুনিয়াটা যে কত খারাপ সে বিষয়ে তোর কোনো ধারণাই নেই। এই তো আমাকেই দ্যাখ। বিদেশ থেকে এসে যে চক্করে পড়েছি— ভয়াবহ! আসতে-না-আসতেই। তুই চাস বা না চাস এই ভয়ংকর চক্র তোকে কেটে টুকরো টুকরো করার জন্য সবসময় বনবন করে ঘুরছে।'

আওয়াজটা আবার অনেকটা কমে গেল।

রাকা বলল, 'একী! অনুপমদা! তুমি দেখছি একেবারে নীলাঞ্জনের মতো কথা বলছ।'

'বলতেই হবে। তোর স্বামী বুদ্ধিমান পুরুষ ছিলেন। আর তুই-ই তোর মা-কে বলেছিস যে উনি ছিলেন সহৃদয় ভদ্রলোক। কাজেই উনি যা করছেন সেটা তোর ক্ষতি করার জন্য নিশ্চয়ই নয়।'

রাকা প্রায় আর্তনাদ করে বলল, 'বিদেশে থেকে তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে দেখছি!'

আওয়াজটা এখন আর প্রায় শোনাই যাচ্ছে না।

অনুপম বলল, 'আমার বুদ্ধি কিচ্ছু লোপ পায়নি আর তোরও ঘটে কিছু বুদ্ধি আছে বলে জানতুম। একটু ভেবে দেখিস যে', বলে আস্তে-আস্তে থেমে-থেমে বলল, 'আমি যে তোর সঙ্গে এতক্ষণ কথা বললুম তাতে তোর উপকার হল কি না।'

'আমি কিছু ভেবে দেখব না। দেখতে চাই না।'

'ছেলেমানুষি করিসনি। তোর সঙ্গে আমার একবার দেখা করা দরকার। এসব কথা টেলিফোনে হয় না। তোকে ভালো করে বোঝাতে হবে।'

'আমি বাবার সঙ্গে কথা বলে তাঁর অনুমতি নিয়ে নিচ্ছি। তুমি কাল সকালে টেলিফোন করো।'

'তুই বেশি কথা বলিস না। আমি ওঁর সঙ্গে গিয়ে কথা বলব প্রথমে। তোর সঙ্গেও যা কথা তা ওঁর সাক্ষাতেই হবে— এই অনুমতিটা নিয়ে রাখিস।'

ক্ষীণকণ্ঠে জবাব এল, 'তাই হবে, অনুপমদা।'

টেলিফোনটা রেখে চোঁ-চোঁ করে চা-টা শেষ করে ফেলল অনুপম। ওর বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা তখনও ধড়ফড় করছিল। চিতপাত হয়ে খাটে শুয়ে পড়ে মনে মনে বলল, 'জিন্দাবাদ কৈতববাদ।' তবে একটা সন্দেহ মনের মধ্যে রয়েই গেল— রাকা ইঙ্গিতটা ধরতে পারবে তো?

ঋন্টু ফিরল পৌনে ছ-টা নাগাদ। বলল, 'তুই এসে গেছিস? চল তোকে বাজাজের অফিসে নিয়ে যাই। কাছেই অফিস।'

অনুপম বলল, 'দাঁড়া, দাঁড়া! ব্যস্ত হোসনি। চা-টা খা। আর ততক্ষণ তোকে ক-টা প্রশ্ন করি।'

'কী প্রশ্ন?'

'আমি আজকে প্রভাত ঘোষ রোডে গিয়েছিলুম। সেখানে অ্যাডভোকেট পঙ্কজ পালচৌধুরির সঙ্গে দেখা হল। আলিপুর কোর্টের উকিল। তুই ওঁকে চিনিস?'

'পঙ্কজ পালচৌধুরি? না তো। এরকম নামের কাউকে তো মনে করতে পারছি না।'

'ভদ্রলোক না কি তোর কাছে একজন প্রোমোটারকে নিয়ে এসেছিলেন। তুই তাঁকে ঘাড়ধাক্কা দিয়েছিলি।'

'তা হতে পারে। গুচ্ছের প্রোমোটার, তাদের উকিল, কর্মচারী আর ফড়েরা এখানে এসেছে— তোদের বাড়ি নিয়ে কথা বলতে। আগে বাবা তাদের ঘাড়ধাক্কা দিত, এখন আমি দিই। এদের কাউকেই মনে করে বসে থাকিনি।'

'এরা খবর পায় কী করে?'

'এটা একটা প্রশ্ন হল? অমন একটা প্রপার্টি জলজ্যান্ত চোখের ওপর বছরের-পর-বছর তালাবন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে আর তার খবর এরা পাবে না? আজ থেকে নাকি? আজ অনেক বছর হল এরা আসছে আর ঘাড়ধাক্কা খেয়ে ফিরে যাচ্ছে।'

'এই বাজাজকে দিসনি কেন?'

'দিতে গিয়েছিলুম। তখন দেখি আমারই ঘাড় থেকে মুণ্ডুটা খসে যাওয়ার মতো অবস্থা।'

'সে আবার কী?'

'লোকটা খুব শান্ত গলায় আমাকে জানাল যে গ্লোব জুটমিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি দয়াশঙ্কর টিকমানি ওঁর শ্যালক এবং তাঁকে বললে গ্লোবের পারচেস ডিপার্টমেন্টের জনৈক সুব্রত চট্টোপাধ্যায়ের চাকরির ইতি হওয়াটা কোনো ব্যাপারই নয়। আর, এতে যে ইউনিয়ন কোনো হস্তক্ষেপ করবে না সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। অতএব আমি যেন তাঁর এজেন্ট শ্রী পাঁচুগোপাল সাউ-এর সঙ্গে ব্যাকালাপ করি। তুই তো জানিস, এ বাজারে চাকরি গেলে কী অবস্থা হয়। তার ওপর নীলিমার বাবা-মা বিয়ের তারিখ স্থির করবার জন্য চাপাচাপি শুরু করে দিয়েছেন। কাজেই ঘাড় ধাক্কা না-দেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলুম।'

'তোকে টাকা অফার করেনি?'

'তা-ও করেছে। এক লাখ টাকা কমিশন দেবে বলেছে। তবে পাঁচুগোপালের কাছে তার মালিকের গল্প যা শুনলুম তাতে ওই টাকাটা যে কাগজে কলমেই থাকবে আর আমার ব্যাঙ্কে কোনোদিনই ঢুকবে না, সে বিষয়ে দ্বিমত থাকার কোনো অবকাশই নেই।'

'আচ্ছা, যদি আমরা আমাদের বাড়িতে একজন কেয়ারটেকার রাখি তাহলে কী

হয়? বেশ পালোয়ান গোছের একটা লোক, যে বাড়ি পাহারা দেবে, বাজাজের আক্রমণ সামলাবে আর আমরা এলে বাড়িটা ছেড়ে দেবে।'

'ছেড়ে দেবে? তুই গাধা নাকি রে? এরকম শাপভ্রষ্ট দেবতা আজ পৃথিবীতে কোথাও আছে?'

'পঙ্কজ উকিল তো বললেন যে তাঁর সন্ধানে এরকম লোক আছে যে তাঁর কথা ঠেলতে পারবে না। ঠিক বাড়ি ছেড়ে দেবে।'

'নাঃ! বিদেশে এত বছর কাটিয়ে তোর এখানকার হালচাল সব মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে দেখছি। তুই উকিলি প্যাঁচটা ধরতে পারলি না। পরে যদি বলে, বললুম তো। ছাড়ছে না। কী করি! তখন তুই কোথায় যাবি? বাজাজের প্রস্তাবে রাজি হলে অন্তত পাঁচটা ফ্ল্যাট পাবি। এক্ষেত্রে তোর বাড়িটা যাবে। একটা পয়সাও পাবি না। ভাবছিস কেস করবি? সে গুড়ে বালি। উকিলের সঙ্গে লড়ে জীবনেও পারবি না। পিসেমশাই রিটায়ার করে শান্তিতে থাকবেন, না কোর্ট-কাছারি থানাপুলিশ করে বেড়াবেন? ওসব আইডিয়া ছাড়। এখন চল, বাজাজের সঙ্গে দেখা করে আসবি।'

'বাড়ি আমার। বাজাজ খরিদ্দার। আমি কেন ওর কাছে যাব? আমি কি আলতা, সাবানের ফিরিওলা। দরকার হয় তো ও আসবে আমার কাছে।'

'বেশ। আমি ফোন ধরিয়ে দিচ্ছি। তুই কথা বলে নে।'

বাজাজ বললেন, 'আপনি যা বললেন অনুপমবাবু, সেটা বুদ্ধিমানের মতো কথা হল না। আজ কলকাতা শহরে অতবড়ো একটা সম্পত্তি রাখা যে কী খরচের ব্যাপার তা বোধ হয় আপনি জানেন না। বাড়ি পরিষ্কার রাখতে, সারাতে কত টাকা যে যাবে তার সীমা নেই। তার ওপর ট্যাক্স। ফতুর হয়ে যাবেন। কত বাঙালি ভদ্রলোক প্রথমে না-বলে পরে আমার কাছেই এসেছেন। আপনাদেরও আসতে হবে।'

অনুপম বলল, 'বাড়ি পরিষ্কার রেখে সারিয়ে, ট্যাক্স দিয়ে ফতুর হয়ে আপনার কাছে যেতে সময় লাগবে হরিরামবাবু। আমার ছেলে হয়তো আপনার নাতির কাছে যাবে। কাজেই ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এখন কী লাভ?'

'আপনাদের একটা সামাজিক কর্তব্যও তো আছে। কলকাতায় এত থাকবার জায়গার অভাব। সেখানে অতবড়ো একটা জমি আটকে রাখাটা অন্যায়।'

'হরিরামবাবু, আপনি ওখানে ক-টা ফ্ল্যাট বিক্রি করবেন, ভাবছেন? দশটা? বারোটা? সেখানে যাঁরা আসবেন তাঁরা কেউই থাকবার জায়গার অভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে তো মনে হয় না। কাজেই ন্যায়-অন্যায়ের বিচারটা মুলতুবি রাখাই ভালো।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। আমি আপনাদের ছ-টা ফ্ল্যাটই দেব। আপনার বাবার একটা

দু-ভাই-এর দুটো। বাকি তিনটে ফ্ল্যাট বিক্রি করলে যা পাবেন তাতে কোনো অসুবিধে হবে না। এটাই কিন্তু আমার শেষ প্রস্তাব। এবার খুশি তো?

'ওরে বাবা! এ যে একেবারে কালনেমির লঙ্কাভাগ করে দিলেন আপনি। যাক, আপনার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ। তবে আমার বাবা এই প্রস্তাবে রাজি হবেন না, এটা আপনি ধরে নিতে পারেন।'

হরিরাম বাজাজ এতক্ষণ খুব শান্ত, প্রায় ঘুমন্ত গলায় কথা বলতে যেন কষ্ট হচ্ছে, এইভাবে বাক্যালাপ করছিলেন। এইবার ওঁর কণ্ঠস্বরে একটু প্রাণের ছোঁয়া লাগল। বললেন, 'রাজি না-হলে অবশ্য কিছু যায় আসে না। হরিরাম বাজাজ যা চায় সেটা সে নিয়ে থাকে। তবে তাতে কিছু খরচা আছে। সেটা পুষিয়ে নিতে আমার অফারটা হয়তো কমে যেতে পারে। সিধে আঙুলে যদি ঘি না-ওঠে তাহলে অন্য রাস্তা তো নিতেই হবে।'

'ভালো কথা। আপনার যে রাস্তা খুশি আপনি নেবেন।'

সে রাত্রে হংকং-এ টেলিফোন করল অনুপম। নির্মল বললেন, 'ঠিক কাজ করেছিস। আমি জীবনে কখনো অন্যায় শক্তির কাছে মাথা নীচু করিনি। তুইও করিস না। এক কাজ কর। এখানে চলে আয়। কী করবে বাজাজ? বাড়িটা দখল করে নেবে জোর করে? করলে করবে। তখন যদি লড়াই করতে হয়, তাই করা যাবে। তুই চলে আয়। আর বিপদে পড়লে ব্যারিস্টার পবিত্র গুপ্ত-র কাছে যাবি। আমার নাম করলেই হবে।'

অনুপম বলল, 'তাই যাব। তবে ফিরব আর কয়েকটা দিন পরে। অন্য একটা প্রব্লেম আছে। সেটা মা-কে বলছি। মা-ই তোমাকে বলবে।'

রাকার কথা শুনে শমিতা বললেন, 'এসব কী হচ্ছে কী? তুই এক্ষুনি রাকার বাড়িতে যা। যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় ওকে উঠিয়ে নিয়ে শ্যামপুকুরের বাড়িতে নিয়ে আয়। ঝন্টুকে বলে পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে ওকে যেন যত শিগগির সম্ভব হংকং-এ পাঠিয়ে দেয়। ততদিন ও সেজোবউদির কাছে থাকবে না-হয়।'

অনুপম হাসতে হাসতে বলল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। অত ব্যস্ত হলে হয়? তোমাকে তো বললুম, ব্যাপারটা খুব সোজা নয়। আস্তে আস্তে এগোতে হবে, নইলে গণ্ডগোল হওয়ার সম্ভাবনা।'

মাঝরাতে ফোন এল আমেরিকা থেকে। রূপম মহা উত্তেজিত। বলল, 'করেছিস কী দাদা! একদিকে ভয়ংকর ক্রিমিন্যাল অন্যদিকে বীভৎস ভূত! দুটো একসঙ্গে সামলাতে পারবি, না আমিও যাব?'

'তুই এসে কী করবি? কোনো দরকার নেই। আমি একাই....'

'আমি জানতুম। পুরো মজাটাই তোর চাই। শোন, আমি রেডি হয়ে থাকছি। যদি দেখিস ব্যাপার গুরুতর ফোন করবি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।'

পরদিন ভোর বেলা পুলিশ এসে হাজির। একজন অফিসার আর দু-জন কনস্টেবল। অফিসার নিজের পরিচয় দিলেন শ্যামপুকুর থানার ওসি বলে।

ওসি বললেন, 'আপনি গত পরশু রাত্রে হংকং থেকে কলকাতায় এসেছেন?'

অনুপম নির্বিকার মুখে বলল, 'না।'

'মিথ্যে কথা। আমাদের কাছে খবর আছে। দেখি আপনার পাসপোর্ট।'

'আমি ভারতীয় নাগরিক। সবসময় পকেটে পাসপোর্ট নিয়ে ঘোরার কথা নয় আমার।'

'আপনাকে এখুনি থানায় যেতে হবে। নীচে আমাদের গাড়ি আছে। আর এ-বাড়ি আমরা সার্চ করব। আপনি অনেক বেআইনি মাল এনেছেন হংকং থেকে।'

'হংকং থেকে আসিনি যখন, তখন এই প্রশ্নই ওঠে না। আর বাড়ি সার্চ করতে ওয়ারেন্ট লাগে। সেটা এত তাড়াতাড়ি জোগাড় করে উঠতে পেরেছেন কি? আর থানায় আমি স্বেচ্ছায় যাব না। আমাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতে হবে। তারও ওয়ারেন্ট তো আনেননি। কী ভেবেছে হরিরাম বাজাজ? আমি একটি মেষশাবক? এই ঝন্টু, তুই এই নম্বরে ফোন কর তো। ব্যারিস্টার পি কে গুপ্তকে ঘটনাটা বলবি। বলবি, নির্মল মজুমদারের ছেলের তরফ থেকে কথা বলছি।'

অফিসার বললেন, 'ব্যারিস্টার দেখাচ্ছেন? ঠিক আছে। ভদ্রলোকের মতো যাবেন না যখন, তখন অ্যারেস্ট করেই নিয়ে যেতে হবে। আমি এবার ওয়ারেন্ট নিয়েই আসব। প্রস্তুত থাকবেন। পালাবার চেষ্টা করবেন না।'

'আমি এখানেই থাকব। পালাবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না।'

পুলিশ চলে যাওয়ার দশ মিনিট বাদেই ব্যারিস্টার গুপ্তর ফোন এল। বললেন, 'কাল রাত্রেই আমি তোমার বাবার ফোন পেয়েছি। সব শুনেছি। এত তাড়াতাড়ি সব শুরু হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। তোমার কোনো ভয় নেই। যদি চাও তো ডিসি কে বলে আমি তোমার পুলিশ প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আর একটা কথা। আমি শ্যামপুকুর থানায় ফোন করেছিলুম। ওরা বলল, ওসি সকাল থেকে থানাতেই আছেন, কোথাও যাননি।'

ঝন্টু অফিসে যাওয়ার সময় বলে গেল, 'সাবধানে থাকবি। কাউকে ফ্ল্যাটের দরজা খুলবি না। কোথাও যাবি না। আর যদি কোথাও যাস, কোথায় যাচ্ছিস সেটা সাধুচরণকে জানিয়ে যাবি।'

কোথাও যাবি না বললে তো আর হয় না। ঝন্টু যাওয়ার ঘন্টাখানেক বাদে অনুপম ফোন করল রাকার শ্বশুরবাড়িতে। ফোন ধরলেন কৃষ্ণানন্দবাবু। শান্ত, পরিশীলিত ভারী গলা। বললেন, 'আমি বউমার কাছে শুনেছি যে আপনি ওর বাল্যকালের প্রতিবেশী এবং পরিচিত। আপনি ওর সঙ্গে দেখা করতে চান। আপনি অবশ্যই আসতে

পারেন। কিন্তু এখানে এলে আপনার... ইয়ে... কিছু অসুবিধে হতে পারে। সে সম্পর্কে কি আপনি কিছু জানেন?'

অনুপম বলল, 'জানি।'

'আপনি হয়তো এসব কথা বিশ্বাস করেন না, কিন্তু আমরা করি। আর সত্যি কথা বলতে কী, করতে চাই। আমাদের একমাত্র সন্তান যে একেবারে চলে যায়নি, আমাদের কাছেই আছে— এই বিশ্বাসটা আমাদের বুড়োবুড়ির কাছে কত বড়ো সান্ত্বনা তা হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন।'

'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি। আপনাদের ছেলে অত্যন্ত হৃদয়বান। তিনি যে অকারণে আমার কোনোরকম অসুবিধে হতে দেবেন না— এই বিশ্বাসও আমার আছে।'

কৃষ্ণানন্দবাবুর গলাটা এবার একটু তরল হল। বললেন, 'তুমি, দেখছি যথেষ্ট সহৃদয় মানুষ। তুমি এসো বাবা। আজ বিকেলে, পাঁচটায়।'

সারা দুপুর অনুপম বাড়ির দলিলগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ে দেখল। কোথাও কোনো গলদ আছে কি না খুঁজে দেখল। পেল না। চারটে নাগাদ বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে বউবাজারের দিকে রওনা হল।

শিয়ালদার কাছাকাছি এসে ট্যাক্সিওয়ালা বলল, 'স্যার একটা নীলরঙের অ্যামবাসাডার আমাদের ফলো করছে বলে মনে হচ্ছে। গলিটলি দিয়ে বেরিয়ে যাব?'

অনুপম বলল, 'না, দেরি হয়ে যাবে। আপনি যেমন যাচ্ছেন তেমনিই যান।'

বাড়িটা খুঁজে পেতে একটু সময় লাগল। ঠিকানাটা বউবাজার স্ট্রিটের হলেও বাড়িতে ঢুকতে হয় একটা সরু কানাগলি দিয়ে কিছুটা ভেতরে ঢুকে। গলিটা নির্জন, যদিও সামান্য দূরেই বউবাজার স্ট্রিটের জনস্রোত বয়ে চলেছে।

অনুপম কলিং বেল বাজাতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিল। কড়া নাড়ল। দরজা খুলে দিলেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, হাতে লাঠি, মাথার চুল একেবারে সাদা, বলিরেখাঙ্কিত বিষণ্ণ মুখে মোটা ফ্রেমের চশমা। বললেন, 'তুমিই অনুপম? ভেতরে এসো।'

দরজা দিয়ে ঢুকেই ডানদিকে প্রকাণ্ড বসবার ঘর। একটা অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক সোফাসেট, একটা রাইটিং ব্যুরো, অনেকগুলো ছোটো ছোটো টেবিল, একটা আর্মচেয়ার আর দেয়ালে সম্ভবত পূর্বপুরুষদের কয়েকটা অয়েলপেন্টিং ঘরটা অলংকৃত করছে। এখানে আলো-হাওয়ার প্রবেশ বেশ সীমিত আর হয়তো সেইজন্যেই ঘর জুড়ে কেমন একটা ভ্যাপসা দম আটকানো গন্ধ।

কৃষ্ণানন্দবাবু বললেন, 'তুমি বোসো। আমি বউমাকে ডেকে দিচ্ছি।'

অনুপম বলল, 'না। আপনি রাকাকে ডেকে পাঠান। আপনি এখানেই থাকবেন। আপনার বউমার সঙ্গে যা কথাবার্তা তা আপনার সামনেই হবে।' বলে একটা সিঙ্গল সোফার ওপর বসল। সঙ্গেসঙ্গে ওর মনে হল যেন ওর পিঠের নীচে সোফার ভেতরে একটা মোটা সাপ কিলবিল করে নড়ছে। অন্য সময় হলে ও হয়তো চিৎকার করে লাফ দিয়ে উঠত। কিন্তু এরকমই কোনো কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিল বলে, যথাসাধ্য নির্বিকার মুখে বসে রইল।

কৃষ্ণানন্দবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। একটু বাদেই ফিরে এলেন। তাঁর পেছনে পেছনে এলেন একজন স্থূলকায়া বয়স্কা মহিলা আর তাঁর পেছনে রাকা। এই রাকা। সেই গোলগাল বাচ্চা মেয়েটির এত পরিবর্তন! এ যে অপূর্ব সুন্দরী! নাক-মুখ-চোখ-গড়ন—সব-ই যে নিখুঁত। উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা রাকার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল অনুপম। কিন্তু তা কয়েক মুহূর্তের জন্য। তার পরেই সম্বিত ফিরে পেল। না-পেয়েও উপায় ছিল না। উঠে দাঁড়িয়েছিল অনুপম। ওর মনে হল ওর ট্রাউজার্সের ভেতরে দু-পা বেয়ে দুটো মাকড়সা জাতীয় জীব খড়খড় করে ওপরে উঠছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে টিপ করে প্রণাম করল বয়স্কা মহিলাকে।

মহিলা দু-জনও হাঁ করে তাকিয়ে ছিলেন অনুপমের দিকে। রাকার শাশুড়ি বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবা। দীর্ঘজীবী হও। চা খাবে তো? তুমি বসো। আমি চা করে আনি।'

অনুপম বলল, 'না মাসিমা। চা খাব না। আমি অল্প সময়ের জন্য এসেছি। এখুনি চলে যাব। আপনি বসুন।' তারপর রাকার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই রাকা? তোকে তো চেনাই যায় না রে। কী সুন্দরী হয়েছিস তুই!'

রাকা হাসল। অসাধারণ হাসি। বলল, 'তুমিও খুব হ্যান্ডসাম হয়েছ, অনুপমদা। একেবারে ফিল্‌মস্টার মার্কা চেহারা।'

'যা, যাঃ! ফাজলামি করিস না। আগে দুষ্টু ছিলি এখন ফাজিল হয়েছিস।'

মাকড়সা দুটোর ঊর্ধ্বগতি একটু কমল কিন্তু বন্ধ হল না। সবাই বসলে রাকা দু-টি নিরাভরণ হাত কোলের ওপর রেখে বলল, 'কেমন আছ তোমরা? মাসি, মেসো, রূপমদা, তুমি?'

'আমরা সবাই ভালো আছি। এবার শোন। আমি দশদিনের ছুটিতে কলকাতায় এসেছি। তোর কথা মা-কে ফোনে জানিয়েছি। তোর বিয়ে আর তার পরের ঘটনাগুলো আমরা কিছুই জানতুম না। তা, সে যাই হয়ে থাক না-কেন, মা তোকে একটা উপহার দিতে চান। আমাকে বলেছেন, তোকে জিগ্যেস করে এখান থেকে কিনে দিতে।'

ম্লান হাসল রাকা। বলল, 'উপহার! আমাকে আর কী উপহার দেবে, অনুপমদা? তবে মাসির যখন ইচ্ছে তখন এইরকম একটা সবুজ পাড় মিলের শাড়ি কিনে দিও। কাজে লাগবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনুপম বলল, 'না, তা আমি দিতে পারব না। আচ্ছা, আমি যদি তোকে একটা রুপোর ফোটোফ্রেম দিই? তাতে তোর স্বামীর একটা ছবি লাগিয়ে রাখতে পারবি?'

বলতেই মাকড়সা দুটোর উর্ধ্বগতি বন্ধ হল। পিঠের নীচে সাপটার কিলবিল করাও স্থগিত রইল।

ঘাড় কাত করে রাকা বলল, 'বেশ তাই দিও' বলতে গিয়ে ওর ঠোঁটের কোণে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল। যে হাসির অর্থ একটাই। অনুপম বুঝল। ওর কাল রাতের ইঙ্গিতটা রাকা ধরতে পেরেছে।

অনুপম বলল, 'এরকমভাবে কতদিন চালাবি, বল তো। পড়াশুনো শুরু কর না। বাড়িতে বসেই পড়। অন্তত বি এ-টা পাশ কর। একসময় না-একসময় তো তোকে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে।'

'কোথায় নিজের পায়ে দাঁড়াব, অনুপমদা? কী হবে পড়াশুনো করে? বাড়ি থেকেই বেরুতে পারি না। একটা মেয়েদের গানের স্কুলে ভরতি হয়েছিলুম। সেখানে এমন উৎপাত শুরু করল যে লজ্জায় পালিয়ে এলুম।'

'সেখানে নিশ্চয়ই কিছু অসৎ লোক ছিল। সেইজন্যেই তোর স্বামী তোকে বাধা দিয়েছেন। কিন্তু এরকমভাবে তো চলতে পারে না। আপনারা কিছু ভেবেছেন? আপনাদের অবর্তমানে রাকা কোথায় যাবে বা কী করবে?'

কৃষ্ণানন্দবাবু বললেন, 'ভেবেছি বাবা। অনেক ভেবেছি, এখনও ভাবছি। কিন্তু কোনো সমাধানসূত্র খুঁজে পাইনি। আমাদের শরিকে শরিকে প্রবল ঝগড়াঝাঁটি। তাদের মধ্যে ও কোথাও আশ্রয় পাবে তা মনে হয় না। পেলেও সেখানে সসম্মানে থাকতে পারবে, তা মনে হয় না। ওর বাপের বাড়ি বা মামারবাড়ির দিকটাও ফাঁকা। যাঁরা আছেন তাঁদের কারুরই আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। ও এখন আমার মেয়ে। আমি আবার ওর বিয়ে দিতে চাই। কিন্তু পাত্র পাব কী করে? যে ক-জন কথাবার্তা বলতে এসেছিল, ভয় পেয়ে পালিয়েছে। নীলাঞ্জনকে দোষ দিই না, পরে জানতে পেরেছি তাদের সকলেরই লক্ষ্য ছিল হয় আমার টাকা নয় ওর রূপ। একটা পরিচ্ছন্ন, সুন্দর সংসার গড়ে তোলা কারুরই উদ্দেশ্য ছিল না। নিজের পায়ে না-দাঁড়াতে পারলে ও যে কোথায় যাবে জানি না। রাকা তোমার স্নেহের পাত্রী। দ্যাখো না, যদি ওর একজন উপযুক্ত পাত্র জোগাড় করে দিতে পারো।' এই কথার মধ্যে রাকা উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

অনুপম বলল, 'আপনি কী বলেন মাসিমা?'

ভদ্রমহিলা কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। মাথা নেড়ে কিছু মন্তব্য করতে অস্বীকার করলেন। তাঁর চোখ ছলছল করে উঠল।

অনুপম উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ঠিক আছে। দেখি উপযুক্ত পাত্র একজন জোগাড় করতে পারি কি না। অবশ্য তাকে যদি রাকার পছন্দ হয়।' বলে হেসে উঠল।

কৃষ্ণানন্দও উঠে দাঁড়ালেন। ডেকে বললেন, 'এসো তো বউমা। আমরা অনুপমকে গলির মুখটা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।'

কলকাতায় তখন সন্ধ্যা নেমেছে। সদর দরজা খুলে দেখা গেল, গলিটা বেশ অন্ধকার। কেবল তার মুখের কাছটা বউবাজার স্ট্রিটের দোকানগুলোর উজ্জ্বল আলোয় কিছুটা আলোকিত হয়ে আছে। তিনজনে গলি দিয়ে দু-পা এগোতেই হঠাৎ চারজন লোক ওদের ঘিরে ফেলল। তাদের একজনের হাতে সাইকেলের চেন, অন্য তিনজনের হাতে লোহার রড। আরও দুটো লোক দেখা গেল নিঃশব্দে গলির মুখে এসে দাঁড়াল যাতে কেউ ভেতরে ঢুকতে না-পারে।

চেনওয়ালা চেনটা ঘোরাতে ঘোরাতে অনুপমকে বলল, 'এই যে চাঁদু! কলকাতায় এসে রংবাজি করছ, ভুলে গেছ এটা তোমার বিলেত নয়। আবার মেয়েছেলের সঙ্গে চক্করও চালাচ্ছ দেখছি। আজ তোমাকে এমন শিক্ষা দেব যে রংবাজি জীবনের মতো ভুলে যাবে?'

একজন রডওলা বলল, 'মালটা কিন্তু খাপচু (খাসা) ওস্তাদ।'

কৃষ্ণানন্দবাবু বললেন, 'একী? কে তোমরা?'

চেনওয়ালা বলল, 'কে আমরা এখুনি দেখতে পাবে। অ্যাই আসগর, বুড়োটাকে চপ্পল (বাধা) দে তো।'

বলামাত্র দু-নম্বর রডওয়ালা কৃষ্ণানন্দবাবুর গলা ধরে তাঁকে দেওয়ালের গায়ে ঠেসে ধরল। শান্ত গলায় অনুপম বলল, 'ওঁর গায়ে হাত দিও না। সাবধান করে দিচ্ছি।'

চেনওলা বলল, 'ওরে আমার লাল্টুচাঁদ! উনি সাবধান করে দিচ্ছেন। ওরে তোরা সাবধানে থাকিস রে।' চারজনে হেসে উঠল। 'এই চিকনা, তুই আর ছোট্টু এই ধুরটাকে (লোকটাকে) কোটা করে ঝাড় (আচ্ছা করে পেটা)। ঠ্যাং ভেঙে দিবি, যেন হাঁটতে না-পারে। শালা, দোগলা (চরিত্রহীন)।'

অনুপম পূর্ববৎ বলল, 'আমি আবার সাবধান করে দিচ্ছি। তোমরা চলে যাও।'

'চোপ শালা! তখন থেকে সাবধান, সাবধান করছে।'

দু-নম্বর রডওয়ালা বলল, 'ওস্তাদ, আমার পেটের ওপর কী কিলবিল করছে। সাপ না কি?'

'কলকাতায় সাপ! হলে হবে। কামড়ালে দেখা যাবে। তুই বুড়োটাকে ধরে রাখ।'

বাকি দুই রডওয়ালা বলল, 'আমাদেরও পায়ে কীসব সুড়সুড় করছে, ওস্তাদ।'

'আরশোলা হবে। করুক। তোরা এটাকে ক্যালা (মার) আমি ততক্ষণ এই দো-তল্লিটার (বারাঙ্গনার) কদমা দুটোয় চারনি মেরে (চাপ দিয়ে) লি।'

অনুপম বলল, 'এই শেষবার তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি। পরে আমাকে দোষ দিও না।'

দুই রডওলা রড তুলে তেড়ে এল অনুপমের দিকে, আর চেনওয়ালা হাত বাড়াল আতঙ্কে মৃতপ্রায় রাকার দিকে।

হঠাৎ অনুপমের গলা দিয়ে একটা রক্ত জল করা হুংকার বেরিয়ে এল। একটা ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো শূন্যে লাফ দিয়ে উঠল সে। তারপর ওই সরু গলিটার মধ্যে যেন একটা ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল। একমিনিটও লাগল না। দেখা গেল তিন রডওয়ালা ঘাড় মুচড়ে তিনদিকে পড়ে আছে। তাদের মুখ রক্তাক্ত। হাত-পা গুলোর অবস্থাও খুব স্বাভাবিক নয় আর চেনওয়ালা অনড় হয়ে মাটিতে পড়ে চ্যাঁচাচ্ছে, 'মদনা' কোল্কে ঝাড়, কোল্কে ঝাড় (পিস্তল চালা)।' কে কোল্কে ঝাড়বে? গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকা একজন ঘুরে দাঁড়িয়ে কোমর থেকে পিস্তল বের করতে-না-করতেই একটা লোহার রড ঘুরতে-ঘুরতে এসে তার মাথায় লাগল আর সে 'বাপরে!' বলে আর্তনাদ করে উলটে পড়ে গেল। ষষ্ঠজন বুদ্ধিমান লোক। সে আর দাঁড়াল না। সামনের ভিড়ে মিশে গেল।

অনুপম চেনওয়ালাকে কান ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল। দেখা গেল, সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। একদিকে বেঁকে রয়েছে। তার গালে ঠাস করে একটা চড় মেরে অনুপম বলল, 'তোমাদের নীল অ্যামবাসাডরটা আছে এখনও?'

লোকটা হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। একটা ভাঙা দাঁত থুক করে মুখ থেকে বের করে দিয়ে বলল, 'আর মারবেন না স্যার! যা বিলিতি মার মেরেছেন, তারপর আর দিশি চড়চাপড় মারবেন না। অ্যামবাসাডার স্যার? আপনি সেটাও জানেন? আছে স্যার।'

'তোমার শাগরেদদের সে পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে, না আমি সাহায্য করব?'

'পারব, স্যার। আপনি যান স্যার। আমরা ঠিক চলে যাব, স্যার!'

'তাই যাও। আর এখানে যদি ভবিষ্যতে কখনো আসো, মনে রেখো, আমি তোমাদের জ্যান্ত চামড়া খুলে নেব।'

'মনে রাখব, স্যার।'

রাকা আর অনুপম কৃষ্ণানন্দবাবুকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে এল। শুইয়ে দিল বড়ো সোফাটার ওপরে। রাকার শাশুড়িও দৌড়ে এলেন। বেশ কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর উঠে বসলেন ভদ্রলোক। স্ত্রীকে বললেন, 'জানো মীরা, এই ছেলেটির জন্য শুধু যে আজ

আমরা প্রাণে বেঁচে ফিরেছি তা নয়, আমাদের মানসম্ভ্রমও অক্ষত আছে। তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাব বাবা!'

অনুপম হেসে বলল, 'ধন্যবাদ একেবারেই জানাবেন না।'

রাকা বলল, 'এ তো চীনাদের মারামারি। এটা কোত্থেকে শিখলে, অনুপমদা?'

'খোদ চীনেদের কাছ থেকে। ওরা আমাকে একটা ব্ল্যাক বেল্ট উপহার দিয়েছিল।'

'আজ নীলাঞ্জন বেঁচে থাকলে তোমাকে একেবারে হিরো বানিয়ে রাখত। ও তো দিনরাত টিভি-তে এই চীনেদের মারামারির সিনেমা দেখত। আমার মনে হত এসব সাজানো। আজ দেখলুম, তা নয়।'

'না, একেবারেই তা নয়। এখন শোন। এই আক্রমণের আসল লক্ষ্য কিন্তু আমি। আমি যতদিন কলকাতায় আছি, ততদিন কোনোমতেই বাড়ি থেকে বেরুবি না।' বলে কৃষ্ণানন্দবাবুকে সমস্ত ব্যাপারটা বলল।

কৃষ্ণানন্দ বললেন, 'তুমি একা সামলাতে পারবে? পুলিশ কিন্তু তোমাকে খুব একটা সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হয় না। এরা স্থানীয় লোক, তুমি বিদেশে থাকো। কাজেই এদের এখানে যা ইনফ্লুয়েন্স তার কিছুই তোমার নেই। তারপর যা মনে হচ্ছে, এরা অতি বিপজ্জনক লোক।'

অনুপম বলল, 'দেখি, কতদূর সামলাতে পারি। তবে একটা কথা কিন্তু আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে গেল। তা হচ্ছে, কোনো দেহধারী আক্রমণকারীকে একজন বিদেহীর পক্ষে বেশিক্ষণ আটকে রাখা প্রায় অসম্ভব। তাকে ভয় দেখিয়ে অস্বস্তিতে ফেলে হয়তো কিছুক্ষণ বাধা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু যে স্থিরপ্রতিজ্ঞ গুণ্ডা তার পক্ষে এই ভয় বা অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে বেশি সময় লাগবে না। এখনও পর্যন্ত যারা আপনার কাছে এসেছে তারা অসৎ হতে পারে কিন্তু অপরাধজগতের লোক নয়। তাদের চলাফেরা আলোতেই, অন্ধকারে নয়। কাজেই তাদের ভয় দেখিয়ে তাড়ানো গেছে। কিন্তু আপনাদের অবর্তমানে যে শকুনের দল এসে এ বাড়ির ওপর পড়বে তাদের সকলেই না-হোক অনেকেই ভদ্রলোক হবে না। তাদের নীলাঞ্জন ঠেকাতে পারবেন কি? আপনারা কথাটা ভেবে দেখবেন।'

অনুপম যখন শ্যামপুকুর ফিরল, তখন প্রায় আটটা বাজে। ঝন্টু বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। ওকে দেখে ধমকে উঠল, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ? আমি এদিকে চিন্তা করতে করতে অস্থির। সাধুচরণ বলল যে তুই নিজেই বেরিয়েছিস। ট্যাক্সি নিয়ে। কোথায় গিয়েছিলি?'

অনুপম খাটের ওপর চিতপাত হয়ে শুয়ে পড়ল। বলল, 'আগে সাধুচরণকে এক কাপ

চা দিতে বল, তারপর বলছি।' চা খেতে খেতে রাকার সমস্ত কথা বলল অনুপম। তারপর জিগ্যেস করল, 'রূপোর ফোটোফ্রেম কোথায় পাব বলতে পারবি?'

ঝন্টু হাত নেড়ে বলল, 'দুত্তোর ফোটোফ্রেম! তুই কী আরম্ভ করেছিস? হরিরাম বাজাজকে সামলাতেই হিমশিম। এরপর কোত্থেকে নীলাঞ্জন মুখুজ্যের ভূত জুটিয়ে আনলি।'

'আহা, আমি কি ইচ্ছে করে এনেছি নাকি? এসে গেলে কী করব?'

বিস্ফারিত চোখে ঝন্টু বলল, 'কী করবি? দ্যাখ অনুপম ভূত গ্যাস খায় এরকম কথা আমি বাপের জন্মে শুনিনি। তুই ভাবছিস, গ্যাস খাইয়ে ভূত তাড়াবি? তুই একটি আস্ত পাঁঠা, বুঝলি? ওই কৃষ্ণানন্দবাবুকে ওঝা ডাকতে বল। ঝেড়ে ভূত ভাগিয়ে দেবে।'

'তা হয় না। কৃষ্ণানন্দবাবু তো নীলাঞ্জনকে ভাগাতে চান না। অথচ রাকার একটা ব্যবস্থা করতে চান। আর ভূত গ্যাস খায় না তোকে কে বললে? তুই যে পুজো করিস, মন্ত্র বলিস, সেগুলো কী? দেবতাকে গ্যাস দেওয়া নয়? তা দেবতা যদি খেতে পারেন, অপদেবতা খাবে না এরকম কোনো আইন আছে? তুই একটা জিনিস বুঝতে পারছিস না— নীলাঞ্জন এতদিন, মানে জীবিত এবং মৃত অবস্থায় রাকার সঙ্গে যে ব্যবহার করে এসেছেন, সেটা সবাই নিন্দা করেছে, সমালোচনা করেছে। অথচ উনি জানেন উনি যা করছেন সেটাই ঠিক, যুক্তিযুক্ত। আজ আমার কাছে সমর্থন পেয়ে, আমার প্রতি নীলাঞ্জন যথেষ্ট.... ইয়ে হয়ে পড়েছেন, বুঝতে পারছি। মনে হচ্ছে একটা রফা হলেও হয়ে যেতে পারে।'

বলতে-না-বলতেই ফোন বাজল। বাজাজের ফোন। বললেন, 'অনুপমবাবু আপনি আমার লোকেদের ড্যামেজ করিয়ে দিয়েছেন। এদের সারাই করতে আমার ভালোরকম পয়সা খরচ হবে। কাজেই পাঁচটাও নয়, তিনটে ফ্ল্যাট আপনারা পাবেন।'

অনুপম বলল, 'বলেন কী? আপনার করুণা হৃদয়ে একেবারে গাঁথা হয়ে গেল যে!'

'আমি কাল দুপুর বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। যদি আমার প্রস্তাব না-মেনে নেন, তাহলে যা ঘটবে তার জন্য আমাকে দায়ী করবেন না!'

'কী যে বলেন। তা কখনো পারি?'

বাজাজ দুম করে ফোন রেখে দিলেন। অনুপম তখন ব্যারিস্টার গুপ্তকে ফোন করে সব ঘটনাটা জানাল। ভদ্রলোক পুলিশ প্রোটেকশান না-নেওয়ার জন্য প্রথমে ওকে একটু বকাবকি করলেন। তারপর প্রশ্ন করে করে রাকার ব্যাপারটা জেনে নিলেন। সব শেষে জানালেন যে তাঁর সাহায্য নিতে অনুপম যেন কিছুমাত্র দ্বিধা না-করে; কারণ, উনি আর নির্মল বাল্যবন্ধু, এক স্কুল, এক কলেজ।

শুতে যাওয়ার আগে আবার ফোটোফ্রেমের কথাটা তুলল অনুপম। ঝন্টু বলল, 'ও জিনিস

তো তুই বউবাজারেই পাবি। দু-চারটে দোকান ঘুরলেই মনের মতো ফ্রেম পেয়ে যাবি।'

সকাল বেলা ব্রেকফাস্ট খেয়ে দশটা নাগাদ বেরুল অনুপম। প্রথমে গেল বউবাজারে। একটা দোকানে ফ্রেম পছন্দ হল। সেটা পালিস করতে দিয়ে সন্ধে বেলা ডেলিভারি নেবে বলে চলে গেল আলিপুর কোর্টে। চার নম্বর বার লাইব্রেরিতে পঙ্কজ পালচৌধুরি অদ্ভুত ব্যবহার করলেন ওর সঙ্গে। প্রথমে তো চিনতেই পারলেন না। তারপর বেশ অভদ্রভাবেই ওকে বলে দিলেন যে তাঁর পক্ষে অনুপমকে কোনোরকম পরামর্শ দেওয়া সম্ভব নয়।

অনুপম জিগ্যেস করল, 'ব্যাপারটা কী বলুন তো? পরশু দিন আপনি আমাকে সবরকমের সাহায্য করবেন বললেন। আর আজ একথা বলছেন। কেন?'

পঙ্কজ বললেন, 'পরশু পর্যন্ত আমি জানতুম আপনি একজন ভদ্রলোক। আমার সাহায্যের আপনার দরকার আছে। আজ দেখছি, তার আর দরকার নেই।'

এইবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। অনুপম সহাস্যে বলল, 'কী করে দেখলেন? বাজাজ দেখাল বুঝি? আমি যে একজন ভদ্রলোকের মতো মার খেয়ে দু-টি পা খোয়ানোয় রাজি না-হয়ে উলটে বাজাজের লোকদেরই মার দিয়েছি, সেটাই আপনাদের কাছে ঘোরতর অন্যায় বলে মনে হয়েছে, তাই না? ও-বাড়ির ওপর নজর রাখতে আপনাকে কত টাকা দেয় বাজাজ?'

রক্তচক্ষু করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়েও সামলে নিলেন পঙ্কজ পালচৌধুরি। বললেন, 'আপনি চলে যান এখান থেকে। আমি আপনার সঙ্গে কোনো কথা বলতে চাই না।'

নিউ মার্কেটে বাবা-মার জন্য কিছু কেনাকাটা করে সাড়ে চারটে নাগাদ ম্যাঙ্গো লেনে ঝন্টুর অফিসে চলে গেল অনুপম। বলল, 'তুই কাজ সেরে পাঁচটার সময় বেরুবি তো? তখন তোকে বউবাজারে নিয়ে যাব। তারপর একটু এদিক-ওদিক ঘুরব।'

ঝন্টু বলল, 'তুই খেপেছিস? ওই ভূতের বাড়িতে আমি যাব? নেভার। তুই তো বললি তোর সঙ্গে ভূতের ইয়ে হয়েছে? তা ইয়ে হোক বা না-হোক আমি যাচ্ছি না।'

অনুপম বিমর্ষ হয়ে বলল, 'ঠিক আছে। আমরা ঢুকব না ভেতরে। বাইরে থেকেই ফ্রেমটা দিয়ে চলে আসব।'

'তুই কবে ফিরবি বল তো? বাড়িটা যদি কিছু নাই করিস, তবে কেটে পড় না। ঝামেলা বাঁচে।'

'নাঃ, কেটে পড়লে চলবে না। দুটো সমস্যা এখানে, তাদের সমাধান না-করে তো যেতে পারি না। দশদিনের ছুটির পুরোটাই কাটাতে হবে মনে হচ্ছে। তা ছাড়া, বোঝাই যাচ্ছে, বাজাজ একটা শেষ লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আমি এখন কেটে পড়লে ও দুঃখ পাবে না? সেজোপিসি, ছোটোপিসিমা আর বাবার মামা পরিমলদাদু— এঁরা

কলকাতায় আছেন। ওঁদের বাড়ি যাওয়া দরকার। ভাবছি কাল সারাদিনটা এই কাজের জন্য রাখব।'

সদর দরজা থেকেই ফ্রেমের প্যাকেটটা দিয়ে ফিরে এল দু-জনে। ঝন্টুর সঙ্গে পরিচয় হল কৃষ্ণানন্দবাবুর। তবে ওরা ভেতরে ঢুকতে চাইল না বলে তিনি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হলেন, তা মনে হল না। এরকম ব্যবহারে তিনি অভ্যস্ত বলেই মনে হল। রাকা বেরুল না। তবে, একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হল অনুপম যে ওদের পেছনে ফেউ লেগেছে।

পরদিন আত্মীয়দের বাড়ি ঘুরে ছোটোপিসিমার বাড়ি রাত্রের খাওয়া সেরে অনুপম যখন শ্যামপুকুর ফিরল তখন রাত প্রায় দশটা। ওর মনে হচ্ছিল, আজ একটা কিছু ঘটবেই। অনেক চেষ্টা করেও ও ধরতে পারল না যে, কেউ ওকে ফলো করছে কি না? খুব সম্ভবত করছিল না। কেন? এটা কি ঝড়ের আগের থমথমে ভাব?

বাড়িতে ঝন্টু ছিল না। সাধুচরণ চিন্তিত মুখে রোয়াকে বসেছিল। বলল, 'কিছুই বলে যায়নি— কোথায় গেছে বা দেরি হবে কি না। ছোটোদাদাবাবু তো এরকম কখনো করেন না।'

অনুপম ঘরে ঢোকামাত্র টেলিফোনটা বেজে উঠল। বাজাজের গলা, 'এই যে অনুপমবাবু। বাড়ি ফিরেছেন? আপনাকে তো আর একবার কষ্ট করে বেরুতে হবে।'

'কোথায় যেতে হবে?' অনুপম জিগ্যেস করল।

'সেটা একটা খুব ভালো জায়গা। আপনার মনের মতো জায়গা। সেখানে আপনার বান্ধবী মিসেস রাকা মুখার্জি, তার শ্বশুর-শাশুড়ি আর আপনার ভাই সুব্রতবাবু আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।' বাজাজের গলা নির্বিকার, নির্বিকল্প, যেন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কথা বলছেন।

অনুপমের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল। অনেক কষ্টে গলাটা অকম্পিত রেখে বলল, 'কোথায়?'

'সেটা গেলেই দেখতে পাবেন। নীচে সদর দরজায় আমার গাড়ি অপেক্ষা করছে। ড্রাইভার আপনাকে নিয়ে যাবে।'

'যদি না-যাই?'

'কাল সকালে ওই চারজনের লাশ অপনার সদর দরজার সামনে দেখতে পাবেন।'

'ঠিক আছে। আমি আসছি।'

'দেরি করবেন না। আর অস্ত্রশস্ত্র কিছু আনবেন না। তাতে আখেরে আপনারই ক্ষতি হবে।'

'ঠিক আছে। অস্ত্রশস্ত্র আমার নেই, কাজেই সে প্রশ্নই ওঠে না।'

বাজাজ ফোনটা রাখামাত্র ব্যারিস্টার গুপ্তকে ফোন করল অনুপম। ওর কথা শুনে ভদ্রলোক রেগে আগুন হয়ে গেলেন। বললেন, 'এতদূর স্পর্ধা হরিরামের। তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, জানো?'

অনুপম বলল, 'ওর কথা শুনে মনে হল ষোলো নম্বর প্রভাত ঘোষ রোডের বাড়িতে। যদি তা না-হয়, উনিশ নম্বরের অ্যাডভোকেট পঙ্কজ পালচৌধুরিকে চাপ দিলে হয়তো জানতে পারবেন যে ও কোথায় আমাকে নিয়ে যেতে চায়।'

'ঠিক আছে। এটা লোকাল থানার ব্যাপার নয়। আমি হোম মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলছি। লালবাজারের সঙ্গেও যোগাযোগ করছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা তোমাদের কাছে পৌঁছে যাব। এই হরিরামের একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। টাকার জোরে শয়তানটা ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।'

অনুপমের অনুমানই ঠিক। ওকে নিয়ে বাজাজের গাড়ি ষোলো নম্বরেই ঢুকল। রাত তখন এগারোটা। রাস্তা জনহীন। দু-একটা বাড়ির কয়েকটা জানলায় আলো জ্বলছে। তাদের মধ্যে একটা উনিশ নম্বর। ওদের বাড়ির গেট খুলে দিল একটা গুণ্ডামতন লোক। সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার। কোথাও কোনো আলো দেখা যাচ্ছে না। লনের সামনে গেট থেকে নেমে হেঁটে গিয়ে সদর দরজার সামনে দাঁড়াল অনুপম। সঙ্গেসঙ্গে দরজাটা খুলে গেল। একটা লোক পেনসিল টর্চের আলো দেখিয়ে ওকে বসবার ঘরে নিয়ে ঢোকাল। ভেতরটা গুমোট হয়ে রয়েছে। একটা ভ্যাপসা গন্ধ, অনেকটা রাকাদের বাড়িতে ঢোকবার সময় যে গন্ধ পেয়েছিল অনুপম, সেইরকম। ওর একটু নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তবে সেটা টেনশনের জন্যও হতে পারে।

অনুপম ঘরে ঢোকামাত্র ফস্ করে একটা আলো জ্বলে উঠল। দেখা গেল ঘরের এক কোণে কৃষ্ণানন্দবাবু, তাঁর স্ত্রী আর রাকা মেঝের ওপর বসে আছে। তিনজনের মুখেই ভয়ংকর আতঙ্কের ছায়া। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ঝন্টু। সে-ও ভয়ে আধমরা হয়ে রয়েছে। ঘরে একটা খালি বুককেস ছাড়া আর কোনো আসবাবপত্র নেই, জানলাগুলোয় ভারী পর্দা লাগানো হয়েছে যাতে কোনো আলো বাইরে না-যায়।

ঝন্টু বলল, 'তুই এলি কেন? জেনেশুনে বাঘের গুহায় এসে ঢুকলি।'

অনুপম বলল, 'কেন এসেছি, তুই তা বুঝবি না। তোরা এখানে এলি কী করে?'

'পাঁচটার সময় অফিস থেকে বেরুনোমাত্র চার-পাঁচটা লোক আমাকে ঘিরে ফেলল। বলল, হরিরামবাবু ডাকছেন। এক্ষুনি যেতে হবে। কী করি। না গেলে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে। ওদের সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠলুম। দেখি দুটো গাড়ি। একটায় আমি আর দুটো লোক। বলল, আমাকে কৃষ্ণানন্দবাবুকে গিয়ে বলতে হবে যে তুই গুরুতর আহত, হাসপাতালে। রাকাকে একবার দেখতে চাইছিস।'

'তুই বললি?'

'না-বলে উপায় কী? আমার পেছনে দু-জন দাঁড়িয়ে। আমার পিঠে পিস্তল ঠেকানো। বলে দিয়েছিল, আমাকে খুন করতে ওদের এতটুকু অসুবিধে হবে না। আমার কথা

শুনে কৃষ্ণানন্দবাবুর স্ত্রীও যেতে চাইলেন। হুড়মুড় করে ওঁরা বেরিয়ে এলেন। তারপর এইখানে।'

অনুপম বলল, 'এই সামান্য বাড়িটার জন্য এত কাণ্ড করছে হরিরাম?'

একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর পেছন থেকে বলল, 'কারণ আছে, অনুপমবাবু। আপনি যদি আমাকে অপমান না-করতেন আর আমার লোকগুলোকে না-মারতেন, তাহলে এত কাণ্ড করতে হত না। এখন আপনার একটা উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা না-করলে তো চলছে না।' বলতে বলতে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন হরিরাম বাজাজ। তাঁর সঙ্গে দু-জন লোক, তাদের হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল। বোঝা গেল তারা হরিরামের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী। লোকটা ছিপছিপে রোগা, ফর্সা রং, মেহেন্দি করা লাল চুল, চোখে স্টিলফ্রেমের চশমা, পরনে সাদা রঙের স্যুট, সাদা রঙের জুতো, বয়েস চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। 'শুনুন অনুপমবাবু। বেশি কথা বলা আমি পছন্দ করি না। এখন আপনাকে যা বলব তা আপনাকে করতে হবে। এই মোবাইল ফোন নিন। হংকং-এ আপনার বাবাকে ফোন করুন। তাঁকে বলুন যে আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমার একজন লোক এই বাড়ি ভেঙে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং করার এগ্রিমেন্টের কাগজপত্র নিয়ে তাঁর কাছে যাবে। তিনি যেন দেরি না-করে কাগজগুলোয় সই করে দেন। ব্যাস। তাহলেই আপনার কাজ শেষ। আপনারা সবাই যে যার বাড়ি চলে যাবেন। এখন অবশ্য হংকং-এ অনেক রাত। তা বাবাকে না-হয় একটু কষ্টই দেবেন।'

অনুপম হাসল। বলল, 'হরিরাম, আপনি বেশি কথা বলেন না হয়তো কিন্তু বেশি বাজে কথা বলেন। আমি বাবাকে ফোন করে দিলুম। কাগজে সই হয়ে গেল আর আপনি আমাদের ছেড়ে দিলেন যাতে আমরা একদৌড়ে থানায় গিয়ে এফ আই আর করতে পারি— এ গল্প আমাকে করে কোনো লাভ নেই। আপনার কার্যসিদ্ধি হলে আপনি আমাদের জীবিত থাকতে যে দেবেন না, এটা বুঝতে তো কোনো কষ্ট হয় না।'

'বাঃ, আপনার তো বেশ বুদ্ধি আছে দেখছি। আমি ভেবেছিলুম আপনি শুধু মারামারিই করতে পারেন। এতই যদি বোঝেন, তাহলে এখানে কেন যে এলেন তা আপনিই জানেন। যাহোক, কার্যসিদ্ধি আমার হবেই। আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। যদি ফোন না-করেন তাহলে আমরা একের-পর-এক আপনার এই বান্ধবীটিকে রেপ করতে শুরু করব যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি আমার কথা শুনছেন। যদি শোনেন তাহলে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আপনাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে আপনাদের খুন করবে আমাদের লোকেরা। আমরা আটজন আছি। আমাদের সকলের কাছেই রাইফেল বা রিভলভার আছে। কাজেই কোনোরকম চালাকি করার চেষ্টা করবেন না।'

অনুপম যথাসাধ্য শান্ত গলায় বলল, 'আপনি একটা কথা জেনে রাখুন, মি বাজাজ, যে

ব্যারিস্টার পি কে গুপ্ত হোম মিনিস্টারের সঙ্গে একটু আগে এ ব্যাপারে কথা বলেছেন এবং লালবাজারকে অ্যালার্ট করা হয়েছে। অপমানের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আপনি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। আমাদের খুন করলেও আপনি বেরিয়ে যেতে পারবেন না। আপনার খেলা এবার শেষ।'

মৃদু হেসে বাজাজ বললেন, 'আমাকে ব্লাফ দিয়ে কোনো লাভ হবে না অনুপমবাবু। আমার খেলা অত সহজে শেষ হবে না। ফোন করবেন কি না বলুন।'

'করব। ফোনটা দিন?'

'উঁহু। নম্বরটা বলুন। আমি লাগিয়ে দিচ্ছি।'

অনুপম নম্বরটা বলল, বাজাজ বোতাম টিপে ডায়াল করে ফোনটা কানের কাছে ধরেই সেটা বিদ্যুদ্বেগে সরিয়ে নিলেন। ফোনের ভেতর থেকে যেন পাঁচটা কাঠচেরাই কলের আওয়াজ ছিটকে বেরিয়ে এল। বাজাজ দাঁতের ফাঁকে একটা অশ্লীল গালাগালি করে নম্বরটা রিডায়াল করলেন। আবার সেই একই ব্যাপার।

অনুপম চট করে রাকার মুখের দিকে তাকাল। দেখল ওর দিকেই তাকিয়ে আছে, ঠোঁটের কোণে একটা ক্ষীণ হাসির আভাস।

বাজাজ বললেন, 'উফ্! এই ফোনগুলো কোনো কাজের নয়। ইয়াকুব, যা তো আমার গাড়িতে আর একটা ফোন আছে। নিয়ে আয়। ওটা জাপানি, গোলমাল হবে না। তাড়াতাড়ি যা।'

ইয়াকুব 'ঠিক আছে' বলে বেরুতে যেতেই একটা লোক দরজা দিয়ে মুন্ডু বের করল। বিস্ফারিত চোখে বলল, 'হরিবাবু, ওপাশের বাথরুমের ভেতরে একটা লাশ। পচে গলে গেছে। দুর্গন্ধে থাকা যাচ্ছে না।'

'লাশ তো কী হয়েছে? খালি বাড়ি দেখে পাড়ার কেউ ঢুকে ঝুলে পড়েছে। তুই যা, সদর দরজায় গিয়ে দাঁড়া।'

'তাই যাচ্ছি। আমার কিন্তু ভালো বোধ হচ্ছে না, হরিবাবু। আমার খালি মনে হচ্ছে, কে যেন আমার পেছনে পেছনে ঘুরছে। পিছন ফিরলে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।' বলে মুণ্ডুটা অদৃশ্য হল। আর সঙ্গেসঙ্গে দোতলায় একটা পৈশাচিক গর্জন উঠল, সেইসঙ্গে ভারী পায়ের দুপদুপ শব্দ। কতগুলো লোক আর্তনাদ করতে করতে দুড়দুড় করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। সঙ্গেসঙ্গে কয়েকটা গুলির আওয়াজ। দুপদুপ আওয়াজটা কিন্তু থামল না। সেটাও সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বসবার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল।

এইবার হরিরাম বাজাজের মুখে আতঙ্কের ছায়া পড়ল। চিৎকার করে বললেন, 'আরে কী হচ্ছে এসব? ইয়াকুব, মকবুল, দরজায় গুলি চালা।'

কে গুলি চালাবে? দু-জনের হাত এত কাঁপছে যে বন্দুক তুলতেই পারছে না। দরজার বাইরে আবার সেই পৈশাচিক গর্জন আর সঙ্গেসঙ্গে দুপ করে ঘরের আলোটা নিভে গেল। অনুপম এই সুযোগটারই অপেক্ষায় ছিল। তৎক্ষণাৎ আন্দাজে বাজাজের মুখ বরাবর একটা প্রচণ্ড লাথি চালাল। লাথিটা ঠিক জায়গাতেই লাগল বলে মনে হল। গাঁক করে শব্দ করে কেউ সশব্দে ধরাশায়ী হল, বোঝা গেল। পরমুহূর্তেই আলো জ্বলে উঠল। দেখা গেল, রক্তাক্ত মুখে বাজাজ এবং বাকি দু-জনও অজ্ঞান হয়ে মেঝেয় পড়ে রয়েছে।

কথা হচ্ছিল ব্যারিস্টার গুপ্তর চেম্বারে বসে। গুপ্ত বলছিলেন, 'আমরা বাজাজের বিরুদ্ধে কেবল ট্রেসপাসিং-এর চার্জ আনব। কিডন্যাপিং-এর চার্জ আনব না। তাহলে কৃষ্ণানন্দবাবুর কোর্টকাছারি করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। তাতে হয়তো বাজাজের উপযুক্ত শাস্তি হবে না, তবে তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। কারণ বাজাজ আর তার লোকজন আর জীবনে কখনো ও-বাড়ির ছায়া মাড়াবে না। হানাবাড়িতে কে যাবে প্রাণ হাতে করে? বাজাজ তো আর জানে না যে ওর মুখের লাথিটা অনুপমের, ভূতের নয়। আর রাকা তো কাল অনুপমের সঙ্গে চলেই যাচ্ছে জাকার্তায়। সেখানে ওর জারিজুরি চলবে না। ওরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নির্মল বললেন, 'এ সবই তোর জন্য হতে পারল, বিটু। দু-দিনের মধ্যে রাকা-অনুপমের বিয়ে রেজিস্ট্রেশন, আমাদের হংকং থেকে আসার টিকিটের ব্যবস্থা— এতসব তুই না-থাকলে হত না।'

হাত নেড়ে গুপ্ত বললেন, 'ওসব কিছু না। কলকাতায় সব সম্ভব। তবে হ্যাঁ, হোম মিনিস্টারও খুব সাহায্য করেছেন। আমার তো ভয় ছিল বিয়েটা। ভেবেছিলুম, ঝামেলা হবে।'

'না, সে ভয় আর নেই। কৃষ্ণানন্দবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ওঁর বোধ হয় ছেলের সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ হয়। উনি তো বললেন যে নীলাঞ্জনের মূল যে সমস্যাটা ছিল সেটা ঈর্ষা নয়, সেটা রাকার শারীরিক এবং মানসিক ক্ষতির সম্ভাবনাটা দূর করা। সে যখন জীবিত ছিল তখন ঈর্ষাটাই বড়ো ছিল। তবে সেটা একটা দেহজ প্রতিক্রিয়া। দেহটাই যখন নেই, তখন সেটা আর থাকে কী করে? আজ সে নিশ্চিত যে অনুপম কোনোরকম অসদুদ্দেশ্য ছাড়াই রাকার ভার নিতে চায়। তার জন্য সে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখেও এগিয়ে যেতে পারে এবং রাকাকে নিরাপত্তা দেওয়ার মতো ক্ষমতা তার আছে। অতএব নীলাঞ্জনের এখন আর তেমন কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। তা ছাড়া, আদতে সে একজন ভদ্রলোক। নিষ্প্রয়োজনে সে কারুর ক্ষতি করতে চায় না। ঈর্ষাটা একটা

অসুখ। আজ তার শরীরের সঙ্গেসঙ্গে অসুখটাও পঞ্চভূতে মিলিয়ে গেছে। এইসব কথা কৃষ্ণানন্দবাবু বলছিলেন। এই কথাগুলো তো এখনও পর্যন্ত মনে হচ্ছে ঠিক আর এটাও ঠিক যে স্বভাব যায় না মলেও। আরও একটা কথা বললেন কৃষ্ণানন্দবাবু। সেদিনের প্রভাত ঘোষ রোডের বাড়ির ঘটনায় নীলাঞ্জন নাকি এত আনন্দ পেয়েছে, সেরকম এর আগে সে কখনো পায়নি।'

শমিতা বললেন, 'ওদের ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন? রূপমের প্লেন তো নেমে গেছে দেড় ঘণ্টা হল। এতক্ষণ লাগে দমদম থেকে এখানে আসতে?'

নির্মল বললেন, 'তা তো লাগবেই। কাস্টমসই কতক্ষণ নেয়, তার ঠিক আছে।'

বলতে-বলতেই অনুপম, রাকা আর ঝন্টু রূপমকে নিয়ে হইহই করতে করতে চেম্বারে ঢুকল। ঢুকেই রূপম বলল, 'মা আমি একদিন বলিনি তোমার যে এই রাককুসী রাকা অতি ডেঞ্জারাস। একসময় ঠিক দাদার মুণ্ডু চিবিয়ে খাবে। ঠিক তাই হল।'

শমিতা হাসতে হাসতে বললেন, 'ছি রূপম। রাকা এখন তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ। তাকে তুই-তোকারি করবে না। ভক্তিশ্রদ্ধা করবে আর কক্ষনো রাককুসী বলবে না।'

রাকা বলল, 'আচ্ছা আমি তো না-হয় রাককুসী। তোমার ঘাড়ে যে আমেরিকান শাঁকচুন্নিটি চেপেছেন তাঁকে কবে দেখব, শুনি?'

নীলাঞ্জনছায়া

সকাল থেকেই আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছিল, দুপুর হতে-না-হতেই চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। পাঁচতলার ওপরে বাতাসের জোরটা বেশি, সজল হাওয়ায় পর্দাগুলো মেঝের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল হয়ে উড়তে লাগল। বীথি খাওয়া শেষ করে, টেবিল তুলে, মৌরি মুখে দিয়ে বসবার ঘরে এসে ওঁর প্রিয় রকিং চেয়ারটায় বসলেন। এসময় টিভি দেখতে ইচ্ছে করছিল না, তাই পাশে টেবিলের ওপর রাখা ট্রানজিস্টারটা চালিয়ে দিলেন। শুনলেন কে যেন গাইছে— নীলাঞ্জনছায়া...। মনে মনে ভাবলেন, আজ রাত্রেই তো গৌতম টুর থেকে ফিরছে, কাজেই কান্তবিরহকান্তারে আর বেশিক্ষণ থাকতে হবে না।

গানটা ভালো করে শোনবার জন্য চোখ বুজে শরীরটা এলিয়ে দিলেন বীথি। শুনতে শুনতে ওঁর সমস্ত দেহমনে এক তৃপ্ত প্রশান্ত মধুর অনুভূতি আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। পাঁচতলার ওপরে ভিজে মাটির গন্ধ আসে না, তবু যেন কল্পনায় তাঁর ছেলেবেলাকার সেই অতিপরিচিত সুবাস— বেল, জুঁই আর কেয়াফুলের গন্ধে মিশে তাঁর সমস্ত সত্তাকে অধিকার করে নিতে আরম্ভ করল। যেমন হত হরিমোহনপুরের সোমারভিল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের স্টাফ-কোয়ার্টার্সে তাঁর ছেলেবেলায়। ভাবা যায় না যে, তাঁর ছেলেমেয়েরা প্রফুল্ল কদম্ববন যে কী বস্তু তা জানেই না। ঘন মেঘের ছায়ায় জামের বনে যে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে, বাগান থেকে ভেসে আসে আশ্চর্য সুগন্ধ, সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই। তাঁর মনে হতে লাগল যেন তাঁর জীবন থেকে সেই বেঁচে থাকার তীব্রতাটা কখনোই সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যায়নি। কলকাতার ধুলোধোঁয়া, ট্রামবাসের ঘড়ঘড়ানি আর অসংখ্য মানুষের ঠেলাঠেলি তাঁর অস্তিত্বের সেই অংশটাকে কোনোদিনই মুছে ফেলতে পারেনি।

এই চিন্তার মধ্যেই রাজার মতো প্রচণ্ড বজ্রপাতের ডংকা বাজিয়ে ঝমঝম করে বৃষ্টি এল। বীথির মনে হল, এক্ষুনি যেন রান্নাঘরের টিনের চালের ওপরে বৃষ্টির জলতরঙ্গের

আওয়াজ ভেদ করে ভেসে আসা মা-র গলা শুনবেন, 'ওরে জানলাগুলো বন্ধ কর। টিপসি হয়ে বসে না-থেকে বাইরের কাপড়গুলো তুলে আনতে পারছিস না? তোর বাবা তো একটা ছাতা নিয়েও যায়নি। ভিজে ঢোল হয়ে ফিরবে।'

হঠাৎ দরজার কর্কশ ঘন্টির শব্দ বীথিকে একটা নিষ্ঠুর নাড়ায় হরিমোহনপুর থেকে উপড়ে এনে ফেলে দিল রাধামাধব দত্ত রোডের পাঁচতলার ফ্ল্যাটে। এ সময় কে আসতে পারে? গৌতম তো রাত্রে আসছে। তবে আবার কে এল?

চেয়ার থেকে উঠে দরজার আইহোলে চোখ লাগিয়ে বীথি দেখলেন বাইরে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর পরনে নীল রঙের শার্ট, ছাইরঙের প্যান্ট, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, মুখে কাঁচা-পাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। এঁকে কোনোদিন দেখেছেন বলে মনে হল না।

একটু বিরক্ত হয়েই বীথি বললেন, 'কে?'

বাইরের থেকে প্রশ্ন করা হল, 'এটা কি মি গৌতম চক্রবর্তীর বাড়ি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তিনি তো বাড়িতে নেই, কলকাতার বাইরে গেছেন, আজ রাত্রে ফিরবেন। আপনি কাল আসবেন।'

প্রশ্নকর্তা হাসলেন। বললেন, 'আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। আমার দরকার তাঁর স্ত্রী বীথির সঙ্গে। তিনি বাড়িতে আছেন কি?'

'আপনি কে?'

'আমি শশাঙ্ক, হরিমোহনপুরের শশাঙ্কশেখর মিত্র।'

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো থরথর করে কেঁপে উঠলেন বীথি। কোনো কিছু চিন্তা করবার আগেই তাঁর ডানহাতটা যেন উড়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে দিল। চেঁচিয়ে বললেন, 'আরে, শশাঙ্কদা, তুমি! তুমি কোত্থেকে? এসো, এসো ভেতরে এসো। একী, দাড়ি রেখেছ কেন? চুলগুলো সব পেকে গেল কী করে? নিজের গলার তীব্রতাটা তাঁর নিজের কানেই কেমন যেন অস্বাভাবিক শোনাল।'

ভিজে জুতো পচপচ করতে করতে, এক হাতে একটা ব্রাউন রঙের চামড়ার ব্যাগ আর অন্য হাতে একটা ভিজে ছাতার জল ঝরাতে ঝরাতে ঘরে ঢুকলেন শশাঙ্ক। দরজার পাশে টেলিফোনের টেবিলের ওপর ব্যাগটা রেখে হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমার অনেক প্রশ্ন করবার আছে তো? আমি জানি। সব জবাব পাবে। আগে বলো, এই ভিজে জুতো আর ছাতা রাখব কোথায়?'

বীথি সামান্য বিস্ফারিত চোখে শশাঙ্ককে দেখছিলেন। তেতাল্লিশ বছর বয়েস অথচ এর মধ্যেই চুলদাড়ি বেশ পেকে গেছে, চোখে চশমা উঠেছে। তবে, সেই অসাধারণ স্বাস্থ্যটি অটুট রয়েছে, টোল খায়নি একেবারেই। হরিমোহনপুরের দিগন্তবিস্তৃত ধান

Gautam Chakraborty

খেতের আলের ওপর দিয়ে হো হো করে দৌড়োনো, ক্যানালের জলে সাঁতার কাটা, আম গাছে উঠে ঘুড়ি পাড়া আর বড়ো দরগার রুক্ষ মাঠে সারাবছর ফুটবল খেলা যে স্বাস্থ্য তৈরি করে দেয়, তাকে নষ্ট করা সহজ ব্যাপার নয়।

শশাঙ্কের প্রশ্ন শুনে বীথি বললেন, 'এক মিনিট দাঁড়াও, ব্যবস্থা করছি।' বলে বাথরুমের দিকে রওনা হলেন। হঠাৎ তাঁর ইচ্ছে হল ছেলেমানুষের মতো দৌড়ে যেতে কিন্তু পারলেন না, দেখলেন পায়ে পা জড়িয়ে যাচ্ছে। বাথরুম থেকে একটা লাল প্লাস্টিকের বালতি এনে শশাঙ্কের পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ভিজে জুতোজোড়া আর ছাতাটা এর মধ্যে রাখো।'

শশাঙ্কের ঠোঁটের কোণে একটা তীক্ষ্ণ ছুরির মতো বাঁকা হাসি খেলে গেল। বললেন, 'আমার প্যান্টটাও কিন্তু ভিজে গেছে।'

বীথির বুকের ভেতরে একটা আকাশ-ফাটানো বাজ পড়ল। ওঁর কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে চোখ পাকিয়ে বললেন, 'ভিজুক গিয়ে। ফ্যানের নীচে বসো, এক্ষুনি শুকিয়ে যাবে।'

জুতো আর ছাতা বালতিতে রেখে শশাঙ্ক হাসতে হাসতে একটা সোফায় গিয়ে বসলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। কত বছর বাদে দেখা হল বলো তো? বিশ বছর হবে। এখনও কিন্তু আমাকে বকুনি দেবার তোমার অভ্যেসটি পালটায়নি।'

বীথি ততক্ষণে ফিরেগেছন তাঁর রকিং চেয়ারে। বললেন, 'বকুনি দেব না তো কী করব? তোমারও তো বাজে কথা বলার অভ্যেস পালটায়নি দেখছি।'

শশাঙ্ক সামনের সেন্টার টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে, ভালো করে হেলান দিয়ে বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'এবার তোমার কী কী প্রশ্ন করবার আছে করে ফ্যালো। তারপরে, আমি আমার প্রশ্নমালা বের করব।'

বীথি বললেন, 'আমার আর কী প্রশ্ন। কোথায় আছ, কী করছ, ছেলেপুলে ক-টি, কী করে তারা— এই তো।'

'বেশ। তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর, আছি গৌরদাস লাহা রোডে হিমশিখর অ্যাপার্টমেন্টে। এখান থেকে খুব একটা দূরে নয়। একটা ফ্ল্যাট কিনেছি সেখানে। বছর খানেক হল। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, রুগি মারছি আর পয়সা কামাচ্ছি। হিমশিখরের একতলাতেই আমার চেম্বার। তৃতীয় উত্তর, ছেলেপুলে নেই, কারণ বিয়ে করিনি।'

'বিয়ে করনি? কেন?'

'এ প্রশ্নের উত্তর তো তোমার না জানার কথা নয়, বীথি। হরিমোহনপুরকে যদি ভুলে গিয়ে থাকো, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।'

'হরিমোহনপুরকে ভুলিনি শশাঙ্কদা, ভোলা সম্ভবও নয়। কিন্তু তার জন্যে—'

বাধা দিয়ে শশাঙ্ক বললেন, 'এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই বীথি। যা হবার নয়, তা হয়নি। ক-টা বছরই বা ছিলুম বিলেতে! তিনবছর, তার বেশি তো নয়। সেই তিনবছরের প্রত্যেকটা দিন আমি বেঁচে থাকতে পেরেছি কেবল হরিমোহনপুরের স্মৃতিটাকে বুকের ভেতর আঁকড়ে রেখে। প্রচণ্ড শীতে সেই আমাকে জুগিয়েছে উত্তাপ, নিঃসঙ্গতায় প্রাণ-ভরানো গান, ক্লান্তিতে নতুন করে লড়াই করার উদ্যম। যখন ফিরে এলুম, দেখলুম আমার সেই স্মৃতির হরিমোহনপুর ছিন্নভিন্ন হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেছে, তার আর চিহ্নমাত্র নেই। জানো, তোমার যে বিয়ে হয়ে গেছে সে খবরটা পর্যন্ত আমাকে কেউ দেয়নি।'

বীথির গলার কাছে কী যেন একটা কঠিন জিনিস আটকে আছে, গলা দিয়ে স্বর বেরুতে অসুবিধে হচ্ছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কোনোরকমে ঢোঁক গিলে সেটাকে একটু নীচে নামিয়ে বললেন, 'ওঁরা কেউ জানতেন না শশাঙ্কদা। মা কাউকে জানায়নি। তুমি বিলেত যাবার দশদিনের মধ্যে বাবা অ্যাকসিডেন্টে মারা গেলেন আর সেই আঘাতে মা কীরকম যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। আমিও ভাবতে পারিনি যে তার একমাসের মধ্যে সমস্ত টাকাপয়সা বুঝিয়ে দিয়ে সোমারভিল কেমিক্যাল আমাদের ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। আমরা তখন অকূল-পাথারে। আর একটা মাস থাকবার অনুমতির জন্যে হেন লোক নেই যার কাছে আমরা দরবার করিনি। কিন্তু লাভ হয়নি কিছুই। কেউ এগিয়ে এসে একজন সামান্য সুপারভাইজারের স্ত্রী আর মেয়েকে সাহায্যের হাত বাড়ানো প্রয়োজন মনে করেনি, এমনকী কিছু বাড়তি মালপত্র কয়েক দিনের জন্য রাখার দায়িত্ব পর্যন্ত কেউ নিতে চায়নি। ফলে, মালপত্র নিয়ে আমরা যখন হাওড়া স্টেশনে এসে নামলুম, তখনও জানি না কোথায় গিয়ে উঠব। সেই রাগে মা হরিমোহনপুরের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেছিল।'

শশাঙ্ক বললেন, 'আমি এরকমই কিছু অনুমান করেছিলুম। কিন্তু তোমার যখন বিয়ে ঠিক হল, তখন তুমি একবার হরিমোহনপুরে আমার বাবা-মার কাছে গেলে না কেন?'

'গিয়েছিলুম শশাঙ্কদা, সব লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে গিয়েছিলুম। ওঁরা আমার সঙ্গে খুবই সস্নেহ ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু তোমার ঠিকানা দেননি। বলেছিলেন, হারিয়ে গেছে। এরপর, আমার আর কিছু করবার ছিল না। যদিও আজ বলা নিরর্থক, তবু তার কারণটা তোমাকে বলছি। হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে, আমরা জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলুম আশ্রয়ের সন্ধানে। জ্যাঠাইমা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, ওখানে আমাদের স্থান হবে না। সেখান থেকে মা-র বড়োমামার কাছে। সেখানে থাকতে পেলুম। সেটা যে কত বড়ো পাওয়া, যাদের সামনে একমাত্র বিকল্প ফুটপাথ— তারা ছাড়া আর কেউ তা বুঝতে পারবে না। তাই, আমার মামাতো ভাই শম্ভুদার স্ত্রী নন্দাবউদি যখন তার মাসতুতো ভাই গৌতমের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব আনল, তখন সেটা অস্বীকার করবার মতো

ক্ষমতা আমাদের ছিল না। সদ্য বিএ পাশ করা কুড়িবছর বয়েসের একটি মেয়ের পক্ষে বিদ্রোহ করা তখন আত্মহত্যারই নামান্তর হত। পায়ের তলায় যেটুকু সামান্য মাটি সেটা যেকোনো মূল্যে আঁকড়ে থাকাই তখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আমার মা-র কথা ভেবে আমাকে রাজি হতে হয়েছিল।'

শশাঙ্ক ফিকে হাসলেন। বললেন, 'হয়তো ভালোই করেছিলে যে, আমার কথাটা আর ভাবোনি। আমি আজ সেইজন্যে আর কিছু না-হোক, মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে থাকতে পারছি। কিন্তু মুক্তি আমি চাইনি বীথি, আমি বন্ধনই চেয়েছিলুম। সেই সোনার খাঁচাটার সন্ধানে বিলেত থেকে ফিরে পাগলের মতো কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি। কত লোকের কাছে অশ্রাব্য গালিগালাজ শুনেছি, কত জায়গায় মার খেতে খেতে বেঁচে গেছি। তবু, সেই খোঁজা তো আজও বন্ধ হল না। কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখলে থমকে দাঁড়াই, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার মুখে আর একটা মুখ খুঁজি। লোকে ভাবে আমি দুশ্চরিত্র বদমাশ। আমি কেয়ার করিনে।'

'কাকে তুমি খুঁজছ, শশাঙ্কদা? সেই বীথি তো আর নেই। হরিমোহনপুরের মতো সেও তো আজ কেবল একটা স্মৃতি।'

'না, হরিমোহনপুর আমার কাছে কেবল একটা স্মৃতি নয়, বীথি। আমার বেঁচে থাকার জন্য দরকারি অন্যান্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মতোই তা বাস্তব। আমি তাকে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারি। বিশেষ করে যবে থেকে রাজলক্ষ্মী কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের একটি দু-বিনুনি করা শান্তশিষ্ট মেয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা, তবে থেকে আমার জীবনের সঙ্গে সে তো ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। তাকে কেবল একটা স্মৃতি বলে এড়িয়ে যাব, তার কি উপায় আছে?'

বীথির মনে হল, যেন তাঁর ঘরের সুস্থ, মসৃণ আর কঠিন দেওয়ালগুলো আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। তাদের আটকানো দরকার, কিন্তু আটকাবেন কী করে? তাদের ভিতগুলো যে কবে নড়বড়ে হয়ে গেছে, টেরই পাননি। কীসের যেন একটা ঘুণপোকা তাঁর অজান্তে তাদের কুরেকুরে খেয়ে ফেলেছে। অথচ, দেওয়ালগুলো না থাকলে অনভ্যস্ত আকাশের নীচে বাঁচতে পারবেন কি? তাই বীথি নিজেকে দিয়ে বলালেন, 'ওসব কথা থাক, শশাঙ্কদা। তার চেয়ে বলো, আমার ঠিকানা পেলে কোত্থেকে।'

শশাঙ্ক হাসলেন। বললেন, 'চেষ্টায় কী না হয়, কী না হয় শেষটায়! তোমাদের এই বাড়িতে আমার এক রুগিনী আছেন। দিন দশেক আগে তাঁকে দেখতে এসে, তোমাকে দেখলুম গাড়ি থেকে নামতে। তোমাকে চিনতে এতটুকুও অসুবিধে হয়নি, জানো? রবীন্দ্রনাথের ক্ষ্যাপা পরশপাথর চিনতে পারেনি, এই ক্ষ্যাপা কিন্তু পারল। শুধু একটু মোটা হয়েছ, এই যা। তোমার সব খবর আমার সেই রুগিনীই দিলেন। তোমার গৃহকর্তার

বদলির চাকরি, এতদিন বাইরে বাইরে কাটিয়ে বছর খানেক আগে এসেছেন কলকাতার হেড অফিসে। তাঁর রিটায়ারমেন্টের আগে এটাই বোধ হয় শেষ পোস্টিং। মাসছয়েক আগে এই ফ্ল্যাটটা কিনে এখানে এসেছেন। তোমাদের ভারতবর্ষের অনেক শহরেই ঘুরতে হয়েছে। তোমার ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে পুনায়, মেয়ে পড়ছে দিল্লির মিরান্দা হাউসে। পরিপূর্ণ সংসার।'

গলার মধ্যে শব্দ করে হাসলেন বীথি। বললেন, 'হ্যাঁ, পরিপূর্ণ সংসারই বটে। ছেলে-মেয়ে দুটো সারাজীবনই কাটাল হস্টেলে, হাজব্যান্ড মাসের মধ্যে পনেরো দিন টুরে। আমি উৎকণ্ঠ হয়ে এই পরিপূর্ণ সংসার সাজিয়ে বসে থাকি কে কবে কখন এসে আমাকে ধন্য করবে সেই আশায়। আজ আমার সব ভালোবাসা, স্নেহ, প্রেম, আকাঙ্ক্ষা আটকে রয়েছে এ বাড়ির কতগুলো ফোটো-অ্যালবামের হলদে হয়ে আসা ছবির ভেতরে।'

শশাঙ্ক গম্ভীর হয়ে গেলেন। চশমাটা খুলে মুখের ওপর হাত বুলিয়ে বললেন, 'জানো বীথি, আমি চিরকাল ভাবতুম, এখনও ভাবি, যে তোমার আর যাই কিছু প্রাপ্য হোক না কেন, সেটা নিঃসঙ্গতা নয়। অনেকে হয়তো তোমাকে জানে সুন্দর, শান্ত, গম্ভীর আর অন্তর্মুখী বলে। কিন্তু আমি জানি, তোমার মধ্যে ছটফট করে বেড়াচ্ছে একটা পাগলা ঘোড়া। বেড়া ভেঙে মুক্ত মাঠের ওপর বেরিয়ে এলে তার উদ্দাম উল্লাস আর হৃষ্ট হ্রেষা আমি যে আজও শুনতে পাই।'

বীথির সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে আসতে লাগল। অতীতের তীর থেকে ভেসে আসা ঝরাফুলের কান্নায় তাঁর দু-চোখ জলে ভরে এল, আপ্রাণ চেষ্টা করেও তা ঠেকাতে পারলেন না। একটু সামলে নিয়ে কোনোরকমে বললেন, 'যা হারিয়ে যায়, তাকে আগলে বসে থেকে কী লাভ, শশাঙ্কদা? আজ তুমিও কি নিঃসঙ্গ নও? আমিও তো জানি যে তোমার ওই শিক্ষিত, সভ্য, ভদ্র, পরিচ্ছন্ন ওপরের খোলসটার ভেতরে একটা আদিম বন্য হিংস্র মানুষ লুকিয়ে রয়েছে, যে সবকিছু নিষ্ঠুরভাবে কেড়ে নেয়, ভাসিয়ে নিয়ে যায় বাঁধভাঙা বন্যার মতো। আজ তো সে সবই পুরোনো কথা। যে লতার গোড়াটাই কাটা গেছে, তাতে কি আর ফুল ফুটতে পারে?'

'আমার নিঃসঙ্গতার কথা বাদ দাও। সেটা ভেতরের, তাকে ছোঁওয়া যায় না। আমার তো কাজ আছে, বাইরের পৃথিবীটা আছে। অথচ তোমার একাকিত্বটা যেন তোমাকে চারদিক থেকে ঘিরে রয়েছে। তোমার ভেতরের পাগলা ঘোড়াটাকে সে তো কিছুতেই বাইরে আসতে দেবে না। জানো বীথি, ওই বুনো লোকটা যদি সেই ঘোড়াটাকে পেত, তবে সে হুংকার করে আকাশ ফাটিয়ে বলত, সবাই সাবধান, ঘূর্ণিঝড়ের মতো আমরা আসছি, তোমরা আমাদের অভ্যর্থনা না করতে পারো— অগ্রাহ্য করতে পারবে না।'

শশাঙ্ক সেন্টার টেবিল থেকে পা নামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বীথির কাছে এগিয়ে

এসে ওঁর আর্দ্র মুখটা দু-হাতে উঁচু করে তুলে ধরে ঠোঁটের ওপরে একটা অসাধারণ চুমু খেলেন। কোনো বাধা দিতে পারলেন না বীথি; অথবা দিলেন না। ব্যাপারটা আকস্মিক হলেও তাঁর মনের অনেকটা গভীরে বোধ হয় অপ্রত্যাশিত ছিল না।

কিছুক্ষণ বাদে বীথির মুখের ওপর থেকে মুখ সরিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন শশাঙ্ক। যেন বৃষ্টির দৃশ্য দেখতে দেখতে বললেন, 'তোমার ঠাকুমার শোবার ঘরটা মনে পড়ে, বীথি? উনি মারা যাবার পর ওই ঘরেই আমাদের প্রথম প্রকৃত ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।'

বীথির সমস্ত দেহ তখন শিথিল, থরথর করে কাঁপছে। অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'মনে পড়ে, শশাঙ্কদা।'

'ওই যে তুমি প্রশ্ন করলে না যে, যে লতার গোড়াটাই কাটা গেছে, তাতে কি আর ফুল ফুটতে পারে, তার উত্তর হল পারে। সেটা মনের ব্যাপার, বাগানের নয়। আসল কথা কি জানো, আমাদের মনটা ওই শোবার ঘরের মতো। সেখানে সব অসম্ভবই সম্ভব হয়। আমরা বন্ধ দরজার বাইরে একরকম, ভেতরে বোধ হয় একেবারেই অন্যরকম। যে ভীরু কিশোরীটি সবার কাছ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সবসময় নিজেকে আঁচল দিয়ে ঘিরে রাখে, সে-ই শোবার ঘরের ভেতরে অক্লেশে উলঙ্গ হয়, নিজেকে নির্ভয়ে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে চায়। একটা নার্ভাস আনাড়ি ছেলে তার নিজের মধ্যে খুঁজে পায় তার অন্তর্গত দুর্দমনীয় পৌরুষকে। এর মধ্যে কোনটা যে কার আসল রূপ, তা আমি জানি না। বোধ হয়, দুটো মিলেই আমাদের বেঁচে থাকা। তবে, একটা ব্যাপার বড়ো অদ্ভুত। শোবার ঘরের বাইরে, বিশাল পৃথিবীতে আমাদের আনাগোনা একটা নিতান্ত ছোট্ট গণ্ডির ভেতরে। অথচ দ্যাখো, ওই চার দেওয়ালের মধ্যে আমরা সীমাহীন আকাশটাকে টেনে নামিয়ে আনতে পারি, আনতে পারি সমুদ্রের উচ্ছ্বাস, বসন্তের সুগন্ধ অথবা মৃত্যুর প্রশান্তি। পারি না?'

'আমি আর পারি না, শশাঙ্কদা। তোমার পাগলা ঘোড়া ছ্যাকড়াগাড়ি টেনে টেনে আজ বুড়ো হয়ে গেছে, তার শোবার ঘর শুধু সারাদিনের শেষে ঘুমিয়ে পড়বার জায়গা। আকাশ, সমুদ্র, বসন্ত— এসব আর নেই। যা আছে সেটা শুধুই ক্লান্তি।'

'এটা ঠিক নয়, বীথি। আমিও এতদিন এরকম কথাই ভাবতুম। মনে হত, সব বুঝি শেষ হয়ে মিলিয়ে গেছে। আবার তোমাকে দেখে পর্যন্ত মনে হচ্ছে, এই ক্লান্তিটা মিথ্যে। তাদের বয়েস যাই হোক না কেন, দুটো তারার সংঘর্ষে সারা আকাশ জুড়ে আলোর স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়বেই, দু-টুকরো কাঠের ঘষায় দাবানল জ্বলে উঠবেই। এসো বীথি, এই প্রাণহীন, হৃদয়হীন, দিনগত পাপক্ষয়ের মধ্যে আবার আমরা হরিমোহনপুরের একটা বর্ষণমুখর দিনকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি।'

বীথি শুনেছিলেন যে রেললাইনের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো লোক যখন একটা

ইঞ্জিনকে তার দিকে ছুটে আসতে দ্যাখে, তখন নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও সে অসহায়ভাবে অনড় হয়ে দাঁড়িয়েই থাকে— পালাতে চাইলেও পালাতে পারে না। তাঁর মনে হতে লাগল যেন, ঠিক সেইরকম কোনো সুদুর দিগন্তে বিলীন হয়ে যাওয়া রেললাইন দিয়ে অনেক কষ্টে তৈরি করা নিরাপদ অন্ধকার ভেদ করে তাঁর প্রথম যৌবনের এক তীব্র জ্বালা, চোখধাঁধানো আলো জ্বেলে ভয়ংকর গতিতে তাঁর দিকে ছুটে আসছে। তিনি জানেন, ওই আলোর মধ্যে তিনি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবেন, তবু পালাতে পারছেন না তো। তিনি কি পালাতে চান, অস্বীকার করতে চান ওই চোখ অন্ধ করে দেওয়া আলোটাকে? সে বিচারে যাওয়ার আগে তাঁর রক্তের ভেতরে মিশে থাকা হাজার বছরের সংস্কার তাঁকে দিয়ে বলাল, 'তা হয় না, শশাঙ্কদা। এটা অন্যায়, অনুচিত। আমরা যে পালটে গেছি— সেটা তো অস্বীকার করা চলে না।'

'ন্যায়-অন্যায় বা উচিত-অনুচিতের কথা আমাকে বোলো না, বীথি। আমরা যেদিন ঘনিষ্ঠ হয়েছিলুম, সেদিন ওসব কথা বিবেচনা করিনি, আজ কেন তা করতে যাব! পালটে গেছি আমরা? আমার ডান কাঁধে পাঁচটা সেলাই-এর দাগ আছে, তোমার মনে পড়ে? কই, সেটা তো পালটায়নি! তোমার নাভির ঠিক পাশে একটা লাল তিল ছিল। সেটা কি পালটেছে? আমাদের বুকের ভেতরে ভালোবাসা, সাহচর্য আর সুখের জন্যে যে উজ্জ্বল বাসনাটা ছিল, সেটা পালটেছে? আর, সমাজের প্রতি কর্তব্য? যা সত্যি, যা একান্ত অবশ্যম্ভাবী, তাকে অস্বীকার করাটা মূর্খতা, কর্তব্যপালন নয়। এসো, বীথি, চলো, আমরা শোবার ঘরে যাই। আমি দরজাটা খুলে রাখব, তোমাকে আসতে হবে— আসতেই হবে।'

শশাঙ্ক দীর্ঘ এবং দৃঢ় পদক্ষেপে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, দরজাটা খুলে দিলেন হাট করে। বীথি নিজেকে আটকে না-রাখার আপ্রাণ চেষ্টায় চোখ বুজে তাঁর কম্পিত শরীর আর মনকে আয়ত্তে আনার চেষ্টায় নিজেকে ব্যাপৃত করলেন।

হঠাৎ আবার একটা দীর্ঘ কর্কশ ঘন্টির শব্দে চমকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বীথি। তাঁর বুকের ভেতরে একটা ভয়ংকর আতঙ্ক ধড়ফড় করে উঠল। এবার নিশ্চয়ই গৌতম। কিন্তু দরজার বাইরে যেন অনেকগুলো মেয়েলি গলায় উত্তেজিত কোলাহল শুনলেন। চট করে শোবার ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তার দরজা বন্ধ রয়েছে। ফ্ল্যাটে ঢোকার দরজার একপাশে টেলিফোন টেবিলের ওপর কোনো ব্যাগের চিহ্নমাত্র নেই, অন্যপাশে লাল প্লাস্টিকের বালতিও নেই। তবে কি গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন আর এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন? কী অদ্ভুত জীবন্ত স্বপ্ন! এখনও যেন তাঁর মুখের ওপর আর একটা সুগন্ধী মুখের স্পর্শ লেগে রয়েছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আঁচল দিয়ে মুখ মুছে দরজা খুললেন বীথি।

করিডরে পাঁচতলার যাবতীয় ফ্ল্যাটের মহিলাদের উত্তেজিত জটলা। পুনরায় বেল বাজানোর জন্য উদ্যত পাঁচ-শো তিনের দীপ্তি ঘোষ বললেন, 'এই যে। ঘুমুচ্ছিলি, না? চোখ মুখ ফোলাফোলা দেখছি। কখন থেকে বেল বাজাচ্ছি। এদিকে এ বাড়িতে যে কত ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, তার খোঁজ রাখিস?'

বীথি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'ভয়ংকর ঘটনা! কী হয়েছে?'

'একটা মারাত্মক খুনি এ বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। একগাদা পুলিশ সারা বাড়িটা ঘিরে ফেলেছে। এখন প্রত্যেক ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে ঢুকে তল্লাশি চালাচ্ছে।'

পাঁচ-শো ছয়ের আলপনা মৈত্র চোখ গোল গোল করে বলল, 'হ্যাঁ বীথিদি, লোকটা নাকি সাইকোপ্যাথিক মার্ডারার। আমার ননদ একটু আগে কলেজ থেকে ফিরেছে। নীচের থেকে শুনে এসেছে।'

এই কথার মধ্যে ভিজে ছাতা ঝাড়তে ঝাড়তে লিফ্‌ট থেকে বেরুলেন পাঁচ-শো আটের রণদেব হাজরা। বছর-দুয়েক হল চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। বেরিয়েই ভিড় দেখে বললেন, 'একী, আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? যান, যে যার ফ্ল্যাটে চলে যান। এক্ষুনি পুলিশ এসে পড়বে।'

আলপনা বলল, 'যাচ্ছি মেশোমশাই। তবে, আগে শুনি আপনি নীচের থেকে কী শুনে এলেন। তিস্তা বলল, লোকটা নাকি সাইকোপ্যাথিক মার্ডারার।'

রণদেব বললেন, 'আমি নীচে ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেন্টের দু-জন অফিসারের কাছে যা শুনে এসেছি, বলছি—'

ভিড়টা রণদেবের চারদিকে ঘন হয়ে এল। রণদেব বললেন, 'আমিও তাই শুনলুম। লোকটা ডাক্তার, বিলিতি ডিগ্রি আছে, হার্ট স্পেশালিস্ট আর সাক্ষাৎ শয়তান। রুগিদের বাঁচানোর চেয়ে মারার দিকেই তার ঝোঁকটা বেশি। অন্তত দু-জন রুগি আর ছ-জন রুগিনি, যাঁরা সঙ্গে কাউকে না-নিয়ে একা তার হিমশিখর অ্যাপার্টমেন্টের চেম্বারে গিয়েছিলেন, তাঁরা নিখোঁজ। এঁদের সকলেরই জীবনের ইতিহাস আবার এমনই যে, ডাক্তার দিব্যি তার আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে গেছে। সে নাকি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলায় মহা ওস্তাদ। এঁদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে যখন চেম্বারে কেউ নেই সেইসময় নিয়ে এসে খুন করেছে। পরে তাঁদের কয়েক জনের মৃতদেহ কলকাতার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ আবিষ্কার করে। এর প্রথম স্ত্রীও নিখোঁজ। ডাক্তার বলে, সে নাকি তার প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়েছে। তবে পুলিশের ধারণা অন্যরকম। দু-নম্বর স্ত্রী আর তার মা-কে তো একেবারে গলাকাটা অবস্থায় পাওয়া যায় নৈহাটি স্টেশনে রেললাইনের ধারে। কিন্তু ডাক্তার এমন অকাট্য অ্যালিবাই তৈরি করে যে পুলিশ তাকে ছুঁতেই পারে না। তিন নম্বরটা শুনলুম এখনও টিকে আছে। আজ সকালেও ব্যাটা একজন রুগিনীকে

চেম্বারে নিয়ে এসে তাঁকে ধর্ষণ করেছিল। পরে অবশ্যই তাঁকেও হারিয়ে যেতে হত। তা, সেইসময় একজন ইলেকট্রিশিয়ান ঘটনাটা দেখে ফেলে। সে গিয়ে সেই কমপ্লেক্সের সবাইকে জানায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।'

দীপ্তি বললেন, 'তা ওখান থেকে সবাই মিলে আমাদের এখানে চলে এল কী করে? যত ঝামেলা!'

'আগে শুনুন তো। ডাক্তার বিপদ আঁচ করে ফেলে। পুলিশ তো অনেকদিনই তক্কে তক্কে ছিল। তারা হুড়মুড় করে এসে পড়ে দেখে যে, সে গাড়ি নিয়ে পালাচ্ছে। তারাও তখন তার পেছনে ছোটে। লোকটা তখন উপায়ান্ত না-দেখে এখানে ঢুকে এসে গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির ভেতরে চলে যায়। পুলিশও সঙ্গেসঙ্গে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে তার সব পালাবার রাস্তা বন্ধ করে দেয়। অতএব, এমন ইঁদুরকলে পড়ে লোকটা এখনও যে এ বাড়িতেই আছে তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই, আপনাদের কর্তব্য হল, নিজের নিজের ফ্ল্যাটে গিয়ে পুলিশের অপেক্ষা করা আর যতক্ষণ তারা না আসছে ততক্ষণ দরজা বন্ধ করে রাখা।'

ঠিক এইসময় সিঁড়িতে অনেকগুলো ভারী জুতোর দুপদাপ আওয়াজ পাওয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যে করিডর ফাঁকা হয়ে গেল, কেবল তাঁর ফ্ল্যাটের খোলা দরজার সামনে স্তম্ভিত বীথি প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

উদ্যত রিভলবার হাতে একজন পুলিশ অফিসার সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন, সঙ্গে তিনজন রাইফেলধারী কনস্টেবল। সামনেই বীথিকে দেখে তড়বড় করে বলে গেলেন, 'ম্যাডাম, আপনার ফ্ল্যাটে কি ব্লু শার্ট আর গ্রে ট্রাউজার্স পরা, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, মুখে সেইরকম ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে চশমা, ডাক্তারের ব্যাগ হাতে, শশাঙ্কশেখর মিত্র বলে কোনো লোক একটু অগে এসে ঢুকেছে?'

নিঃশব্দে ভাবলেশহীন মুখে যন্ত্রচালিতের মতো হাত তুলে শোবার ঘরটা দেখিয়ে দিলেন বীথি।

বিদেশে দৈবের বশে

আজ থেকে বছর পনেরো আগে আমাকে একবার যেতে হয়েছিল বিরৌলি নামে উত্তরপ্রদেশের একটি ছোটো শহরে। রামনগর থেকে যে রাস্তাটা কাঠগুদামের দিকে গেছে, তার মাঝামাঝি প্রায় একটা জায়গায় বিরৌলি। প্রায় মানে, একটা ছোটো রাস্তা দিয়ে মাইল দুয়েক একটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। বড়ো রাস্তা থেকে বিরৌলি নজরে পড়ে না। তবে, জানি না, আজ হয়তো ওসব জায়গার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

বিরৌলি কিন্তু তীর্থযাত্রীদের কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। একটা উষ্ণ প্রস্রবন আছে এখানে, আর আছে মৃত্যুঞ্জয় শিবের মন্দির। প্রতি বছর মাঘ মাসে একটা বড়ো মেলাও হয়। তবে যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় বড়ো একটা দূরের যাত্রী এখানে আসত না, কারণ কাঠগুদাম বা রামনগর দু-জায়গা থেকেই এখানে আসা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। একটিমাত্র হাড় জিরজিরে বাস সকালে কাঠগুদাম থেকে রামনগর গিয়ে বিকেলে ফিরে আসত। তাও রোজ নয়, মাঝে মাঝেই সেটা বিগড়ে যেত। তা ছাড়া ছিল এক্কা। সেটাতে অতটা পথ যাওয়া যে কী কষ্টকর অভিজ্ঞতা, সে শুধু যে গেছে সেই বুঝেছে। জঙ্গলেও ভয় ছিল, জন্তু জানোয়ারেরও, মানুষেরও।

তবু কাছেপিঠের থেকে যাত্রী আসত। তাই, বিরৌলিতে ধর্মশালা ছিল, বেশ কিছু দোকান পাট ছিল, একটা ছোটো হোটেলও ছিল— ওরিয়েন্টাল লজ, প্রোঃ হরিদয়াল চতুর্বেদী। এ ছাড়া ছিল একটা টি বি স্যানাটোরিয়াম। হোটেলটা স্যানাটোরিয়ামের রুগির আত্মীয়দের আশ্রয়স্থল ছিল।

বিরৌলিতে আমার গন্তব্যস্থল ছিল এই স্যানাটোরিয়াম। আমি তখন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে ওই অঞ্চলটা কভার করছিলুম। স্যানাটোরিয়ামের রেসিডেন্ট ডাক্তার ছিলেন কলকাতার লোক— ডা ফুলচাঁদ সরোগি। তাঁর জন্ম লেখাপড়া প্রভৃতি

সবই কলকাতায়, বাংলা বলতেন পরিষ্কার। উনি যখন কলকাতায় প্র্যাকটিস করার চেষ্টা শুরু করেছিলেন, তখনই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ও হয়েছিল, মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে নয়, রুগি হিসেবে। খানিকটা তাঁর ভরসাতেই আমার বিরৌলিতে যাওয়া।

রামনগর রোডের ওপর বিরৌলি মোড়ে নেমে টাঙ্গা করে শহরে যখন গিয়ে পৌঁছলুম, তখন বেলা প্রায় বারোটা। ভোর চারটেয় বেরিয়েছি, তার ওপর বাসটা দু-বার রাস্তায় খারাপ হওয়ায় সব যাত্রীদের সঙ্গে আমাকেও ঠেলতে হয়েছিল সেটাকে; ফলে ক্লান্তিতে শরীর প্রায় অবসন্ন তখন। হসপিটালে তখনই না-গিয়ে সোজা চলে গেলুম ওরিয়েন্টাল লজে। সেখানে মালপত্র রেখে, স্নান খাওয়া সেরে একটু লম্বা হতেই ঘুমিয়ে পড়লুম। যখন ঘুম ভাঙল তখন বেলা আর বেশি বাকি নেই। ঘরের দরজায় তালা মেরে, ব্যাগ হাতে তখনই ছুটলুম হসপিটালের দিকে।

হসপিটালটা শহর থেকে একটু বাইরে, মিনিট পনেরোর হাঁটা পথ। পথটাও ভারি সুন্দর। একটা ছোট্ট নদীর তীর ধরে ধরে যেতে হয়। হটস্প্রিংয়ের জলটা এই নদীতেই এসে মেশে। নদীর ওপারে একটা গ্রাম। এপারে জনবসতিহীন রুক্ষ মাঠ। এই মাঠেরই অন্যপ্রান্তে নটবরলাল মেমোরিয়াল টি-বি হসপিটাল; সংক্ষেপে এন এম এইচ। কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা বেশ বড়ো একতলা হলদে রঙের বাড়ি, সামনে বাগান। তার থেকে কিছুটা দূরে পাঁচ-ছ-খানা একতলা বাংলো ধরনের বাগানওলা বাড়ি— সেগুলো ডাক্তারদের কোয়ার্টার্স।

হসপিটালে গিয়ে শুনলুম ডা সরোগি ছুটি নিয়েছেন, তবে কোয়ার্টার্সেই আছেন। তখন তাঁর বাড়িতে গিয়ে হানা দেওয়া গেল। অনেকক্ষণ বেল বাজানোর পর সন্তর্পণে দরজা খুললেন ডাক্তার। খুবই চিন্তিত মুখ, আমাকে দেখে একটু অবাক হলেন, কিন্তু খুশি হলেন কি না বুঝতে পারলুম না। নীরবে হাত নেড়ে ভেতরে আসতে বললেন। ডা সরোগি কোনোকালেই খুব হাসিখুশি লোক ছিলেন না, কিন্তু এতটা গম্ভীরও তাঁকে কোনোদিন দেখিনি।

সাদামাটা পরিচ্ছন্ন বসবার ঘর। একটা বেতের চেয়ারে বসে গড়গড় করে অনেক কথা বলে গেলুম। আমার তার পেয়েছেন কি না, শরীর কেমন আছে, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে কোথায়, ইত্যাদি। ভদ্রলোক চুপ করে বসে সব শুনলেন। চোখ দু-টি কিন্তু অন্যমনস্ক। বললেন, 'তার করেছিলেন নাকি? পাইনি তো। স্ত্রী ভেতরে আছেন, ছেলেমেয়েরা হোস্টেলে। ভালোই আছে সব। তা কী মনে করে?'

আমি বললুম, 'ডাক্তারসাহেব, মনে হচ্ছে কিছু নিয়ে আপনি খুব চিন্তিত আছেন।

আমি যে কী মনে করে এসেছি, তা তো আপনার জানাই আছে। তবে আজ সে কথা থাক। কাল বলা যাবে-খন।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বললুম, 'যদি রাগ না-করেন তো একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কী কথা?'

'আপনার যদি কোনো সমস্যা এসে থাকে আর সেটা যদি নিতান্ত ব্যক্তিগত না-হয়, তাহলে আমি কি কোনোভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি? আমি আপনার বহুদিনের পরিচিত, সেই ভরসাতেই এ কথাটা বললুম।'

ডাক্তার আমার কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'মিস্টার রায়, সত্যিই আপনি বোধ হয় আমাকে সাহায্য করতে পারেন। করবেন?'

আমি মাথা নেড়ে বললুম, 'করব। আপনি আমার বোনকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, আমি...'

ডাক্তার বাধা দিয়ে বললেন, 'না, না, ওসব কিছু নয়! তবে চট করে হ্যাঁ বা না বলে বসবেন না। আগে আমার প্রবলেমটা শুনুন, তারপরে যা স্থির করার করবেন।'

আমি বললুম, 'বেশ তো! বলুন।'

ডাক্তার বললেন, 'দেবেন্দ্র গর্গের নাম শুনেছেন? আপনার অবশ্য না-শোনারই কথা। ভদ্রলোক লখনউ-এর একজন নামজাদা কনট্রাক্টর, কোটিপতি লোক। মাস দুয়েক আগে ভদ্রলোক আমাদের এই হসপিটালে ভরতি হন। তখনই অবস্থা খুব সঙ্গীন। কোনোরকমে ঠেকা দিয়ে রাখা গিয়েছিল, সামান্য উন্নতিও হয়েছিল। গতকাল ভোররাত্রে হঠাৎ মারা গেলেন। সিজার অফ হার্ট। কিছু করার ছিল না।

ভদ্রলোক বিপত্নীক, দুই ছেলে। বিনয়কুমার আর অশোককুমার। একজনের বয়েস বাইশ, অপরজন চব্বিশ হবে। গোড়ার দিকে খুব ঘনঘন আসত, ইদানিং আসা অনেক কমিয়ে দিয়েছিল। ব্যাবসার ব্যাপার ফেলে রাখা যায় না।

দেবেন্দ্র মারা যেতে আমি লখনউতে ওদের বাড়িতে ফোন করি। শুনলুম অশোক গেছে আমেরিকায়, বিনয় কলকাতায়। মুনশিজি বললেন যে উনিও তক্ষুনি রওনা হতে পারছেন না, অতএব আমি যেন মৃতের সংকার করে অস্থি রেখে দিই, যাতে ছেলেরা এসে সেটা সংগ্রহ করতে পারে।

এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। আমার এখানে তো আর কোল্ড স্টোরেজ নেই। কিন্তু দাহ করতে গিয়েই হল প্রবলেম।

ভদ্রলোকের হাতে ছিল একটা দামি সোনার ঘড়ি, আর দু-হাতে গোটা চারেক আংটি— সেগুলোরও অনেক দাম। কাজেই ডেডবডি ওয়াশ করার আগে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেগুলো খোলাই।

এ ছাড়াও ওঁর দু-হাতে কনুইয়ের ওপর দুটো বড়ো বড়ো মাদুলি ছিল, সে দুটোই একইসঙ্গে খোলানো হয়। সব ক-টা জিনিস নিয়ে আমি আমার অফিস ঘরে লোহার সিন্দুকে রেখে চাবি দিয়ে দিই। মাদুলি দুটো পকেটেই ছিল, ভেবেছিলুম নদীর জলে ফেলে দেব।

মৃতদেহ শ্মশানে পাঠিয়ে আমার বাড়ি আসতে আসতে দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল। স্নান করতে যাবার আগে পকেট থেকে সব জিনিসপত্র বের করতে গিয়ে মাদুলি দুটো বেরিয়ে আসে। আমার স্ত্রী তখন সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওঁর হাতে মাদুলি দুটো দিয়ে বললুম, "এগুলো এখন রেখে দাও, পরে নদীতে ফেলে দেব-খন।"

বেশ বড়ো বড়ো দু-টি মাদুলি, কালো কার দিয়ে বাঁধা। আমার স্ত্রী সে দুটো নিতে গিয়ে অসাবধানে হাত থেকে ফেলে দেন। অমনি দুটোরই পাশদুটো খুলে গিয়ে ভেতর থেকে বড়ো বড়ো চারটে হিরে বেরিয়ে আসে, যাদের এক-একটারই দাম কয়েক লাখ টাকা। বুঝতে পারলুম, দেবেন্দ্র গর্গ এমার্জেন্সির জন্য ওগুলো নিজের সঙ্গে রেখেছিলেন। নিজের লোকেদের বা আত্মীয়স্বজনের ওপরেও খুব আস্থা বোধ হয় ছিল না।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'হিরেগুলোর অত দাম আপনি কী করে বুঝলেন?'

ডা সরোগি হাসলেন। বললেন, 'আমি ডাক্তার হতে পারি, কিন্তু আমার বংশ তো ব্যাবসাদারের বংশ। আমি মিসফিট বলে ব্যবসায় ঢুকিনি, কিন্তু হিরে দেখলে চিনতে পারব না সেটা তো কোনো কাজের কথা নয়।'

আমি বললুম, 'সে তো বটেই। তারপর কী হল?'

'সেখানে আমরা দু-জন ছাড়াও, আমাদের বাড়ির কাজের মেয়ে রামদুলারী উপস্থিত ছিল। সে সেখানে না-থাকলে হয়তো কোনো বিপদই হত না, কিন্তু থেকেই যত গণ্ডোগোল বেধেছে। যদিও রামদুলারী অনেক বছর আমাদের বাড়িতে আছে ঠিকই, তবে সে খুব সৎ নয়, তার কিছু হাতটান আছে এটা আমরা জানি। শুনেছি, ওর বয়ফ্রেন্ড হচ্ছে গুলাব রাই; এই অঞ্চলের নামকরা ডাকাত। ভাবটা নাকি সম্প্রতি হয়েছে। কানাঘুসোয় শোনা, সত্যি-মিথ্যে জানা নেই।'

আমি প্রশ্ন করলুম, 'এসব জেনেশুনেও অমন কাজের লোক ছাড়িয়ে দেননি?'

ডাক্তার মাথা নাড়লেন। বললেন, 'না। তার প্রথম কারণ, মেয়েটি আমাদের কাছে অনেক দিন আছে। দ্বিতীয় কারণ, সে অত্যন্ত এফিসিয়েন্ট। তৃতীয় কারণ, তার সম্বন্ধে যা কিছু শুনেছি, তার সব-ই গুজব। চতুর্থ কারণ, গুলাব রাই আমার রুগি, আমার কোনো ক্ষতি সে করবে না বলেই এতদিন বিশ্বাস ছিল।

এসব অঞ্চলের কথা তো আপনি জানেন। ডাকাতরা বেশ ওপনেলি ঘুরে বেড়ায়,

স্থানীয় লোকেরা তাদের হিরো ওয়ার্শিপও করে থাকে। সত্যি কথা বলতে কী, গুলাবকে নিয়ে বিরৌলির মানুষ বেশ অহংকার বোধ করে থাকে। পুলিশ রেড হলে খবর চলে আসে আগের থেকে। গুলাবকে জঙ্গলে পালিয়ে যেতে সাহায্য করা হয়, তার হাইড-আউটে খাবারদাবারও পৌঁছে যায়।

তা এই গুলাবকে আমি অনেক দিন থেকেই চিকিৎসা করে আসছি। কিশোর বয়েসে ওর প্লুরিসি হয়েছিল, তারপর থেকে বুকটা খুব সুস্থ নয়। নিশ্বাসের কষ্ট আছে। আর এ অঞ্চলের সকলের মতো যক্ষ্মা রোগটাকে বেজায় ভয় পায়। কাজেই মাঝে মাঝে সে আসে আমার কাছে। অত্যন্ত বিনয়ী, শান্ত প্রকৃতির লোক। আপনি দেখলেই চিন্তাই করতে পারবেন না যে, সে একটা দুর্দান্ত ডাকাত আর ভারত সরকার তার মাথার দাম ঘোষণা করেছেন পাঁচ হাজার টাকা।

এতদিন ভাবতুম গুলাব আর যারই ক্ষতি করুক, আমার করবে না। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সে ধারণা ভুল।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কেন?'

'সে কথাই বলছি। রামদুলারী হিরেগুলোকে দ্যাখে এবং উত্তেজনার বশে বলে ফেলা আমার মন্তব্যগুলোও সে শোনে। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে জোরে জোরে বলি যে খেয়ে উঠেই আমাকে এগুলো নিয়ে গিয়ে হসপিটালের সিন্দুকে রেখে আসতে হবে। বলে, ব্যাপারটা রিয়ালিস্টিক করবার জন্যে আমি হসপিটালে ফিরে গিয়ে বেশ জোরে জোরে শব্দ করে সিন্দুক খুলি, কিন্তু হিরেগুলো ওখানে রাখার পরিবর্তে সোনার ঘড়ি এবং আংটিগুলোও বাড়ি নিয়ে চলে আসি।'

আমি আঁতকে উঠে বললুম, 'সর্বনাশ! করেছেন কী? গায়ে পড়ে এই ভয়ংকর ঝামেলা নিজের বাড়িতে এনে তুলেছেন?'

ডাক্তার গম্ভীর হলেন। বললেন, 'হুঁ, আমার স্ত্রীও সে কথাই বলছেন বটে। কিন্তু কর্তব্যবোধ বলছে, আমি ঠিক কাজই করেছি। এই হাসপাতালে দেবেন্দ্রজির অপরিসীম দান আছে এবং আমি মনে করি তাঁর মূল্যবান জিনিসগুলো তাঁর উত্তরাধিকারীদের হাতে তুলে দেওয়াই আমার কর্তব্য, জেনেশুনে ডাকাতের হাতে তুলে দেওয়া নয়।'

আমি বললুম, 'ঠিক আছে, আপাতত আপনার কথাই মেনে নিলুম, পরে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা যাবে। কিন্তু তার পরের ঘটনা বলুন।'

'আমি বাড়ি ফিরে এসে দেখলুম, যা সন্দেহ করেছি তাই ঘটেছে— রামদুলারী অদৃশ্য হয়েছেন। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই শুনলুম, হাসপাতালে কাল রাত্রে ডাকাত পড়েছিল। দারোয়ানের হাত-পা-মুখ বেঁধে সিন্দুকের দরজা কেটে ফেলা হয়েছিল অক্সি-অ্যাসিটিলিন গ্যাস দিয়ে। ভেতরে হাজার খানেকের কিছু কম টাকা ছিল। সেটা

গায়েব হয়েছে। রুগিরা কেউ টের পায়নি, নার্সরাও নয়। আর পাবেই বা কোত্থেকে। এসব ব্যাপারে এ অঞ্চলে কেউ টের পায় না, পেতেও চায় না।

এখন আমার সন্দেহ, শুধু সন্দেহ কেন, স্থির বিশ্বাস যে আজ রাতে আমার বাড়িতে ডাকাত পড়বে। গুলাবের লোভের কাছে তার কৃতজ্ঞতাবোধ যে হার মানবে তাতে সন্দেহ নেই। এ যে অনেক টাকা।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'পুলিশে খবর দেননি?'

'দিয়েছি। পুলিশ আসেনি, কালও আসবে কি না সন্দেহ। কাজ শেষ হলে তবেই আসবে বোধ হয়। গুলাবেরও তো সবাইকে সন্তুষ্ট রেখে চলা প্রয়োজন, তাই না? আসলে পুলিশের ওপর আমার ভরসা নেই, তা তো বুঝতেই পারছেন। তাই আজ সারাদিন বসে বসে বন্দুক পরিষ্কার করেছি। বিনা বাধায় গুলাবকে ঢুকতে দেব না।'

আমি বললুম, 'বেশ করেছেন! অকারণে এমন ভয়ংকর বিপদ নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন। এবার তাহলে বলুন, আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'হিরেগুলো আপনাকে পাচার করতে হবে।'

'সর্বনাশ! বলে যান।'

'আপনার যদি আপত্তি থাকে তাহলে...'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'সর্বনাশ বলা আমার স্বভাব। বললুম তো, বলে যান। আপনার প্ল্যানটা শুনি।'

'দেখুন, আপনি মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। আপনার সঙ্গে অনেক ওষুধের স্যাম্পল থাকে। তার যেকোনো একটা কৌটোর মধ্যে ভরে আপনি হিরেগুলো এখান থেকে বাইরে নিয়ে যান।'

'আপনি আমায় বিশ্বাস করেন? গুলাবের লোভ যে আমাকে পেয়ে বসবে না, তার কোনো স্থিরতা আছে কি?'

'না, তা নেই। তবে আপনি গুলাব নন। এত দামি হিরে আপনি কখনো হজম করতে পারবেন না, ধরা পড়ে যাবেন।'

'বেশ, বুঝলুম যে আমার প্রতি আপনার আস্থার কারণ আমার সততা নয়, আমার অপদার্থতা।'

ডাক্তার বাধা দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ডাকাত হিসেবে, ভদ্রলোক হিসেবে নয়।'

'কিন্তু একটা অসুবিধে আছে যে। আমার ব্যাগ তো আনিনি এখন; সেটা পড়ে আছে হোটেলের ঘরে।'

ডাক্তার একটু ভেবে বললেন, 'আনেননি ভালোই হয়েছে। আপনি এই অন্ধকারে হিরেগুলো নিয়ে নদীর ধার দিয়ে ফিরতেন— সেটা ভালো হত না। এক কাজ করা যাক।

হোটেল থেকে আপনার মালপত্র আনিয়ে নিচ্ছি আর এখানে একটা থাকার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। আজ রাতটা এখানেই কাটান, কাল সকালে আমি আপনাকে বাস রাস্তায় পৌঁছে দিয়ে আসব।' বলে টেলিফোন তুলে হসপিটালের কেয়ারটেকারকে ডেকে পাঠালেন।

কেয়ারটেকার রোগা লম্বা মাঝবয়সী একটি লোক, প্রকাণ্ড গোঁফ, মাথাভরতি ঝাঁকড়া চুল। এককালে নাকি মিলিটারিতে ছিল, নাম হরিরাম গোয়েল।

ডাক্তার হরিরামকে হোটেল থেকে আমার সব মালপত্র এনে দিতে বললেন আর প্রশ্ন করলেন, 'সাত নম্বর কোয়ার্টারটা তো খালি হয়েছে, তাই না? উনি ওখানেই থাকবেন। আমার এখানে ডিনারের পর ওখানে গেলে ওঁকে দরজাটা খুলে দিও। ইনি আমার পুরোনো বন্ধু; দেখো যেন কোনো অসুবিধে না-হয়।

হরিরাম ডাক্তার সরোগির কথা শুনে একটু কেমন চোখে যেন তাকাল, তারপর মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

হরিরাম চলে গেলে আমাকে বললেন, 'আমার বাড়িতে আপনাকে রাখলুম না, কারণ আমার বিশ্বাস ওরা আজ রাতে আমার বাড়িতে হানা দেবে। অন্য বাড়িতে আপনাকে সম্ভবত অ্যাটাক করবে না, কারণ এত দামি হিরে আমি হাতছাড়া করব এটা ওরা বোধ হয় মানতে পারবে না। আর দ্বিতীয় কারণ, ওবাড়ির সদর দরজায় কোলাপসিবল গেট আছে, যেটা এখানে অন্য কোনো বাড়িতে নেই। সেটা একটা বাড়তি প্রোটেকশন। তার পরেও যদি দ্যাখেন ওরা আপনাকে অ্যাটাক করেছে, তাহলে হিরেগুলো দিয়েই দেবেন। অকারণে রিস্ক নেবেন না।'

আমি বললুম, 'বেশ, তাই হবে। তবে আপনিও অকারণে রিস্ক নেবেন না, আপনার সঙ্গে বউদি আছেন, তাঁর কথাটা মনে রাখবেন।'

সাত নম্বর বাড়িটা ডাক্তারদের কলোনির একপ্রান্তে। একপাশে দিগন্তবিস্তৃত রুক্ষ মাঠ, সামনে বেশ কিছুটা দূরে নদী। সামনে সুন্দর বাগান। আমি বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে হরিরামকে জিজ্ঞেস করলুম, 'এ বাড়িতে কেউ থাকে না?'

হরিরাম মাথা নেড়ে বলল, 'না। অনেক দিন হল সাত নম্বর ডাক্তারের পোস্ট খালি পড়ে আছে, তাই বাড়িটাও খালিই পড়ে থাকে। দু-একজন গেস্ট এলে বা রুগির আত্মীয়স্বজন এলে কখনো-সখনো তাঁদের এখানে জায়গা দেওয়া হয়।'

কথা বলতে বলতে আমরা বাড়ির ভেতরে ঢুকলুম। দেখলুম, বাইরের বড়ো ঘরটায় একটা খাট পাতা রয়েছে। পাশে টেবিলে জল, একছড়া কলা আর একটা বড়ো মোমবাতি রাখা আছে। মশারি খাটানো। ঘরের একপাশে আমার ব্যাগ, বিছানা আর

সুটকেশ গুছিয়ে রাখা। বুঝলুম, আমার কোনোরকম অসুবিধে যাতে না-হয়, তার সব বন্দোবস্তই করা আছে।

কেবল একটা জায়গায় খটকা লাগল। আমি বহু জায়গায় ঘুরেছি, বহু জায়গায় থেকেছি, দীর্ঘকাল অব্যবহৃত ঘরেও বাস করেছি, কিন্তু এ বাড়িটা অনেক দিন খালি পড়ে আছে সেরকম আমার মোটেই মনে হল না। অব্যবহারের সোঁদা গন্ধ তো নেই-ই, বরং মানুষের বাস করার গন্ধই প্রবল। হরিরামকে জিজ্ঞেস করেই ফেললুম, 'এ বাড়িতে কি সম্প্রতি লোক ছিল?'

হরিরাম বলল, 'হ্যাঁ, এক বাবু এখানে কিছুদিন ছিলেন। রুগির আত্মীয়। কাল রাত্রে চলে গিয়েছেন।' বলে আমাকে নমস্কার করে বিদায় নিল। আমি কোলাপসিবল গেটে তালা মেরে ঘরে দোর দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বসলুম। রাতটা মোটামুটি জেগেই কাটাতে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না।

পকেট থেকে ডা ফুলচাঁদ সরোগির দেওয়া ট্যাবলেটের কৌটোটা বের করে আমার স্যাম্পেলের ব্যাগের ভেতরে রেখে দিলুম। হিরেগুলো ডাক্তার আমায় দেখিয়েছিলেন, দ্বিতীয় বার দেখবার আর ইচ্ছে হল না। এই কয়েকটা স্বচ্ছ কঠিন পাথরের টুকরোর জন্য মানুষ কী করে অমানুষে পরিণত হতে পারে, সিগারেটে টান দিতে দিতে সে দার্শনিক তত্ত্ব নিয়েই চিন্তা করছিলুম। এমন সময় বাইরে একটা গর্জন শুনে চমকে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলুম।

মানুষের গলা। কে যেন বাইরে হিন্দিমিশ্রিত উর্দুতে এই হসপিটাল আর তার ম্যানেজমেন্টের যাবতীয় লোককে গাল পাড়ছে। এ তো ডাকাত হতে পারে না। ডাকাত এমন চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে আসবে কেন? আমার হৃৎপিণ্ডটা এতক্ষণ গলার কাছে এসে ধড়ফড় করছিল, অনেক কষ্টে ঢোক গিলে সেটাকে স্বস্থানে পাঠিয়ে ঘরের দরজায় ছিটকিনি খুলে অল্প একটু ফাঁক করে দেখতে গেলুম।

ঘরের আলো বাইরে যেতে এবার যাবতীয় গালাগালি আমার দিকে ধেয়ে এল। দেখি, কোলাপসিবল গেটের বাইরে এক বেঁটেখাটো বৃদ্ধ ভদ্রলোক পাঞ্জাবি আর চুড়িদার পাজামা পরা, হাতে সরু ওয়াকিং স্টিক, সচিৎকারে জানতে চাইছেন যে আমি কে, কোন আক্কেলে আমি তাঁর ঘর দখল করেছি, সেই শুয়ারের বাচ্চা হরিরাম কত টাকা ঘুস খেয়েছে আর আমি সেই ভদ্রলোককে সারারাত বাগানেই দাঁড় করিয়ে রাখতে চাই কি না।

আমাকে খুব তাড়াতাড়ি কতগুলো ডিসিশন নিতে হল। প্রথমত, রাত তখন বেশি নয়, সাড়ে আটটা হবে, সামনে হসপিটালে আর পাশের বাড়িগুলোতে আলো জ্বলছে, কাজেই আমার অতিথিটি ডাকাতি করতে এসেছেন বলে মনে হল না। দ্বিতীয়ত,

ভদ্রলোক এতই সৌম্যদর্শন এবং অভিজাত যে তাঁকে ডাকাতের চর বলেও মনে হল না। তৃতীয়ত, যদি চর হনও, তাহলেও বৃদ্ধকে ঘরের মধ্যে কাবু করা আমার পক্ষে কঠিন হবে না। চতুর্থত, ভদ্রলোক এমনই ক্রুদ্ধ যে স্পষ্টত সেটা অভিনয় নয়, নিশ্চিয়ই ওঁর বক্তব্য আমার শোনা উচিত। কাজেই কোলাপসিবল গেটের চাবি হাতে আমি দরজা খুলে বারান্দায় এলুম।

আমাকে দেখতে পেয়ে ভদ্রলোক যেন একটু শান্ত হলেন। আমার শার্ট আর ট্রাউজার্স পরিহিত চেহারা দেখে বিশুদ্ধ ইংরাজিতে বললেন, 'আমি দুঃখিত, আমি ভেবেছিলুম, হরিরামের কোনো বন্ধু বুঝি এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আমাকে দয়া করে ভেতরে আসতে দিন।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি কি এখানে থাকেন? হরিরাম বলল যে যিনি এখানে ছিলেন, তিনি কাল রাত্রে চলে গিয়েছেন?'

শুনে ভদ্রলোক আবার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, 'উঃ, হরিরামের মতো এরকম একটা নির্বোধ লোক যে কেন জেলে না-থেকে বাইরে ঘোরাঘুরি করছে, কে জানে। আমি গিয়েছিলুম কাঠগুদামে। আমার স্ত্রী এখানে রুগি হিসেবে আছেন। কাল ভোরে তাঁকে ডিসচার্জ করার কথা। তো, আমাকে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করতে হবে না? তা ছাড়া, আমার মালপত্র রয়েছে এখানে। আমি তাকে বললুম যে আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, আর অমনি সে ধরে নিল যে আমি ঘর ছেড়ে চলে গেলুম? এমন একটা গাধা আর আপনি দ্বিতীয় দেখেছেন?'

আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে ভেতরে নিয়ে এলুম। ভদ্রলোক বললেন, 'দরজায় ভালো করে তালা দিন, জায়গাটা ভালো নয়।' বলে ভেতরে চলে গেলেন। আমিও ওঁর পেছন পেছন গেলুম। দেখি, ভেতরে যেটা আসলে বেডরুম, সেখানে সত্যিই ওঁর মালপত্র সব রাখা আছে, বিছানা করা আছে, কেবল মশারিটা ওপরে তোলা, নামানো নেই।

ভদ্রলোক সহাস্যে বললেন, 'দেখুন, হরিরামটা ঘরের ভেতরে পর্যন্ত ঢোকেনি। যাক, আমি স্নান করে আসছি, তারপরে আপনার সঙ্গে কথা বলা যাবে-খন।'

ভদ্রলোকের বয়েস ষাটের একটু ওপরেই হবে। টকটকে ফর্সা গায়ের রং, মাথার চুল সব সাদা, কিন্তু অত্যন্ত মজবুত শরীর। বেঁটে, কিন্তু এ বয়েসেও যথেষ্ট শক্তি রাখেন, সেটা বোঝা যায়। পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবির ভেতর দিয়ে ওঁর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারাটি সত্যিই দেখবার মতো। আর অত্যন্ত মার্জিত, শিক্ষিত এবং অভিজাত চেহারা।

একটি ছোটো হুইস্কির বোতল ছোটো টেবিলটার ওপর রেখে আমার সামনে সোফার ওপর আরাম করে বসলেন। বললেন, 'চলবে নাকি?'

আমি মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালুম। বললুম, 'একা একা রাত কাটাতে হবে ভয় ছিল। আপনাকে পেয়ে যা আনন্দ হয়েছে, তার ওপর ওটা আর চড়াতে চাই না। অতিরিক্ত আনন্দও খারাপ।'

শুনে ভদ্রলোক হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'বাঃ, আপনি তো বেশ কথা বলেন। যাহোক, আমাদের পরিচয়টা কিন্তু এখনও হয়নি। আমার নাম, অজিত আচার্য, এলাহাবাদী।'

আমি বললুম, 'আমার নাম জ্ঞানব্রত রায়। আমি কলকাতায় থাকি।'

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক ভারি খুশি হলেন মনে হল। হঠাৎ পরিষ্কার বাংলায় প্রশ্ন করলেন, 'আপনি বাঙালি?'

আমি বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি?'

'আমিও বাঙালি, যদিও আমরা চার পুরুষ এলাহাবাদের বাসিন্দা। আমার ঠাকুর্দার বাবা গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে এলাহাবাদে স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেন। কিন্তু তাই বলে আমরা কিন্তু বাঙালিত্ব ছাড়িনি। আমাদের বাড়িতে বাংলা বইয়ের বিরাট লাইব্রেরি আছে, প্রতি বছর আমরা অনেক টাকার বই কিনে থাকি। বাংলা ভাষার চর্চা রীতিমতো হয়। বাংলা ভাষার হেন বড়ো সাহিত্যিক নেই, যিনি আমাদের বাড়িতে একবার-না-একবার পায়ের ধুলো দেননি। আসলে কী জানেন, হিন্দি উর্দু বলতে আমাদের কোনো কষ্ট হয় না, কিন্তু বাংলায় কথা বলে যে আনন্দ পাই, তার কোনো তুলনা হয় না।'

আমি বললুম, 'আপনি বাংলার বাইরে থাকেন বলেই বোধ হয় বাংলা ভাষাকে এত ভালোবাসেন। কই, আমরা তো তেমন বাসিনে।'

'নিশ্চয়ই বাসেন, অবশ্যই বাসেন। বাংলা ভাষাকে ভালো না-বেসে কেউ থাকতে পারে? বিশেষত, বাংলা যার মাতৃভাষা? আমি তো বিদেশে কোনো বাঙালিকে দেখলে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে পড়ি। যখন মিলিটারিতে ছিলুম...'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আপনি মিলিটারিতে ছিলেন নাকি?'

'শুধু আমি কেন? আমরা চার পুরুষই মিলিটারি বলতে পারেন। আমার ঠাকুর্দার বাবা ছিলেন মিলিটারি অ্যাকাউন্টসে। বাদবাকি সবাই মিলিটারিতে লড়াই করেছি।'

'এতক্ষণে বুঝলুম, আপনার এমন সুন্দর স্বাস্থ্যের কারণটা কী? মিলিটারি ডিসিপ্লিন। আচ্ছা, আপনি কোথায় লড়াই করেছেন?'

'সে সব কথা বলব আপনাকে। কিন্তু যে কথাটা বলছিলুম সেটা আগে শেষ করে নিই। এই মিলিটারিতে থাকার সূত্রে আমি বহু জায়গায় ঘুরেছি— বর্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর, কাশ্মীর, গোয়া, কঙ্গো, সাইপ্রাস। সর্বত্র কী দেখেছি জানেন? দেখেছি, সব জায়গাতেই

একটি-না-একটি বাঙালি পরিবার, আর সব জায়গাতেই তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে আমাকে প্রীতির সূত্রে গেঁথেছেন। কারোর কাছ থেকে কখনো আমাকে বিমুখ হয়ে ফিরে আসতে হয়নি।'

'বলেন কী? কঙ্গো বা সাইপ্রাসেও বাঙালি পরিবার দেখেছেন?'

'নিশ্চয়ই। কিনসাসায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, নাম প্রদ্যোৎ ঘটক। ইস্টবেঙ্গলের লোক, পাকিস্থান হবার পর ভাসতে ভাসতে ওখানে গিয়ে উঠেছেন। কী করেন তিনি জানেন? রেকর্ড, ম্যাগাজিন আর আইস ক্রিমের একটা দোকান চালান। খুব জোর চলে।' বলে ভদ্রলোক ঝাঁক বেঁধে একের পর এক তাঁর নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলে যেতে লাগলেন।

রাত যত বাড়তে লাগল তাঁর গল্পগুলোও ততই বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর হতে লাগল। তাদের কতটা সত্যি, কতটা মনগড়া, তা বলার সাধ্য আমার নেই, কিন্তু ভদ্রলোকের গল্প বলার ক্ষমতা এতই চমৎকার যে আমি সেসব চিন্তা না-করেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর গল্প শুনতে লাগলুম।

হঠাৎ গল্প থামিয়ে ভদ্রলোক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওরে সর্বনাশ! এ যে রাত প্রায় একটা! এতক্ষণ বকবক করলুম, থামিয়ে দেবেন তো মশাই! চলুন, চলুন, শুয়ে পড়া যাক। কাল সকালে আবার আমার অনেক কাজ।' বলে সোফা থেকে উঠে পড়লেন।

আমিও আড়মোড়া ভেঙে উঠতে উঠতে বললুম, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। শুয়ে পড়া যাক।'

বলতে না-বলতেই হঠাৎ ঘড়ঘড় শব্দে বাইরের কোলাপসিবল গেটটা খুলে গেল। আমি ভয়ানক আতঙ্কিত হয়ে বলে উঠলুম, 'একী? গেটে তো তালা দেওয়া ছিল। খুলল কী করে?'

আচার্যমশাই সহাস্যে বললেন, 'তালা দিয়ে কেউ কোনোদিন চোর ঠেকাতে পেরেছে? তালা হল গে চোরের প্রতি একটা ক্ষীণ অনুরোধ রে বাবা, এটা আমার ঘর, তুমি এখানে ঢুকো না। নেহাত অলস চোর ছাড়া সে অনুরোধ কেউ রাখে?'

আমি কিছু বলার আগেই দরজায় দড়াম দড়াম করে শব্দ হল। বাইরে মোটা গলায় ধমকের সুরে হিন্দিতে প্রশ্ন হল, 'ভেতরে কেউ আছে?'

আচার্যমশাই ততোধিক ধমকের সুরে গর্জন করলেন, 'হ্যাঁ, আছে। তোর বাবা!'

আর তৎক্ষণাৎ বাইরে একটা ভয়ংকর শব্দ হল, সেটা গালাগালিও হতে পারে, অন্য কিছুও হতে পারে।

আমি অত্যন্ত কাতর হয়ে বললুম, 'করছেন কী? ওরা ডাকাত, ওদের চটাচ্ছেন?'

আচার্য বললেন, 'আরে, রাখুন মশায় ডাকাত। আমিও ব্রিগেডিয়ার আচারিয়া, ওদের ডাকাতি বের করছি।'

বলতে বলতেই দরজায় একটা প্রচণ্ড লাথি পড়ল, খিলটা মট করে ভেঙে দরজাটা হাট করে খুলে গেল, আর সাক্ষাৎ যমদূতের মতো একটা লোক দু-হাতে একটা রাইফেল ধরে লাফ দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে এল। এই যদি গুলাব রাই হয় তবে একে যে কী অবস্থায় ডাক্তার সরোগি শান্ত আর বিনয়ী দেখেছেন, তা তিনিই জানেন। বেশ লম্বা, স্বাস্থ্যবান চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল একটা লাল রুমাল দিয়ে বাঁধা, পরনে খাকি শার্ট আর প্যান্ট, বুকের ওপর আড়াআড়ি বাঁধা গুলির স্ট্র্যাপ, পায়ে রাইডিং বুক, এক মুখ দাড়ি-গোঁফ আর ঘন ভুরুর নীচে একজোড়া নিষ্ঠুর চোখ— এই তার বিনীত চেহারার লক্ষণ।

লোকটি স্পষ্টতই ঘরের মধ্যে একজন লোক আশা করেছিল। আমাদের দু-জনকে দেখে একটু থতমত খেয়ে গেল। চিৎকার করে বলল, 'ঘরের ভেতরে দুটো লোক আছে রে, বুলকি! তৈরি থাক।'

আচার্য বিদ্রুপের ভঙ্গিতে লোকটার দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'কী, গুলাব রাই, হিরে নিতে এসেছ? তা ওই নিমকহারাম গোয়েলের বাচ্চা হরিরাম তোমাকে সব খবর দিয়েছে, আর আমি যে এখানে আছি, সেটা আর বলেনি বুঝি?'

আমি তো আচার্যের কথা শুনে আর দুঃসাহস দেখে স্তম্ভিত। গুলাবও খানিকটা তাই। তবে তা খুব কম সময়ের জন্যে। চট করে সামলে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'কে রে তুই বুড়ো? তুই আছিস তো কী হয়েছে? আগে তো তোকে গুলি করে মারব, তারপর ওই কলকাত্তিয়া বাবুর পেট চিরে হিরে বের করে নিয়ে যাব। কোন শালা ঠেকাতে পারে, দেখি।'

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তার আগেই আচার্যমশাই আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'হিরে নিবি? তুই? তবেই হয়েছে! বাড়ি গিয়ে মার কোলে শুয়ে পড়, আর তোর বাপকে পাঠিয়ে দে তবে যদি কিছু হয়। ও, তোর তো আবার বাপের ঠিক নেই।'

বলতেই গুলাব রাই উন্মত্ত ক্রোধে ফেটে পড়ল যেন। চিৎকার করে বলল, 'শালা বুড়ো শুয়োর, আজই তোর শেষ দিন!' বলে বিদ্যুদ্বেগে রাইফেল ওঠাল।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। ব্রিগেডিয়ার আচার্য অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় এক ঝটকায় রাইফেলটা গুলাবের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে তার সেই বিরাট শরীরটা অবলীলাক্রমে দু-হাতে মাথার ওপর তুলে দরজার ওপর ছুড়ে মারলেন। ঠিক সেইসময় আর একজন ডাকাত, হয়তো বুলকি, গুলাবের চিৎকার শুনে একটা দেশি পিস্তল হাতে ভেতরে ঢুকছিল; গুলাবের শরীরটা একবস্তা আলুর মতো তার মুখের ওপর গিয়ে পড়ল। সে বেচারী পিস্তল-ফিস্তল ফেলে গাঁক করে একটা শব্দ করে সশব্দে ধরাশায়ী হল। গুলাব পড়ল তার ঘাড়ে। আর ব্রিগেডিয়ার আচার্য একটা চিতা বাঘের মতো লাফ দিয়ে দু-জনের ওপরে গিয়ে পড়লেন।

তখন বাইরে বারান্দায় শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ বেধে গেল। ক-জন ডাকাত যে বাইরে ছিল, তা তখনও জানি না। কিন্তু বোঝা গেল, আচার্যমশাই তাদের কাউকেই বিশেষ সুবিধে করতে দিচ্ছেন না। কারণ নানা রকমের দুমদাম শব্দ এবং আর্তনাদের মধ্যে তাঁর সহর্ষ এবং ছাপার অযোগ্য গালিগালাজ শুনতে পাচ্ছিলুম। কিন্তু আমি যে বাইরে গিয়ে তাঁকে সাহায্য করব, তার ক্ষমতা আমার তখন ছিল না। আমি খাটের ওপর বসে কেবল থরথর করে কাঁপতে লাগলুম।

কিছুক্ষণ বাদে বাইরে সব শান্ত হয়ে গেল। ব্রিগেডিয়ার সহাস্যে ঘরের মধ্যে ঢুকে যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে বললেন, 'ব্যস, গুলাব রাইয়ের খেলা শেষ। আর আপনার ভয় নেই।'

কোনো ক্রমে আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বের হল, 'আপনি সব কথাই জানেন? নিশ্চয় ডাক্তার সরোগি আপনাকে পাঠিয়েছেন। আর আমি কিনা ভাবছিলুম যে দরকার হলে আপনাকে সহজেই কায়দা করে ফেলা যাবে।'

শুনে ভদ্রলোক হা হা করে উঠলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, আমি সবকথাই জানি। আর আমাকে কায়দা করা অত্যন্ত কঠিন, রায় মশাই। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে ব্রিটিশ আর্মির কাছে কমান্ডো ট্রেনিং নিতে হয়েছিল আমাকে। আর পরে আমায় ইন্সট্রাক্টররাই আমাকে ভয় পেতে শুরু করেছিল।'

আমি কোনোরকমে মুখে হাসি এনে বললুম, 'তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু আপনার লাগেনি তো?'

'আরে, না, না। এরা তো সব ছেলেমানুষ। আমার লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা জাপানিদের সঙ্গে, যারা ক্যারাটে লড়াইয়ে ভুবন বিখ্যাত।'

আমি হাতজোড় করে বললুম, 'কী উপকার যে আমার করলেন। আপনি আমার প্রাণ বাঁচালেন। কী করে এ দেনা শোধ করব, জানি না।'

একটা পরিতৃপ্তির হাসি হেসে ব্রিগেডিয়ার বললেন, 'এটা একটা কোনো দেনাই নয়, রায় মশাই। বিদেশে বাঙালি যদি বাঙালিকে না-দেখে তো, কে দেখবে বলুন? আমি যা করেছি— এটাই তো আমার কর্তব্য ছিল, তাই না? থাক, আর কথা বাড়াবেন না, এবার শুয়ে পড়ুন।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'কিন্তু ওরা? মানে, ডাকাতগুলো তারা কোথায় গেল?'

ব্রিগেডিয়ার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বারান্দার দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, 'ওখানে পড়ে আছে সব ক-টা। কাল সকালের আগে জ্ঞান ফিরবে না। অতএব চিন্তার কোনো কারণ নেই, আপনি শুয়ে পড়ুন।' বলে ভদ্রলোক ভেতরে শোবার ঘরে চলে গেলেন।

একটু পরেই বাইরে লোকজনের উত্তেজিত গলার আওয়াজ পেলুম। ডাক্তার সরোগি

আমার নাম ধরে ডাকছেন, তাও শুনতে পেলুম। আমি তাড়াতাড়ি বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলুম। দেখি, পাঁচটা যণ্ডামার্কা লোক বিভিন্ন ভঙ্গিতে দুমড়ে মুচড়ে অজ্ঞান হয়ে মেঝেয় পড়ে আছে!

ডাক্তার সরোগি যে কখন বন্দুক বগলে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, বুঝতেই পারিনি। আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'এ কী কাণ্ড মিস্টার রায়! এ যে গুলাবের দল! এসব আপনি করেছেন?'

আমি ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'আমি? না, না, আমি করব কেন? করেছেন ব্রিগেডিয়ার আচার্য। তাকে তো আপনিই পাঠিয়েছেন, তাই না?'

ডাক্তার সরোগি কিছুক্ষণ বোবা দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লেন। বললেন, 'ব্রিগেডিয়ার আচার্য! উনি এ বাড়িতে ছিলেন বটে, কিন্তু গতকাল রাত্রে হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। এসব উনি করেছেন, আপনি নিজের চোখে দেখেছেন।'

আমি যেন আচার্য মশাইয়ের প্রসন্ন, নির্মল হাসিটি মনের মধ্যে শুনতে পেলুম। ঘাড় নেড়ে বললুম, 'না, বোধ হয় বুঝতে ভুল হয়েছিল।'

এমন সময় হরিরাম ছুটতে ছুটতে এল। বলল, 'মিসেস উমা আচার্য এইমাত্র মারা গেলেন। ডাক্তারসাহেব, আপনাকে এখনই একবার হাসপাতালে যেতে হবে।'

ভূত বলে কিছু নেই

শ্রীকান্ত বসু আর প্রদীপ গুপ্ত অভিন্নহৃদয় বন্ধু, যদিও দু-জনের স্বভাবে কিছুমাত্র মিল নেই। শ্রীকান্ত বা কানু চটপটে, হাসিখুশি, চঞ্চল আর প্রদীপ বা ভোলা গম্ভীর প্রকৃতির, শান্ত। একটু সুযোগ পেলেই যত্রতত্র অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। দু-জনেই কলকাতার কাছে একটা কারখানায় চাকরি করেন। প্রত্যেক বছর পুজোর ছুটিতে বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন। কানুর একটা পুরোনো মডেলের ফোর্ড গাড়ি আছে, সেটি হল ওঁদের বাহন। এই দু-জন, নাকি তিনজন যতবারই বেড়াতে বের হন, ততবারই কোনো-না-কোনো মারাত্মক অ্যাডভেঞ্চারের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেরেন। কত কী যে ঘটেছে ওঁদের এই ঘোরার সময়— বাঘে তাড়া করেছে, হাতি পথ আটকেছে, ডাকাতে ধরেছে। কোনোরকমে প্রাণ হাতে করে ফিরে এসেছেন প্রত্যেক বার।

সে-বার ওঁরা স্থির করলেন নাগাল্যান্ড যাবেন। কোহিমায় ভোলাবাবুর মেজদার বন্ধু পরিতোষ হালদার চাকরি করেন। অনেকদিন থেকেই যেতে বলছেন দু-জনকে। মস্ত বাংলোয় থাকেন, একা মানুষ। কাজেই কোনো অতিথি এলে অত্যন্ত খুশি হন, আতিথেয়তার কোনো অভাব হয় না।

পুজোর ছুটির সঙ্গে আরও কিছুদিনের ছুটি যোগ করে, সপ্তমীর দিন দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়লেন। কোহিমা পর্যন্ত যেতে কোনো অসুবিধে হল না তেমন। কানুবাবুর গাড়ি চালানোর কষ্ট ভুলিয়ে দিল গুয়াহাটি থেকে কোহিমা যাওয়ার রাস্তার দু-পাশের অপূর্ব দৃশ্য। বর্ষার পর ঘন সবুজ জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের যে রূপ, তা যেকোনো মানুষেরই সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দিতে পারে। ভোলাবাবু অবশ্য সমস্ত রাস্তাটাই ঘুমিয়ে কাটালেন। কানুর বেসুরো গলায় উদ্ভট গানগুলো তাঁকে কিছুমাত্র বিরক্ত করতে পারল না।

গোলমাল বাধল ফেরার সময়। পরিতোষবাবুর দিলদরিয়া স্বভাব আর অকৃপণ অতিথিসৎকারের ফলে দু-জনে অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তেই রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু ঘণ্টাখানেক

যেতে-না-যেতেই নামল তুমুল বৃষ্টি। যদিও রাস্তা জনহীন, কোনো গাড়ি বা লরির চিহ্নমাত্র নেই, তবুও এরকম বর্ষায় গাড়ি চালানো অত্যন্ত বিপজ্জনক। কানুবাবু কিন্তু গাড়ি চালিয়েই যেতে থাকলেন, কারণ থামতে তাঁর মোটেই ভালো লাগছিল না। ঘন জঙ্গলের মধ্যে কোথায় গাড়ি দাঁড় করাবেন? যদিও তখন সকাল আটটা কিন্তু জঙ্গলের নিশাচর জন্তুজানোয়াররা সবাই যে নিয়ম মেনে শুতে গেছে সেরকম কোনো স্থিরতা নেই। তার ওপর বিপজ্জনক মানুষেরও কোনো অভাব নেই। কাজেই খুব সাবধানে হেডলাইট জ্বেলে প্রায় আন্দাজে রাস্তার নিশানা রেখে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে লাগলেন কানুবাবু। ভোলাবাবুর কোনো বিকারই নেই। তিনি অকাতরে ঘুমোতে লাগলেন।

কিছুটা যাওয়ার পরেই এমন একটা দৃশ্য দেখলেন কানুবাবু যে তাঁকে গাড়ি দাঁড় করাতেই হল। রাস্তার ধারে একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে একটি নাগা মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পরনে স্কুল ইউনিফর্ম, পিঠে স্কুলব্যাগ, বয়েস এগারো-বারো হবে। হাপুস নয়নে কাঁদছে মেয়েটি। তার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে আর সেইজন্যেই বোধ হয় থরথর করে কাঁপছে।

কানুবাবু গাড়ি দাঁড় করালেন বটে, কিন্তু মেয়েটি এগিয়ে এল না। যেখানে ছিল, সেখানে দাঁড়িয়েই উদ্‌বিগ্ন চোখে গাড়িটাকে দেখতে লাগল। কানুবাবু ইঞ্জিন বন্ধ করে জানলা নামিয়ে বললেন, 'তুমি কি ইংরেজি জানো?'

মাথা নেড়ে মেয়েটি জানাল যে সে জানে।

'এরকম নির্জন জায়গায় এই বৃষ্টির মধ্যে তুমি একা দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? কোথায় যাবে তুমি?' জিগ্যেস করলেন কানুবাবু।

এইবার মেয়েটি আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। কানুবাবুকে দেখে আর তাঁর কথা শুনে একটু বোধ হয় ভরসা পেল। ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'আমি ইশকুলে যাচ্ছিলুম। দেরি হয়ে গিয়েছিল তাই বন্ধুরা আগে চলে গেছে। ভেবেছিলুম দৌড়ে ওদের ধরে ফেলব। এখন এমন বৃষ্টি নামল! এ-অবস্থায় আমি ইশকুলেও যেতে পারছি না, বাড়িও ফিরতে পারছি না।' বলে আবার কান্না শুরু করল।

'কোথায় তোমার বাড়ি?' জিগ্যেস করলেন কানুবাবু।

'এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে আমাদের গ্রাম। ওইদিকে।' বলে মেয়েটি কানুবাবুরা যেদিকে যাচ্ছিলেন সেই দিকে আঙুল তুলে দেখাল। 'ওই টিলাটার ওপাশে।'

'তবে তো আমাদের পথেই পড়বে। তুমি গাড়িতে উঠে এসো। আমরা তোমাকে পৌঁছে দেব। তোমাদের গ্রাম পর্যন্ত গাড়ি যাবে?'

'যাবে। মাঝখানে একটা নদী আছে, তবে তার ওপরে একটা ব্রিজ আছে।'

'তবে তো ভালোই হল। উঠে এসো।'

মেয়েটি ইতস্তত করছিল। কানুবাবু বললেন, 'কী হল? দেরি করছ কেন?'

'তোমার সঙ্গে ওই লোকটি অমনভাবে পড়ে আছে কেন? মাতাল?'

'আরে না না। ও ঘুমোচ্ছে। সব সময়েই ঘুমোয়।' বলে কানুবাবু ভোলাবাবুকে এক ধাক্কা মেরে বললেন, 'অ্যাই ভোলা ওঠ। দ্যাখ, এই মেয়েটি তোকে দেখে মাতাল ভাবছে। ভাববেই। এই সকালে কেউ ঘুমোয়!'

ভোলাবাবু আড়মোড়া ভেঙে উঠে বললেন, 'মেয়ে? আরে তাই তো, এ কে? বৃষ্টিতে আটকে গেছে বুঝি?'

কানুবাবু বললেন, 'ওকে বাড়ি পৌঁছে দেব। কাছেই গ্রাম। ভালোই হল, একটা নাগা গ্রামও দেখা হয়ে যাবে।'

মেয়েটি তখনও ইতস্তত করছে দেখে, কানুবাবু একটু অধৈর্য হয়ে বললেন, 'আবার কী হল? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজে কোনো লাভ আছে?'

মেয়েটি বলল, 'আপনার গাড়ির সিট কিন্তু ভিজে যাবে।'

'ভিজুক। সে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

অত্যন্ত সংকুচিতভাবে মেয়েটি গাড়ির পেছনের সিটে উঠে বসল। বলল, 'আমি অত্যন্ত লজ্জিত। আপনাদের এরকমভাবে বিব্রত করলুম।'

কানুবাবু বললেন, 'ওসব কথা ছাড়ো। এখন আমাদের রাস্তা দেখাও। বলে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করবার জন্য চাবি ঘুরিয়ে সেল্ফ স্টার্টারের বোতাম টিপলেন। গাড়ি স্টার্ট হল না। যতবার বোতাম টেপেন কানুবাবু, ততবারই গাড়ি চ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ-চ্যাঁ হ্যাঁ-হ্যাঁ হ্যাঁ করে আর্তনাদ করে থরথর করে কাঁপে; কিন্তু তার ইঞ্জিন আর চালু হয় না।

খেয়েছে। ইঞ্জিন নির্ঘাত ঠান্ডা হয়ে জমে গেছে। ভাবলেন কানুবাবু, কিন্তু স্টার্ট তো করতেই হবে। এরকমভাবে রাস্তার মাঝখানে তো দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই গাড়ি থেকে বেরুতে বাধ্য হলেন কানুবাবু। ভোলাবাবুকে বলে লাভ নেই কারণ তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। বনেটের ডালা খুলে স্পার্ক প্লাগগুলো নাড়াচাড়া করলেন, কিন্তু তাতে আর কী লাভ। আগুন জ্বেলে সেগুলো গরম করা দরকার। কোথায় আগুন জ্বালবেন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছেন আর কী করা যায় ভাবছেন কানুবাবু।

এমন সময় দূরে একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। এইদিকেই আসছিল গাড়িটা। বৃষ্টির প্রায় নিশ্ছিদ্র পরদার পেছনে একজোড়া হেডলাইটের ম্লান আলো দেখা গেল। গাড়ি যখন, তখন নিশ্চয়ই সাহায্য পাওয়া যাবে, এই ভেবে কানুবাবু এগিয়ে গেলেন পেছনের গাড়িটার দিকে। দু-হাত তুলে থামতে বললেন, গাড়িটা থামল। দেখা গেল সেটা একটা জিপ— স্থানীয় পুলিশের।

পুলকিত চিত্তে কানুবাবু জিপের কাছে চলে গেলেন। জানলা খুলে মুণ্ডু বের করলেন একজন অফিসার। বললেন, 'কী হয়েছে? গাড়ি খারাপ?'

নাক-চোখ থেকে জল ঝেড়ে ফেলে কানুবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, স্টার্ট নিচ্ছে না। তবে, সেটা বড়ো কথা নয়। আমার গাড়িতে একটা বাচ্চা মেয়ে আছে। সে বাড়ি ফিরতে পারছে না এইরকম আবহাওয়ায়। আপনারা যদি দয়া করে ওকে পৌঁছে দেন আর সেইসঙ্গে একজন গাড়ির মিস্ত্রিকে যদি খবর দিয়ে দেন তো বড়ো উপকার হয়।'

'মেয়েটির বাড়ি কোথায়?'

'ওই টিলাটার ওপাশে। এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে।'

'ওই টিলাটার ওপাশে? মেয়েটি এখনও রয়েছে আপনার গাড়িতে?' বলতে বলতে প্রবল বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে লাফ দিয়ে জিপ থেকে নামলেন পুলিশ অফিসার। কোমরের খাপ থেকে রিভলভার বের করে উত্তেজনায় কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, 'চলুন তো।'

কানুবাবু বেশ আশ্চর্যই হলেন। বললেন, 'আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? মেয়েটির নিতান্তই অল্পবয়েস, স্কুলে পড়ে।'

অফিসার বিরক্ত গলায় বললেন, 'কোনো কথা বলবেন না। চুপচাপ আসুন।'

অফিসারের পেছনে পেছনে জিপ থেকে তিনজন বন্দুকধারী কনস্টেবলও নেমে এসেছিল। তারা চারজনে মিলে কানুবাবুর গাড়িটা ঘিরে ফেলল। অফিসার গাড়ির ভেতরে উঁকি মেরে বললেন, 'কোথায় মেয়ে? আর এ কে? মরে গেছে না কি?'

কানুবাবু বললেন, 'মেয়েটি নেই? তাহলে আপনাদের দেখে পালিয়েছে। আর ও আমার বন্ধু। মারা যায়নি, ঘুমোচ্ছে।'

'বাব্বা, এমন ঘুম! মেয়েটিকে ঠিক দেখেছিলেন তো?'

'নিশ্চয়ই ঠিক দেখেছি। দেখুন না পেছনের সিট আর তলার পা রাখার জায়গা ভিজে রয়েছে কি না।'

অফিসার বললেন, 'না, একেবারেই ভিজে নেই।' বলে কনস্টেবলদের বললেন, 'তোমরা জিপে গিয়ে বোসো। আমি আসছি।'

দরজা খুলে পেছনের সিটে বসলেন অফিসার। কানুবাবুকে বললেন, 'আপনি উঠে আসুন আর আপনার বন্ধুকে ঘুম থেকে তুলুন। ওঁকে বলুন যে আজ সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছেন দু-জনে।'

এইবার ভয় পেলেন কানুবাবু। ধাক্কা মেরে ওঠালেন ভোলাবাবুকে। বললেন, 'শোন একবার, ইনি কী বলছেন।'

অফিসার ভোলাবাবুকে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি মেয়েটিকে দেখেছিলেন?'

ভোলাবাবু বললেন, 'কোন মেয়ে? ও সেই যাকে কানু বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল? দেখেছি বই কী? কোথায় সে?'

'সেটা পরে বলছি। আচ্ছা, মেয়েটি কি লাল আর সবুজে চৌখুপি ডিজাইনের স্কার্ট

আর সাদা রঙের জামা পরেছিল? কাঁধে ছিল গাঢ় নীল রঙের স্কুলব্যাগ?'

'ঠিক তাই, গেল কোথায় সে?'

'কোথাও যায়নি। এখানেই সে রয়েছে। একটা শিকার ফসকেছে, আর-একটার আশায় বসে রয়েছে।'

'কী যে বলেন তার ঠিক নেই। শিকার আবার কী? ওইটুকু একটা বাচ্চা মেয়ে...'

'তাহলে শুনুন। ওই যে টিলাটি দেখছেন যার ওপাশে মেয়েটির গ্রাম, ওটার পেছনে যাওয়ার কাঁচা রাস্তাটি এই হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে সামান্য কিছুদূর গিয়েই একটা সূচ্যগ্র বাঁক নিয়ে বিপজ্জনকভাবে খাড়া নেমে গেছে নীচে পাহাড়ি নদীতে। যারা এইসব পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালাতে অভ্যস্ত, তাদের পক্ষেও সেই উতরাইতে সামলে চালানো প্রায় অসম্ভব। আর যারা অভ্যস্ত নয়, তাদের পক্ষে হুড়মুড় করে গিয়ে অনেক নীচে নদীর প্রচণ্ড স্রোতের মধ্যে আছড়ে পড়া ছাড়া আর গতি নেই। আর, সেই পড়ার অর্থ অবধারিত মৃত্যু।'

'ব্রেক কষলে লাভ হয় না?'

'না। গাড়ি তাহলে ডিগবাজি খেয়ে নদীর মধ্যে পড়বে। আর ব্রেক কষবেন কখন? বাঁকটা ঘোরার সঙ্গে-সঙ্গেই তো উতরাই। তার ওপর এই বৃষ্টি। একহাত দূরের গাছটাই ভালো দেখা যায় না, তো রাস্তা! ওই মোড়ে যানবাহনকে সতর্ক করতে বড়ো বোর্ডও আছে। এই বৃষ্টিতে সেটাই কি কারও নজরে পড়তে পারে?'

কানুবাবু বললেন, 'মেয়েটি যে বলল নদীর ওপর একটা ব্রিজ আছে।'

'ছিল। বছর পনেরো আগে সেটা বন্যায় ভেঙে যায়। এখন একটা দড়ির সাঁকো আছে। তার ওপর দিয়ে সাইকেল ঠেলে নিয়ে যাওয়া চলে, আপনার এই গাড়ি নয়।'

'নদীর ওপারে গ্রামটা?'

'সেটা আছে। মেয়েটা ওই গ্রামেই থাকত।'

'থাকত?'

'হ্যাঁ। প্রায় বারো বছর আগে এমনি এক বর্ষার সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় দৌড়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ি চাপা পড়ে। ড্রাইভারের খুব একটা দোষ ছিল তা বলা যায় না। বৃষ্টিটা হচ্ছিল খুব জোরে, বেচারি দেখতে পায়নি। যখন দেখেছে, তখন আর সামলাতে পারেনি। তারপর থেকে, এই বারো বছরে প্রায় আট-দশটা গাড়ি ওই রাস্তা দিয়ে নেমে গিয়ে নদীতে ভেঙে পড়েছে। প্রায় চৌদ্দো-পনেরো জন লোকের মৃত্যু হয়েছে। কেবল একজন গুরুতরভাবে আহত হয়েও বেঁচে ছিল কিছুদিন। মারা যাওয়ার আগে সে যে বয়ান দিয়েছিল, তার থেকেই আমরা জানতে পারি কেন এই গাড়িগুলো প্রবল বৃষ্টির মধ্যে হাইওয়ে ছেড়ে ওই দুর্গম রাস্তায় ভয়াবহ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছে। তা না-হলে হয়তো এই ঘটনাগুলো একটা রহস্যই থেকে যেত। আমাদের ওপরওয়ালারা অবশ্য এ-বয়ান বিশ্বাস করেননি। তাঁরা

বলেন দুর্ঘটনার ফলে লোকটির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই উলটোপালটা বকেছে। তাঁরা এই ব্যাপারটায় একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়ে থাকেন। আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপও বাদ যায় না।'

'অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে মেয়েটি ভূত? আর এসব ভূতের প্রতিহিংসার ব্যাপার?'

'অফিসিয়ালি সে কথা আমি আপনাকে বলতে পারি না।'

'আমি ভূতে বিশ্বাস করি না।' ব্যাজার মুখে বললেন কানুবাবু।

'না-করতে পারেন। আপনার গাড়িটা কিন্তু করে। আর সেইজন্যেই সে ভয়ে স্টার্ট নেয়নি, যে কারণে আপনারা এখনও জীবিত আছেন। যাক গে, এখন বনেটটা একবার খুলুন, দেখি একে স্টার্ট করানো যায় কি না।' বলে গাড়ি থেকে নামলেন অফিসার।

বনেট খোলার দরকার হল না। কানুবাবু চাবি ঘুরিয়ে সেল্ফ স্টার্টার টেপামাত্র গাড়ি চড়াৎ করে চালু হয়ে গেল। পুলিশ অফিসার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'দেখছেন? কী বলেছিলাম?' বলে পেছনের জিপের দিকে চলে গেলেন।

কানুবাবু সস্নেহে গাড়ির স্টিয়ারিং-এ হাত বুলিয়ে বললেন, 'দুর ব্যাটা ভীতুর ডিম। ভূত বলে কিছু নেই, জানিস না? ভয়ে একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেলি?'

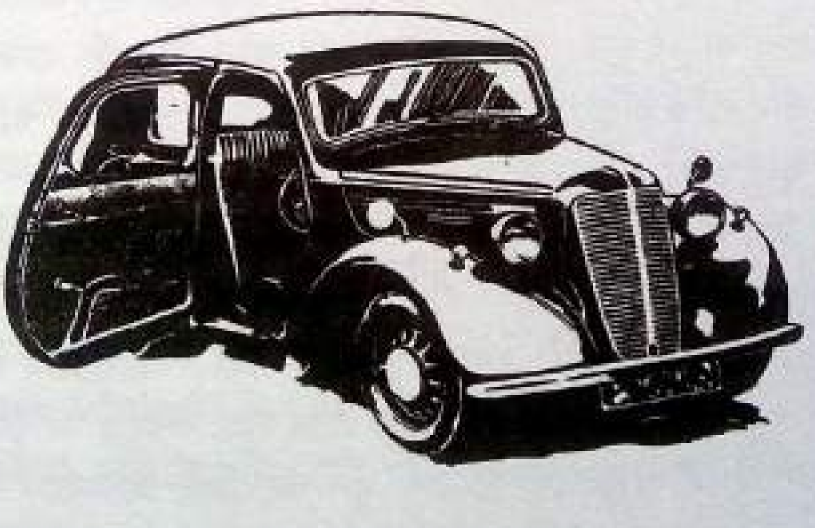

অখিলবাবুর মৃত্যুরহস্য

অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন মধুসূদনপুর মহকুমা আদালতের উকিল। যেমন শকুনের মতো চেহারা তেমনি শকুনির মতো বুদ্ধি। অত্যন্ত ঘুঘু লোক। দিনকে রাত, রাতকে দিন করতে পারেন বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। যত প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীই থাক না-কেন, একজন খুনীকে অনায়াসে মেষশাবকের মতো নিরীহ বলে প্রমাণ করে দিতে তাঁর জুড়ি ছিল না। ফলে তাঁর যেমন প্রচণ্ড পসার তেমনি রোজগার ছিল। লোকে বলে, স্বনামে-বেনামে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ নাকি পঁচিশ-তিরিশ লক্ষ।

ছোটোবেলা থেকেই অখিলবাবুর স্বভাবচরিত্র একটু গোলমেলে হয়ে পড়েছিল। তাঁর বাবা ছিলেন স্কুলমাস্টার, সর্বজনশ্রদ্ধেয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। অথচ, হেন দোষ নেই যা অখিলবাবুর ছিল না। মদ্যপান থেকে গোমাংসভক্ষণ তো সামান্য ব্যাপার, যেকোনোরকম নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক দুষ্কর্মে তাঁর কোনোরকম আপত্তি ছিল না। তবে, অত্যন্ত সাবধানে থাকতেন যাতে ধরা না-পড়েন। তাঁর ক্রিয়াকর্মের কথা তাঁর স্ত্রী বন্দিতাকে কোনোদিন জানতে দেননি। তাঁর প্রতি বন্দিতার অগাধ বিশ্বাস আর আস্থা ছিল। স্বামীকে তিনি আদর্শ পুরুষ বলে মনে করতেন।

অখিলবাবুর জীবনের শেষ মক্কেলের নাম আকবর মণ্ডল। নিত্যানন্দপুরের দুর্দান্ত ডাকাত। হেন খারাপ কাজ নেই যা সে করেনি। তার ভয়ে আশেপাশে পাঁচটা গ্রাম তটস্থ হয়ে থাকত। তারই গ্রামের রাবেয়া খাতুনকে তার স্বামী এনায়েতের সামনে ধর্ষণ করে তাকে গলা টিপে খুন করেছিল সে। এনায়েত আর সহ্য করতে না-পেরে থানায় গিয়ে এজাহার দিয়েছিল। সেই অপরাধে তাকেও খুন করেছিল আকবর। পুলিশ দেখল যে ব্যাপরটা বেশি রকমের বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, আকবর তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। তারা আকবরকে অ্যারেস্ট করে ৩০২ ধারায় মামলা দায়ের করে দিল। আকবরের আত্মীয়রা অখিলবাবুকে সেই মামলা চালানোর ভার দিল।

অখিলবাবুর কাছে এটা নিতান্তই সামান্য ব্যাপার। রাবেয়াকে ধর্ষণের একমাত্র সাক্ষী ছিল এনায়েত। সে আর নেই, কাজেই সেই অপরাধ যে কে করেছিল সেটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা অসম্ভব। এও বোঝা যাচ্ছে এনায়েতের যেকোনো কারণেই হোক ধারণা হয়েছিল যে আকবরই সেই কাণ্ডটি করেছে। অতএব, সে থানায় এজাহার দিয়ে ফেরার সময় আকবরকে দেখতে পেয়ে তাকে আক্রমণ করেছিল। তখন, আত্মরক্ষা করতে গিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আকবর তাকে খুন করে ফেলে। এই যুক্তির ওপরে তার খালাস হয়ে যাবারই কথা।

এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল, কিন্তু গোলমাল বাধাল নিত্যানন্দপুরের লোকেরা। তাদের যে আকবরের ওপরে এতটা রাগ জমে ছিল আর সেই রাগে যে তারা একযোগে আকবরের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে এগিয়ে আসবে সেটা অখিলবাবু বুঝতে পারেননি। সরকারপক্ষের সাক্ষী এনায়েতের প্রতিবেশিনী আনোয়ারা খাতুন। সে স্বামী পরিত্যক্তা, রাবেয়ার পাশের বাড়িতে একা থাকে। ঘটনার রাত্রে ভয়ে ঘর থেকে বের হয়নি বটে কিন্তু সে যা শুনেছিল তা আকবরের অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ। তাকে কাঁদিয়ে ছাড়লেন অখিলবাবু। প্রমাণ করে দিলেন যে সে একটি সন্দেহজনক নষ্টচরিত্রের স্ত্রীলোক, যার একটি কথাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবু সে যে সত্যি কথা বলছে এটা বুঝতে শ্রোতাদের কোনো অসুবিধে হল না।

পরের সাক্ষী রাবেয়া খাতুনের বারো বছরের কাজের লোক মাসুম। ঘটনার সময় সে ওই বাড়িতেই ছিল। সেও সত্যি কথা বলবে বলে মনে হল অখিলবাবুর। তাকে কব্জা করা হয়তো কঠিন হবে না। কিন্তু জজসাহেবের সহানুভূতি যে তার দিকেই যাবে তার সম্ভাবনা খুবই প্রবল।

সে রাত্রে আকবরের ছোটোভাই সিরাজকে ডেকে পাঠালেন অখিলবাবু। সিরাজ তার দাদার মতো না হলেও, নানা রকমের ছোটোবড়ো অপরাধের সঙ্গে ভালোভাবেই যুক্ত ছিল। পরামর্শ করে ঠিক হল যে মাসুমের বাবাকে ভয় দেখিয়ে তার সাক্ষী দেওয়ানো বন্ধ করতে হবে। মাসুমের বাবা দরিদ্র দিনমজুর। সে সিরাজের বিরুদ্ধে যেতে সাহস পাবে না।

পরদিন সকালে অখিলবাবু যা খবর পেলেন তাতে খুবই দমে গেলেন তিনি। মাসুমের বাবা সিরাজের প্রস্তাবে রাজি হয়নি। সে ভয়তো পায়ই নি, উলটে তার পাড়ার লোকজন ডেকে এনে মহা হইচই বাধিয়ে তুলেছিল। সিরাজকে একরকম ল্যাজ গুটিয়ে ওখান থেকে পালাতে হয়েছিল।

সেদিন কী একটা পুজো উপলক্ষ্যে কোর্ট বন্ধ ছিল। সারা সকাল অখিলবাবু অস্থিরভাবে পায়চারি করলেন। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল যে এই প্রথম তাঁকে হেরে যেতে হবে। একজন গরিব দিনমজুরই যেখানে ভয় পাচ্ছে না আর কথা শুনছে না, সেখানে অন্য

সাক্ষীদের ভাঙানো কি সম্ভব হবে? ব্যাপারটা তাঁর কাছে অসহ্য অপমান বলে মনে হতে লাগল। এদিকে সিরাজের কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়ে বসে আছেন। হেরে গেলে সে-ই কি ছেড়ে কথা কইবে? অতএব, দুপুর বেলা তিনি আবার সিরাজকে ডাকলেন।

অখিলবাবু বললেন, 'দ্যাখ্ সিরাজ, যদি দাদাকে বাঁচাতে চাস্ তাহলে যেভাবেই হোক, সাক্ষীদের মুখ তোকে বন্ধ করতেই হবে। সওয়াল করে জিততে পারব কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছি না। জজসাহেবটা অতিবাজে লোক, ঘুস খায় না, মেয়েছেলের দোষ নেই, মদ পর্যন্তি খায় না। তার ওপরে প্রচণ্ড বদরাগী। একেবারে যাচ্ছেতাই। ওকে হাত করা যাবে না। কাজেই টাকা দিয়ে হোক, ভয় দেখিয়ে হোক, যেভাবে হোক, এই কাজটা তোকে করতেই হবে। দরকার পড়লে দু-একজনকে হাপিস করে দিবি।'

সিরাজ একগাদা পানখাওয়া এবড়োখেবড়ো দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'ঠিক আছে, চ্যাটার্জীবাবু সেই ব্যবস্থাই করছি। আজ রাতের মধ্যেই ওই পাকটি (বেশ্যা) আনোয়োরাটাকে ফাঁড়িয়ে দিচ্ছি (মেরে ফেলছি) আর মাসুমকে এমন ভসকাব (মেরে মুখ ফাটিয়ে দেব) যে ওর বাপও ওকে চিনতে পারবে না। আমার সঙ্গে টক্কর দেবার মজা টের পাবে। তখন দেখবেন আর কেউ সাহস দেখাতে এগিয়ে আসবে না। কেন কি, এমন কেউ অছে যে শালা জানের পরওয়া করে না? সব শালারা সুড়সুড় করে গর্তের ভেতরে গিয়ে যদি না-ঢুকেছে তো কী বললুম আপনাকে।'

সিরাজ চলে যাবার পরেও স্বস্তি পেলেন না অখিলবাবু। ভেবে ভেবে তাঁর মাথা গরম হয়ে উঠল। সন্ধে বেলা বন্দিতাকে বললেন, 'একটু ঘুরে আসছি। কয়েক জন লোকের সঙ্গে দেখা করা দরকার।'

বলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন শহরের অন্যপ্রান্তে কাঠগোলা বাজারের বেশ্যাপল্লীতে তাঁর রক্ষিতা কাকলি বিশ্বাসের বাড়িতে। শরীর ও মন দুটোকেই একটু শান্ত করা দরকার।

রাত আটটা নাগাদ সেলফোনে খবর পেলেন যে আনোয়ারা খুন হয়েছে। এইবার খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন অখিলবাবু। সিরাজ তাহলে কথা রেখেছে। কাকলি অনেকক্ষণ ধরেই তাঁর গোমড়া মুখ নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করছিল। এতক্ষণে সেই মুখে হাসি ফুটল। ভাবলেন, ঘণ্টাখানেক ফূর্তি করে উঠে পড়বেন।

একটু বাদে এমন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল যার জন্য অখিলবাবু একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ দরজায় প্রবল কড়া নাড়ার শব্দ হল। তারপরে দুমদাম লাথি। দরজা ভেঙে যায় আর কী! অখিলবাবুর মনে হল নির্ঘাত পুলিশ এসেছে। তিনি লাফ দিয়ে উঠে জামাপ্যান্ট পরতে শুরু করে দিলেন। কাকলি কোনোরকমে শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে

যেন সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে এইরকম একটা ভাব করে দরজাটা খুলে দিল। সঙ্গেসঙ্গে ময়লা জামাকাপড় পরা গুণ্ডামতন একটা লোক হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকেই তার গলা টিপে ধরল। হুংকার দিয়ে বলল, 'হারামজাদী, ভেবেছিলি তোকে খুঁজে পাব না, তাই না? উকিলের সঙ্গে আশনাই করে বেঁচে যাবি ভেবেছিস?'

কাকলি খাবি খেতে খেতে বলল, 'তুমি... তুমি ঠিকানা পেলে কী করে?'

'একটা বোরখাপরা মোসলমান মেয়ে দিয়েছে আর কোন সময় তোদের একসঙ্গে পাওয়া যাবে তাও বলেছে। এখন আগে তোকে মারব, তারপর ওই শালা উকিলের পেট ফাটাবো।'

শুনেই অখিলবাবু জামাটা প্যান্টের ভেতরে গুঁজতে গুঁজতে এক লাফে দরজা পেরিয়ে ছুট লাগালেন। জুতোটা পর্যন্ত পরবার সময় পেলেন না। গোলমাল শুনে তখন একদল লোক সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছিল। তাদের ধাক্কা মেরে ঠেলে কোনোরকমে নীচে নেমে রাস্তায় এসে পড়লেন। গাড়ির দরজা খুলতে গিয়ে দেখেন যে তাড়াহুড়োয় মানিব্যাগ, হাতঘড়ি, ফোন আর গাড়ির চাবি কাকলির ঘরে ফেলে এসেছেন। তখন আর সেখানে ফিরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। যত শিগগির সম্ভব পালাতে হবে। কাকলির হাসব্যান্ড যদুলাল বিশ্বাস ডেঞ্জারাস মার্ডারার। সে এসে পড়ল বলে। ধরতে পারলে একটা একটা করে হাত-পা ছিঁড়ে নেবে। এদিকে রাস্তায় একটাও রিকশা নেই। এখানে কেউ তাঁকে চেনেও না যে তাঁকে আশ্রয় দেবার ঝুঁকি নেবে। কাজেই, সোজা রাস্তায় না-গিয়ে অখিলবাবু কাঠগোলা বাজারের পেছন দিয়ে মহিষবাথানের মাঠের ভেতর দিয়ে হন হন করে হাঁটতে শুরু করে দিলেন।

অনেকটা দূরে মুনশিপাড়ার আলো দেখা যাচ্ছিল। একবার ওখানে গিয়ে পড়তে পারলে আর ভয় নেই। মহিষবাথানের মাঠ তাঁর চেনা জায়গা। ছেলেবেলায় এখানে অনেকবার এসেছেন বুনো কুলের সন্ধানে। তাঁর জীবনের প্রথম প্রেমিকা, তাঁদের বাড়ির ঝি, গিরি; তাঁকে এখানে নিয়ে আসত ভালোবাসা শেখাবার জন্য। তখন তাঁর ষোলো বছর বয়েস। কাজেই দ্বাদশীর চাঁদের আলোয় যে ঠিক চলে যেতে পারবেন, তাতে অখিলবাবুর সন্দেহ ছিল না। একমাত্র ভয় সাপের। তবে কিনা, যদুলাল বিশ্বাস আরও ভয়ংকর। অবশ্য এই অচেনা অন্ধকার মাঠে আসতে সে সাহস পাবে কি না সেটাই প্রশ্ন।

দ্রুতবেগে হাঁটতে হাঁটতে অখিলবাবু ভাবতে লাগলেন— একটি মুসলমান মেয়ে যদুলালকে খবর দিয়েছে। সে কে রে, বাবা? যদুলাল থাকে কৈলাসপুর কলোনিতে। সেখান থেকে কাঠগোলা বাজারে বাসে আসতে কমপক্ষে দু-ঘণ্টা লাগার কথা। ট্যাক্সি করে সে আসবে না, কিপ্টে নাম্বার ওয়ান। তাহলে, সেই মেয়েটি তাকে জানাল কখন? এখানে তো তাঁর আসবার কথা ছিল না, সেটা হঠাৎই ঠিক করেছিলেন। সেকথাটাই বা

সেই মেয়েটি জানাল কীভাবে আর যদুলালকে খবরটাই বা দিল কী করে? সে নিজে গিয়েছিল? সেটা অসম্ভব। টেলিফোনে? তাহলে সে যে বোরখা-পরা মেয়ে সেটা যদুলাল জানল কী করে? যদুলালের কি টেলিফোন আছে? সেরকম কথা তো শোনেননি কখনো।

ভাবতে ভাবতে আর হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ অখিলবাবু দেখলেন, একটু দূরের মাঠের মধ্যে একটা ছোটো দু-কামরার একতলা বাড়ি। তার একটা ঘর অন্ধকার আর অন্যটায় আলো জ্বলছে। লণ্ঠনের ম্লান হলদেটে আলো খোলা জানলা আর দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। এখানে আবার এই বাড়িটা হল কবে? এই ফাঁকা মাঠের মধ্যে থাকেই বা কে? ডাকাত-ফাকাত নয় তো? ডাকাত হলে সে তাঁর মক্কেল হতে পারে। কিন্তু মহিষবাথানের ভেতরে এরকম খোলা জায়গায় কোনো ডাকাত থাকে বলে তো শোনেননি কখনো। কৌতূহল সামলাতে না-পেরে বাড়িটার দিকে গুটিগুটি এগিয়ে গেলেন।

কাছাকাছি আসতেই একটা গোঙানির শব্দ পেলেন অখিলবাবু। এতে তাঁর কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। যথাসাধ্য চুপিসাড়ে খোলা জানলাটার নীচে গিয়ে ডিঙি মেরে ভেতরে উঁকি মারলেন। যা দেখলেন তাতে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন ভদ্রলোক। প্রায় নিরাভরণ দরিদ্রলাঞ্ছিত ঘরে একটি খাটিয়ার ওপরে একটি নিরাবরণ সুঠাম নারীদেহ উপুর হয়ে পড়ে রয়েছে। তার ঘন কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছে খাটিয়ার থেকে মেঝের ওপর। কিন্তু তার শরীরে বেশ সদ্য আরোপিত ধারালো অস্ত্রের রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন। কেবল গোঙানির শব্দ ছাড়া তার সর্বাঙ্গে আর কোনোরকম প্রাণের লক্ষণ নেই। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে কেউ তাকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। প্রথমটায় সে কতটা সার্থক হয়েছে সেটা অবশ্য বোঝবার উপায় নেই কিন্তু দ্বিতীয়টায় সে হয়নি সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। যাকে মৃত ভেবে লোকটা চলে গেছে, সে কোনোরকমে বেঁচে রয়েছে— বোধ হয় অখিলবাবুর আসবার অপেক্ষায়।

অখিলবাবুর শরীরে রিরংসা সাপের মতো ফণা তুলে দাঁড়াল। যেকোনো কারণেই হোক, মেয়েটির পড়ে থাকার ওই দৃশ্যটা তাঁর রক্তে আগুন জ্বালিয়ে দিল। কাকলির ঘরে তাঁর শরীরের তৃষ্ণা কিছুই মেটেনি। এই সুযোগে সেটা মিটিয়ে না-নেবার কোনো কারণই নেই। তিনি ব্রাহ্মণসন্তান, কারুর উচ্ছিষ্ট ছোঁন না, সেটা ঠিক। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর কোনোদিন কোনো সন্দেহ নেই যে নারীদেহ সবসময়েই পবিত্র, তা কখনোই উচ্ছিষ্ট হয় না। প্রমাণ, যে পঞ্চকন্যাকে স্মরণ করলে পুনর্জন্ম হয় না, তাঁরা কেউই ঠিক গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা ছিলেন না। আসলে, তাঁর জন্যে এ হেন যোগাযোগ একমাত্র ঈশ্বরই সৃষ্টি করতে পারেন। সেটা অস্বীকার করে তো তাঁকে ছোটো করা যায় না।

হঠাৎ তাঁর মনে হল, মেয়েটির যা অবস্থা, তাতে অখিলবাবুর উপরিটা সে সামলাতে পারবে তো? টেঁসে যাবে না তো? তা গেলে যাবে। তার তো মরে যাবারই কথা। মরেই

গেছে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অখিলবাবু তো নিমিত্তমাত্র। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিলে আইনত কোনো দোষ হয় না। তবে, তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। সেই ধারালো অস্ত্রওলা লোকটা যদি আবার ফিরে আসে, তাহলে গোলমাল। অখিলবাবু ঘরে ঢুকে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিলেন।

একটু বাদেই অখিলবাবুর আর্তনাদ জানলা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল— 'এ কী, এ কী, কে তুমি? তুমি বেঁচে আছ? সিরাজ যে বলল সে তোমাকে...'

তারপরেই একটা প্রাণফাটা হাহাকার মহিষবাথানের নিস্তব্ধ অন্ধকারটাকে থরথর করে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

পুলিশ এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে অখিলবাবু ডাকাতের হাতে নিহত হয়েছেন, কারণ তাঁর মানিব্যাগ, হাতঘড়ি, ফোন আর সদ্য কেনা বাটার হাশপাপি জুতো নিখোঁজ। কিন্তু কতগুলো খটকা তাদের রয়েই গেছে। যেমন, মহিষবাথানের বিশাল মাঠের মধ্যিখানে রাত্রি বেলা অখিলবাবু গিয়েছিলেন কেন? তাঁর গাড়িটা মধ্যমগ্রামের কাছে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে ওই জায়গায় তিনি গেলেন কীভাবে? ডাকাত বা ডাকাতেরা তাঁর সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাঁকে প্রায় উলঙ্গ করে একটা বাবলা গাছের নীচে ফেলে রেখে গিয়েছিল। তা করতেই পারে। কিন্তু অমন বীভৎসভাবে আঁচড়ে কামড়ে, চোখদুটো উপড়ে দিয়ে, কানদুটো ছিঁড়ে ফেলে, মুখটা প্রায় চেনার অযোগ্য করে রেখে গেল কেন? এহেন নৃশংসতার কি প্রয়োজন ছিল?

বাসুদেবের নতুন বাসা

সন্ধের ম্লান আলোয় মুগ্ধ চোখে বাড়িটা দেখছিলেন বাসুদেব সরকার। ঠিক এইরকমই একটা বাড়ি খুঁজছিলেন কিছু দিন ধরে। শ্যাওড়াফুলি থেকে যে রাস্তাটা চন্দননগরের দিকে গেছে, তার মাঝামাঝি একটা সরু রাস্তা বেরিয়ে দু-পাশে কলাবাগানের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে কয়েকটা গ্রাম ঘুরে দিয়াড়ার দিকে চলে গেছে। তারই ওপরে একটা গ্রাম গোবিন্দনগর। তার একপ্রান্তে পেছন দিকে চারদিকে ধান খেতের মধ্যিখানে বাড়িটা অসহায় নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বাড়িটার বয়েস কোনোনা এক-শো বছর তো হবেই আর কতদিন যে পরিত্যক্ত তা বোধ হয় কেউ জানে না। একটা মস্ত চৌকো উঠোনের চারদিক ঘিরে প্রকাণ্ড দোতলা ইমারত। বাইরের পলেস্তারা কবেই খসে পড়ে গেছে, জানলাগুলোর চিহ্নমাত্র নেই, উঠোন ভরতি বড়ো বড়ো ঘাস, উঠোনের মাঝখানে শ্বেতপাথরের স্নানরতা নগ্ন ভেনাসের মূর্তি, তবে তাঁর আর সংকোচের কোনো কারণ আপাতত নেই; কারণ বুনো লতায় তাঁকে প্রায় আগাপাস্তলা ঢেকে ফেলেছে। ভেতরে ঢোকার উঁচু খিলেন করা দেউড়ির দরজা অদৃশ্য আর তার চুড়োয় রাখা গোটাতিনেক পরির সকলেই আজ ধরাশায়ী।

খুবই পুলকিত চিত্তে এক হাতে বেহালার বাক্স আর অন্য হাতে একটা বড়ো সুটকেশ নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন বাসুদেব। ভেবেছিলেন, হিংস্র আর পরশ্রীকাতর প্রতিবেশীদের অসভ্যতা আর চারদিকের টেলি-ভীষণের সশব্দ অত্যাচারে তাঁর শিল্পসাধনায় তিনি বোধ হয় আর কোনদিনই সফল হতে পারবেন না। এইবার এইখানে তিনি মুক্ত, তাঁর সাধনায় কেউ বাধা দিতে আসবে না। স্টেশনে শুনে এসেছেন যে, লোকে এই বাড়িটাকে রাজবাড়ি বলে আর সন্ধের পর ভয়ে কোনো লোক এর ধারেকাছে আসে না। শুনে যে কী খুশি হয়েছিলেন! সারাদিন ঘুমোবেন, সন্ধের পরেই শুরু করবেন তাঁর সাধনা। সেটাই তো প্রকৃষ্ট সময়।

বাসুদেব একজন শিল্পী। এতদিন মগ্ন ছিলেন ছবি আঁকা নিয়ে, যদিও এজন্য তাঁর পরিবারের লোক আর গর্দভ সমালোচকদের নানারকম কটুকথা তাঁকে শুনতে হয়েছে। তিনি অবশ্য তাতে মোটেই বিচলিত হননি। আর্টের ব্যাপারে এদের যা জ্ঞানগম্যি তাতে এর চেয়ে অন্যরকম কিছু তিনি আশাও করেননি। কিন্তু ঘটনাটা গুরুতর হয়ে উঠল যখন তিনি বেহালা বাজানো শুরু করলেন। এবার তাঁর পরিবারের লোকেদের সঙ্গে প্রতিবেশীরাও যোগ দিল। রীতিমতো অত্যাচার শুরু হয়ে গেল। তাঁর চিলেকোঠার ঘরে রাত্রি বেলা যেই তিনি বেহালায় ছড় টানতেন, অমনি জানালার ওপর ঠকাস ঠকাস করে ঢিল পড়তে শুরু করত। দু-একটা ভেতরেও যে চলে আসত না তা নয়। ভীমের সঙ্গে হনুমানের মোলাকাতের একটা অসাধারণ বিমূর্ত ছবি এঁকেছিলেন, সেটা তো ছিঁড়েই গেল। আর সেইসঙ্গে নীচের তলা আর চারপাশ থেকে গালাগালির ঝড়। এহেন অসহ্য অবস্থায় সাধনা করা কি কারুর পক্ষে সম্ভব?

এখন আর ভয় নেই। এখানে কেউ তাঁকে বিরক্ত করতে আসবে না। এই নীরব শান্ত নিষ্কলুষ নির্জনতায় তিনি নিশ্চিন্তে তাঁর সাধনা চালিয়ে যেতে পারবেন।

এইবার বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখতে শুরু করলেন বাসুদেব।

একতলার ঘরগুলো বাস করার পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত বলে মনে হল না। মেঝে ফাটিয়ে ঘাস গজিয়েছে, জানালা দিয়ে ঢুকে এসেছে জংলি লতা। একটা ঘরই কিছুটা পরিষ্কার আছে, বোধ হয় বছর দশেক আগে এখানে কিছু অসামাজিক লোক আশ্রয় নিয়েছিল। আজও মাকড়শার ঝুলে ঢাকা একটা তোলা উনুন আর একটা কুঁজো তাদের স্মৃতি বহন করছে।

দোতলায় যেতে গিয়ে কিছুটা বাধা পেলেন বাসুদেব। ওপরে ওঠার চওড়া কাঠের সিঁড়িটা ভেঙে নীচে পড়ে আছে। তবে, কে বা কারা, হয়তো বা সেই অসামাজিক লোকগুলোই হবে, তার জায়গায় একটা বাঁশের মই লাগিয়ে রেখে গেছে। পাকা বাঁশ এখনও প্রায় অক্ষতই আছে। ভালোই হল। ওপরে গিয়ে মই তুলে নিলে আর কেউ আচমকা উঠে আসতে পারবে না।

দোতলার ঘরগুলোর অবস্থা অনেক ভালো। দেওয়ালে মেঝেতে বড়ো বড়ো ফাটল আছে বটে, তবে তা একেবারে বসবাসের অনুপযুক্ত, সেরকম নয়। বাসুদেব একটা বড়ো ঘর দেখতে পেলেন যার ভেতরে একটা প্রকাণ্ড কালো কাঠের টেবিল তিনটে তাকওলা কারুকার্য করা একটা আলমারিও আছে। প্রায় অক্ষত। চমৎকার ব্যবস্থা। টেবিলটার ওপর শোওয়া যাবে। সুটকেসের জিনিসপত্রগুলো আরামসে আলমারিতে ধরে যাবে।

তিনতলায় ছাদে যাবার সিঁড়িটাও ভাঙা। মইটা লাগিয়ে উঠে চারদিকের দৃশ্য দেখে

একেবারে বিমোহিত হয়ে গেল বাসুদেব। বাড়িটার ঠিক পেছনেই একটা আধবিঘে পরিমাণ ডোবা বা পুকুর, কচুরিপানায় ঢাকা, তবে জল আছে। আর, চারদিকে ধান খেত। দূরে কয়েকটা গ্রাম আসন্ন সন্ধ্যায় গাঢ় কমলারঙের ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপর কালো কালো স্তূপের বিমূর্ত ছবির মতো দেখাচ্ছে। এইশিল্পীর শিল্পসাধনার প্রকৃষ্ট জায়গা।

বড়ো সুখে দিন কাটছিল বাসুদেবের। তিনি আসবার পর ভাগ্যক্রমে বাড়িটার বদনাম আরও বেড়েছে। আগে চাষিরা দুপুর বেলা বাড়িটার ছায়ায় বসে ভাত খেত, খুব সাহসীদের কেউ কেউ ভেতরে ঢুকে ঘাসও কাটত, এখন সেসব বন্ধ। কিছুদিন আগে গোবিন্দনগর গিয়েছিলেন বাসুদেব। সেখানে মুদির দোকানে শোনেন খুব উত্তেজিত আলোচনা চলছে। দু-দিন আগে কার্তিক সাঁতরার বড়ো ছেলে ব্রজগোপাল চন্দননগরে কলেজ সেরে ফিরছিল। রাত হয়ে গিয়েছিল বলে মাঠের ভেতর দিয়ে শটকার্ট মারছিল। ডাকাবুকো ছেলে ভয়ডর কম। রাজবাড়ির কাছাকাছি আসতে সে শোনে ভেতর থেকে একটি মেয়ের কান্নার আওয়াজ আসছে। তখন তার মধ্যে বীরত্ব জেগে ওঠে। সে ওদিকে ছুটে যায়। কিন্তু কাছাকাছি যেতেই সে স্পষ্ট শোনে দেউড়ির পেছনে একটা ক্রুদ্ধ ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি ডাক। তখন তার সব সাহস উবে যায়, সে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে চলে আসে। তার কারণ গোবিন্দনগর কেন, আশেপাশে পাঁচটা গাঁয়ের লোক এই তল্লাটে ঘোড়া তো দূরস্থান, গাধাই দেখেনি কোনোদিন।

শুনে বাসুদেব মনে মনে হেসে অস্থির। হিসাব করে দেখলেন, ঘটনাটি যে রাত্রের এবং যে সময়ের কথা হচ্ছে, তখন তিনি পুরিয়া ধানেশ্রী বাজাচ্ছিলেন। তাঁর সূক্ষ্ম মীড় আর ঝালার কাজ শুনে যতসব হিজিবিজি কথা ভেবেছে ব্রজগোপাল। তবে তারই বা দোষ কী? গাঁয়ের ছেলে, সে কি আর কোনোদিন বেহালায় ক্লাসিক্যাল রাগরাগিণী শুনেছে!

দুর্ভাগ্য এই যে, সুখ কখনোই নিরবচ্ছিন্ন হয় না। তা না-হলে ছ-টা মাস কাটতে না-কাটতেই খামোখা একজোড়া ঘরপালানো প্রেমিক-প্রেমিকা এ বাড়িতে উপস্থিত হবে কেন।

সেদিন বিকেল বেলা ছাদে বসে ছবি আঁকছিলেন বাসুদেব। বিষয়বস্তুটা অত্যন্ত জটিল। বালক শ্রীকৃষ্ণ গিরিগোবর্ধন ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন আর তাঁকে সে অবস্থায় দেখে নিজেকে কিছুতেই সামলাতে না-পেরে একটি অত্যন্ত দুষ্ট গোপবালক তাঁকে কাতুকুতু দিতে এগিয়ে আসছে। এই দৃশ্যে সমবেত গোপমণ্ডলীর প্রত্যেকটি লোকের মুখে যে বিভিন্ন রকমের ভাবোদয় হচ্ছে সেটা আলাদা আলাদা করে ফুটিয়ে তোলা তো চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। কাজেই, গভীর মনোযোগ সহকারে সেই কর্মে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন তিনি। এইসময় তাঁর কানে এল নীচের উঠোন থেকে একটি নারী ও একটি

পুরুষের কণ্ঠস্বর। পুরুষ কণ্ঠ বলছিল, 'দ্যাখো রূপা, লুকিয়ে থাকার এরচেয়ে ভালো জায়গা আর পাবে না। তোমার বাবা দুঁদে দারোগা, কলকাতা আর চন্দননগর চষে ফেলে দেবেন কালকেই। কিন্তু এ জায়গার খবর ডায়েরিতে লেখা নেই। আজ থেকে বছর বারো আগে, আমি তখন স্কুলে পড়ি, এই বাড়িতে এসে লুকিয়েছিলুম প্রায় একমাস পাড়ার পোলিটিকাল পার্টির দাদাদের সঙ্গে। কোনোদিন একটা পুলিশেরও টিকি দেখিনি। দিনদশেক যেতে দাও, দেখবে তোমার মার মন দিব্যি নরম হয়ে এসেছে। তোমার মা-ই ঘ্যানঘ্যান ঘ্যানঘ্যান করে সে-ই কাজটি করবেন। আমি একদিন গোপনে চন্দননগরে গিয়ে খবর নিয়ে আসব, তারপর ড্যাংড্যাং করতে করতে ফিরে যাব।

রূপা বলল, 'কিন্তু আমার যে বড্ডো গা-ছমছম করছে, মন্টুদা।' মন্টুদা বলল, 'তা তো একটু করবেই। এরকম একটা পোড়ো-বাড়িতে সেটাই স্বাভাবিক। তবে ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমি তো ছিলুম এখানে। এখন শীতকাল, সাপখোপের ভয় নেই। আর, ভূতপ্রেত? ওসবে আমি বিশ্বাসও করি না, ভয়ও পাই না।'

দু-জনে দিনদশেক থাকবে শুনে বাসুদেব প্রায় ভির্মি যাচ্ছিলেন। এ তো মহাবিপদ। এতদিন তো নিজেকে লুকিয়ে রাখা যাবে না। আর, একবার উপস্থিতি টের পেলে দু-জনে যদি মেসোমশাই, মেসোমশাই করতে করতে ঘাড়ে এসে পড়ে তবে তো তাঁর সাধনার দফা, গয়া। তার ওপর আবার থানা-পুলিশের ব্যাপার আছে। নাঃ এদের পত্রপাঠ না-তাড়াতে পারলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

ছবি আঁকা মাথায় উঠল। অত্যন্ত চিন্তাকুল চিত্তে রং, তুলি, কাগজ বগলদাবা করে মই বেয়ে দোতলায় নেমে এলেন বাসুদেব। একটুও সময় নষ্ট করা চলবে না, আজ রাত্রের মধ্যেই তাড়াতে হবে। মেরে তাড়ানো সম্ভব নয়। একমাত্র উপায় ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করা। এমন ভয় দেখাতে হবে যাতে জীবনে আর দু-জনে এমুখো না-হয়। ভূতের ভয়ই দেখাতে হবে। অন্য অনেক কিছুই হয়তো করা যেত, কিন্তু সেসব করবার সময় নেই। মেয়েটা তো এখনি ভয় পেয়েই গেছে। সেটা বাড়াতে হবে আর ছেলেটাকেও তদানুরূপ ভয় পাওয়াতে হবে। তিনি নাকি আবার ভূতে বিশ্বাস করেন না! দেখা যাক সে ব্যাপারে কিছু করা যায় কিনা।

প্ল্যান-প্রোগ্রাম ঠিক করে সবকিছু তৈরি করতে করতে সন্ধে গাড়িয়ে রাত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ছেলেমেয়ে দুটো বাজার থেকে কিনে আনা ডালপুরি আলুর দম খেয়ে, গায়ে ওডোমস মেখে, তোলা উনুনওলা ঘরটায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। মেয়েটির চিত্তে কিন্তু একটুও সুখ নেই। না থাকারই কথা। কোথায় দারোগার কোয়ার্টার্স-এর শোবার ঘর আর কোথায় এই ভূতুড়ে পোড়ো বাড়ির ভাঙা ঘরে মাটিতে বিছানা। মন্টুদা একটু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড মুখঝামটা খেয়ে বিষণ্ণ মনে নাক ডাকানোই স্থির করেছেন।

রূপার প্রবল ঠেলা খেয়ে 'কে কে, কী কী' করতে করতে উঠে বসল মন্টু। কাঁপা কাঁপা গলায় রূপা বলল, 'শুনছ? ওপরতলায় কে যেন বেহালা বাজাচ্ছে।'

'কোথায়?' বলে কান পেতে শুনে মন্টু বলল, 'এঃ, কী জঘন্য হাত! এ কি বাজনা হচ্ছে? মনে হচ্ছে, বাগেশ্রী বাজাবার চেষ্টা করছে। বাগেশ্রী তো নয়, হচ্ছে বাঘের শ্রী। কিংবা বিশ্রীও বলতে পারো।

কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলেন বাসুদেব। ভীষণ চটে গেলেন। যতসব অশিক্ষিত পাষণ্ড। রেগেমেগে একটা দারুণ মীড়ের কাজ লাগালেন। এইবার বোঝ।

মন্টু বলল, 'ইস্‌স্‌! মার্ডার, মার্ডার! নাঃ, এর দ্বারা জীবনেও বেহালা বাজানো হবে না।'

রূপা চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'উফ, মন্টুদা! আমি কি তোমাকে বাজনার সমালোচনা করতে বলেছি? দোতলায় তো যাবার কোনো পথ নেই। সেখানে বসে কে এইসময় বেহালা বাজাচ্ছে, সেটা ভেবে দেখছ কি?'

'যেই বাজাক, তার বাজানো কিন্তু একেবারেই উচিত হচ্ছে না। আর, তুমি কি ভাবছ কোনো অশরীরী ওপরে বসে এহেন বেসুরো বেহালা বাজাচ্ছে? আমার তা মোটেই মনে হচ্ছে না। অশরীরীদের কি আর খেয়েদেয়ে কোনো কাজ নেই? দ্যাখো গিয়ে, গোবিন্দনগরের কোনো ছেলে যাত্রাদলে নাম লেখানোর জন্য ধান খেতে বসে বাজনা প্র্যাকটিস করছে। পাড়ার মধ্যে করলে তো মার খেয়ে চিরকালের জন্য খোঁড়া হয়ে যাবে, সেইজন্য। আর সেই আওয়াজ প্রতিধ্বনি হয়ে মনে হচ্ছে দোতলা থেকে আসছে। তবে, প্র্যাকটিসটা বৃথা যাচ্ছে। দুনিয়ায় কোনো যাত্রা পার্টি নেই যারা এই বেহালাবাদককে দলে নেবে— এটা আমি লিখে দিতে পারি। বলে মন্টুদা আবার নাক ডাকতে শুরু করে দিল।

একটু বাদেই আবার প্রবল ঠেলা খেয়ে উঠে বসল মন্টু। ঘুমজড়িত গলায় বলল, 'আবার কী হল?'

কাঁদোকাঁদো গলায় রূপা বলল, 'ওই শোনো, ওপরে কী যেন গড়াচ্ছে।'

'ও কিছু নয়। ইঁদুর-টিদুর হবে। গড়াচ্ছে তো গড়াতে দাও না।'

'ইঁদুর কি কখনো অনবরত একটা ভারী জিনিস ঘরের এককোণ থেকে অন্যকোণে ঠেলে নিয়ে যায় আর নিয়ে আসে?'

'দ্যাখো রূপা, কবি বলেছেন, ইঁদুরের কেন বলো হেন ব্যবহার, যাহা পায় কেটেকুটে করে ছারখার? তা, সত্যদ্রষ্টা কবিরাই যখন ইঁদুরের ব্যবহারের রহস্য ভেদ করতে পারেননি, সেখানে চুনোপুঁটি আমি কোত্থেকে পারব বলো দেখি?'

রূপা চেঁচিয়ে বলল, 'এই কি তোমার পদ্য আওড়ানোর সময় হল? ওপরে ভূত বল খেলছে আর তুমি পদ্য আওড়াচ্ছ!'

'বল খেলছে? নাঃ আর খেলছে না। ভূত এখন পায়চারি করছে।'

ভারী সুটকেসটা ঠেলাঠেলি করে বাসুদেব ক্লান্তবোধ করছিলেন। এখন লেদার-সোলের পাম্পশু জোড়া পরে খটাস খটাস করে ঘর থেকে বারান্দা আর বারান্দা থেকে ঘর পায়চারি করতে শুরু করে দিয়েছেন।

রূপা প্রায় কেঁদে ফেলল। বলল, 'অ মন্টুদা, কিছু একটা করো!'

মন্টুদা একটু যেন নার্ভাস হয়েছে বলে মনে হল। বলল, 'দাঁড়াও, একটু চিন্তা করতে দাও। ওপরে নিশ্চয়ই কেউ আছে। সে আমাদের ভয় দেখাতে চাইছে। তার মানে সে খুব একটা সুবিধের লোক নয়। যদি গুণ্ডা-ফুন্ডা হয়, তবে তো চিত্তির। আমি আবার মারামারিটা তেমন পছন্দ করি না।'

'তা তো জানিই। ওই তো হাড়জিরজিরে স্বাস্থ্য, সারা বছর জিয়ারডিয়ায় ভোগো। তুমি আবার মারামারি করবে কি! তার চেয়ে চলো পালাই।'

'ব্যস্ত হয়ো না। পালাই বললেই তো আর হল না। এই রাতবিরেতে কোথায় পালাবে? তার চেয়ে আগে ওপরের ওই লোকটার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে দেখি। দেখি যদি ভজাতে পারি।'

ফিক করে হেসে রূপা বলল, 'তা তুমি পারবে। দারোগার মেয়েকে যখন ভজাতে পেরেছ, একেও পারবে।'

'সেই ভালো।' বলে মন্টু উঠে দাঁড়াল। বাইরের উঠোনে ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। তাই দেখে মন্টুর সাহস কিছুটা বাড়ল। দু-হাত ঘষতে ঘষতে যথাসাধ্য বীরত্ব দেখিয়ে উঠোনে নেমে ওপরের দিকে তাকিয়ে হাঁকল, 'এই যে দোতলার দাদা! একটু বাইরে বারান্দায় আসবেন, কথা....'

এই পর্যন্ত বলেই মন্টু হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেল। মুখটা হাঁ হয়েই রইল, চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল, হাত-পা একেবারে নট নড়নচড়ন।

রূপা দৌড়ে এসে পাশে দাঁড়াল। ব্যাকুল হয়ে বলল, 'মন্টুদা কী হয়েছে তোমার?'

মন্টুদা সম্বিৎ ফিরে পেতেই ওর মুখ বন্ধ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। দাঁতে দাঁতে লেগে ঠকাঠক ঠকাঠক করে বাদ্যবৃন্দ হয়ে গেল। তার ফাঁকে কোনোরকমে বলতে পারল, 'বার বার বার বার।'

'বার বার? কী বার বার, মন্টুদা?'

প্রবলবেগে মাথা নেড়ে মন্টুদা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'বার বার না। বারান্দায় একটা কং কং কং কং।'

'কংকং। সে আবার কী?'

আবার মাথা নেড়ে মন্টুদা পূর্ববৎ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কংকং না। বারান্দায় একটা কঙ্কাল!'

'হিইইইইই।'

'আমাকে হাত নেড়ে ডাকল, তারপর চলে গেল।'

'হিইইইইইই! আর আর এক মুহূর্তও এখানে থাকব না। থাকতে হয় তুমি থাকো।'

রূপার সান্নিধ্যে মন্টুর বোধ হয় সাহস কিঞ্চিৎ বেড়েছিল। বলল, 'একটু দাঁড়াও। চাঁদের আলোয় ভুল দেখলুম কি?'

কথাটা শেষ করতে পারল না মন্টু, তার আগেই ঝপাস করে এক বালতি পানাপুকুরের বরফঠান্ডা দুর্গন্ধ পচা জল এসে পড়ল দু-জনের মাথায়। সেইসঙ্গে বারান্দার ওপরে একটা সাদাকালো ছায়ামূর্তিও দেখা গেল।

তৎক্ষণাৎ হাঁটুর ওপর শাড়ি তুলে, 'আঁমি মাঁ-র কাঁছে যাঁব' বলে যে গতিতে রূপা দেউড়ির দিকে ছুট লাগাল তা উইলমা রুডলফ দেখলে দৌড়নো ছেড়ে যে লুডো খেলার সাধনায় আত্মনিয়োগ করতেন তাতে কোনো সন্দেহই থাকে না। মন্টুদাও চোখের জল মুছে, 'ও রূপা আমিও যাব, আমাকে ফেলে যেও না গো,' বলে উর্ধ্বশ্বাসে পেছনে দৌড়ল।

হাসতে হাসতে বাসুদেব সরকার প্রায় শুয়েই পড়েছিলেন। কোনোরকমে ধুতির ওপর কালো রং দিয়ে আঁকা কঙ্কালের পোশাকটা খুলে ফেলে লাফাতে লাফাতে নীচে নেমে এলেন। এতদিনে তাঁর বহুকালের বাসনা চরিতার্থ হল। বলে কিনা বাগেশ্রী না-হয় বাঘের শ্রী হচ্ছে? জঘন্য হাত? এতবড়ো আস্পর্ধা। এইরকম সব সমালোচকদের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতে পারলে আরও খুশি হতেন। তবে যা দিয়েছেন তা যথেষ্টরও বেশি। মন ভরে গিয়েছে। পেট চেপে হাসতে হাসতে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে চাঁদের আলোয় ধান খেতের ওপর দিয়ে বিদ্যুদ্বেগে অপস্রিয়মাণ মূর্তি দুটোকে যতক্ষণ পারলেন দেখলেন বাসুদেব। তারপর, আনন্দের আতিশয্যে একটা প্রকাণ্ড লাফ মেরে দোতলার একটা ছোট্ট ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে সুড়ুৎ করে গলে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

মায়াকানন

বিশ্বরূপ রায় আর দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য শাকিলা বাজার থেকে জামশেদপুরে ফিরছিলেন। শাকিলা বাজারে একটা মিনি স্টিল প্লান্ট বসবে, তার টেন্ডার নিয়ে কথাবার্তা বলবার জন্যে কোম্পানি ওঁদের পাঠিয়েছিল কলকাতা থেকে। জামশেদপুর থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ভোর বেলা বেরিয়েছিলেন, আলাপ-আলোচনার পর শাকিলা বাজার থেকে যখন বেরুতে পরলেন তখন বিকেল হয়ে গেছে।

জামশেদপুর থেকে শাকিলা বাজারের রাস্তাটা ভালো নয়। ভাঙাচোরা তো বটেই, ডাকাতেরও ভয় আছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার রঘুনাথ সিং সেজন্য কোনো অ্যাটাচিকেস বা স্যুটকেস সঙ্গে নিতে বারণ করেছিল। সেইসঙ্গে দু-জনের পকেটে হাজার খানেক করে টাকা রাখতে বলেছিল যাতে ডাকাতে ধরলে সেটা দিয়ে পার পাওয়া যায়। বাকি কাগজপত্র সব ফাইলে নিতে বলেছিল।

শাকিলা বাজারে যাওয়ার সময় কোনো গণ্ডগোল হয়নি। ফেরার পথে গোলমাল শুরু হল। বেশ চলছিল ট্যাক্সিটা, হঠাৎ ভানুপুরার জঙ্গলের মাঝামাঝি এসে গাড়িটা একটা ঝাঁকানি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

দেবেন্দ্র চাপা গলায় বলল, 'দেখলেন তো স্যার! যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়।'

বিশ্বরূপ বললেন, 'যা বলেছ। আজ কপালে দুঃখ আছে।'

ইতিমধ্যে রঘুনাথ সিং গাড়ি থেকে নেমে বনেট খুলে কীসব করছিল। অনেক ধস্তাধস্তির পর যখন স্টার্ট দিল তখন ইঞ্জিন চালু হল বটে কিন্তু তার ভেতরে একটা বিকট ঘটঘট শব্দ শুরু হল। আর পেছনের পাইপ দিয়ে গল গল করে কালো ধোঁয়া বেরুতে লাগল।

রঘুনাথ বলল, 'ইঞ্জিনের ভেতরে কিছু ভেঙেছে বলে মনে হচ্ছে। না-খুললে বোঝা যাবে না।' বলে সাবধানে গাড়িটা চালু করল। গাড়ি চলতে শুরু করল ঠিকই কিন্তু একেবারে শম্বুক গতিতে, নানা রকমের শব্দ করে আপত্তি জানাতে জানাতে।

দেবেন্দ্র বলল, 'এরচেয়ে আর বেশি জোরে চালানো যাবে না?'

রঘুনাথ মাথা নাড়ল। বলল, 'না, বেশি চাপাচাপি করলে একেবারে বসে যাবে। সামনেই রানিজির দোকান। আপনারা ওখানে বসে চা-টা খান। আমি গাড়ি রেখে হেঁটে আগে চলে যাব। ভানুপুরার বস্তি ওখান থেকে মাইলদুয়েক। সেখান থেকে লোকজন নিয়ে আসব।'

'রানিজি কে?'

রঘুনাথ সিং হাসল। বলল, 'আমি ঠিক জানি না। যতদিন এ রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছি, ততদিন ওঁকে দেখে আসছি। আমার বাবাও তাই দেখেছেন। কত বয়েস কেউ জানে না। কবে থেকে দোকান চালাচ্ছেন তা-ও আর কারুর মনে নেই।'

দেবেন্দ্র শঙ্কিত মুখে বিশ্বরূপকে বলল, 'ব্যাপার কিছু বুঝলেন স্যার?'

বিশ্বরূপ একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'ব্যাপার বুঝে দরকার নেই। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিলেই হবে।'

ট্যাক্সি যখন ঘটাং-ঘটাং করতে করতে রানিজির দোকানে পৌঁছল, তখন রাত হতে আর বেশি বাকি নেই। জঙ্গলের মাথায় সূর্যাস্তের বিলীয়মান আলোর কিছুটা রয়ে গেছে বটে কিন্তু তার তলায় জমাট অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। ঘরে-ফেরা পাখিদের চ্যাঁচামেচিও প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। রঘুনাথ গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করামাত্র নিস্তব্ধ জঙ্গল যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

রাস্তার ধারেই রানিজির দোকান। যাওয়ার সময় কারুরই নজরে পড়েনি। না পড়বারই কথা। শ্যাওলাধরা ইটের দেওয়াল আর ধূসর হয়ে আসা টিনের চালের ছোট্ট ঘরটা চারিদিকের বড়ো বড়ো গাছ আর ঝোপঝাড়ের সঙ্গে যেন মিলেমিশে রয়েছে। ঝাঁপ বন্ধ থাকলে জঙ্গলের থেকে তাকে আলাদা করা কঠিন ব্যাপার।

এখন অবশ্য নজরে পড়ল। দূর থেকে দেখা গেল, সাদা শাড়ির ওপর খয়েরি রঙের চাদর মুড়ি দেওয়া এক বৃদ্ধা মহিলা হারিকেন জ্বেলে দোকানের বাইরে আসছেন। উদ্দেশ্য, ঘটাং ঘটাং শব্দটা কেন হচ্ছে তার কারণ অনুসন্ধান করা।

রঘুনাথ সিং দোকানের সামনে গাড়ি রেখে নেমে গেল। বৃদ্ধার কাছে গিয়ে তাকে নমস্কার করে ঠেট হিন্দিতে বলল, 'নমস্তে রানিজি। আপনার একটু সাহয্যের দরকার।' বলে কী ঘটেছে তা সবিস্তারে জানাল।

লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল বৃদ্ধার লোলচর্ম দন্তহীন মুখে একটা অত্যন্ত মধুর হাসি ফুটে উঠল। মাথা নেড়ে রানিজি সওয়ারি দু-জনকে নেমে আসতে আহ্বান করলেন।

বিশ্বরূপ গাড়ি থেকে নেমে রঘুনাথকে বললেন, 'তুমি, এই অন্ধকারে যেতে পারবে তো? কোনোরকম বিপদ-আপদ হবে না তো?'

রঘুনাথ প্রশ্নটা শুনে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। বলল, 'ঠিকই বলেছেন। জানোয়ারকে

ভয় পাই না, ভয় মানুষের। তাহলে, আমি গাড়িটা নিয়েই যাচ্ছি। সারানো হলেই নিয়ে চলে আসব।' বলে রানিজিকে বলল, 'আপনি তো একটু বাদে দোকান বন্ধ করবেন। ওঁদের একটু ভেতরে থাকতে দেবেন!'

রানিজি একটু ইতস্তত করে কাঁপা-কাঁপা গলায় হিন্দিতে বললেন, 'ঠিক আছে। তবে তাড়াতাড়ি এসো। নইলে এঁদের লাড়োয়া বিস্কুট আর চা খেয়ে রাতের খাওয়া সারতে হবে।' তারপর অতিথিদের বাংলায় বললেন, 'আমার সঙ্গে আসুন।'

দোকানের সামনে ঢোকার পথের আধখানা জুড়ে একটা মাটির উনুন। একপাশে একটা প্রাগৈতিহাসিক কাচের আলমারি। তার ভেতরে কয়েকটা কাচের বোয়ামে চা, চিনি, বিস্কুট, কেক ইত্যাদি। অন্যপাশে একটা হাইবেঞ্চ আর একটা নীচু বেঞ্চ। পেছনের দেওয়ালে একটা টিনের দরজা।

অসুস্থ গাড়িটা আর্তনাদ করতে করতে আর প্রচুর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলে গেলে রানিজি অতিথিদের ভেতরে এনে বসালেন। বললেন, 'চা খাবেন তো? সেইসঙ্গে কেক?'

দেবেন্দ্র বলল, 'আপনি তো ভারি চমৎকার বাংলা বলেন!'

রানিজি হাসলেন। বললেন, 'শুধু বাংলা কেন, আমি আরও পাঁচ-ছটা ভাষায় কথা বলতে পারি। আমার এখানে নানা প্রদেশের ড্রাইভাররা আসে। তাদের কথাবার্তা শুনে শুনে শিখে নিয়েছি। অনেক বছর তো হল এখানে।'

'এই জঙ্গলের মধ্যে একা দোকান চালাচ্ছেন, ভয় করে না আপনার?'

'কীসের ভয়? বাঘ-ভাল্লুক তো নেই। মাঝে মাঝে চিতাবাঘ এসে পড়ে। এই উনুন দেখলে তারা আর কাছে আসে না। আর চোরডাকাত? আমার কাছে কী যে চুরি করবে? এই দোকানের গেলাস বা ডিশ চুরি করতে পারে অবশ্য, তবে তাতে তাদেরই পরদিন চা জুটবে না।'

'এই সেরেছে। তাঁরাও আসেন নাকি এখানে?'

'নিশ্চয়ই। এই এলাকাটা দিনের বেলা পুলিশের, রাত্রি বেলা ডাকাতের। কোনো অসুবিধে নেই। কেউ কারুর অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না। আর ডাকাতরা আমার দোকানের খদ্দেরদের কখনো বিরক্ত করে না।' বলে পলকাটা দুটো গেলাসে প্রায় সাদা চা আর একটা প্লেটে দুটো কেক হাইবেঞ্চের ওপর রাখলেন রানিজি।

দেবেন্দ্র অবশ্য একথায় যে খুব একটা আশ্বস্ত হয়েছে তা মনে হল না। সন্ত্রস্ত মুখে চায়ে চুমুক দিতে লাগল।

বিশ্বরূপ জিগ্যেস করলেন, 'কত বছর এখানে আছেন রানিজি?'

'সে কি আর মনে আছে? অনেক বছর।'

'তবু? সে সময়কার কোনো ঘটনা আপনার মনে পড়ে?'

রানিজি একটা নীচু টুলের ওপর বসেছিলেন। মাথা নীচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন শেষ হয়ে আসছে।'

বিশ্বরূপের হাত থেকে চায়ের গেলাসটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। কোনোরকমে সামলে নিয়ে বললেন, 'বলেন কী? সে তো উনিশ-শো পঁয়তাল্লিশ কী ছেচল্লিশ হবে। তার মানে আজ থেকে প্রায় চুয়ান্ন বছর আগে! ওরে বাবা! এখন আপনার বয়েস কত?'

'কত হবে? আশি বোধ হয়।' বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রানিজি উঠে দাঁড়ালেন। খালি গেলাসগুলো নিয়ে পেছনের দরজা খুলে বাইরে অন্ধকারে বেরিয়ে গেলেন একটা লণ্ঠন নিয়ে। আওয়াজে বোঝা গেল বালতি থেকে জল নিয়ে গেলাসগুলো ধোওয়া হচ্ছে।

বিশ্বরূপ বিড়বিড় করে হিসাব করছিলেন, 'আশি বছর। তার মনে ছাব্বিশ বছর বয়েসে দোকান দিয়েছিলেন।'

একটু বাদেই রানিজি ফিরে এলেন। বিশ্বরূপ জিগ্যেস করলেন, 'এইখানে চুয়ান্ন বছর আগে দোকান দিয়েছিলেন? তখন খদ্দের আসত?'

'কেন আসবে না? বরং বেশি আসত। আগে রকসৌল বা বাঘা যাওয়ার এটাই রাস্তা ছিল। এখন নতুন রাস্তা হয়েছে। গাড়ি-ঘোড়া কমে গেছে।'

'আপনি কি ভানুপুরার বাসিন্দা?'

রানিজি এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না। মাথা নীচু করে বিষণ্ণ মুখে আবার টুলের ওপরে গিয়ে বসলেন। দেবেন্দ্র গলা নামিয়ে বলল, 'স্যার! আমরা বোধ হয় ওঁর হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাচ্ছি।'

বিশ্বরূপ চোখ পাকিয়ে বললেন, 'চোপ! কথায় কথায় তোমার এই কাব্যি করার অভ্যেসটা ছাড়ো তো। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এসেছিলে কী করতে, হ্যাঁ?'

ম্লান হেসে রানিজি বললেন, 'ওকে বকবেন না। সত্যিই তো, আমাদের অতীতের স্মৃতিগুলো বেদনাদায়কই তো বটে।'

আবার হাঁ হয়ে গেলেন বিশ্বরূপ। বললেন, 'আপনি যা বললেন তাতে বুঝলুম যে আপনি ভানুপুরার বাসিন্দা নন এবং আপনি বাঙালি। কারণ, ট্রাক ড্রাইভারদের বাক্যালাপ শুনে আপনি যে ভাষায় কথা বললেন, সে ভাষা শেখা যায় না। আর আপনি যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছেন তাতেও সন্দেহ নেই। তাহলে এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় এরকম চায়ের দোকান কেন দিয়েছিলেন ছাব্বিশ বছর বয়েসে? আপনি কি বিপ্লবী ছিলেন?'

রানিজি সহাস্যে বললেন, 'বিপ্লবী? না, না, সেরকম কিছু নয়। দোকান দিয়েছিলুম পেট চালানোর জন্যে।'

'পেট চালানোর জন্য! এই জঙ্গলে? দুনিয়ায় আর জায়গা ছিল না?'

রানিজি বললেন, 'উপায় ছিল না।' বলে উদাস হয়ে বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বিশ্বরূপ একটু ইতস্তত করে বললেন, 'দেখুন, অতিরিক্ত কৌতূহল বা কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসা যে অত্যন্ত অন্যায়, একটা সামাজিক অপরাধ তা আমি জানি। আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কেউ বেশি প্রশ্ন-ট্রশ্ন করলে আমি ভয়ানক রেগে যাই, গালাগালি করি পর্যন্ত। তা সত্ত্বেও আপনার অতীত জীবনের ইতিহাস জানবার ইচ্ছেটা চেপে রাখতে পারছি না। আপনার ভাষা বলে দিচ্ছে যে আপনি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের মানুষ। অথচ এরকম একটা জায়গায় এরকম একটা দোকান দিয়ে অর্ধশতাব্দী কাটিয়ে দিলেন যে, তার কারণটা না-জানতে পারলে আমার রাতের ঘুম, দিনের খাওয়া ইত্যাদির বেশ অসুবিধে হতে পারে।'

বৃদ্ধার মুখে একটা ছেলেমানুষি হাসি ফুটে উঠল। উজ্জ্বল চোখে বললেন, 'বলেন কী? সে তো ভালো কথা নয়।'

'নয়ই তো।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রানিজি বললেন, 'আপনারা বুদ্ধিমান লোক। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমি এখানে অজ্ঞাতবাস করছি। যে কারণে অজ্ঞাতবাস শুরু করেছিলুম সেটা বোধ হয় শেষ হয়ে যায়নি। জীবনের শেষ পর্যন্ত এই ভাবেই হয়তো আমাকে কাটাতে হবে। কাজেই, আমার জীবনের ইতিহাস আপনাদের বলা আমার বিপদ ডেকে আনতে পারে, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা পারে যদি না-আপনি আমাদের যা বলবেন সেটা এই ঘরের চার দেওয়ালের বাইরে কখনোই না-যায়। আপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন। আমরা ভদ্রলোক। নিঃস্বার্থভাবে অন্যের অপকার করা আমাদের স্বভাব নয়।'

দেবেন্দ্র বলল, 'আপনি যা বলবেন, সেটা আমরা গল্প বলেই ধরে নেব। এই অন্ধকারেই তো জোনাকি রঙে গল্প তৈরি হয়।'

বিশ্বরূপ আবার চোখ পাকিয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে রানিজি বললেন, 'তা ঠিক। বিশেষত আজ আমার জীবনের সব লেনদেনই যখন ফুরিয়েছে, তখন আর বাধা কোথায়? আমার এখানে যারা আসে তাদের ভীষণ তাড়া। আমাকে তারা লক্ষই করে না। আজ আপনাদের যে অবস্থায় এখানে আসতে হল, তাতে মনে হচ্ছে কেউ হয়তো চাইছে যে আমার ভেতরে জমে ওঠা কথার ভার কিছুটা কমিয়ে দেওয়াই দরকার।'

কুড়ি বছর বয়েসে বি এ পাশ করবার পর ভাগলপুরের বিখ্যাত উকিল প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদারের ছোটোছেলে প্রমথেশ মজুমদারের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। বাবা-মা আমার ছোটোবেলায় মারা গিয়েছিলেন। বড়ো হয়েছিলুম পাকপাড়ায় মামাবাড়িতে। আমার বিয়ে দিয়ে তাঁরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন।

প্রমথেশ ভাগলপুরের ভিক্টোরিয়া স্কুলে ইংরেজির টিচার ছিলেন। ভাগলপুর ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবের ক্যাপ্টেন ছিলেন। হিন্দি, ইংরেজি, উর্দু আর বাংলায় কবিতা লিখতেন 'প্রমথ' ছদ্মনামে। ওঁর অনেক কবিতাই সে যুগে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

আমাদের বিয়ের বছরচারেক বাদে প্রফুল্লচন্দ্র হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে মারা গেলেন। তখন সে যুগের আইনানুযায়ী তাঁর সমস্ত সম্পত্তির ভার নিলেন তাঁর বড়োছেলে অভয়চরণ। তিনি আর তাঁর পরের ভাই হরিচরণ ছিলেন প্রমথেশের বৈমাত্র ভাই। তাঁরা নিজেদের বেলা কী করেছিলেন তা জানি না, তার রোজগার কমে গেছে এই অজুহাতে প্রমথেশের মাসোয়ারা বন্ধ করে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যে হেঁশেলও আলাদা হয়ে গেল।

তখন বড়ো দুঃসময়। যুদ্ধের বাজারে জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া, খাদ্যাভাব, কালোবাজারিদের স্বর্ণযুগ। স্কুলের সামান্য মাইনেতে দিন চালানো অসম্ভব হয়ে উঠল। আমাদের সংসারে তখন আমার শাশুড়ি আর আড়াই বছরের ছেলেকে নিয়ে সাড়ে তিনজন। ছেলের জন্য চিন্তা ছিল না। হরিচরণ নিঃসন্তান ছিলেন। সে সারাদিন তার মেজোমার কাছেই থাকত। কিন্তু আমাদের দু-বেলা খাওয়া জোটাই কঠিন হয়ে পড়ল।

উপায়ান্তর না-দেখে উনি কলকাতায় চলে গিয়ে মিলিটারিতে নাম লেখালেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে চলে যেতে হল আফ্রিকায়। তারপর থেকে টাকা আসত ঠিকই কিন্তু তাতে সুখ কিছু বাড়ল না। তাঁর প্রত্যেকটি চিঠিতেই বোঝা যেত যে যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা আর নৃশংসতা তাঁকে কী ভীষণ মানসিক দুঃখে ক্লিষ্ট করছে। মাঝে-মাঝে মনে হত বুঝি সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে ফিরে আসবেন।

বছরখানেক বাদে আহত হয়ে দেশে ফিরে এলেন। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ছাড়া পাওয়ার পর তাঁকে ইটালিতে যেতে বলা হল। যাওয়ার আগে সাতদিনের ছুটিতে বাড়ি আসার অনুমতি পেলেন। ইতিমধ্যে হরিচণ মারা গেছেন। আমার ছেলে প্রায় পাকাপাকিভাবেই তার মেজোমার কাছে থাকছে।

উনি যেদিন এলেন তার পরদিন সকালে আমাকে বললেন, 'আমি আর ফিরে যাব না।' কিন্তু ফিরে যাব না তো বললেই হয় না। ডিসচার্জড না-হলে কারুর সৈন্যবাহিনীতে ফিরে না-যাওয়া গুরুতর অপরাধ। আর্মি এসে কান ধরে নিয়ে যাবে তারপর ভয়ানক শাস্তি। এসব উনি জানতেন কিন্তু কিছুতেই ওই অমানুষিক নারকীয়তার মধ্যে ফিরে যেতে রাজি হলেন না।

নিরুপায় হয়ে আমরা নকুলেশ্বর রাই-এর কাছে গেলুম পরামর্শ করতে। নকুলবাবু ভিক্টোরিয়া স্কুলে ইতিহাস পড়াতেন আর ওঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ভানুপুরার জমিদারবাড়ির ছেলে, প্রচণ্ড গান্ধীবাদী, অনুগ্রহ নারায়ণ সিং-এর কাছের মানুস আর ভাগলপুর আর তার আশেপাশের এলাকার প্রভাবশালী নেতা ছিলেন নকুলবাবু। দু-জনের ঘনিষ্ঠতার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল কবিতা। নকুলবাবু ওঁর কবিতার গভীর অনুরাগী ছিলেন।

সব শুনে নকুলবাবু বললেন, 'আমি ওকে দোষ দিই না। ও একজন কবি। ওই হিংস্রতার মধ্যে ও কখনো বাঁচতে পারে? এখন একমাত্র উপায় পালিয়ে যাওয়া। এতে নীতিগত কোনো অন্যায় নেই কারণ বেআইনি দখলদার ইংরেজ রাজত্বের প্রতি আনুগত্যের কোনো প্রতিজ্ঞারই কোনো মূল্য নেই। কিন্তু পালানো সহজ হবে না। সেজন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের স্বাধীনতার দিন আসন্ন। আর কয়েক বছর মাত্র। তারপর স্বাধীন ভারতের সৈন্যবাহিনী ওকে কখনো শাস্তি দেবে না। কাজেই সেদিন পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে।'

আমরা জিগ্যেস করলুম, 'কী ব্যবস্থা করবেন?'

একটু ভেবে নকুলবাবু বললেন যে ভানুপুরার জঙ্গলের ভেতরে ওঁদের একটা এক কামরার ছোটো বাড়ি আছে। ওঁর কোনো পূর্বপুরুষ ওটা বানিয়েছিলেন শিকার পার্টির বিশ্রামগৃহ হিসেবে। এ ছাড়া ওই বাড়িটা থেকে এক মিনিটের হাঁটাপথে আর-একটা ছোট্ট ঘর আছে। সেটা ঝোপঝাড়, লতাপাতা আর বড়ো বড়ো গাছে এমনভাবে ঢাকা যে জানা না-থাকলে কারুর সাধ্যি নেই সেটা খুঁজে বের করে। নকুলবাবু লজ্জিতভাবে জানালেন যে ওঠা ছিল তাঁর পূর্বপুরুষদের লীলাকক্ষ। আজ ওই ঘর দুটোর কথা প্রায় সকলেই ভুলে গেছে।

ব্যবস্থাটা এইরকম হল যে, সরু পায়ে চলা পথ দিয়ে জঙ্গলের ভেতরে বাড়িটাতে পৌঁছানো যায়, তার ওপর আড়াআড়ি করে এই দোকানটা তৈরি হল। উদ্দেশ্য, কেউ যদি বাড়িটাতে যেতে যায় তাহলে তাকে এই দোকানের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। দিনের বেলা হলে আমাকে ডিঙিয়ে, রাত্রি বেলা হলে দরজা ভেঙে। অর্থাৎ নিঃশব্দে বা অগোচরে যাওয়া যাবে না। বাড়িটা তো এখান থেকে কাছেই। কাজেই বাড়িতে যে-ই থাকুক, সে টের পেয়ে যাবে। তখন, পেছনের দরজা খুলে বেরিয়ে ছোটো ঘরটার মধ্যে আশ্রয় নিতে পারবে।

দোকানটা তৈরি হতে সময় লাগল দিন পাঁচেক। এর মধ্যে ঘর দুটোও সাফ হয়ে গেল। সাত দিনের দিন গভীর রাত্রে আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়ে গেলেন নকুলবাবু। তার পরদিন থেকে সিধা পাল্লু শাড়ি পরে, দু-হাতে একগাদা লালসবুজ কাচের চুড়ি পরে, একগলা ঘোমটা টেনে আমি দোকনদারি শুরু করলুম। ততদিনে আমার লোকাল ভাষাটা বেশ রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। নকুলবাবু মাঝে মাঝে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতেন, জিনিসপত্র দিয়ে যেতেন আর 'প্রমথ'-র কবিতা নিয়ে যেতেন ছাপানোর জন্যে। কেউ কোনো সন্দেহ করল না। সবাই জানল, নকুলবাবু তাঁর এক গরিব দেহাতি রক্ষিতাকে দোকান দিয়ে বসিয়েছেন। এই গুজবের কয়েকটা ভালো ফল হল এই যে, নকুলবাবুর পরিবার তাঁর বিলাসব্যসনহীন দেশভক্তি ছেড়ে এই পুরুষসুলভ স্বাভাবিক ব্যবহারে অত্যন্ত খুশি হল আর ডাকাত বা

বাজে লোকেরা আমাদের বিরক্ত করা থেকে বিরত রইল। কারণ ভানুপুরায় রাইপরিবারের রক্ষিতাকে ঘাঁটানোর ফল যে কী ভয়ানক হতে পারে, তা তারা বিলক্ষণ জানত।

এরমধ্যে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। আমাদের বিপদ কিন্তু কাটল না। পালিয়ে যাওয়া সৈন্যদের খুঁজে বের করতে আর্মি আরও বেশি করে উঠেপড়ে লাগল। তারপর দেশ স্বাধীন হল কিন্তু পালানো সৈন্যদের ক্ষমা করা হল না। এই সময় নকুলবাবু মারা গেলেন। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যে যোগাযোগ ছিল তা-ও প্রায় ছিন্ন হয়ে গেল। কাজেই আমাদের আর অজ্ঞাতবাস থেকে মুক্তি হল না।'

দেবেন্দ্র রুদ্ধনিশ্বাসে বলল, 'তারপর?'

'তারপর আর কিছু নেই। এখানেই রয়ে গেলুম। কোথায় বা যাব? বাপের বাড়ি বলে তো কিছু নেই। আমাদের ছেলেও আমাদের চেনে না। সে জানে তার বাবা-মা তার ছেলেবেলায় মারা গেছে। নকুলবাবু যতদিন বেঁচে ছিলেন, তার খোঁজখবর পেতুম। এখন সে যে কোথায় আছে, কী করছে জানিও না। আমার স্বামীও হঠাৎ অথর্ব হয়ে পড়লেন, 'তাঁকে নড়ানো-চড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ল।'

'অথর্ব হয়ে পড়লেন কেন?'

'শারীরিক আর মানসিক দু-দিক দিয়েই ওঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। স্বাধীনতার পর থেকে ওঁকে একটা প্রবল মানসিক অবসাদ আচ্ছন্ন করে ফেলল। তার কারণ কিছুটা অনুশোচনা, কিছুটা অপরাধবোধ, কিছুটা ভয় আর কিছুটা আমার জন্য চিন্তা। আমি আর নকুলবাবু অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছি, পারিনি। সেইসঙ্গে আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্রে পাওয়া আঘাতটা, যেটা কখনোই পুরোপুরি সারেনি, তাঁকে যন্ত্রণা দিতে শুরু করে দিল। তার ওপরে বছরের-পর-বছর ধরে নিশ্ছিদ্র নির্জনতা তাঁকে কেমন যেন জুবুথুবু করে ফেলেছিল। নকুলবাবু মারা যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই উনি একেবারে চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়লেন। এখন সারাদিন ওই যাকে বললুম লীলাকক্ষ সেখানে চুপ করে পড়ে থকেন। সারাদিনে একবার খান। আমি রাত্রে দোকান বন্ধ করে ওঁর জন্য খাবার নিয়ে যাই। কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। কেউ দেখা করতে গেলে চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে থাকেন। নকুলবাবুর খাস-চাকর বুদ্ধিনাথ দু-একবার ওঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল। লাভ হয়নি।'

'আপনার কলকাতায় যেতে ইচ্ছে করে না? জীবনের কুড়িটা বছর তো ওখানে কাটিয়েছিলেন।'

'নাঃ! একেবারেই ইচ্ছে করে না। এই তো বেশ আছি। কোনো অসুবিধে তো নেই। আর প্রমথেশকে ছেড়ে যাবই বা কী করে? তাকে তো নড়ানো যাবে না। তা ছাড়া, ড্রাইভারদের কাছে যা শুনি তাতে মনে হয় আমার দেখা কলকাতা আর নেই। গত ষাট বছরে তার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে।'

মাথা নেড়ে বিশ্বরূপ বললেন, 'হ্যাঁ, সেকথা ঠিক।'

'এবার আমাকে যেতে হবে।' বলতে বলতে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন রানিজি।

বিশ্বরূপ বললেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। রাত হয়েছে প্রমথেশবাবু অপেক্ষা করে আছেন। আপনি দোকান বন্ধ করে দিন, আমরা বাইরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। রঘুনাথ এসে পড়বে এখুনি।'

রানিজি বললেন, 'না, না, তা কখনো হয় নাকি? আপনারা ভেতরেই থাকবেন। রঘুনাথ কখন আসবে তার কি কোনো স্থিরতা আছে? তবে সে আসবে। আমি তাকে জানি, সে কথার খেলাপ করে পালিয়ে যাবে না। আপনারা বেঞ্চ দুটোর ওপর শুয়ে পড়ুন। ওই কোণে কুঁজোয় জল আছে, আলমারিতে কেক-বিস্কুট আছে। খিদে পেলে খেয়ে নেবেন। দামটা ওই উনুনের পাশে রেখে দেবেন। বাইরের ঝাঁপটা ভেতর থেকে তার দিয়ে আটকানো থাকবে। রঘুনাথ এলে সেটা খুলে বেরিয়ে যাবেন। ঝাঁপটা নামিয়ে দিতে ভুলবেন না যেন। আমি পেছনের দরজাটা বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে যাব। ওদিক দিয়ে বেরুতে পারবেন না।'

বিশ্বরূপ কৃতজ্ঞভাবে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমরা আপনি যেরকম বললেন, সেরকমই করব।'

বিশ্বরূপের কথা শেষ হওয়ার পরেও রানিজি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, 'আর একটা কথা। স্থানীয় লোকেরা এই জঙ্গলটাকে জাদু জঙ্গল বলে। এখানে নাকি রাত বাড়লে নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে থাকে।'

দেবেন্দ্র আবার রুদ্ধনিশ্বাসে প্রশ্ন করল, 'কীরকম ঘটনা?'

'আমি যদিও এতবছরে কখনো শুনিনি, তবে লোকে বলে নানারকম গান শোনা যায়, জঙ্গলের ভেতর থেকে ঘুঙুরের শব্দ ভেসে আসে, ভেসে আসে হাসির আওয়াজ। যদি সেরকম কিছু শোনেন, ভয় পাবেন না আর কোনোমতেই ঘর থেকে বেরুবেন না। গাড়ির আওয়াজ পেলে আর রঘুনাথের গলা শুনলে তবেই ঝাঁপ খুলবেন।'

বিশ্বরূপ হেসে বললেন, 'ভয় পাব না। কিন্তু, আপনি ভয় না-পেয়ে থাকেন কী করে?'

'ওই যে বললুম, আমি কখনো কিছু শুনিওনি, দেখিওনি।'

ফোঁস করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দেবেন্দ্র বলল, 'জাদু জঙ্গল! মানে মায়াকানন! চমৎকার।'

বিশ্বরূপ হাইবেঞ্চের ওপর শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। দেবেন্দ্রর ঠেলা খেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলেন। ঘড়িতে দেখলেন রাত তখন দশটা।

দেবেন্দ্র হাঁসফাঁস করে বলল, 'শুরু হয়ে গেছে, স্যার, মায়াকাননের মায়া। শুনতে পাচ্ছেন?'

বিশ্বরূপ বললেন, 'হ্যাঁ পাচ্ছি। একটা গান। রবীন্দ্রসংগীত। মোটা, পুরুষালি গলা। কী গান? হ্যাঁ। সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি, নন্দন ফুলহার, তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার। তাই না?'

'হ্যাঁ, স্যার। ঠিক তাই।'

'ঘাবড়িও না। মনে হচ্ছে, প্রমথেশবাবু গাইছেন।'

'প্রমথেশবাবু? এ কী স্যার নব্বুই বছরের বুড়োর গলা? এ তো কোনো জোয়ান লোককেও লজ্জা দেবে। কী অসাধারণ গলার কাজ, শুনেছেন? মনে হচ্ছে যেন কোনো বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসছে। তবুও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।'

'এতে অত অবাক হওয়ার কী আছে? নব্বুই বছর বয়েস হলেই কারুর গলা মিনমিনে হয়ে যাবে, এরকম কোনো কথা নেই। আমার ঠাকুরদার আশি বছর বয়েসেও বাজখাঁই গলা ছিল। ভোর বেলা গোয়ালার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া শুনে পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙত।'

বিশ্বরূপ আরও কিছু হয়তো বলতেন, কিন্তু একটা ক্ষীণ জলতরঙ্গের মতো হাসি তাঁর কথা বন্ধ করে দিল। একটু চটুল, অত্যন্ত মধুর কণ্ঠ শোনা গেল, 'আঃ! হয়েছে, হয়েছে একটু আস্তে। দোকানে লোক আছে।'

উত্তরে পুরুষকণ্ঠ গান থামিয়ে বলল, 'থাকুক গে।' বলে আবার শুরু করল, 'নীল অম্বর চুম্বনরত, চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত...'

মুখের ওপর হাত বুলিয়ে বিশ্বরূপ বললেন, 'এ তো রানিজির গলা নয়। মনে হচ্ছে, ওঁর সঙ্গে একটি অল্পবয়সি মেয়েও থাকে। থাকতেই পারে।'

দেবেন্দ্র বলল, 'থাকতেই পারে কী স্যার? রানিজি যাই বলুন না-কেন, আমি এ রহস্য ভেদ না-করে যাচ্ছি না।'

'রহস্যভেদ করবে কী করে? ও দিকে তো যেতে পারবে না। পেছনের দরজা তালা বন্ধ আর চারদিকে দুর্ভেদ্য ঝোপঝাড় আর জঙ্গল।'

'রাস্তা একটা আছে, স্যার। এই ঘরে ঢোকার সময় দেখেছি, পেছন থেকে একটা কাঁচা ড্রেন বেরিয়ে এসেছে একপাশ দিয়ে। ওখানে বোধ হয় একটা কুয়ো আছে। তার জল রাস্তার ধারে নয়ানজুলিতে ফেলবার জন্য ওটা কাটা হয়েছে। ওই ড্রেনের ভেতরে পা দিয়ে দিয়ে ঝোপঝাড় সরিয়ে ওপাশে চলে যাওয়া যাবে বোধ হয়।'

'ড্রেনের ভেতরে পা দিয়ে দিয়ে? জুতোর বারোটা বাজবে!'

অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে দেবেন্দ্র বলল, 'এইসময় আপনি জুতোর কথা ভাববেন স্যার?'

ত্রয়োদশীর চাঁদ তখনও মধ্যগগনে আসেনি। তার স্নিগ্ধ নরম আলোয় জঙ্গলটাকে মায়াকানন বলেই মনে হচ্ছিল। গানটা ততক্ষণে থেমে গেছে কিন্তু তার 'লহ হৃদয়ের ফুলচন্দন' যেন জ্যোৎস্নাধারার সঙ্গে মিশে তখনও বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। জঙ্গলের

ভেতর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে-আসা কোনো রাতজাগা পাখির ডাক ছাড়া চারদিক তখন নিস্তব্ধ। রোমাঞ্চিত শরীরে বিশ্বরূপ আর দেবেন্দ্র সরু পায়েচলা পথ দিয়ে এগিয়ে চললেন।

রানিজির ঘরটা দোকান থেকে কুড়ি-পঁচিশ গজের ভেতরে। একটা অতিকায় মহীরুহের নীচে ছোট্ট একতলা বাড়ি। তার একটা আধখোলা দরজার ভেতর থেকে প্রদীপের হলদেটে আলো বেরিয়ে আসছিল। দু-জনে বাড়িটার কাছাকাছি আসতে দরজার পেছনে কারুর উপস্থিতি লক্ষ করা গেল। ওঁরা তাড়াতাড়ি পথের ধারে একটা ঝোপের পেছনে আত্মগোপন করলেন।

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। একহাতে একটা জ্বলন্ত প্রদীপ আর অন্যহাতে কাপড় দিয়ে ঢাকা একটা থালা নিয়ে যে বেরিয়ে এল তাকে দেখে দু-জনেই স্তম্ভিত। একটি পূর্ণযৌবনা মেয়ে, পরনে তার লাল-সাদায় ডুরে শাড়ি। তার স্নিগ্ধ পেলব মুখের ওপর প্রদীপের আলো একটা অপার্থিব, অনির্বচনীয় দৃশ্য সৃষ্টি করেছে। সে সুন্দর কী অসুন্দর এই কথাটাই কারুর মনে এল না। কম্প্রবক্ষে, নেত্রপাতে, স্মিতহাস্যে সে চলেছে লজ্জিত বাসরশয্যায়।

বিস্ময়ে বিমূঢ় দুই গোপন দর্শকের সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে মেয়েটি একটা স্তূপাকার ঝোপের সামনে দাঁড়াল। প্রদীপের আলোয় দেখা গেল, ঝোপের সামনে একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ পেশিবহুল শরীর, পরনে ধুতি, অনাবৃত বুকের ওপর দু-টি পুরুষালি হাত আড়াআড়ি ভাবে রাখা। তাঁর মুখে একটা অদ্ভুত রহস্যময় চটুল হাসি।

মেয়েটি তাঁর সামনে গিয়ে যেন গান গেয়ে উঠল, 'এ সখি কি পেখঁলু এক অপরূপ শুনইতে মানবি স্বপন স্বরূপ।'

বিশ্বরূপ ফিসফিস করে বললেন, 'এই মরেছে! এ আবার কী ভাষায় কথা বলছে?'

দেবেন্দ্র আবার বিমর্ষ হয়ে কানে কানে বলল, 'ব্রজবুলী, স্যার।'

'বটে? কী বলল বুঝলে?'

'হ্যাঁ, স্যার। বলল একী অপরূপ রূপ দেখলুম! সখি তোর শুনলে মনে হবে যেন সে একটা স্বপ্ন।'

'ঠিক। আমরা স্বপ্ন দেখছি না তো, ভটচায্?'

'না, স্যার। একেবারে বাস্তব। আপনার গায়ে চিমটি কেটে দেখব, স্যার?'

'না, খবরদার!'

ইতিমধ্যে স্বপ্নস্বরূপ তাঁর নায়িকাকে একটি দীর্ঘ চুম্বন করেছেন। নায়িকার খোঁপা খুলে ঘনকৃষ্ণ মেঘের মতো আলুলায়িত কুন্তল ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাঁর পিঠের ওপরে। সেই অত্যন্ত ব্যক্তিগত, অপ্রকাশ্য আশ্লেষ দৃশ্য কোনো ভদ্র সন্তানের গোপনে দেখা অন্যায় কিন্তু বিশ্বরূপ আর দেবেন্দ্রর মনে হচ্ছিল যেন ওঁরা কোনো ইংরেজি সিনেমার একটি মধুর রোমান্টিক দৃশ্যের অভিনয় দেখছেন। ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নটা তখন অবান্তর। বটিচেলি বা রদাঁর শিল্পকর্মের

মতো দৃশ্যটা এতই সুন্দর, পরিচ্ছন্ন আর মনোগ্রাহী যে প্রথম রসের প্রাবল্য সত্ত্বেও ওঁরা চোখ ফেরাতে পারলেন না এবং তারপরে যখন নায়ক-নায়িকা আলিঙ্গবদ্ধ হয়ে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য ঘরটার মধ্যে ঢুকে গেলেন তখনও তাঁরা ন যযৌ না তস্থৌ হয়ে রইলেন।

বিশ্বরূপ বললেন, 'এবার বোধ হয় আমাদের চলে যাওয়া উচিত, না কি বলো ভটচায্?'

দেবেন্দ্র বলল, 'যাব স্যার, শেষ দৃশ্যটা দেখেই চলে যাব।'

দেবেন্দ্রর কথায় বিশ্বরূপ অসন্তুষ্ট হলেন বলে একেবারেই মনে হল না। দু-জনে ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা একটা ক্ষীণ আলোর রেখার দিকে উদ্‌বেল হৃদয়ে তাকিয়ে রইলেন।

একটু পরেই আবার মন্দ্রকণ্ঠে গান শোনা গেল, 'তুমি জানো না, আমি তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে...' গানের শেষে কিছু টুকরো টুকরো হাসি, পায়েলের ক্ষীণ ঝংকার, কিছু সুখের চাপা আর্তনাদ। তারও বেশ কিছু পরে ঝোপের ভেতরে আলোটা বিস্তৃততর হল। একটু বাদে নায়িকা বেরিয়ে এলেন। আঁচল দিয়ে মুখের আধখানা ঢেকে ত্রস্ত এবং সামান্য অসংলগ্ন পদক্ষেপে গিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন। যখন দরজা বন্ধ করছেন তখন পেছনে আলো থাকার জন্য তাঁর মুখটা দেখা গেল না মোটে, কিন্তু এটুকু বোঝা গেল যে তাঁর মাথার সব চুল সাদা— ঠিক রানিজির মতো।

তার প্রায় পরমুহূর্তেই বাড়ির ভেতরের আলোটা নিভে গেল। তবে ঝোপের ভেতরে আলোটা জ্বলতেই লাগল।

দেবেন্দ্র ব্যাকুল হয়ে বলল, 'ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন, স্যার?'

বিশ্বরূপ বললেন, 'আমি দেখতে চাই ওই ঝোপের পেছনে ঘরটার ভেতরে কে আছে।'

'যাবেন না, স্যার। আপনি যা দেখবেন, তা আপনার ভালো লাগবে না। আপনি সহ্য করতে পারবেন না।'

'আমারও মনে হয় ভালো লাগবে না। কিন্তু ঠিক সহ্য করতে পারব। দ্যাখো তুমি।'

'নাটক শেষ হয়ে গেছে, স্যার। এখন পর্দা তুলে তার পেছনে যা দেখবেন তাতে কিন্তু সুর কেটে যাবে। চলুন, আমরা ফিরে যাই।'

'না ভটচায্। নাটক এখনও শেষ হয়নি। তুমি থাকো। আমি একাই যাচ্ছি। বলে নীচু হয়ে পা টিপে-টিপে ঝোপটার দিকে এগিয়ে গেলেন বিশ্বরূপ। বোধ হয় কয়েক সেকেন্ডের জন্য তাঁর শরীর আলোটাকে আড়াল করল। তার পরেই ছিটকে সরে এলেন। তাড়া-খাওয়া বানরের মতো চার হাত-পায়ে হুড়মুড় করতে করতে ছুটে এসে দেবেন্দ্রর পাশে আছড়ে পড়লেন। তাঁর মুখের প্রতিটি রেখা তখন একটা চরম বিভীষিকায় বিকৃত হয়ে রয়েছে।

দেবেন্দ্র দু-হাতে তাঁকে ধরে বলল, 'বললুম স্যার, সহ্য করতে পারবেন না।'

বিশ্বরূপ খাবি খেতে খেতে বললেন, 'পালাও, ভটচায্, পালাও। ওটা যদি এখন বেরিয়ে আসে?'

দেবেন্দ্র বিশ্বরূপকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিতে দিতে বলল, 'কেউ আসবে না, স্যার। চলুন, আমরা চলে যাই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই চলো। ওহ্! কী বীভৎস, কী ভয়ংকর!'

বিশ্বরূপকে ধরে ধরে নিয়ে যেতে যেতে দেবেন্দ্র বলতে লাগল, 'কোনো ভয় নেই স্যার! আমরা তো ওঁদের কোনো ক্ষতি করিনি। তাহলে ওঁরাই বা আমাদের ক্ষতি করবেন কেন? ওঁরা দু-জনে ওঁদের পরস্পরের প্রতি তীব্র ভালোবাসায় নিজেদের একটা জগৎ তৈরি করেছেন। সে জগৎ আমাদের পরিচিত গণ্ডির বাইরে। প্রতি রাত্রে যখন সে জগৎটা তৈরি হয় তখন সেই অতীন্দ্রিয় অস্তিত্বে আমাদের জানা স্থান-কাল-জীবন-মৃত্যু সবকিছুই অন্য এক স্তরে চলে যায়। সেখানে তখন কে জীবিত বা কে মৃত, কে তরুণ বা কে বৃদ্ধ সেটা বোধ হয় অর্থহীন হয়ে পড়ে। হয়তো সময় এগিয়ে আসে বা পেছিয়ে যায়। বোধ হয় অনেকটা স্বপ্নের মতো। আমরা যখন স্বপ্ন দেখি তখন সেটাই বাস্তব। কিন্তু যখন জেগে উঠি তখন তা আর বাস্তব থাকে না। সারাদিনের দৈন্যের সঞ্চয়ই তো রাত্রের সেই স্বপ্নের আযোজন করে। সময়ের ওপর থেকে তারার আলোয় যিনি নির্নিমেষে চেয়ে আছেন, তাঁর খোলসটা দেখে তাঁকে ভয় পাবেন না, স্যার। তিনি প্রেমিক, তিনি কবি। তাঁর প্রতি অবিচার কবেন না।'

রঘুনাথ যখন এল তখন রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, 'যদি অপরাধ না-নেন তো একটা প্রশ্ন জিগ্যেস করব?'

বিশ্বরূপ পেছনের সিটে চোখ বুজে পড়েছিলেন। চোখ না-খুলেই বললেন, 'কী প্রশ্ন?'

'এই জঙ্গলটাকে স্যার, লোকে বলে জাদু জঙ্গল। এখানে নাকি সূর্য ডুবে গেলে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। আপনারা সেরকম কিছু কি দেখলেন?'

বিশ্বরূপ আর দেবেন্দ্র সমস্বরে বলে উঠলেন, 'না, না! সেরকম কিছু আমরা দেখিওনি, শুনিওনি।'

প্রভাময়ীর প্রত্যুপকার

ট্যাক্সি থেকে অরিজিতের হাত ধরে নামতে নামতে প্রভাময়ী বললেন, 'জায়গাটা কী নির্জন! চারদিকে বাড়িঘর নেই নাকি রে? কোনো লোকজনের আওয়াজ পাইনে কেন?'

অরিজিৎ ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিতে দিতে বলল, 'বাড়িঘর আছে মা। শোনো তোমাকে বলি। এই আমরা এখন আট নম্বর জয়চন্দ্র গার্ডেন লেনের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। বাড়িটা পুবমুখো। উত্তর আর পশ্চিম দিক ঘিরে রয়েছে নববিদ্যাবীথি হাই স্কুলের প্রকাণ্ড বাড়ি আর খেলার মাঠের পাঁচিল। এখন বাজে পাঁচটা, ইশকুল ছুটি হয়ে গেছে। কাল সকাল হলে শুনতে পাবে একটা বিশাল মৌচাকের ভনভন শব্দের মতো ছেলেমেয়েদের কলরব। দক্ষিণ দিকে মহারাজা নবীনকিশোর রায়চৌধুরির বাড়ির বিশাল উঁচু পাঁচিল, গলিটা শেষ হয়েছে তার গায়ে। ও বাড়ির এখন ভগ্নদশা, কেউই প্রায় থাকে না। আর পুব দিকে গলির ওপারে রাজা বিজয়কৃষ্ণ সিংহের বাড়ির পেছন দিক। ও বাড়িটা এখন সরকারি অফিস, বিকেল হলেই শুনশান।'

প্রভাময়ী বললেন, 'এ কোন পাড়ায় বাড়ি নিলি রে, খোকা? চারদিকে যে রাজা-মহারাজাদের বাড়ি।'

অরিজিৎ হাসল। বলল, 'যা বলেছ। একটা সময় ছিল ঠিকই যখন এ পাড়ায় ঢুকতে গেলে আমাদের মতো মধ্যবিত্ত লোকের হাঁটু বেঁকে যেত। আজ আর সেদিন নেই মা। আজ যেখানে নববিদ্যাবীথি হাই স্কুল, সেটা ছিল রাজা জয়চন্দ্র রায়ের বাগানবাড়ি। আর আমাদের বাড়িটা ছিল সেই বাগানবাড়ির কেয়ারটেকার আশুতোষ ধরের কোয়ার্টার। বংশানুক্রমে ধরেরা এই কাজ করেছেন এই বাড়িতে থেকে। রাজা জয়চন্দ্রের বর্তমান বংশধর যখন অর্থাভাবে তাঁর বাগানবাড়ি বিদ্যাবীথি এডুকেশন ট্রাস্টকে বিক্রি করেন তখন জমিসমেত এই বাড়িটা লিখে দেন হরিপদবাবুকে। হরিপদবাবু আশুতোষ ধরের বংশধর। তাঁরও এখন খুবই দুরবস্থা। তিনি আমাকে সম্পত্তিটা বিক্রি করে দিলেন।'

প্রভাময়ী বললেন, 'বুঝলুম। এবার বাড়িটার কথা বল।'

খড়খড় করে একটা লোহার গেট খুলে অরিজিৎ বলল, 'বাড়ির সামনেও এক মানুষ সমান উঁচু পাঁচিল, পুব-উত্তর কোণে এই লোহার গেট খুলে আমরা ভেতরে ঢুকছি। বাড়ির সামনে একটা ছোট্ট ঘাসের জমি আছে। বাড়িটা একতলা, তবে মেঝেটা রাস্তা থেকে বেশ ওপরে। মনে রেখো, দশটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে হবে। সামনে টানা বারান্দা। তার একপাশে তিনটে খিলেন-করা থাম আর অন্যপাশে দুটো শোবার ঘর, একটা রান্নাঘর, এটা ভাঁড়ার ঘর, একটা বাথরুম আর একটা ছোটো পুজোর ঘর। আমাদের পক্ষে এই যথেষ্ট, না কি বলো মা? তার ওপর, বারান্দার সামনের দিকে আগাগোড়া চারটে কোলাপসিবল গেট লাগানো আছে। জানলায় লোহার গ্রিল, দেওয়ালগুলো পঁচিশ থেকে তিরিশ ইঞ্চি চওড়া। গেটগুলো বন্ধ থাকলে কারুর সাধ্যি নেই যে বাড়ির ভেতরে ঢোকে।'

প্রভাময়ী লাঠিতে ভর দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে বললেন, 'এ তো চমৎকার! এমন একটা বাড়ি তুই এত সস্তায় পেলি— এ তো ভাবাই যায় না।'

'সবই তোমার আশীর্বাদ, মা।' অরিজিৎ বলল, 'তার ওপর আরও দ্যাখো, হরিপদবাবু এমন একজন সজ্জন লোক যে বাড়িটা সারিয়ে-সুরিয়ে রংটং পর্যন্ত করে দিয়েছেন। আমার আর এখন কোনো খরচা করবার দরকার নেই।'

প্রভাময়ী পুত্রবধূ সুনন্দার এগিয়ে দেওয়া একটা মোড়ার ওপর বসে বললেন, 'আমার কিন্তু কোথায় যেন একটা খটকা লাগছে, জানিস। তুই দলিলপত্র সব ভালো করে দেখে নিয়েছিস তো খোকা? কোথাও কোনো গোলমাল নেই তো?'

প্রভাময়ীর প্রশ্নটা শুনে চমকে উঠেছিল অরিজিৎ। সামলে নিয়ে বলল, 'সব ভালো করে দেখে নিয়েছি মা। তোমার খটকা লাগার কোনো কারণ নেই।'

'তবুও লাগছে। আসলে কী জানিস, আমাদের মতো লোকের কপালে এরকম শিকে ছেঁড়বার তো কথা নয়। সারাজীবন তো শুধু বঞ্চনাই পেয়ে এলুম।'

'সেসব কথা ভুলে যাও, মা। এত কষ্ট করে আমাদের লেখাপড়া শিখিয়েছ সে তো এরকম একটা দিনের আশায়, তাই না? এখন সেদিন আসবার সময় হয়েছে। পুরোনো দিনের কথা আর ভেবো না তো।'

মাথা নাড়লেন প্রভময়ী। বললেন, 'না, আর ভাববো না। শোন, একটা গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান করবি না? একটা পুজো বা ওইরকম?'

'এখনই না, মা। দিদি-জামাইবাবু বলেছে, পুজোর সময় ওরা যখন আসবে, তখন গৃহপ্রবেশের ব্যবস্থা করতে। তা ছাড়া, টাকাপয়সাও তেমন নেই। প্রথম কিস্তির টাকা দিতেই ফতুর হয়ে গেছি। এরপর লোনের টাকা যখন কাটতে শুরু করবে তখন আর বড়ো রকমের কোনো অনুষ্ঠান করবার মতো অবস্থা থাকবে না।'

'সে আমি জানি। ঠিক আছে, এসব ব্যাপার পরে করলেও হবে।'

মাকে সারা বাড়ি ঘুরিয়ে, তাঁকে তাঁর ঘরে রেখে, চারটে কোলাপসিবল গেট বন্ধ করে, রান্নাঘরে এসে বসল অরিজিৎ। সুনন্দাকে বলল, 'মার বাড়িটা খুব পছন্দ হয়েছে। সারাজীবন কষ্ট করেছে, বাড়িওলি মাসির মুখঝামটা সহ্য করেছে, এবার অন্তত সেই অত্যাচার থেকে মুক্তি। দুঃখ করছিল যে বাবা দেখে যেতে পারল না। সে দুঃখ যে আমারও নেই তা নয়। তবে, আমি বিশ্বাস করি যে ওপর থেকে নিশ্চয়ই তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছি, নইলে আজ যে আমি নিজের বাড়িতে বসে আছি সেটা কখনোই সম্ভব হত না।'

সুনন্দা হাঁড়িকুড়ি গোছাতে গোছাতে বলল, 'একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব?'

'কী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে?'

'মা যখন বললেন যে তাঁর কোথাও একটা খটকা লাগছে, তখন তুমি ভয়ানক চমকে উঠলে কেন? কোথাও একটা গোলমাল আছে, তাই না?'

কাষ্ঠহেসে অরিজিৎ বলল, 'আরে না, না। গোলমাল আবার কী? গোলমাল কিছু নেই। আসলে, আমার ভয় হয়েছিল যে মার বোধ হয় বাড়িটা পছন্দ হল না। কপালজোরে পেয়ে গেছি, মার পছন্দ না-হলে তো আবার নতুন বাড়ির খোঁজে বেরুতে হবে।'

কথাটা কিন্তু সত্যি নয়। প্রভাময়ী সারাজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে আজ একেবারে ভগ্নস্বাস্থ্য, অকালবার্ধক্যে নুয়ে পড়েছেন। গত তিন বছর যাবৎ অতিরিক্ত ডায়াবেটিসে সম্পূর্ণ অন্ধ, তবু তাঁর স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধির ধার একটুও কমেনি। বরং, দৃষ্টিশক্তি চলে যাবার পর তাঁর বাকি ইন্দ্রিয়গুলো যেন আরও বেশি সজাগ আর সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাঁর কথা শুনে অরিজিতের মনে হয়েছিল বাড়িটাতে যে সত্যিই কোনো গোলমাল আছে বলে ও শুনেছে, সেটা চেপে যাওয়া সত্ত্বেও প্রভাময়ী বোধ হয় ধরে ফেলেছেন।

আসলে গোলমাল তেমন কিছুই নয়। যত সব বাজে কুসংস্কার। হরিপদ ধরের ধারণা যে এই বাড়িটাতে ভূত আছে, এ-কথা সবাই জানে আর সেইজন্যেই তাঁর বাড়ির কোনো খরিদ্দার জুটছে না। বাড়িটা জলের দরে বেচে দেবার কারণটা হল এই। একথা অরিজিৎকে বলতেও দ্বিধা করেননি হরিপদবাবু। ভদ্রলোক সরল প্রকৃতির মানুষ, হয়তো নিজেকে ভবিষ্যৎ বিবেকদংশনের হাত থেকেও মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। তবে একথা তিনি ভেবে দেখেননি যে উত্তর কলকাতার একটেরে, একটা কানাগলির শেষপ্রান্তে, পাঁচকাঠা জমির ওপরে একটা দেড়শো বছরের পুরোনো বাড়ি কিনতে বিশেষ কারুর দায় পড়েনি। তা ছাড়া, এসব কথা লোক ডেকে বলাও তো যায় না। না-কিনলে সবাই বলবে, 'তুই একটা গাধা', কিনলে বলবে, 'জেনেশুনে এই কাণ্ডটা করলি?'

সুনন্দ অরিজিতের মুখের দিকে চেয়েছিল। বলল, 'কী ভাবছ?'

অরিজিৎ বলল, 'ভাবছি যে আজ সারাদিন তোমার খুব ধকল গেছে, এখন এক কাপ

চা চাওয়াটা খুব অন্যায় হবে কি?'

'না। কিছুমাত্র না। আমি তো ভাবছিলুম, তুমি খেলে, আমিও এক কাপ খেতুম। মাকেও ডাকো না। তিজনেই খাই।'

ডাকার দরকার হল না। প্রভাময়ী নিজেই লাঠি ঠকঠক করতে করতে রান্নাঘরে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর, কী যেন চিন্তা করছেন।

সুনন্দা একটু উদ্‌বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে মা? শরীর খারাপ লাগছে?'

প্রভাময়ী মাথা নাড়লেন। বললেন, 'কই, না তো। আমার শরীর বেশ ভালোই আছে।' তারপর, একটু থেমে বললেন, 'আচ্ছা বউমা, তুমি কি একটু আগে আমার ঘরে গিয়েছিলে?'

'না তো।'

'সে তো বটেই। তুমি কী করে হবে? তুমি তো গয়না পরো না।'

অরিজিৎ বলল, 'কী বলছ বলো তো? গয়না-টয়না আবার কী? ওর কি আছে নাকি কিছু যে পরবে?'

প্রভাময়ী পুনর্বার মাথা নাড়লেন। বললেন, 'তাইতো ভাবছি। মনে হল কে যেন ঘরের ভেতর ঢুকল, তার চুড়ি-বালার টুংটাং শব্দ পেলুম।'

সশব্দে হেসে উঠল অরিজিৎ। বলল, 'এই ভর সন্ধে বেলা ভূতের ভয় পেলে নাকি মা? ওই শোনো, পাঁচিলের ওপাশে টিউবওয়েলের জল তোলার শব্দ। নিশ্চয়ই ইশকুলের দরওয়ানের বউ চুড়ি-বালা ঠংঠঙিয়ে জল আনতে এসেছে। তুমি তারই আওয়াজ পেয়েছ। এটা নতুন জায়গা, চারদিক ফাঁকা, নিস্তব্ধ। খুব ছোটো ছোটো শব্দও প্রতিধ্বনি হয়ে কানে আসবে। তাতে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।'

প্রভাময়ী বললেন, 'দ্যাখ খোকা, আমার ছোলেবেলাটা কেটেছে গাঁয়ে। সেখানে সন্ধ্যে হলেই ঘন অন্ধকার, তালগাছের ওপর একানড়ে, বেলগাছে বেম্মদত্যি, নদীর পাড়ে শাঁকচুন্নি, পুকুরপাড়ে পেত্নি— এদের মধ্যে বড়ো হয়েছি, তাই এদের আমি ভয় পাইনে। ভয় পাবি তোরা। তবে, মনে হচ্ছে তোর কথাই ঠিক। আমার ভুলই হয়েছিল।'

হাসতে হাসতে অরিজিৎ বলল, 'ভয় আমারও নেই, মা। আমি একমাত্র ভয় পাই মানুষকে। বিশেষ করে যে মানুষকে চেনা যায় না। তবে চারটে কোলাপসিবল গেটই বন্ধ আছে, কোনো মানুষের সাধ্যি নেই যে ভেতরে ঢুকতে পারে। অবশ্য সুনন্দার কথা জানি না, ও হয়তো ভূতের ভয় পায়।'

সুনন্দ হাত নেড়ে বলল, 'পাই, পাই। ভূত, পুলিশ, পাগল, মাতাল, সব্বাইকে ভয় পাই।'

অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল প্রভাময়ীর। স্পষ্ট টের পেলেন ঘরের ভেতরে কেউ আছে। চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ, মোটা কাপড়ের খসখস শব্দ শুনতে পেলেন

পরিষ্কার। খোলা জানলার পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে সে। তবে তার কোনোরকম বদ মতলব আছে বলে মনে হল না প্রভাময়ীর। শুয়ে শুয়েই প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কে?' কোনো সাড়া পেলেন না। আবার প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কথা বলতে পারো না?' তারও কোনো সাড়া পেলেন না। এবার কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও? যদি এর উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে দরজাটার পাশে গিয়ে দাঁড়াও।' এবার খসখস শব্দটা চেয়ার থেকে সরে দরজার কাছে চলে গেল।

চমৎকার! প্রভাময়ী বলেন, 'বাঃ! তাহলে, এখন তো আমরা আলাপ করতে পারি। আমি তোমাকে প্রশ্ন করব, তার উত্তর হ্যাঁ হলে তুমি দরজার কাছে যাবে আর না-হলে চেয়ারে বসে থাকবে। তোমার হয়তো তাতে একটু কষ্ট হবে, তবে কথা তো বলা যাবে। এ ছাড়া আর উপাই বা কী!' পরে অবশ্য তাঁর মনে হল, যার শরীর নেই তার শারীরিক কষ্ট হবার তো কথা নয়।

এইভাবে একতরফা প্রশ্ন আর হ্যাঁ-না উত্তরের মধ্য দিয়ে আলাপচারি শুরু হল। ভোরের প্রথম কাক ডাকার সঙ্গেসঙ্গে শব্দটা বন্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত অনেক সংবাদ সংগ্রহ করলেন প্রভাময়ী। ঘরের ভেতরে যিনি আছেন, তিনি একজন মহিলা। বহুবছর ধরে আছেন এই বাড়িতে। চলে যেতে চান, কিন্তু যেতে পারছেন না। তাঁকে আর তাঁর স্বামীকে গুলি করে মেরেছিল তাঁরই কোনো আত্মীয়। মারা যাওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের ভেতর। সবচেয়ে বড়ো কথা হল, প্রভাময়ীকে তাঁর ভালো লেগেছে কারণ তিনি জানেন যে প্রভাময়ী ভয় পাবেন না এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে। অনেক কথাই বলবার আছে তাঁর, কিন্তু যার সঙ্গেই কথা বলতে যান, সেই ভয় পায়।

এবার প্রভাময়ীর সামনে দুটো সমস্যা। ব্যাপারটা অরিজিৎকে বলা উচিত কি উচিত নয়? অনেক ভেবে, না বলাই স্থির করলেন প্রভাময়ী। বেচারি অনেক কষ্টে অনেক আশা নিয়ে বাড়িটা কিনেছে। এই ঘটনার কথা জানলে সে ভেঙে পড়তে পারে। এই মহিলার যখন কাউকে ভয় দেখানোর বা কারুর ক্ষতি করার কোনো বাসনা নেই, তখন আর অরিজিৎকে মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলার কী দরকার?

দিন দশেক বাদে, সকাল বেলায় সুনন্দা অরিজিৎকে বলল, 'জানো, মার কিছু একটা হয়েছে। তুমি তো সারারাত মোষের মতো ঘুমোও, কিছুই টের পাও না। মাঝে মাঝে যখন অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যায়, আমি শুনেছি মা বিড়বিড় করে কথা বলছেন। এরকম তো আগে কখনো শুনিনি। তা ছাড়া, আজকাল যে মা পুজো করেন, দেখছি ধূপ জ্বালেন না, জোরে জোরে মন্ত্র পড়েন না। কী ব্যাপার, বুঝতে পারছি না।'

অরিজিৎ চিন্তিত হয়ে বলল, 'দ্যাখো, ধূপ না-জ্বালানো বা জোরে জোরে মন্ত্র না-পড়াটা

কোনো ব্যাপার নয়। মা যেভাবে ইচ্ছে সেভাবেই পুজো করবে। কিন্তু মাঝরাতে আপন মনে বিড়বিড় করাটা তো ভালো কথা নয়। দাঁড়াও, এখনই মাকে জিজ্ঞেস করছি।'

প্রভাময়ী বারান্দায় মোড়ায় বসে চা খাচ্ছিলেন। অরিজিৎ গিয়ে তাঁর পাশে বসে পড়ল। বলল, 'মা, শুনছি তুমি নাকি আজকাল রাতবিরেতে আপনমনে বিড়বিড় করে কথা বলো। ব্যাপার কী? তোমার কি ঘুম হচ্ছে না? প্রেশার বাড়ল নাকি?'

প্রভাময়ী হেসে উঠলেন। বললেন, 'দূর। প্রেশার-ট্রেশার কিছু নয়। দ্যাখ খোকা, পঁয়ত্রিশ বছর কাটালুম যেন একটা বাজারের মধ্যে। দিনরাত হইচই, ট্রামবাসের আওয়াজ, অন্য ভাড়াটেদের চ্যাঁচামেচি, ঝগড়াঝাঁটি, বাচ্চাদের চিৎকার, এতেই তো অভ্যস্ত ছিলুম। তোর এই বাড়িটা এত নিস্তব্ধ যে সত্যি সত্যি ঘুম আসতে চায় না, এলেও মাঝে মাঝে ভেঙে যায়। তখন আর কী করব, জোরে জোরে কৃষ্ণনাম করি। তাতে কি তোদের অসুবিধে হয়? তাহলে না-হয় না-ই করব।'

লজ্জা পেয়ে অরিজিৎ বলল, 'তুমি কৃষ্ণনাম করবে আর তাতে আমাদের অসুবিধে হবে? কী যে তুমি বলো, তার ঠিক নেই!'

'তবে যা, আর দেরি না-করে বাজারটা করে আন।'

অরিজিৎ বাজার থেকে ফিরল, সঙ্গে এক বছর পঞ্চাশেক বয়েসের ট্রাউজার্স আর সোয়েট-শার্ট পরিহিত বিরলকেশ লম্বা-চওড়া ভদ্রলোক। হাঁক দিয়ে বলল, 'শুনছ, দ্যাখো কাকে নিয়ে এসেছি।'

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল সুনন্দা। বলল, 'আরে, এ যে বুড়োকাকা। আপনি কোত্থেকে? মা, ইনি আমার ছোটো পিসেমশায়ের ভাই, খুব নামকরা লোক। শ্রী পরিমল ঘোষ ওরফে চপলকুমার, থিয়েটারে নায়ক সাজেন।'

ইতিমধ্যে প্রভাময়ীও রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। পরিমল তাঁকে প্রণাম করে গাম্ভারি হাসি হেসে বললেন, 'সাজেন নয়, বলো সাজতেন। আমি আজকাল আর অভিনয় করি না, আমি এখন প্রোডিউসার, মানে প্রযোজক। বেগম থিয়েটারে এখন আমার নাটক চলছে, নাম শুনেছ নিশ্চয়— "উগ্র প্রেমের তীব্র জ্বালা"? পাবলিক খুব নিয়েছে।'

উগ্র প্রেমের তীব্র জ্বালা শুনে বাকি তিনজন কেমন যেন ভড়কে গেল। অরিজিৎ বলল, 'সিনেমা-থিয়েটারের খোঁজ আমরা বড়ো একটা রাখি না, বুড়োকাকা। তৈল-তণ্ডুল-লবন-ইন্ধনের সন্ধানে সারাদিন কাটে, এসব ব্যাপারে আমাদের আদার ব্যাপারী হওয়া ছাড়া উপায় কী বলুন?'

বুড়োকাকা বললেন, 'উপায় নেই, একথা আমি মানিনে। বুঝলে সুনন্দা, শখ করে যদি গরিব থাকতে চাও, তো সে আলাদা কথা। নইলে, কলকাতার অলিতে-গলিতে টাকা

উড়ছে, কেবল তুলে নেওয়ার ওয়াস্তা। তবে হ্যাঁ, তার জন্যে চাই সাহস আর দূরদৃষ্টি। এই আমাকেই দ্যাখো না। বি এ, এম এ পাশ করিনি ঠিকই, অথচ আজ আমার লাখ লাখ টাকা খাটছে থিয়েটার প্রোডাকশনে। এরপর, আমি আর আমার পার্টনার সুরযলাল সিং তো সিনেমা প্রোডিউস করতে যাচ্ছি। গল্পও বাছা হয়ে গেছে, ভবেন সাউ-এর লেখা "ক্যাবারের নটী কঙ্কাবতী"। আসলে কী জানো, সাহস করে হাত বাড়াতে হবে, দেখবে দু-হাত উপচে পড়ছে।'

উপচে পড়ার কথায় শ্রোতারা কেউই খুব উৎসাহিত হল বলে মনে হল না। সুনন্দা যেন কথাটা ঘোরাবার জন্য বলল, 'ওর তো আপনাকে চেনবার কথা নয়, আপনিই বোধ হয় ওকে চিনেছেন, তাই না বুড়োকাকা? কী করে চিনলেন?'

'হ্যাঁ, বাজারের মধ্যে আমিই ওকে চিনেছি। আরে, মানুষের মুখ নিয়েই যে আমার কারবার। যে মুখ আমি একবার দেখি তা কখনো ভুলি না।'

অরিজিৎ বলল, 'এবার আমাকে উঠতে হবে, নইলে অফিসে দেরি হয়ে যাবে।' সুনন্দাও উঠে পড়ল। তখন কিছুটা যেন মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে এবং অযাচিতভাবে আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন পরিমল ঘোষ।

সে রাত্রে প্রভাময়ীর নির্বাক সহবাসিনীর কাপড়ের খসখস শব্দ খুব উত্তেজিতভাবে ঘরের এক কোণ থেকে অন্য কোণে ঘুরে বেড়াল। হ্যাঁ আর না উত্তরের সাহায্যে প্রভাময়ী যা জানতে পারলেন তা হল, পরিমল ঘোষের মতলব মোটেই ভালো নয়। সে একটি অত্যন্ত অসৎ, মিথ্যেবাদী, জোচ্চর আর দুশ্চরিত্র লোক। তাকে এ বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া একেবারেই উচিত নয়।

এই কথাগুলো অবশ্যই বলবার অপেক্ষা রাখে না। পরিমল ঘোষ যে কী পদার্থ, তা বুঝতে প্রভাময়ীর একটুও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু কী করা যেতে পারে? স্রেফ সন্দেহের ওপরে তো একজন আত্মীয়কে বাড়িতে ঢুকতে বাধা দেওয়া যায় না। তাতে সুনন্দার পরিবারে তার শ্বশুরবাড়ির বদনাম হয়ে যাবে। লোকে বলবে, দুটো পয়সা হয়েছে বলে অরিজিতের মাটিতে পা পড়ছে না। প্রভাময়ীর শ্বশুরবাড়িও অসন্তুষ্ট হতে পারে। আসলে অরিজিতের অবস্থা তো যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই আছে। সবাইকে চটিয়ে, বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ানোর মতো সামর্থ্য বা মানসিকতা কোনোটাই ওর নেই। তা ছাড়া, পরিমল ঘোষ যথেষ্ট প্রভাবশালী লোক বলে মনে হল। ইচ্ছে করলে অরিজিতের চাকরির ক্ষতিও করতে পারেন। তবে তো ও পথে বসবে। অথচ, একটা কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে পরিমল আঘাত করবেই, এবং ওর লক্ষ্য সুনন্দা। এই ব্যাপারটা নিয়ে সুনন্দার সঙ্গে যে কথা বলবেন তাও সম্ভব নয়। একে বুড়োকাকা তার আত্মীয়, তার ওপরে সে সরল

সিধে মানুষ, হয়তো সে কিছু বুঝতেই পারেনি। তাকে এসব কথা বললে তার মানসিক অবস্থা কী দাঁড়াবে বলা কঠিন। এ অবস্থায় তাহলে কী করণীয়? কী করে সুনন্দা আর তার ছোট্ট সুখী সংসারটাকে বাঁচানো যায়? ক্ষমতাশালীর কদর্য লোভের হাত থেকে বাঁচাবার কি কোনো উপায় নেই?

'তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবে?' প্রশ্ন করলেন প্রভাময়ী।

উত্তর এল, 'হ্যাঁ।'

এইবার বড়ো ভরসা পেলেন প্রবাময়ী। জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে কি পরিমল কোনো কুকর্ম করার চেষ্টা করা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব?'

আবার উত্তর এল, হ্যাঁ।'

হঠাৎ কী মনে হওয়ায় প্রভাময়ী জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, এই যে তুমি আমাকে সাহায্য করবে বলছ, তার বদলে আমাকে কিছু দিতে হবে, তাই না?'

এবারেও উত্তর এল, 'হ্যাঁ।'

'তা তো বটেই। বিনা স্বার্থে কি কেউ কারও উপকার করে? দেবতারাই করেন না। বর যা দেন তা সুদে-আসলে আদায় করে নেন। কিন্তু আমি তোমাকে কী দিতে পারি? তোমার তো টাকাপয়সা বা গয়নাগাঁটির কোনো দরকার নেই। তোমার শ্রাদ্ধ করব তার উপায় নেই। তোমার নামধাম কিছুই জানিনে। তুমি আমার পরিবারের ইজ্জৎ বাঁচাবে, এত বড়ো উপকারের কী প্রতিদান দেব বলো তো?'

এই প্রশ্নের কোনো উত্তর এল না। আসতে পারেও না, কারণ এর জবাব তো হ্যাঁ বা না দিয়ে হয় না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন প্রভাময়ী। হঠাৎ বিদ্যুতচমকের মতো প্রশ্নের উত্তরটা তাঁর মনে এসে গেল। সহাস্যে বললেন, 'বুঝেছি তুমি কী চাও। তাই পাবে তুমি।'

পরিমল ঘোষ দু-দিন পরেই উদয় হলেন। সকাল বেলা তিনজনে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিল, এইসময় পরিমল এসে একটা বড়ো গয়নার বাক্স দিলেন সুনন্দার হাতে। বললেন, 'তোমার বিয়েতে দিতে পারিনি, লোকেশন শুটিং থেকে সোজা বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলুম। একটু দেরি হল অবশ্য, তবু ভাবলুম, উপহারটা দিয়েই যাই। যাবার পথে বাজারটাও করে নিয়ে যাব।'

বাক্স খুলে চেঁচামেচি করে উঠল সুনন্দা। বলল, 'ওমা, এ তো ভীষণ দামি গয়না! এ আপনি আমাকে দিলেন কেন? এই হার পরে কোথাও যেতে পারব আমি? তা ছাড়া, আমি তো গয়নাই পরি না।'

'কেন পরো না? তোমার মতো সুন্দরীরা যদি গয়না না-পরে তো পরবে কে?'

'আমি আবার সুন্দরী কোথায়? আমি তো কালো।'

'গায়ের রঙে কী যায় আসে? সিনেমায় যেসব নায়িকাদের ধবধবে ফর্সা দেখো, তারা কেউই সেরকম নয়। তাদের ওইরকম বানানো হয়। তোমার যা ফিগার আর যাকে বলে ফেস-কাটিং, তাতে তুমি সেইসব অনেক নায়িকারই কান কেটে নিতে পারো।'

অরিজিৎ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোথায় থাকেন?'

পরিমল বললেন, 'আমি থাকি কেয়াতলায়। জানো সুনন্দা ওখান থেকে টালিগঞ্জ কাছে হয় তো, তাই ওখানেই ফ্ল্যাট নিয়েছি।'

অরিজিৎ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেয়াতলায়? বলেন কী? সে তো ঢাকুরিয়া লেকের কাছে! সেখান থেকে আপনি রোজ কাশীনাথ কোলের বাজারে আসেন বাজার করতে?'

একটু থতমত খেয়ে গেলেন পরিমল। তবে সামলাতে বেশি সময় লাগল না। বললেন, 'আগে তো এ পাড়াতেই থাকতুম। ওটা অভ্যেসের ব্যাপার। বুঝলে সুনন্দা, বাঙালরা যেমন বলে— কোলের মাছ না-হইলে আবার আমি খাইতে পারি না।' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে অস্থির হলেন।

অরিজিৎও হাসল বটে কিন্তু কথাটা যে তার কাছে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য হয়েছে তা মোটেই মনে হল না।

সেদিন কথাবার্তা আর খুব একটা এগোল না। চটপট উঠে পড়লেন পরিমল। কিন্তু তাঁর আসা বন্ধ হল না। সপ্তাহে অন্তত একবার তাঁর পদধূলি পড়তেই থাকল। তিনি আসেন, কেবল সুনন্দার সঙ্গে কথা বলেন, অন্য কেউ কোনো প্রশ্ন করলে তার জবাব দেন সুনন্দাকে। আর তাঁর সব বক্তব্যেরই বিষয়বস্তু একটাই— টাকা। পৃথিবী টাকার বশ, এই তত্ত্বটি যে তিনি সার বুঝেছেন, এ বিষয়ে তাঁর শ্রোতাদের মনে কোনোরকম সন্দেহই থাকে না। সচ্ছলতায় তাঁর বিশ্বাস নেই। অতিরিক্ত মাত্রায় টাকা না-থাকলে যে জীবন বৃথা সে কথা সবাইকে বোঝাবার ক্লান্তিহীন প্রয়াস চালিয়ে যান।

এর ওপর আছে উপহার। কোনো উপলক্ষ্য থাক বা না-থাক, সুনন্দার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও মাঝে মাঝেই দামি শাড়ি বা গয়না নিয়ে এসে উপস্থিত হন। সুনন্দা চেঁচামেচি করে, রাগারাগি করে কিন্তু কোনো লাভ হয় না। একবার তো বলেই দিল যে, হাতে করে কিছু আনলে বুড়োকাকার আসার দরকার নেই। তাতে অবশ্য বুড়োকাকা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তাঁর এত আছে, তার থেকে এই সামান্য কিছু জিনিস যদি তিনি তাঁর স্নেহের পাত্রীটিকে দেন, তাহলে অসুবিধে কী আছে। এরপর থেকে সুনন্দা আর প্রতিবাদ করত না। বুড়োকাকা মনে মনে অবশ্যই এর একটা নিজের পছন্দমতো ব্যাখ্যা করে নিয়েছিলেন।

নিয়েছিলেন যে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁর ক্রমবর্ধমান সাহস দেখে। সুনন্দার গা ঘেঁষে বসতে শুরু করলেন, পিঠে হাত রাখাও আরম্ভ হল। আর তাঁর আসবার সময়টাও

ক্রমশ পিছিয়ে সকাল থেকে দুপুরের দিকে যেতে লাগল, যাতে অরিজিৎ তখন অফিসে চলে যায়। সবই বুঝতে পারছিলেন প্রভাময়ী অথচ কিছুই করতে পারছিলেন না। সাঁতার না-জানা লোকের সামনে কুমির যখন তার প্রিয়জনকে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়, তখন তার যে-রকম মনের অবস্থা হয়, তেমনই অসহায় অবস্থা তখন তাঁর।

'আমার তো মনে হচ্ছে পরিমল যা করবার দিনের বেলাতেই করবে। সে সময় তুমি কিছু করতে পারবে তো?'

উত্তর এল, 'হ্যাঁ।'

'আমি কি কিছু না-করে এখন চুপ করেই থাকব?'

পুনরায়, 'হ্যাঁ।'

বেড়াল এবার আস্তে আস্তে থলির ভেতর থেকে বের হতে শুরু করল। কিছুদিন বাদে পরিমল বললেন, 'সুনন্দা, আমি দেখছি যে তুমি চব্বিশ ঘণ্টা রান্নাঘরে কাটাও। এটা ঠিক নয়। চলো না, আমার গাড়ি চড়ে বেড়িয়ে আসবে। এই গলিতে তো আমার গাড়ি ঢোকে না, তাই সেটা বড়োরাস্তায় রেখে এসেছি। বেশি নয়, ধরো ঘণ্টাখানেক।'

সুনন্দা বলল, 'পাগল হয়েছেন! মাকে একা রেখে কোথায় যাব? অন্ধ মানুষ। তা ছাড়া, কে বললে আপনাকে যে আমি চব্বিশ ঘণ্টা রান্নাঘরে কাটাই? প্রত্যেক শনি-রবিবার সন্ধে বেলা আমরা তিনজনে ঘুরতে বের হই। আর বেশি ঘোরবার আমার কোনো দরকার নেই।'

প্রথম প্রচেষ্টা এই পর্যন্ত। এর কিছুদিন পরে, বেড়ালটা অনেকটাই আত্মপ্রকাশ করল। পরিমল বললেন, 'তোমার এই দুরবস্থা চোখে দেখা যায় না, সুনন্দা। তুমি আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমাকে সিনেমায় নায়িকার পার্ট দেব। আমার প্রোডাকশন, আমার ডিরেকশন। আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব, সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়ে যাব, কাজেই তোমার ভয় বা চিন্তার কোনো কারণই নেই। আমি এ লাইনে গত প্রায় পঁচিশ বছর আছি। আমি বলছি, তুমি সাকসেসফুল হবেই। দেশে-বিদেশে তোমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে, প্রোডিউসাররা টাকার থলি নিয়ে তোমার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে।'

সশব্দে হেসে উঠল সুনন্দা। মাথা নেড়ে বলল, 'এ হয় না বুড়োকাকা, আমার জন্যে এত চিন্তা করবেন না, আমি খুব ভালো আছি। এরচেয়ে ভালো আমি থাকতে চাই না।'

অনেক চাপাচাপি করলেন পরিমল। দেবীকারানী, সাধনা বোস, সুচিত্রা সেন, শর্মিলা ঠাকুর প্রমুখ বড়ো বড়ো পরিবার থেকে আসা সিনেমার নায়িকাদের কথা বললেন, কিন্তু কোনো লাভ হল না। অনড় হয়ে রইল সুনন্দা। তার নিরর্থক নির্বুদ্ধিতায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ আর কিছুটা ক্রুদ্ধ হয়েই বিদায় নিলেন বুড়োকাকা।

সন্ধে বেলা সব শুনল অরিজিৎ। বলল, 'এতদিন তোমাকে বলিনি, কিন্তু আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমার ধারণা ভদ্রলোক সুবিধের নন। উনি তোমার আত্মীয়, তার ওপরে গুরুজন, কাজেই একথা তোমাকে বলা হয়তো আমার পক্ষে শোভন নয়। তবুও না-বলে পারছি না।'

চিন্তিত, গম্ভীর মুখে প্রভাময়ী বললেন, 'শোভন নয় যখন বুঝতেই পারছিস, তখন এ সব কথা বলে কেন বউমার মনে কষ্ট দিচ্ছিস? তবে আজ বউমার কথায় যেরকম রেগেমেগে চলে গেছেন তাতে মনে হয় না যে শিগ্‌গিরি আর এদিকে আসবেন।'

হেসে উঠল সুনন্দা। বলল, 'আপনি বুঝতে পেরেছেন, না? যে-রকম হাঁড়িপানা মুখ করে গেছেন, তাতে মনে হয় এখন বেশ কিছুদিন ওঁর ভালোবাসার অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।'

ওদের ভুল হয়েছিল।

পরদিন দুপুর বেলা খাওয়ার পর প্রভাময়ী নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন আর সুনন্দা অরিজিতের কয়েকটা জামা নিয়ে বারান্দায় বসল বোতাম লাগাতে। এইসময় পরিমল এসে হাজির হলেন। বললেন, 'সুনন্দা, তোমার ঘরে চলো, কয়েকটা সিরিয়াস কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'এখানে বসে কথাটা বলা যায় না, বুড়োকাকা?' সুনন্দা জিজ্ঞেস করল।

দৃঢ় গলায় পরিমল বললেন, 'না, নিরিবিলিতে বলা দরকার।'

সুনন্দা বলল, 'ঠিক আছে, চলুন।' বলে জামাগুলো কোল থেকে নামিয়ে রেখে ওর ঘরে গিয়ে ঢুকল। পেছনে পেছনে এলেন পরিমল। ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে মোটা কাঠের খিলটা তুলে দিলেন।

উদ্‌বিগ্ন সুনন্দা প্রশ্ন করল, 'একী, দরজা বন্ধ করছেন কেন, বুড়োকাকা?'

'দরজা বন্ধ করছি এই জন্য যাতে তোমার শাশুড়ি এসে ডিস্টার্ব না করতে পারেন। এখন, বসো তো খাটের ওপর আর আমার কথা মন দিয়ে শোনো। ব্যাপার হল, আমার পার্টনার সূরযলাল সিং আজ থেকে বছর দুয়েক আগে মেজদা, মানে তোমার ছোটো পিসেমশায়ের শ্রাদ্ধে তোমাকে দেখেন। তখনই তাঁর মনে হয়েছিল যে তোমার মধ্যে অভিনয় করার একটা প্রকাণ্ড প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে। তখন তোমার বিয়ে হয়নি। সূরযলালের প্রস্তাব নিয়ে আমি তখন তোমার বাবার কাছে গিয়েছিলুম। অত্যন্ত ভালো প্রস্তাব ছিল সেটা, তা সত্ত্বেও তোমার বাবা আর দুই দাদা আমাকে অপমান করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। অন্য কোনো প্রদেশের লোক হলে এহেন একটা প্রস্তাব লুফে নিত, কিন্তু স্টুপিড বাঙালিদের মোটা মাথায় কোনো ভালো জিনিস ঢোকায় কার বাবার সাধ্যি! আরে এটা যদি বিহার হত, তাহলে তো সূরযলাল প্রস্তাব-ট্রস্তাবের ধারই ধারত না, স্রেফ লোক পাঠিয়ে তোমাকে

তুলে নিয়ে যেত। আনফর্চুনেটলি, ওয়েস্ট বেঙ্গলে এসব করায় ঝুঁকি আছে। তারপর তোমার বিয়ে হয়ে গেল। দেড় কামরার যে বস্তির মধ্যে থাকতে, বাপরে, সেখানে তো আমার ঢুকতেই সাহস হত না।'

'এখন আমাকে কী করতে হবে?'

'তেমন কিছু নয়। তোমাকে আমার সঙ্গে সুরযলালের কাছে যেতে হবে। এখনই। তোমার হাজব্যান্ড অফিস থেকে ফেরবার আগেই ফিরে আসবে তুমি। তোমার উপহারগুলোর জন্য অনেক টাকা খরচ করেছে সুরযলাল। সে আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়। আজ তুমি না-গেলে সুরযলাল আমাকে জ্যান্ত কবর দেবে।'

'আমি তো স্বেচ্ছায় যাব না। পারেন তো জোর করে ধরে নিয়ে যান।' কম্পিত গলায় বলল সুনন্দা।

এইবার পরতে পরতে ভদ্রতার মুখোশটা খসে পড়ল পরিমলের। তাঁর হিংস্র পশুর মতো চেহারাটা বেরিয়ে এল।

ছটফট করছিলেন প্রভাময়ী। লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে প্রায় কেঁদে উঠে বললেন, 'কোথায় তুমি? তুমি যে বলেছিলে আমাকে সাহয্য করবে? ওদিকে যে সুনন্দার সর্বনাশ হতে বসেছে! তোমাকে তো বলেছি, তুমি যা চাও তাই পাবে। তবে তুমি কিছু করছ না কেন?'

এবারে শাড়ির খসখস নয়, একজোড়া ভারী পায়ের আওয়াজ পেলেন প্রভাময়ী। পরক্ষণেই তাঁর সমস্ত চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেল।

'জোর করে নিয়ে যাব? এসব ঝামেলা করবার কোনো দরকারই হবে না, সুনন্দা। যদি ভালোয় ভালোয় না-যাও তাহলে আমি এখনই তোমাকে রেপ করব, বাংলায় যাকে বলে ধর্ষণ। তুমি চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করলেও কেউ তোমাকে এখানে বাঁচাতে আসবে না। তোমার কানা শাশুড়িকে তো ধর্তব্যের মধ্যেই আনি না। আর একবার ধর্ষিতা হলে, তোমার স্বামী আর শাশুড়ি তোমাকে লাথি মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। তখন তো সুড়সুড় করে আমার কাছেই আসতে হবে। কাজেই ভেবে দ্যাখো, কী করবে।'

গুটিশুটি মেরে খাটের এককোণায় সরে যেতে যেতে কেঁদে উঠল সুনন্দা, 'আমি যাব না, কিছুতেই যাব না। আমাকে ছেড়ে দিন বুড়োকাকা। আপনার পায়ে পড়ি। আপনাকে গুরুজন বলে শ্রদ্ধা করি। আমাকে ছেড়ে দিন।'

শেয়ালের মতো দাঁত বের করে হাসলেন বুড়োকাকা। খাটের ধারে বসে জুতো-মোজা খুলতে খুলতে বললেন, 'ওসব ছেঁদো কথায় আমার মন ভেজে না, সুনন্দা। ভেবেছিলুম, সুরযলালের

পর প্রসাদ পাব। এখন দেখছি নৈবেদ্যটা প্রথমে আমার কপালেই নাচছে। ভালোই হল।'

বলতে বলতেই দড়াম করে বোমা ফাটার মতো শব্দ করে ঘরের দরজাটা খুলে গেল। মোটা কাঠের খিলটা ভেঙে দু-টুকরো হয়ে দু-পাশে ছিটকে পড়ল। চমকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন পরিমল। দেখলেন কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ প্রভময়ী দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। কোনোরকমে সামলে নিয়ে পরিমল বললেন, 'ইস, কী পচা কাঠ! এই বুড়ি, এখানে কী চাই? যা ভাগ বলছি! ফূর্তির সময় যতসব ঝামেলা। ভাগ, নইলে গলা টিপে মেরে ফেলব।'

প্রভাময়ী কেটে কেটে বললেন, 'তুমি এই মুহূর্তে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাও, আর কখনো এসো না।'

পরিমল প্রভাময়ীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'তোর কথায় যেতে হবে? কী করবি যদি না-যাই?'

বলামাত্র একটা বিরাশি সিক্কার চড় খেয়ে মেঝের ওপর বসে পড়লেন পরিমল। গালে হাত দিয়ে চোয়ালটা ঠিক করতে করতে বললেন, 'ওব্বাবা, বুড়ি বেধবার গায়ে দেখছি খুব জোর! চালকলা খেয়ে তো এরকম হয় না বাওয়া! লুকিয়ে লুকিয়ে ষাঁড়ের ডালনা খাস বুঝি? তবে, আমার সঙ্গে টক্কর দিয়ে পারবিনে, কানি। এখন আগে তোকে মারব তারপর তোর ছেলের বউটার বারোটা বাজাব।'

এই গোলমালের ভেতরে সুনন্দা খাট থেকে নেমে দরজার দিকে পালাচ্ছিল। তড়বড় করে উঠে দাঁড়ালেন পরিমল। চুলের মুঠি ধরে হ্যাঁচকা টানে ওকে আবার খাটের ওপর ছুড়ে ফেলে দিলেন। গর্জন করে বললেন, 'পালাচ্ছিস কোথায় হারামজাদি? মনে রাখিস, পরিমল ঘোষের হাত থেকে পালানো যায় না—'

কথাটা শেষ করেছেন কী করেননি, প্রভাময়ীর হাতের লাঠিটা হাতুড়ির মতো এসে পড়ল পরিমলের পাঁজরার ঠিক নীচে। উফ্ফ্ করে আর্তনাদ করে দু-ভাঁজ হয়ে গেলেন। কোনোরকমে সোজা হয়ে উঠতে উঠতে পরিমল পকেট থেকে একটা বড়ো ভাঁজ করা ছুরি বের করে ফেললেন। সেটা খুলে একটা অশ্লীল অশ্রাব্য গালাগালি দিয়ে বললেন, 'ভেবেছিলুম খুনখারাপির মধ্যে আর থাকব না। কিন্তু বুড়িটাকে না-মারলে তো দেখছি চলছে না—'

এবারেও কথাটা শেষ করতে পারলেন না, আবার লাঠিটা বিদ্যুদ্বেগে এসে পড়ল পরিমলের কব্জির ওপরে। ছুরিটা ছিটকে বেরিয়ে গেল। এইবার লাঠিটা ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন প্রভাময়ী। এগিয়ে গিয়ে জামার কলার আর কোমরের কাছে ট্রাউজারের বেল্টটা ধরে স্তম্ভিত সুনন্দার চোখের সামনে পরিমলের শরীরটা শূন্যে তুলে ঘরের এককোণে আছড়ে ফেলে দিলেন।

হাউমাউ করে উঠলেন পরিমল, 'ওরে বাবারে, মরে গেলে গেলুম রে, আমার

হাড়গুলো সব ভেঙে গেল রে!' বলে প্রভাময়ীকে আবার এগিয়ে আসতে দেখে একটু আগে সুনন্দা যেমন করছিল, তেমনি গুটিশুটি মেরে ঘরের এককোণায় সরে যেতে যেতে কেঁদে উঠলেন, 'আর না বেয়ান, ঢের হয়েছে।' বলে প্রভাময়ীর চোখে চোখ পড়তেই তাঁর বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। দেখলেন, মণিহীন দু-টি সাদা চোখ এক অপার্থিব হিংস্র জিঘাংসায় জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

ব্যাপারটা চট করে হৃদয়ঙ্গম করলেন পরিমল। দু-হাত জোড় করে বললেন, 'আ-আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি। ভুল করে ভয়ানক অন্যায় করে ফেলেছি। আর কক্ষনো এরকম হবে না, বিশ্বাস করুন। আর কোনোদিন এ বাড়ির ছায়া মাড়াব না, আপনার পরিবারের তো নয়-ই। মাইরি বলছি, মা কালীর দিব্যি।'

আর এগোলেন না প্রভাময়ী। এক হাত তুলে দরজাটা দেখিয়ে দিলেন। দু-হাতে কোমর ধরে বেঁকতে বেঁকতে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে উর্ধ্বশ্বাসে পালালেন পরিমল।

প্রভাময়ীর যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলেন উনি খাটের ওপর বসে আছেন আর সুনন্দা ওঁর কোলে মাথা রেখে হাউমাউ করে কাঁদছে। অনেক সান্ত্বনা, অনেক আদরের পর একটু স্থির হল সুনন্দা। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আমি কি অপবিত্র হয়ে গেলুম, মা?'

প্রভাময়ী হাসলেন। বললেন, 'দূর, পাগলি! ভগবানের সৃষ্টিকে অপবিত্র করা কী অতই সোজা? কিচ্ছু হয়নি তোর। আজকের ঘটনাটা মন থেকে একেবারে মুছে ফেল তো। যা, এখন স্নান করে নে। তোর সব গ্লানি ধুয়ে ফেল। চটপট যা। অরিজিতের আসবার তো আর বেশি দেরি নেই। আর, আমার লাঠিটা কোথায় পড়ল, একটু এনে দে তো। বড্ড ক্লান্ত লাগছে। এখন গিয়ে একটু শুয়ে নিই।'

সুনন্দা মেঝের ওপর পড়ে থাকা লাঠিটা তুলে এনে প্রভাময়ীর হাতে ধরিয়ে দিল। কী যেন একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, শেষপর্যন্ত সেটা আর করে উঠতে পারল না।

অরিজিৎ সব শুনে বলল, 'তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। ফাজলামো করছ নাকি আমার সঙ্গে? মা ভালো করে হাঁটতে পারে না, চোখে দেখতে পায় না। সে কি না ওই বিরাট লাশটাকে মেরে একেবারে চচ্চড়ি বানিয়ে দিল! এ কী ইয়ার্কি নাকি? এসো আমার সঙ্গে, আমি মার মুখ থেকে সব কথা শুনতে চাই।'

দু-জনে ঘরে ঢুকে দেখল প্রসন্ন সমাহিত মুখে প্রভাময়ী শুয়ে রয়েছেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে একটা তৃপ্ত সুখের হাসি। সেদিকে তাকিয়ে অরিজিতের ওঁর ঘুমটা ভাঙাতে মন চাইল না। যথাসম্ভব নিঃশব্দে বেরিয়ে আসার সময় ওর নজরে পড়ল খাটের পাশে ছোটো টেবিলটার ওপরে একটা চিঠি রয়েছে। প্রভাময়ীর হাতের লেখা। ওদের দু-জনকে সম্বোধন করা।

একটু উদ্‌বিগ্নচিত্তে চিঠিটা হাতে করে বারান্দায় এসে বসল অরিজিৎ। সুনন্দাকে বলল, 'মা মুখে না-বলে হঠাৎ আমাদের চিঠি লিখতে গেলেন কেন? অন্ধ হয়ে যাবার পর থেকে মাকে তো কখনো কিছু লিখতে দেখিনি। অথচ এত বছর বাদেও চোখে না-দেখে কী পরিচ্ছন্নভাবে লিখেছেন, দেখেছ!' তারপর চিঠিটা পড়তে শুরু করল—

স্নেহের খোকা ও বউমা। আমার দুই পরম বন্ধুর কোনো অকল্পনীয় এবং অপ্রত্যাশিতপূর্ব উপকারের প্রত্যুপকার করিবার আশায় ইহজগৎ হইতে বিদায় লইলাম। আমি এখন যেখানে আছি তাহা অনন্ত সুখের স্থান, তাই আমার জন্য শোক করিও না। করিলে অকারণে আমাকে কষ্ট পাইতে হইবে। আমার শেষকৃত্যাদি যা ভালো বুঝিবে তাহা করিবে, তবে আর একটি কাজ তোমাদের অতি অবশ্যই করিতে হইবে। ইহা আমার শেষ অনুরোধ এবং আদেশ বলিয়া জানিবে। এই ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণে যে স্তম্ভটি আছে তাহা ভাঙিলে তাহার অভ্যন্তরে দুইটি নরকঙ্কাল পাইবে। পুলিশকে দেখাইয়া সেই অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন দিবে এবং যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে। জীবিতাবস্থায় ইঁহাদের নাম ছিল শিবচন্দ্র ধর ও নন্দরানী ধর। ইঁহারা স্বামী-স্ত্রী। শিবচন্দ্রের পিতার নাম আশুতোষ, পিতামহ হরকালী, প্রপিতামহ বৃন্দাবন। মধ্যবয়সে শিবচন্দ্র ও নন্দরানী বিষয়কর্মে বীতরাগ হইয়া গভীরভাবে ধর্মকার্যে লিপ্ত হন। এই সুযোগে সম্পত্তির লোভে শিবচন্দ্রের ভ্রাতা রামচন্দ্র দুইজনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে ও তাঁহাদের দেহ ওই স্তম্ভের ভিতরে গাঁথিয়া দেয়। হত্যা করিবার পূর্বে সে তাহার মাতৃসমা ভ্রাতৃবধূর উপর পাশবিক অত্যাচার পর্যন্ত করিয়াছিল। পরে সে রটনা করিয়া দেয় যে শিবচন্দ্র সস্ত্রীক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রাত্রের অন্ধকারে সকলের অগোচরে গৃহত্যাগ করিয়াছেন। কালক্রমে লোকে ইঁহাদের কথা বিস্মৃত হয়। এখন শিবচন্দ্রের বর্তমান বংশধর যদি শ্রাদ্ধ করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে খোকা নিজে যেন তাঁহাদের শ্রাদ্ধ করে। ইঁহারা আমাদের পরিবারকে রাহুমুক্ত করিয়াছেন, নিশ্চিত সর্বনাশ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, অতএব খোকার তাঁহাদের শ্রাদ্ধ করিবার অধিকার আছে। দীর্ঘকাল তাঁহারা অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, এইবার তাহা হইতে তাঁহাদের মুক্ত করা খোকার অবশ্যকর্তব্য বলিয়া জানিবে। তোমরা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সুখে থাকিও, ইহাই আমার আশীর্বাদ রহিল।

ডাক্তার নির্মল মৈত্র বললেন, 'এটা স্বাভাবিক মৃত্যু, সুইসাইডের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। স্পষ্ট সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস, সঙ্গেসঙ্গে মৃত্যু হয়েছে। দেখছেন না, মুখে যন্ত্রণার লেশমাত্র নেই? এই বয়সে, এত দুর্বল শরীরে এইরকমই হয়।'

অরিজিৎ অবশ্য ডাক্তার মৈত্রকে চিঠিটার কথা কিছু জানায়নি।

শিকার

আমি ঘরে ঢুকতেই বুঝতে পারলুম কিছু একটা হয়েছে। সবার মুখ থমথম করছে, বড়োবাবুর তো বিশেষ করে। কী হল রে, বাবা! আমি কি কোনো অপরাধ করলুম? এমন জরুরি তলব, আর এখানে এসে এই অবস্থা! দরজার পাশেই কার্তিক দাঁড়িয়েছিল। জিগ্যেস করলুম, 'কী হয়েছে রে, কেতো?'

কার্তিক বলল, 'বড়োবাবু ডেকেছে। যা বলবার উনিই বলবেন।' তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'বড়োবাবু, বিদ্যেসাগর এসেছে।'

এখানে আমাকে সবাই বিদ্যেসাগর বলে ডাকে, কারণ আমি অপরাধের মধ্যে এম এ-টা পাশ করে বসে আছি। বাকি সবাই তো নাম সই করতে গেলে তিনটে কলম ভেঙে -টেঙে একাকার করে। অবশ্য, বড়োবাবু ছাড়া। তাঁর কথা আলাদা। দেবতা বলে যদি কেউ থাকে তো এই বড়োবাবু। এঁর সঠিক নাম কী, কোথায় থাকেন তা আমরা কেউ-ই জানি না। আমাদের জানবার কথাও নয়। তবে যেখানেই থাকুন, সেটা যে স্বর্গ তাতে সন্দেহ নেই। দেবতাদের তো অসংখ্য নাম থাকে, এঁরও আছে। এসব নিয়ে মাথা আমরা ঘামাইনে, ঘামালে মাথাটা খোয়া যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে এটুকু জানি, এরকম মানুষ ভু-ভারতে আর নেই। আমাদের সবাইকে উনি কেবল জীবন দিয়েছেন বললে কম বলা হয়, বলা উচিত বাঁচার মতো করে বাঁচতে শিখিয়েছেন।

এই তো আমি বি এ পাশ করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। একটা কুলির কাজ পেলে বর্তে যাই, তা-ও জুটছিল না। বিধবা মা আর ছোটো বোনটাকে নিয়ে গড়পারের ভাড়া বাড়ি থেকে উৎখাত হয়ে ভাসতে ভাসতে শেষপর্যন্ত রাসবিহারীর ফুটপাথে। চোখের সামনে তখন অনন্ত অন্ধকার। সংসারটা, ভালো বাংলায় যাকে বলে, ক্লেদাক্ত পঙ্কিলে ডুবে যাচ্ছে। তখন গিয়েছিলুম লেক গার্ডেন্স লেভেল ক্রসিং-এ রেলে মাথা দিতে। এই কার্তিক আর দেবেন আমায় তুলে এনেছিল। বড়োবাবু আশ্রয় দিয়েছিলেন।

সে আজ বছরছয়েক আগেকার কথা। বোনের ভালো বিয়ে দিলুম। মা মারা গেলে ধুমধাম করে শ্রাদ্ধ করলুম। এখন ভাবছি, সল্টলেকে জমি কিনে একটা বাড়ি করব। তাই বলছিলুম, বড়োবাবু মানুষ নন, দেবতা। দেবতা।

কার্তিকের গলা শুনে বড়োবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'কে রে, পূর্ণেন্দু? এদিকে আয়। খবর শুনেছিস?'

বড়োবাবুর গলা শুনে বুঝলুম যে আমি কোনো দোষ করিনি। বাব্বা, বাঁচলুম! যা ভয় পেয়েছিলুম। হাত কচলাতে কচলাতে বললুম, 'আজ্ঞে না-তো। কী খবর বড়োবাবু?'

বড়োবাবু ঘরের একপাশে একটা গোলটেবিলের ওপাশে বসেছিলেন। বাকি সবাই দাঁড়িয়েছিল। ওঁর সামনে বসা! টেবিলের ওপর একগ্লাস নিট হুইস্কি আর একটা বোতল রাখা ছিল। বড়োবাবু এক চুমুক খেয়ে বললেন, 'হায়দার মরে গেছে।'

হায়দার! আমরা যাকে গোরিলা বলে ডাকতুম! সে কী? সে ছিল বড়োবাবুর পার্সোনাল বডিগার্ড। আমি ক্ষীণ কণ্ঠে জিগ্যেস করলুম, 'কী হয়েছিল?'

'বদন ঘোষ রোডের একটা বাড়ির ছাদ থেকে কেউ ওকে ঠেলে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল। ঘাড় মটকে মরে গেছে। আর ঠেলে ফেলাই বা বলি কী করে? ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। রাস্তার ঠিক মাঝখানে লাশ পড়েছিল।'

'কী সর্বনাশ! ও ওখানে কী করছিল?'

'পরে বলছি। আচ্ছা, তোমরা এবার যাও। আমি পূর্ণেন্দুর সঙ্গে কিছু কথা বলব।'

বড়োবাবুর আদেশ শুনে সবাই নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে রইলুম শুধু আমি। বড়োবাবু এক হাত তুলে চোখের কালো চশমটা ঠিক করে নিলেন। উনি চব্বিশ ঘণ্টা কালো চশমা পরে থাকেন। কেন, কে জানে! শুনেছি ওঁর একটা চোখ নাকি পাথরের। হতেও পারে। সে খবরে আমাদের কী দরকার? বড়োবাবু সম্পর্কে বেশি কৌতূহল একদম ভালো জিনিস নয়।

বড়োবাবু বললেন, 'বদন ঘোষ রোড তুই চিনিস? ভাবানীপুরে? সে যাক গে, না চিনলে চিনিয়ে দেওয়া যাবে-খন। ওখানে রাজমোহন সিংহরায়দের বাড়ি আছে। পুরোনো দিনের জমিদারবাড়ির মতন। বাড়ির ভেতর মন্দির-টন্দির আছে। রোজ পুজোআচ্চা হয়। হায়দারকে ওখানেই পাঠিয়েছিলুম। কী যে হল! সে যাক গে! এবার কাজের কথা বলি। মন দিয়ে শুনবি।

বদন ঘোষ রোডের বাড়িটাকে লোকে বলে রাজমোহনের রাজবাড়ি। রাজমোহনের বিহারে না কোথায় মস্ত জমিদারি ছিল। ভদ্রলোক প্রায় এক-শো বছর আগে এই বাড়িটা বানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, ওঁর ছেলেপুলেরা কলকাতাতেই থাকতেন, এখান থেকেই জমিদারি চালাতেন। প্রচুর পয়সা ছিল একসময়। প্রচুর ফূর্তিফার্তাও করে নিয়েছেন। সে যাক গে। ওসব কোনো কাজের কথা নয়।

এখন এই বাড়ির মালিক একটা মেয়ে। তার নাম তিলোত্তমা রায়চৌধুরি। এ হচ্ছে এখন সিংহরায়দের শেষ বংশধর। ওর ভাই রত্নাকর সিংহরায় বছরখানেক হল মরে গেছে। সে বিয়ে-থা করেনি, ছেলেপুলে নেই। কাজেই এখন সব সম্পত্তির মালিকানা বর্তেছে এই তিলোত্তমার ওপর। ওর বাবা রমাকান্ত অনেকদিন আগেই গেছে।

মেয়েটি বিধবা। বিয়ে হয়েছিল বছরদশেক আগে কোনো এক রায়চৌধুরির সঙ্গে। একটা বাচ্চা হয়েছিল। সেটা বছরতিনেক বয়েসে মারা যায়। তার পরের বছর রায়চৌধুরিও মারা যায়। তখন মেয়েটি বাপের বাড়ি চলে আসে। এখানে এসে কেবল পুজোআচ্চা ধর্মকর্ম নিয়েই আছে। এটা, তা প্রায়, গত পাঁচ বছর ধরে চলছে।

সিংহরায়দের টাকাপয়সা এখন আর তেমন কিছু নেই। ফোঁপরা হয়ে গেছে। কিন্তু ঠাঁট এখনও বজায় আছে। আর এটা চালিয়ে যাচ্ছে ওদের ম্যানেজার দুর্গাশংকর উপাধ্যায়। নামে হিন্দুস্থানি, বাঙালি হয়ে গেছে। বুড়ো হাড়বজ্জাত, ঘুঘু নাম্বার ওয়ান। ঘুস খায় না, মেয়েছেলের লোভ নেই, মাল খায় না— একেবারে থার্ড ক্লাস। আমি লোকটাকে বাজানোর জন্যে বছরদুয়েক আগে জীতেনকে পাঠিয়েছিলুম। তুই তো জীতেনকে জানিস, কথা বলায় এক্সপার্ট। ইচ্ছে করলে আইনস্টাইনকেও বুঝিয়ে আসতে পারে যে সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে। সেই জীতেন মুখ খুলতে-না-খুলতেই সেই হারাজমজাদা বুড়ো একেবারে পুলিশে ফোন করে দিয়ে বসে আছে! জীতেন কোনোরকমে ওখান থেকে কেটে বেরিয়ে এসে বাঁচে।

এখন তোর মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে সিংহরায়রা যদি ফোঁপরাই হয়ে গিয়ে থাকবে, তাহলে ওদিকে আমার নজর কেন? তার কারণ আছে। ওদের একটা জিনিস আছে যেটা বলা যায় অমূল্য। সেটা ওদের গৃহদেবতা একটা বিষ্ণুমূর্তি। এই মূর্তিটা থাকে বাড়ির ভেতরে, কখনো বাইরে আসে না। বাইরের মন্দিরের যে বিষ্ণুমূর্তি সেটা এই মূর্তিটার হুবহু নকল। কিন্তু নকলই। বাইরেরটা পাথরের, আসলটা অষ্টধাতুর। বাইরের মূর্তিটার যেসব গয়নাগাঁটি আছে সেগুলো সব ঝুটো, আসলটার যে কী তার আর বলে দিতে হয় না। তার চেয়েও বড়ো হচ্ছে, মূর্তিটার বুকে একটা প্রকাণ্ড পদ্মরাগমণি ফিট করা আছে, সেটাকে বলে কৌস্তভমণি। আমার নজর এই মূর্তিটার দিকে। আখতারুজ্জুমান এই খবরটা দিয়েছিল বছরতিনেক আগে। সেই সময় রত্নাকর সিংহরায় নাকি গোপনে এক জার্মান সাহেবের সঙ্গে দর কষাকষি করছিল ওটা বেচে দেওয়ার জন্যে। সেটা আখতার জানতে পারে। তখন সে আমার কাছে আসে। আজ রত্নাকর বা আখতার কেউ-ই বেঁচে নেই। আমি ছাড়া এটার খবর আর বোধ হয় কেউ জানেও না। তবে আমার বিশ্বাস মূর্তিটা বের করে দিতে পারলে ঘরে বিশ লাখ টাকা উঠবে। মিনিমাম। চেপেচুপে ধরতে পারলে চল্লিশ পর্যন্ত উঠতে পারে।

আমি হায়দারকে পাঠিয়েছিলুম মালটা ওঠানোর জন্যে। ও-বাড়ির একটা ঠিকে ঝি-কে তুলে এনে কড়কাতেই সে বলে দিলে যে মাল কোথায় আছে। দোতলার

ওপর কর্তামশাই-এর ঘর, সেখানে দেওয়ালের মধ্যে গাঁথা সিন্দুকের মতো মন্দির। বন্ধ করলে সিন্দুক, খুললে মন্দির। সেখানেই গৃহদেবতার অবস্থান। তুই তো জানিস, হায়দার ছিল কলকাতা কেন সারা দেশের পয়লা নম্বরের গব্বাবাজ, যাকে ইংরেজিতে বলে ক্যাট-বার্গলার। অত বড়ো শরীরটা নিয়ে যেকোনো বাড়ির খাড়া দেওয়াল বেয়ে টিকটিকির মতো উঠে যেতে পারত, দশতলার ওপরে কার্নিস বেয়ে হাঁটাচলা করত যেন ময়দানে হাওয়া খাচ্ছে। তার পক্ষে দোতলার ওপরে একটা ঘরে ঢুকে ঘুমের ওষুধ স্প্রে করে একটা সিন্দুক ভেঙে মাল বের করে আনা কোনো ব্যাপারই ছিল না। অথচ কীসের থেকে কী হয়ে গেল। ও-বাড়ির যে তিনটে দারোয়ান আছে তাদের সাধ্যি নেই হায়দারকে কাবু করে। তার মানে, অনেকগুলো লোক ওখানে হায়দারের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ও ঢুকতেই সবাই মিলে ওকে কবজা করে ছাদে নিয়ে গিয়ে নীচে ছুড়ে দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হল— লোকগুলো জানল কী করে যে সেইদিনই হায়দার যাবে?'

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'ঠিকে ঝি-টা...'

বড়োবাবু হাত নেড়ে বললেন, 'না, না, সেটাকে তো মেরে লেকের জলে ফেলে দিয়েছিলুম। ওসব সাক্ষী রাখতে আছে কখনো? খবর অন্য কেউ দিয়েছে। সে যাক গে, সে ব্যাপারে তোর মাথা ঘামানোর দরকার নেই। এখন তোকে কী করতে হবে বলি, শোন। তানুক কাকে বলে জানিস?'

আমি মিনমিন করে বললুম, 'আজ্ঞে, সুন্দরী তরুণী বিধবা।'

'হ্যাঁ। তোকে সেই তানুক পটাতে হবে। এই কর্মে তুই এক্সপার্ট। যেখানে যতবার তোকে মেয়েছেলে জপাতে পাঠিয়েছি ততবার তুই সাকসেসফুল। তোর ওই ফিল্মস্টার মার্কা চেহারা আর সাহিত্য-টাহিত্য নিয়ে কবি কবি কথাবার্তা যে এমন কাজে লাগবে, কে ভেবেছিল। সে যাক গে। এখন ওই তিলোত্তমাকে গাঁথা দরকার। কারণ, কর্তামশাই-এর ঘরে এখন তিলোত্তমা শোয়, একা। আর ওই সিন্দুকের চাবি থাকে তিলোত্তমার আঁচলে। ওই ঘরে নানা জায়গায়, খাটের পাশে, টেবিলের নীচে, আলমারির কোণায়, সুইচবোর্ডের পেছনে অ্যালার্ম বেলের সুইচ রাখা আছে। এক সেকেন্ড সময় পেলেও ওই সুইচ টিপে দেওয়া সম্ভব। কাজেই তিলোত্তমাকে একেবারে পেড়ে ফেলতে না-পারলে চাবিটা হস্তগত করা কঠিন হবে। তা ছাড়া, আর একবার একটা গব্বাবাজ পাঠাব, তারও উপায় নেই। ওই শালা উপাধ্যায় সব ক-টা জানলার বাইরে বিচ্ছিরি গ্রিল লাগিয়েছে আর এমনভাবে আলো লাগিয়েছে যে ওই ঘরের জানলা দুটোর ওপর গ্রিল ভাঙার কলম নিয়ে বসলে তাকে সবাই দেখতে পাবে। আসল কথা, চাবিটা পেতে হলে ঘরের ভেতরে ঢুকতে হবে এবং তিলোত্তমাকে অসহায় করে ফেলতে হবে। এখন এটাই হল তোর টাস্ক। এবার বল, কোনো প্রশ্ন আছে?'

আমি বললুম, 'তিলোত্তমার বয়েস কত?'

'সাতাশ-আঠাশ।'

'কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল?'

'আঠারো বছরে। স্বামী মারা যায় বাইশ বছরে।'

'স্বামী কীরকম লোক ছিল?'

'শুনেছি এক নম্বরের দুশ্চরিত্র লোক ছিল। নেশাভাং, মেয়েমানুষ— সব দোষই ছিল।'

'মূর্তিটা কত বড়ো?'

'খুব বড়ো কিছু নয়। ফুটখানেক উঁচু হবে। একাই নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবি।'

'কতদিন সময় দেবেন?'

'তা নে না তুই যত সময় দরকার। আমার কোনো তাড়া নেই।'

আমি চুপ করে আছি দেখে বড়োবাবু বললেন, 'ব্যাস? আর কোনো প্রশ্ন নেই?'

আমি মাথা নাড়লুম। বললুম, 'না।'

'তুই একটা কথা খেয়াল করেছিস? এই মেয়েটা কিন্তু ভীষণ ভক্তিমতী, ধর্মপরায়ণ আর শুচিবায়ুগ্রস্ত।'

'তাতে কিছু যায় আসে না। ওসব বাইরের স্নায়বিক বিকার, ভেতরে সব সমান। এতদিনে এটুকু জ্ঞান আমার হয়েছে যে দুনিয়ায় এমন মেয়ে নেই যে প্রলোভন প্রতিরোধ করতে পারে। কেউ হয়তো বেশিদিন আটকে রাখতে পারে, কেউ কম দিন। কিন্তু শেষপর্যন্ত লোভের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিতে হবেই।'

বড়োবাবু দুটো সোনা-বাঁধানো দাঁত বের করে একটা নিঃশব্দ হাসি হাসতে হাসতে বললেন, 'পাজি ছেলে! যা, তৈরি হতে শুরু কর।'

তৈরি হতে মাসচারেক সময় লাগল। প্রথমে প্ল্যানটা ঠিক করা হল। তিলোত্তমা দুঃখী মানুষ, কতটুকুই বা সুখের মুখ দেখেছে। অতএব, আর-একজন দুঃখী লোকের প্রতি তার সহানুভূতি চট করে জাগবে, এটাই স্বাভাবিক। এবার সেই সহানুভূতির রাস্তা ধরে তার কাছে এগোতে হবে। আস্তে আস্তে, দুঃখী দুঃখী ভাবে, ভবিষ্যতের সুখের একটা আবছা ছবি আঁকতে-আঁকতে। ধীরে ধীরে সেই অলীক ছবিটাকে একটা সত্যিকারের রূপ দিতে হবে।

অতএব, প্রথমেই চুল আর দাড়ি কাটা বন্ধ করে দেওয়া গেল। যখন সেগুলো বেশ বড়ো হয়ে উঠল, তখন রোজ শ্যাম্পু করে করে যতদূর সম্ভব রুক্ষ-রুক্ষ করে তোলা হল। মাসদুয়েক খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হল। কাজ শুরু করার দু-দিন আগে থেকে কুমোরবাড়ির মাটি ঘষে-ঘষে চুল দাড়ি এলোমেলো উস্কোখুস্কো করে ফেলা হল। তারপর ছেঁড়া প্যান্ট আর শার্ট জোগাড় হল।

আমার চেহারা দেখে তো মল্লিকা হেসে অস্থির। বললে, 'বাপরে বাপ, পারোও তুমি। এমন পোশাকে আর এই চেহারা নিয়ে কোথায় যে যাচ্ছ, তুমিই জানো। সেসব তো আবার জিগ্যেস করা বারণ। তবে, এতদিন ধরে যখন ঘষামাজা চলছে, তখন এবার বেশ বড়োসড়ো কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে। কী গো, তাই না?'

আমি বললুম, 'বলেছি তো, এসব কথা জিগ্যেস করা বারণ। তবে, এবার দাঁওটা যদি লাগে, তবে তোমার কপাল খুলে যাবে। এই বলে দিলুম।'

'বটে? কী হবে আমার?'

'দিগঙ্গনা অ্যাপার্টমেন্টের তিনতলার ফ্ল্যাটটা তোমায় দিয়ে দেব। আমি চলে যাব সল্টলেকে।'

'ওঃ, এই?'

'কেন, পছন্দ হল না? বারো-শো স্কোয়ার ফুট, দুটো বেডরুম।'

'দুটো বেডরুম! তবে আর কী। কী হবে আমার দুটো বেডরুম দিয়ে? আচ্ছা, তুমি আমায় বিয়ে করতে পারো না?'

'বিয়ে? তোমাকে? আমি?' আমি সশব্দে হেসে ফেললুম, 'পাগল হয়েছ? ফিল্মে নামিয়ে দিয়েছি। ভালো খাচ্ছ-দাচ্ছ। ব্যস। ওই পর্যন্ত। তার বেশি আর হাত বাড়িয়ো না।'

মল্লিকা ধপ করে খাটের ওপর বসে পড়ল। বলল, 'আমি জানতুম। আসলে, তুমি একটা অমানুষ! তোমার বাইরেটা যেমন সুন্দর, ভেতরটা তেমনি কুচ্ছিৎ।'

আমি হাসতে হাসতে বললুম, 'তাহলে বিয়ে করতে চাওয়া কেন? বিয়ে করলে তো ভেতরে-বাইরে সব সমান। তখন সেটা সইতে পারবে? তার চেয়ে এখন বাইরেটা নিয়ে আছ, সেটা নিয়েই থাকো। কুচ্ছিৎ যেটা, সেটা ভেতরেই থাক।'

বড়োবাবুর সঙ্গে গাড়ি করে গিয়ে রাজমোহনের রাজবাড়ি দেখে এলুম। রাজবাড়ি কিচ্ছু নয়। তবে, বেশ বড়ো বাড়ি। চারদিকে আট ফুট উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের মাঝখানে বর্শার মতো দেখতে লোহার শিক লাগানো চওড়া গেট। গেটের পর মার্বেল পাথর বসানো উঠোন, তার একপাশে মন্দির, অন্যপাশে বোধ হয় অফিস ঘর। গেটের দু-পাশে দারোয়ানের বসবার সিমেন্টের চেয়ার, ওপরে সিমেন্টের লাল সবুজ রং করা ছাতা। উঠোনের পেছনে টানা লম্বা দোতলা বাড়ি। সামনে কারুকার্য করা লোহার রেলিং বসানো বারান্দা, ওপরে সবুজ রং করা কাঠের ঝিলমিল। পেছনে সার সার দরজা। ক-টা ঘর বলা শক্ত। একতলায় বাড়ি মাঝখানে বারান্দায় ওঠার শ্বেতপাথরের সিঁড়ি। দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা রাস্তা থেকে দেখা যায় না।

বড়োবাবু বললেন, 'গেটের ঠিক সামনে দোতলায় যে ঘরটা দেখছিস, ওটাই

কর্তামশাই-এর ঘর। তিলোত্তমা ওখানেই শোয়। আর একতলায় একদম ডানদিকে ঘরটা হারামজাদা উপাধ্যায়ের।'

আমি জিগ্যেস করলুম, 'হায়দারের লাশ কোথায় পড়েছিল?'

'এই যে, যেখানে আমরা গাড়ি রেখেছি, ঠিক সেইখানে।'

'ওই বাড়ির ছাদ থেকে হায়দারকে এত দূরে ছুড়ে ফেলেছিল? এ তো দশ-বারোজন তাগড়া লোকের কাজ।'

'হ্যাঁ, তাই বটে। খবরটা যে কে ওগরাল! সে যাক গে, লোক লাগিয়েছি, দু-একদিনের মধ্যেই বের করব। তুই তোর কাজ শুরু করে দে, এ নিয়ে ভাবিসনি। যত তাড়াতাড়ি পারিস, তিলোত্তমাকে ওড়ানোর চেষ্টা কর।' বলে বড়োবাবু দুটো সোনা-বাঁধানো দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন।

সারারাত ফুটপাথে শুয়ে রইলুম। ভোর বেলা একটা রোগাপটকা দারোয়ান গেট খুলে দিল। তখন দেখি দু-চারজন বুড়ো-বুড়ি ফুল-টুল হাতে ভেতরে যাচ্ছে। আমিও তাদের সঙ্গেসঙ্গে ভেতরে ঢুকলুম মাথা নীচু করে। মন্দিরটা দেখলুম খুব বড়ো নয় আর নেহাত ছোটোও নয়। মূল বিগ্রহের ঘরের সামনে একটা বড়োসড়ো চৌকো বারান্দা আছে শ্বেতপাথরে মোড়া। তার চারকোণে চারটে কারুকার্য করা থামের ওপর একটা ছাদও আছে। আমি সিঁড়ি বেয়ে সেই বারান্দায় উঠে একটা থামে ঠেসান দিয়ে মাটিতে বসে উদাস দৃষ্টিতে বিগ্রহের দিকে চেয়ে রইলুম। আর কোনোদিকে তাকালুম না। কে এল, কে গেল সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই। পুরুতমশাই পুজো করলেন, কীসব জলটল ছেটালেন, ভক্তেরা প্রসাদ নিল। আমি কিন্তু বসেই রইলুম। সন্ধে বেলা দারোয়ান এসে আমাকে বাইরে চলে যেতে বলল। আমি বেরিয়ে গেলুম। প্রথম দিন কেউ আমাকে লক্ষই করল না।

দ্বিতীয় দিন লক্ষ করলেন পুরুতমশাই। টের পেলুম, পুজো করছেন, ঘুরছেন ফিরছেন আর বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছেন। আমার কিন্তু কোনোদিকে খেয়াল নেই। দৃষ্টি বিগ্রহের দিকে।

তৃতীয় দিন বিকেল বেলা পুরুতমশাই আমার সামনে এসে বসলেন। নানা প্রশ্ন— আমি কে, কোথায় থাকি, এখানে বসে আছি কেন ইত্যাদি। আমি কোনোটারই জবাব দিলুম না। শেষে খুব করুণ সুরে শুধু বললুম, 'আমি এখানে বসে থাকলে যদি আপনার কোনো অসুবিধে না-হয়, তাহলে বসে থাকতে দিন।' আমার কথা শুনে পুরুতমশাই অত্যন্ত লজ্জিত হলেন।

চতুর্থ দিন দুপুর বেলা একটি দারোয়ান এসে আমার সামনে দাঁড়াল। বলল, 'আমার

সঙ্গে আসুন, ম্যানেজারবাবু ডাকছেন।' আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে কম্পিতপদে উঠোন পার হয়ে অফিসঘরে গেলুম।

দুর্গাশংকর উপাধ্যায়কে দেখে মনে হল ম্যানেজার না-হয়ে সংস্কৃতের পণ্ডিত হলে মানাত ভালো। ফর্সা টকটকে রং, পাকা ভুরু, পাকা গোঁফ, মাথায় সামান্য ক-টি পাকা চুলে ঘেরা প্রকাণ্ড টাক। পরনে সাদা পাঞ্জাবি আর ধুতি। অফিসঘরের একপাশে একটি অতি প্রাচীন টেবিলের উলটোদিকে একটি অতি প্রাচীন চেয়ারে পিঠ সোজা করে বসেছিলেন। প্রশ্ন করলেন, 'তুমি বাঙালি?'

আমি নিঃশব্দে ওপরে-নীচে মাথা নাড়লুম।

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললুম, 'আমার নাম পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য। আমি...' এই পর্যন্ত বলে মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেলুম।

আমি কম্পিত কণ্ঠে বললুম, 'আমি এই সব খাবার খাব?' অফিসঘরের একটা চেয়ারে আমি তখন বসে, চুলদাড়ি তখনও ভিজে, আমার সামনে টেবিলের ওপর ভাত আর পঞ্চব্যাঞ্জন। আমার সামনে দাঁড়িয়ে উপাধ্যায় আর কয়েক জন কর্মচারী।

উপাধ্যায় বললেন, 'হ্যাঁ। সব খাবে। ডাক্তারবাবু বললেন, তিন-চারদিন নাকি তোমার খাওয়া হয়নি।'

আমি নিঃশব্দে কিছুক্ষণ কাঁদলুম, তারপর মাছ তরকারি সরিয়ে রেখে শুধু নুন দিয়ে খানিকটা ভাত খেয়ে উঠে পড়লুম। উপাধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'ধন্যবাদ। তবে, ভবিষ্যতে দয়া করে এটা করবেন না। আমি এখানে খেতে আসি না, আসি শান্তির খোঁজে। যদি মনে করেন, আমার মতো হতভাগার এখানে এলে কোনো অসুবিধে আছে, দারোয়ানকে বলে আমাকে বারণ করে দেবেন।' বলে ক্লান্ত পায়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম।

উপাধ্যায় খুব একটা বিচলিত হয়েছেন বলে মনে হল না। কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'এখানেই শান্তি পাবে এরকম কথা তোমার মনে হল কেন?'

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললুম, 'শান্তি পাব কী পাব না, তা তো জানি না। তবে খুঁজতে দোষ কী? বহু জায়গায়ই তো খুঁজলুম, পাইনি তো। তবে হ্যাঁ, আপনাদের পুরুতমশাইয়ের সংস্কৃত উচ্চারণ বড়ো খারাপ, খুব কানে লাগে।' বলে আবার ফিরে গিয়ে মন্দিরের বারান্দায় বসলুম।

ডাক এল সেদিন বিকেল বেলা। একটি কাজের মেয়ে এসে বলল, 'দিদিমণি তোমাকে ডাকতেছেন।' বুঝলুম, সময় হয়েছে নিকট এবার।

আমাকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হল, সেটা মূল বাড়িটার একতলায় একটা অফিসঘর। মান্ধাতার আমলের মোটা মোটা ফার্নিচার দিয়ে সাজানো— এটাই ছিল কর্তামশাইদের

পার্সোনাল অফিস। ঘরটার একপাশে একটা অতিকায় সেক্রেটারিয়েট টেবিল। তারই সামনে দাঁড়িয়েছিল তিলোত্তমা। আমার শিকার। পাশে উপাধ্যায়, আষাঢ়ের মতো গম্ভীর মুখে।

শিকারটিকে দেখে বড়োই খুশি হওয়া গেল। হ্যাঁ, শিকার হয় তো এমনই। সুন্দরী তো বটেই, কিন্তু কী ব্যক্তিত্ব! কেবল শুভ্রবসনে বা গায়ের রঙে নয়, তপঃক্লিষ্ট মুখ, ঘনকৃষ্ণ চোখ বা রক্তিম অধরোষ্ঠ ঘিরে জ্বলজ্বল করেছে একটা শান্ত, দৃঢ় এবং দুর্ভেদ্য জ্যোতি। দীর্ঘ শরীরে সামান্য মেদের ছোঁয়া লেগেছে কিন্তু তাতে ক্ষতি হয়নি। এমন শিকার না-হলে খেলায় আনন্দ কোথায়? বড়োবাবুর অত হাসির কারণটা বুঝলুম। তাঁর প্রিয় শিষ্য আমি এই প্রস্তর-কঠিন সৌন্দর্যটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করছি, সে দৃশ্য কল্পনা করেই ওঁর অত পুলক হয়েছিল।

তিলোত্তমা অনুচ্চ গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল, 'খাবার দেওয়া হয়েছিল, খাওনি কেন?'

আমি মাথা নীচু করে যথাসাধ্য ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম, 'এসব খাবার আমার পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয়।'

তিলোত্তমা একটু ইতস্তত করে বলল, 'তোমার নাম শুনলাম পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, ব্রাহ্মণ। দেখে তো ভদ্রসন্তান বলে মনে হচ্ছে। পুরুতমশাইয়ের উচ্চারণে ভুল ধরেছ, তার মানে লেখাপড়াও কিছু জানো। কতদূর পড়াশুনো করেছ?'

আমি পূর্ববতৎ বললুম, 'এম এ পাশ করেছি। ইকনমিকসে আর সংস্কৃতে।'

আমার কথা শুনে তিলোত্তমা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। বুঝলুম শকটা লেগেছে। তারপর বলল, 'তুমি মানে, আপনি ইকনমিকসে এম এ পাশ করে এমন পাগলের মতো চেহারা করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন? তার ওপর তিনদিন খাননি। এখানেই বা এসে পড়ে থাকছেন কেন?'

আমি একটা খুব ম্লান হাসি হাসলুম। বললুম, 'আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর, আমার পাগল হয়ে যেতে আর বেশি বাকি নেই। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, আমি সাত দিন খাইনি। আর তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, আমার মতো অভাগা বিশ্বস্রষ্টারা মন্দিরে আসে একটু শান্তির জন্যে। অথচ, যেখানেই যাই সেখানেই বড়ো গোলমাল, বড়ো ঠেলাঠেলি, বড়ো নোংরামি। এই একটা মন্দির যেখানে চেঁচামেচি নেই, দর কষাকষি নেই। তপোবনের মতো এ জায়গাটা গম্ভীর, সংযত আর উদার। তাই এখানে আসি।'

চট করে চোখ তুলে দেখে নিলুম তিলোত্তমার মুখের রেখাগুলো নরম হয়ে এসেছে। হতেই হবে। আবার একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কী হয়েছে আপনার?'

আমি আবার সেই পাণ্ডুর হাসিটি দিলুম। বললুম, 'আপনি সেসব শুনে কী করবেন? সারাজীবন সুখে আর প্রাচুর্যের মধ্যে কাটিয়েছেন। আর আমার কপালে রুক্ষবেশী অলক্ষ্মী অচঞ্চলা হয়ে বসেছেন। এখন শুধু দিন গুনছি কবে তিনি মরণফাঁসিটি টানবেন। সেদিন বাঁচব।'

মুক্তোর মতো দাঁত বের করে হাসল তিলোত্তমা। বলল, 'আপনি ভাবছেন আপনার

চেয়ে দুঃখী এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই, তাই না? আপনার এই ধারণা কিন্তু ভুল। আপনি বলুন আপনার কথা, আমি শুনব।'

তারপর অনেক অনুরোধ-উপরোধ ইত্যাদির পর আমার জীবনকাহিনিটি বললুম। আহা, কী কাহিনি! হিন্দি সিনেমাওয়ালারা পেলে লুফে নিত। গল্পটা এরকম—

আমার বাবা ছিলেন গরিব স্কুলটিচার, সংস্কৃতের সেকেন্ড পণ্ডিত। আমরা থাকতুম গড়পারে, একটা ভাঙা বাড়ির একতলায় দুটো ঘর নিয়ে। আঠারো বছর বয়েসে যখন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করলুম তখন বাবা মারা গেলেন। বাড়িওয়ালা শ্রাদ্ধের পরদিন আমাদের ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। এ পর্যন্ত সত্যি ঘটনা। তারপর আমি মা আর ছোটোবোনকে নিয়ে গিয়ে উঠলুম মধ্য কলকাতার এক বস্তিতে। সারাদিন কখনো কুলিগিরি করে, কখনো ছোটো ছোটো মাল বিক্রি করে অতিকষ্টে সংসার চালাতে চালাতে ও রাস্তার আলোয় পড়াশুনো করে বি এ পাশ করলুম। তখন একটা চাকরি পেলুম একটা ওষুধের কারখানায়, কেরানির কাজ, অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে। পাঁচ-শো টাকা মাইনে— এত টাকা জীবনে কখনো দেখিনি। উত্তরপাড়ার একটা দু-কামরার ঘর ভাড়া করে সেখানে সবাই মিলে উঠে গেলুম। মা জোর করে ধরে বিয়ে দিলেন। বউ অত্যন্ত গরিবঘরের মেয়ে, বিধবার গলার কাঁটা, দেখতেও আহামরি কিছু নয়। তারপর কয়েকটা মাস কাটল স্বপ্নের মতো, সুখ আর আনন্দ যেন উপচে পড়তে লাগল। আমার ভাগ্য-অলক্ষ্মী আড়ালে হাসলেন। আঘাতটা এল হঠাৎ। আমাদের কারখানায় একদিন সন্ধে বেলায় ডাকাত পড়ল, আমাদের অ্যাকাউন্টেন্ট খুন হলেন, তিন লাখ টাকা লুঠ হল। পুলিশ এসে আমাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল। আমার অপরাধ আমি তখন পাশের ঘরে ওভারটাইম করছিলুম। মামলা শুরু হল, পুলিশ প্রমাণ করল যে আমি ডাকাতদলের গুপ্তচর। আমার আট বছর জেল হয়ে গেল। আমি জেল থেকে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে সংস্কৃত আর ইকনমিকসে এম এ পাশ করলুম। ভালো ব্যবহারের জন্যে আমার দু-বছরের সাজা মুকুব হল। ছাড়া পেলুম দিন দশেক আগে। উত্তরপাড়ায় গিয়ে শুনলুম, আমার মা না-খেতে পেয়ে রক্তবমি করে মরে গেছে, আঠারো বছরের বোনটা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। আমার একটা ছেলে হয়েছিল, সে পাঁচ বছর বয়েসে রাস্তায় খেলতে গিয়ে লরির তলায় চাপা পড়ে। তখন আমার স্ত্রী বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। দু-দিন বাদে গঙ্গায় তার মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়। ফলে, আজ আমি এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা, অসহ্য যন্ত্রণার স্মৃতি বুকে নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করছি। আমার জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে।

এহেন গল্প শুনলে চোখে জল আসবে না, পৃথিবীতে এরকম মেয়ে বোধ হয় কেউ নেই। তিলোত্তমারও তাই হল। কেবল উপাধ্যায়ের ভাবলেশহীন মুখ দেখে মনে হল না যে তাঁর কিছুমাত্র মানসিক বিকার ঘটেছে।

সজল কণ্ঠে তিলোত্তমা বলল, 'আপনার ধারণা জীবন শেষ হয়ে গেছে, তাই না? না, জীবন শেষ হয় না। প্রত্যেকদিন সকালে আমাদের নতুন জীবন শুরু হয়। আপনারও হয় এবং হবে। জ্যাঠামশাই, মন্দির ট্রাস্টের একটা পোস্ট তো খালি আছে, পূর্ণেন্দুবাবুকে ওই কাজটা দিন না। উনি চাকরিও করবেন, মন্দিরের দেখাশুনোও করবেন।'

উপাধ্যায় কঠিন গলায় বললেন, 'অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসদেয়ং ন কস্যচিৎ। অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে কখনো আশ্রয় দেবে না। তার ওপর...'

আমি কথাটা শেষ করে দিলুম, 'জেল খাটা আসামি। আশ্রয় তো দূরস্থান, তার মুখদর্শনও পাপ। দিদিমণি, আপনার চাকরি আপনারই থাক। আর, ওঁর যদি আপত্তি থাকে তাহলে কাল থেকে আমাকে আর দেখতেও পাবেন না। কেবল আপনার কাছে দুটো সহানুভূতির কথা শুনে গেলুম, এ স্মৃতিটি মৃত্যু পর্যন্ত মনে থাকবে। এবার তাহলে অনুমতি দিন।'

'না, দাঁড়ান।' বলল তিলোত্তমা, 'যাবেন না। জ্যাঠামশাই, ওঁর যদি কোনো অসুদ্দেশ্য থাকত তাহলে জেল খাটার অংশটুকু তো না বললেই পারতেন, তাই না? আর, অজ্ঞাতকুলশীল হবেন কেন? ওঁর গড়পাড়ের বাড়ির ঠিকানা আর অফিসের ঠিকানায় খোঁজ নিয়ে দেখুন যে উনি যা-যা বলেছেন তারমধ্যে কোনো ফাঁকি আছে কি না।'

যাক, বাঁচা গেল। গড়পারের ঠিকানায় তো কোনো অসুবিধেই নেই। আর আশা করি জয়গোপাল মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কস-এর প্রকাশ মহাজন আর অতুল সারদানা সবকিছু ঠিক ঠিক বলবে। আসলে ফ্যাক্টরিটা বড়োবাবুরই, হেরোইন আর কোকেনের বড়ি তৈরি করার গোপন জায়গা।

আমার বাসস্থান ঠিক হল উপাধ্যায়ের পাশের ঘরে। আমি স্নান করে দাড়ি কামিয়ে একটা হাতকাটা গেঞ্জি আর পাজামা পরে খাটে শুয়েছিলুম খাওয়া-দাওয়ার পর। তিন দিন উপবাসের পর ভোজনটি মন্দ হল না। হঠাৎ দু-জনের পায়ের আওয়াজ শুনলুম। তাড়াতাড়ি একটা সঞ্চয়িতা খুলে মুখের সামনে ধরলুম। গভীর মনোযোগ। দরজা খোলাই ছিল। পর্দা সরিয়ে প্রথমে ঘরে ঢুকলেন উপাধ্যায়, তাঁর পেছনে তিলোত্তমা। আমি যেন হঠাৎ টের পেলুম, এইরকম ভাব করে বইটা তক্তপোশের ওপর ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালুম।

তিলোত্তমা একনজরে বইটা দেখল, তারপর আমার দিকে তাকাল। এক মুহূর্তের জন্যে হলেও ওর চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সে চোখে বিস্ময় এবং আরও একটা কিছু। বিকেল বেলার নোংরা, ছেঁড়া জামাকাপড় পরা, উসকোখুসকো চুলদাড়িওলা, পগলের মতো চেহারার লোকটার ভেতর থেকে যে এরকম একটা কিছু বেরিয়ে আসতে পারে, সেটা যে সে ভাবতেই পারেনি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমাদের দু-জনের চোখ সেই এক মুহূর্তের জন্যে আটকে গেল। তার পরেই চোখ নামিয়ে তিলোত্তমা জিগ্যেস

করল, 'আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?' আমি যেন ওর গলায় একটা অতিক্ষীণ কম্পন শুনতে পেলুম।

আমি প্রবল বিনয়ের সঙ্গে বললুম, 'না দিদিমণি। কিচ্ছু না। উপাধ্যায়মশাই ভাঁড়ার থেকে জামাকাপড় দিয়েছেন, খাওয়াও খুব ভালো হয়েছে। আমি কাল থেকে কাজ শুরু করব।'

'ভালো!' বলে হঠাৎ ঘুরে তিলোত্তমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পেছনে পেছনে আষাঢ়ের মতো মুখ করে গেলেন উপাধ্যায়।

পায়ের শব্দ শুনে বুঝলুম দু-জনে গিয়ে ঢুকলেন পাশের ঘরে। দেওয়ালে কান লাগিয়ে শুনলুম তিলোত্তমা বলছে, 'আপনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন, জ্যাঠামশাই। আমি তো লোকটির কোনো বদ মতলব দেখতে পাচ্ছি না। যাহোক, আপনি খোঁজখবর তো নিন। আর তা ছাড়া, ভুলে যাচ্ছেন কেন যে, আমার কোনো বিপদ হতে পারে না।'

উপাধ্যায় বললেন, 'তোমার এই অদ্ভুত ধারণাটা আমি ভুলে যাওয়ারই চেষ্টা করি, মা।'

তিলোত্তমা হেসে উঠল। সেই হাসির শব্দ বুকে নিয়ে আমি খুশি খুশি মনে ঘুমোতে গেলুম। কেবল একটা কথা খচখচ করতে লাগল। তিলোত্তমার কোনো ক্ষতি হতে পারে না কেন? —এ কথার অর্থ কী?

এরপর দু-দিন আমি শুধু অফিস আর ঘর, ঘর আর অফিস করলুম। দ্বিতীয় দিনে দেখি উপাধ্যায়ের মুখে মেঘ খানিকটা কেটেছে। সেদিন রাত্রে আবার পাশের ঘরে কথোপকথন শুনলুম। উপাধ্যায় বলছিলেন, 'ছেলেটি সত্যি কথাই বলেছে, মা। তবু বলব, আমাদের সাবধানে থাকা দরকার। জেলে কতরকম লোকের সংস্পর্শে এসেছে তার তো ঠিক নেই।'

তিলোত্তমা আবার হেসে উঠল। বলল, 'সীতার অগ্নিপরীক্ষার মতো কোনো ব্যাপার করবেন না কি? কী জানেন জ্যাঠামশাই, যারা আমাদের সহানুভূতি আর সমবেদনা পেলে সুস্থ-সুন্দর মানুষ হয়ে উঠতে পারত, তাদেরই আমরা ঘৃণা করে সরিয়ে দিই। তারা বেঁচে মরে থাকে।'

কিন্তু শুধু সহানুভূতি আর সমবেদনায় তো আমার কাজ চলবে না। ডাইরেক্ট অ্যাকশন চাই। এই দু-দিনে সেই প্ল্যানটা ঠিক করে নেওয়া গেল। তিলোত্তমার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার একটা সময়সূচি করে ফেললুম। দেখলুম সে খুব ভোরে ওঠে। সূর্য ওঠার একটু পরে সে স্নান করে নীচে নেমে আসে। আমাদের ঘরের পেছনে একটা বেশ বড়ো ফুলের বাগান আছে, সেখানে কিছুক্ষণ বেড়ায়, ফুল তোলে। পুরুতমশাই এলে যায় মন্দিরে। গেট খোলার আগে পুজো করে ফিরে আসে। তারপর ওপরে চলে যায়। কাগজপত্র সই করানোর জন্যে উপাধ্যায় ওপরে যায়। আর কারুর ওপরে যাওয়ার অধিকার নেই। শুনলুম, সারাদিন তিলোত্তমা নাকি হয় পুজোআচ্চা করে নয়তো লাইব্রেরি ঘরে বসে

পড়াশুনো করে। উপাধ্যায়ের আদেশে রাত ন-টার মধ্যে আমাদের শুয়ে পড়তে হয় কিন্তু দেখেছি অনেক রাতেও তিলোত্তমার ঘরে আলো জ্বলে।

সকাল থেকেই শুরু করা গেল প্ল্যানের প্রথম পর্ব। তিন-চার দিন বাদে একদিন ভোর বেলা সিন্ধু ভৈরবীতে বাঁধা একটা মীরার ভজন গাইতে শুরু করলুম। জানলার-পরদাটা সামান্য ফাঁক করে রাখলুম তিলোত্তমার ওপর গানের এফেক্টটা কী হয় দেখবার জন্যে। আমার গলা ভালো, বড়োবাবুর কৃপায় ওস্তাদ বাদল মিঞাঁর কাছে রীতিমতো তালিম নিয়েছি। দেখলুম, গান শুরু হতেই তিলোত্তমা একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল গানটা কোত্থেকে আসছে। তারপর যেন ওর বেড়ানোর একটা ছন্দপতন ঘটল। একটু ইতস্তত ঘুরল, দু-একটা ফুলগাছের সামনে দাঁড়াল, তারপর একটা বকুলগাছের নীচে একটা বেদির ওপর মাথা নীচু করে বসে পড়ল। স্থির অকম্পিত দেহে আমার গান শুনতে লাগল। আর দেখলুম, ওর এমনিতে ফ্যাকাশে মুখে যেন রঙের ছোঁয়া লেগেছে। কান দুটো লাল হয়ে উঠেছে। একটু বাদে একটি কাজের মেয়ে এসে কী যেন বলল। বোধ হয় বলল যে পুরুতমশাই অপেক্ষা করছেন। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠে ফুলের সাজিতে যেমন-তেমন কতগুলো ফুল তুলে তাড়াতাড়ি বাগান ছেড়ে চলে যায়। আমি অবশ্য গানটা চালিয়েই গেলুম তার পরেও বেশ কিছুক্ষণ ধরে।

বুঝলুম, ওষুধ ধরতে শুরু করেছে। এরপর চার-পাঁচ দিন এই গানই চলল। কখনো আহীর ভৈরো, কখনো ললিত, কখনো-বা বিভাস। রোজ সেই এক দৃশ্য। বকুলগাছের নীচে শ্বেতপাথরের মূর্তির মতো তিলোত্তমা। ভাগ্যিস রোজ এই সময়ে উপাধ্যায় গঙ্গাস্নানে যান। তিনি থাকলে যে কী হত কে জানে!

এরপর প্ল্যানের দ্বিতীয় পর্ব। দূরত্বটা সরিয়ে দিয়ে কাছাকাছি আসার প্রচেষ্টা। মালিদের সঙ্গে কথা বলাই ছিল। একদিন কাকভোরে উপাধ্যায় গঙ্গাস্নানে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে আমি একটা খাকি শর্টস পরে খালি গায়ে একটা কোদাল কাঁধে বাগানে বেরিয়ে গেলুম আর মাটি কোপানো শুরু করলুম। যখন সূর্য উঠল, ততক্ষণে আমার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে চকচক করছে, সব ক-টা মাসল অবলীলায় খেলে বেড়াচ্ছে। তিলোত্তমার আসার পথের দিকে পেছন করে আমি একমনে মাটি কোপাতে লাগলুম। একটু বাদে শুকনো পাতার ওপর লঘু পায়ের শব্দ আর দামি সাবানের মৃদু সুবাসে বুঝতে পারলুম যে সে এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে। কয়েকটি রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত। তার পরেই আমি যেন হঠাৎ টের পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালুম। দেখলুম, ফুলের সাজি হাতে বিস্ফারিত চোখে তিলোত্তমা আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা ক্ষুধিত বাঘিনীর মতো তার রক্তিম মুখ, নিষ্পলক দু-চোখে চকচক করছে লোলুপ দৃষ্টি।

আমি খুব অল্পসময় সেই দৃশ্যটা উপভোগ করে বলে উঠলুম, 'আরে দিদিমণি, আপনি

কখন এলেন? দেখিনি তো।'

আমার প্রশ্নের জবাব পেলুম না। তিলোত্তমা চটকা ভেঙে একটু কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, 'একী? এ আপনি কী করছেন? মালিরা নেই?'

আমি আমার খ্যাতনামা রমণীমোহন হাসিটি হেসে বললুম, 'থাকবে না কেন? তবে ওদের আসতে একটু দেরি আছে, আমি ওদের কাজটা একটু এগিয়ে রাখছি। এতে স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে, মনও ভালো থাকবে। জানেন, জেলে থাকার সময় আমি বাগান করা শিখি। আমি শান্তশিষ্ট হয়ে থাকতুম বলে বোধ হয় ওরা আমাকে কঠিন কাজ না-দিয়ে বাগানের কাজ দিয়েছিল। আজ আমি এ-কাজে কিন্তু এক্সপার্ট।'

'আপনি জেলের কথা ভাবেন কেন? ও কথাটা ভুলে যান। মনে করুন, ও জীবনটা ফেলে এসেছেন চিরকালের জন্যে। মন ভালো করতে বই পড়েন না-কেন?'

'ভালো বই পাব কোথায়? এদিকে ধারে-কাছে কোথাও লাইব্রেরি আছে বলে জানি না।'

'লাইব্রেরি আছে। এ-বাড়িতেই আছে। আমার ঠাকুরদার আর বাবার কালেকশন। আমার পুজো হয়ে গেলে ওপরে যাব যখন, তখন আসবেন। আপনাকে দেখিয়ে দেব। আপনি যত খুশি বই ওখান থেকে নিয়ে পড়ুন, কিন্তু এসব কাজ করবেন না।'

'আপনি বারণ করলে কখনো করব না, দিদিমণি। তবে আমার যে বাগান করতে খুব ভালো লাগে।'

'বেশ, তাহলে করুন। আর শুনুন, আমাকে দিদিমণি বলে ডাকবেন না। ইয়ে, উত্তমাদি বলে ডাকবেন।'

'আচ্ছা উত্তমাদি, তাই হবে।'

সেদিন সারাদিন আমি ওপরে যাওয়ার কোনো চেষ্টাই করলুম না। বিকেলের দিকে নামল তুমুল বৃষ্টি। কালিদাস বলেছেন, মেঘ দেখলে যিনি সুখী ব্যক্তি, তিনিও উদাস হয়ে পড়েন। কথাটা দেখলুম সত্যি। হঠাৎ উপাধ্যায়মশাই-এর কী যে হল, আমাকে ডেকে বললেন, 'এই যে পূর্ণেন্দু, শুনলুম তুমি নাকি খুব ভালো গান গাও। তা একটা বর্ষার গান শোনাও না।'

আমি তৎক্ষণাৎ রাজি। বারান্দায় বসে ধরলুম মিঞাঁ-কি মলহার। পুরো খেয়াল। চোখ বুজে গান গাইছিলুম। মাঝে একবার চট করে চোখ খুলে দেখে নিলুম সামনের উঠোনে দোতলার দরজার আলো এসে পড়েছে আর তার মধ্যে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি নারীমূর্তির ছায়া। আর দেখার দরকার ছিল না। তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ করে ফেললুম। সে রাত্রে খুব তাড়াতাড়ি দোতলার আলো নিভে গেল।

তার পরদিন দেখি উপাধ্যায়ের মুড খুব ভালো। হেসে ছাড়া কথাই বলছে না। অফিসের বাকি দু-জন কেরানিকে আমার গানের খুব প্রশংসা করলেন। এর মধ্যে বিকেল

বেলা তিলোত্তমার কাজের মেয়েটি অফিসঘরে এসে আমাকে বলল, 'তোমাকে দিদিমণি ডাকতেছেন গো। এখুনি একবার ওপরে যাও।'

আমি উঠে দাঁড়ালুম। তৎক্ষণাৎ ঘরের মধ্যে বজ্রনির্ঘোষ শুনলুম, 'দাঁড়াও। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।' তাকিয়ে দেখি উপাধ্যায়ের মুখে আবার আষাঢ়ের মেঘ, তবে এবারেরটা আরও ঘন।

আমরা দু-জনে একসঙ্গে দোতলায় উঠলুম। দেখি লম্বা বারান্দার একপ্রান্তে একটা দরজার সামনে তিলোত্তমা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদের দেখে কুন্দদন্ত বিকশিত করে বলল, 'এ কী জ্যাঠামশাই! আপনাকেও ডেকে নিয়ে এল নাকি?'

আষাঢ়ের মেঘের ভেতর থেকে গুরুগম্ভীর স্বর বেরুল, 'না, আমি নিজেই এসেছি।'

'আপনার কোনো দরকার নেই, জ্যাঠামশাই, আপনি নীচে যান। আমি পূর্ণেন্দুবাবুকে ওপরে ডেকেছি বাবার লাইব্রেরিটা দেখাব বলে।' বলে দরজাটা খুলে আমাকে বলল, 'আসুন।'

উপাধ্যায় আর এগুতে গিয়েও এগোলেন না। একটা বাচ্চা ছেলের মতো রাগী আর অভিমানী মুখ করে একজায়গায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

লাইব্রেরিটা সত্যিই দেখবার মতো। তিলোত্তমা চঞ্চল পায়ে ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগল। ওর গলার স্বর, কথা বলার স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্যের বদলে কোথায় যেন একটা চাপল্যের ছোঁয়া লাগল। এমনকী একটা বই আলমারি থেকে নামিয়ে সেটা খুলে আমাকে, 'দেখুন, দেখুন, এই লেখাটা দেখুন।' বলে যখন ডাকল, আমি ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে বইটা দেখার ছলে ঘনিষ্ঠ হয়ে কাছে এগিয়ে গেলেও, সে সরে গেল না। আবার দেখলুম মুখে রক্তাভা, বুকের ঘনঘন ওঠা-পড়া।

আমি বইটা হাতে নিয়ে বললুম, 'চমৎকার। এটা আমি নিই?'

তিলোত্তমা ঘাড় কাত করল কিন্তু কোনো শব্দ করল না। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। দেখি উপাধ্যায় এক জায়গায়, একভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। উনি আমার হাতের বইটা আড়চোখে দেখলেন। তারপর আমরা দু-জনে একসঙ্গে নীচে নেমে গেলুম।

বড়োবাবু ঠিকই বলেছিলেন, তিলোত্তমার মতো মেয়েকে ভাঙতে হলে তিন জায়গায় আঘাত হানা দরকার— শরীরে, মনে আর বুদ্ধিবৃত্তিতে। সে কর্মটি বেশ সুচারুরূপে করা গেছে বলেই মনে হচ্ছে। ওই শুভ্র, কঠিন আর পবিত্র অভ্রংলিহ মূর্তিটা দিব্যি নড়বড়ে হয়ে এসেছে। এবার একটা ঠেলা দিলেই হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে পড়বে, তাতে সন্দেহ নেই।

তবুও, আরও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করা দরকার। সাবধানের মার নেই। সেই কারণে পরদিন সকালে বাগানে তিলোত্তমার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে জিগ্যেস করলুম, 'আপনি যে একেবারে একা দোতলায় থাকেন, আপনার ভয় করে না?'

তিলোত্তমা হেসে উঠল। বলল, 'ভয় করবে কেন? নীচেই তো আপনারা আছেন। তা

ছাড়া, আমার মনে হয় ঘরের মধ্যে একটি কাজের মেয়েকে নিয়ে শোওয়ার চেয়ে একা শোওয়া অনেক বেশি নিরাপদ।'

'তাহলেও, একটা দারোয়ান যদি বারান্দায় শুয়ে থাকত—'

'কোনো দরকার নেই। তা ছাড়া, দোতলায় কেউ শুতে চায় না। ওদের নাকি ভয় করে।'

এবার আমার হাসির পালা। বললুম, 'খুব সাহস আপনার, না?'

ছেলেমানুষের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে তিলোত্তমা বলল, 'খুব।' বলে এমনভাবে হাত নাড়ল যে সেই হাত আমার নগ্ন বুকের ওপর দিয়ে যেন ওর অজান্তেই বুলিয়ে গেল।

এরপর প্রায় এক মাস ধরে চলল আমার গান, সকালে একসঙ্গে বাগানে বেড়ানো, লাইব্রেরির বই এনে পড়া। আমি দোতলায় যায় বিকেল বেলা যখন অনেক সময়ই তিলোত্তমা সেখানে থাকে না। ধীরে ধীরে উপাধ্যায়ের মুখের মেঘ আবার কেটে যেতে লাগল, কারণ বাহ্যত তিলোত্তমা আর আমার মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক আর সেইরকম দূরত্বই তিনি দেখতে লাগলেন। অথচ, তাঁর চোখের আড়ালে আমাদের ঘনিষ্ঠতা যে বেড়েই যাচ্ছে, সেকথা তিনি বুঝতেই পারলেন না। আমি ইতিমধ্যে তিলোত্তমার ছোটোবেলা থেকে বিয়ের আগে প্রায় সব ঘটনাই শুনে ফেলেছি। তার পরের কোনো ঘটনা শুনিনি ঠিকই, কিন্তু এটুকু শুনেছি যে সে অংশটা নিষ্ঠুর দুঃখের। দু-টি দুঃখী হৃদয় কাছাকাছি এসেছে। মাঝে মাঝে এই দুঃখেরও যে শেষ হতে পারে, ভবিষ্যতে যে সুখ থাকতে পারে, এহেন আভাস-ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। এমনকী আমাকে পুনরায় বিবাহ করতে অনুরোধ করা হয়েছে এবং যে আমাকে বিয়ে করবে সে যে একটি অত্যন্ত ভাগ্যবতী মেয়ে সে কথাও বলা হয়েছে।

অবশেষে একদিন সকালে বাগানে বেড়ানোর সময় বললুম, 'আপনি কেবল আমাকে বলেন কেন? আপনারই কি জীবন শেষ হয়ে গেছে? কেন আপনি এই দুঃখের বোঝা বয়ে বেড়াবেন? কেন আপনি নতুন করে জীবন শুরু করছেন না?'

তিলোত্তমা ফিকে হাসল। বলল, 'দূর! আমি তো বুড়ি হয়ে গেছি।'

'উত্তমাদি, আপনি বুড়ি? হায় ভগবান! আপনি আমার চেয়ে অনেক অনেক ছোটো, কিন্তু কই আমি তো নিজেকে বুড়ো বলে ভাবি না। আপনাকে যখনই দেখি, কি মনে হয় জানেন? "কাহারে হেরিলাম, সে কি স্বপ্ন, সে কি মায়া, একি অনিন্দ্যসুন্দর কায়া?" আমার যদি সামর্থ্য থাকত, এই সম্পত্তি আর বৈধব্যের জাঁতাকল থেকে আমি আপনাকে জোর করে তুলে নিয়ে যেতুম। বাইরে। আলোয়, মুক্তিতে।'

তিলোত্তমার মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল। চাপাগলায় বলল, 'কে বলেছে তোমার সামর্থ্য নেই?' বলেই হঠাৎ দ্রুত চঞ্চল পায়ে মন্দিরের দিকে চলে গেল।

সে রাত্রে তুমুল বৃষ্টি নামল। ঘনঘন বাজ পড়ার শব্দে চারদিক যেন কেঁপে উঠতে

লাগল। আমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলুম। তাড়াতাড়ি শুয়েও পড়লুম। একটু বাদে দেওয়ালে কান লাগিয়ে শুনি উপাধ্যায়মশাই-এর প্রবল নাক ডাকা শুরু হয়ে গেছে। বুঝলুম, আর দেরি করা ঠিক নয়। আজি রজনীতে হয়েছে সময়।

তৈরি হতে বেশিক্ষণ লাগল না। পাজামার তলায় একটা পায়ের সঙ্গে ইলাস্টিক ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে নিলুম একটা লিকলিকে ছুরি— স্টিলেটো। অন্য পায়ে বাঁধলুম একটা ক্লিপ ড্যাগার। কোন হাতে কখন কোনটা লাগে বলা তো যায় না। পাঞ্জাবির এক পকেটে নিলুম একটা মুখ বাঁধার স্টিকিং প্লাস্টার আর বড়ো একখণ্ড কাপড়। অন্য পকেটে রইল হাত দেড়েক লম্বা সরু একটা নাইলনের দড়ি। তারপর লাইব্রেরি থেকে আনা যে বইটা তখন পড়ছিলুম সেটা হাতে নিয়ে ওপরে রওনা হলুম। একটা ব্যাপারে অন্তত নিশ্চিত ছিলুম যে আমার আজকের এই নৈশ অভিসারের কথা কারুর পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

দোতলায় উঠে দেখি তিলোত্তমার ঘরে তখনও আলো জ্বলছে, দরজা বন্ধ। ভালোই হল। আমি পা টিপে-টিপে ওর ঘরটা পার হয়ে লাইব্রেরি ঘরের দরজাটা ইচ্ছে করে একটু শব্দ করে খুলে ভেতরে ঢুকলুম আর আলোটা জ্বালিয়ে দিলুম। তার একটু পরেই তিলোত্তমার ঘরের দরজা খোলার শব্দ পেলুম। তৎক্ষণাৎ আমি পিছন ফিরে বইটা আলমারিতে রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিলোত্তমা দরজায় এসে দাঁড়াল। আমাকে দেখে কম্পিত গলায় বলল, 'এ কী, তুমি? মানে, আপনি? এত রাতে?'

আমি নতমস্তকে বললুম, 'বইটা রাখতে এসেছিলুম উত্তমাদি। আমি কাল ভোরে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

তিলোত্তমার দু-পা ভেতরে ঢুকে এল। বলল, 'সে কী? কেন?'

'আমি ভীষণ পাপ করেছি, উত্তমাদি। যিনি আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে তুলে এনেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, সমবেদনা আর সহানুভূতি দিয়ে আমার দুঃখ মেটাবার চেষ্টা করেছেন, আমি, এই আমি তাঁর সম্পর্কে কুচিন্তা করেছি। এ বাড়িতে তারপর আমার আর থাকার অধিকার নেই। নরকেও স্থান হবে না আমার।'

তিলোত্তমা আরও দু-পা এগিয়ে আমার বুকের সামনে এসে দাঁড়াল। মৃদু হেসে বলল, 'কুচিন্তা করেছ? আমার সম্পর্কে? বলো না, কী চিন্তা করেছ? বলো না?'

'না উত্তমাদি, সে আমি বলতে পারব না।'

'উত্তমাদি নয়, বলো তিলোত্তমা।'

আমি তৎক্ষণাৎ প্রবল আলিঙ্গনে ওকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলুম, 'তিলোত্তমা, তিলোত্তমা...'

কিন্তু আমার মনে তখন একটা সমস্যা। এ অবস্থায় আমি এক্ষুনি তিলোত্তমাকে খুন করে ফেলতে পারি, একটা শব্দও করার সুযোগ পাবে না। তারপর চাবিটা হস্তগত করা

কোনো ব্যাপারই নয়। সেটাই করব? না, আগে এমন সুন্দরী মেয়েটাকে উপভোগ করে নেব? তারপরে মারব? নাকি হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলে রেখে যাব যাতে সকালে এসে সবাই সে অবস্থায় ওকে দেখতে পায়? তখন মজাটা আরও জমবে। মনে হল, শেষ প্রস্তাবটাই সবচেয়ে ভালো— সবাই দেখুক পবিত্রতার কী হাল হতে পারে। তখন আমি দু-হাতে ওকে কোলে তুলে নিয়ে শোওয়ার ঘরের দিকে রওনা দিলুম।

তিলোত্তমা আমার হাতের ওপর নববধূর মতো থরথর করে কাঁপতে লাগল আর বিড়বিড় করে কীসব যেন বলতে লাগল। ওসব আমি আজকাল আর শুনি না, সব মেয়েই দেখেছি এরকম সময়ে একই কথা বলে।

ওকে নিয়ে শোওয়ার ঘরে এসে খাটের সামনে ওকে দাঁড় করিয়ে দিলুম। প্রথমেই শুইয়ে দিলে ব্যাপারটা রসিয়ে-রসিয়ে খেলানো যাবে না। তারপর ওর বুকের আঁচলটা নামিয়ে দিয়ে একটা মুগ্ধ মুখভঙ্গি করে বললুম, 'তিলোত্তমা, তুমি সত্যিই তিলোত্তমা।'

এরকম একটা বোকা বোকা কথা শুনেও তিলোত্তমা রেগে গেল না। বরং লজ্জারুণ মুখ তুলে আধবোজা চোখে বলল, 'দরজাটা। দরজাটা বন্ধ করে দাও, প্লিজ।' বলে দরজার দিকে তাকিয়েই একটা আর্তনাদ করে উঠে তাড়াতাড়ি আঁচলটা বুকে তুলে দিল।

আমার প্রথমেই মনে হল বন্দুক হাতে উপাধ্যায় দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি একটু সামনে ঝুঁকে, যাতে চট করে পা থেকে একটা ছুরি খুলে নিতে পারি, দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ালুম। হরি হরি। কোথায় উপাধ্যায়? দেখি বছরতিনেকের একটা ফর্সা গোলগাল মেয়ে ঘরে ঢুকছে। মেয়েটি নিষ্পাপ মুখ, একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, বড়ো বড়ো কালো চোখ আর পরনে একটি কুটোও নেই।

এ আবার কে রে বাবা? কার মেয়ে? আমি সহাস্যে তিলোত্তমার দিকে চেয়ে বললুম, 'এ কে?'

তিলোত্তমা কিন্তু হাসল না। নিষ্পলক বিস্ফারিত চোখে মেয়েটির দিকে চেয়ে বলল, 'ও শিখা, ও শিখা।'

শিখা আবার কে? ওর নাম হওয়া উচিত ছিল ঝামেলা। দেখি, ওকে এখন তাড়ানো যায় কি না। এইভেবে আমি বাচ্চাটির কাছে গিয়ে নীচু হয়ে ওর মুখের কাছে মুখ এনে বললুম, 'খুকি! এই বিত্তির মধ্যে নাংতু হয়ে ঘুরতে নেই। যাও তো মা, ঘরে যাও।' বলতেই মেয়েটি হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আমার চুলের মুঠি ধরে আমাকে পাশের দেওয়ালে আছড়ে ফেলল। ব্যাপারটা এমন আচম্বিতে হল যে আমার মুখ থেকে একটা শব্দও বেরুল না। আমার মাথা ঝনঝন করে উঠল, আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে অনড় হয়ে পড়ে রইলুম।

তখন শুনতে পেলুম তিলোত্তমার চাপা গলার হাহাকার, 'তুই কেন এলি? আজ কেন এলি? তোর বাবা যখন আমার গলা টিপে মারতে গিয়েছিল তখন আমি মনে মনে তোকে

ডেকেছিলুম, তুই এসেছিলি। গুণ্ডাগুলো যখন আমায় ধরতে এসেছিল, তুই এসেছিলি। ওই দৈত্যটা যখন এসেছিল, তখনও এসেছিলি। কিন্তু আজ কেন? ও তো আমার কোনো ক্ষতি করতে আসেনি। ও তো আমার কোনো অনিষ্ট করতে চায় না। তবে কেন? তোর জন্যে কি আমি একটু সুখের মুখও দেখতে পাব না?'

মেয়েটি তার নিষ্পাপ বড়ো বড়ো চোখে তিলোত্তমার কথা শুনল, একটি শব্দও করল না। তারপর হঠাৎ আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার একটা ঠ্যাং ধরে অবলীলাক্রমে আমার বিশাল শরীরটা টানতে টানতে তিলোত্তমার পায়ের কাছে ফেলে দিল। বিনাবাক্যব্যায়ে আমার পাজামার দুটো পা আমার হাঁটুর ওপর তুলে দিল। ছুরিদুটো বেরিয়ে পড়ল। এইবার তিলোত্তমার দ্বিতীয় বার আর্তনাদ করার পালা। বাচ্চা মেয়েটা অতঃপর আমার পাঞ্জাবির দু-পকেট থেকে অন্যান্য জিনিসপত্রগুলো বের করে তিলোত্তমার সামনে ফেলে দিল। তিলোত্তমা তখন একটা প্রবল কান্নায় খাটের ওপর ভেঙে পড়ল।

আমি দেখলুম এটাই শেষ সুযোগ। কোনোরকমে একটু খাড়া হয়ে বসে বিদ্যুদ্বেগে স্টিলেটোটা টেনে নিয়ে বাচ্চাটার গলা লক্ষ্য করে চালালুম। সেটা যেন আগে থেকেই তার জানা ছিল। সে চট করে আমার কবজিটা ধরে এমন একটা মোচড় দিল যে আমি অসহ্য যন্ত্রণায় খাড়া হয়ে উঠলুম। কী কষ্টে যে চিৎকারটা আটকালুম সে শুধু আমিই জানি। কেবল আমার গলা থেকে একটা বিকৃত আওয়াজ বেরুল, 'এটা কে তিলোত্তমা, এটা কে?'

ততক্ষণে বাচ্চাটা আমাকে দরজার দিকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। তারই মধ্যে শুনতে পেলুম আমার প্রশ্নের উত্তর, 'ও আমার মেয়ে। শিখা।'

তিলোত্তমার মেয়ে? সে কোথায় ছিল এতদিন? আমার চিন্তা সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে। আমার নাক-মুখ দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে। আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? দরজার সামনে দাঁড় করাল। বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আমার সর্বাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা। আমি পালাতে চাই, এখান থেকে পালাতে চাই। হঠাৎ আমার পেছনে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগল। মনে হল যেন দশটা ঘোড়ার লাথি একসঙ্গে এসে পড়ল। আমি ছিটকে বারান্দা দিয়ে শূন্যে এসে পড়লুম। আমার তপ্ত শরীরে ঠান্ডা বৃষ্টির ধারা অমৃতরসের মতো লাগল। হঠাৎ মনে পড়ল, তিলোত্তমার মেয়ে? বড়োবাবু তো বলেছিলেন সে প্রায় সাত বছর আগে মরে গেছে। বড়োবাবু তো মিথ্যে কথা বলেন না। বড়োবাবু দেবতা। নীচের জলে ভেজা পিচের রাস্তাটা বিদ্যুদ্বেগে আমার দিকে উঠে আসছে। ওখানেই হায়দার পড়েছিল না? আমিও সশব্দে ওখানেই গিয়ে পড়লুম। মট করে আমার ঘাড়টা ভেঙে গেল।

সংহারক সারমেয়

উদয়গড় থানার ওসি বিজয় চৌধুরির সামনে ধুতি-পাঞ্জাবি আর গরম জহরকোট পরা একজন নিতান্ত নিরীহ দর্শন মাঝবয়সি ভদ্রলোক বসেছিলেন। অত্যন্ত সন্ত্রস্তভাবে ভদ্রলোকটি তাঁর বক্তব্য বলতে শুরু করলেন, 'আমার নাম অরিন্দম ঘোষাল, এই কাছেই বৃন্দাবন গোস্বামী লেনের বাইশ নম্বর বাড়িতে থাকি। আমি আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।'

বিজয় চৌধুরি একটা মস্ত বড়ো হাই তুলে বললেন, 'কীসের অনুরোধ?'

'ইয়ে মানে, ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। তাই কীভাবে বলব, বুঝতে পারছি না।'

'খুলে বলুন, তাহলেই হবে।' বলে বিজয় চৌধুরি কানে একটা পেনসিল ঢুকিয়ে সেটা ঘোরাতে শুরু করলেন।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ, তাই বলছি। মানে, আমার অনুরোধটা ওই কুকুরটা সংক্রান্ত আর কী।'

বিজয় চৌধুরি এবার সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, 'কুকুরটা? কোন কুকুরটা?'

'ওই তো যেটাকে বাংলা পত্রিকা "সংহারক সারমেয়" নাম দিয়েছে।'

পেনসিলটা খটাস করে টেবিলের ওপর ফেলে বিজয় চৌধুরি বললেন, 'বলেন কী? ওটাকে আপনি দেখেছেন নাকি? কোথায় দেখেছেন? কবে?'

মাথা নেড়ে অরিন্দম বললেন, 'না না, আমি ওটাকে কোনোদিন দেখিনি। তবে ওই কুকুরটাকে নিয়েই আমার একটা অনুরোধ আছে। আর তা হল, তার পরের শিকারকে আপনারা বাঁচান।'

'তার পরের শিকার কে তা আপনি জানেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি হলেন নিউ ট্যাংরাবাজার রোডের পূর্বাচল অ্যাপার্টমেন্টসের সতেরো নম্বর ফ্ল্যাটের শ্রী কমলেশ্বর নন্দী।'

'এঁকে আপনি চিনলেন কী করে?'

'আমি এঁকে চিনি না।'

'অ!' বলে বিজয় চৌধুরি আবার পেনসিলটা তুলে নিলেন। বললেন, 'আপনি কুকুরটাকে কোনোদিন দেখেননি, কমলেশ্বর নন্দীকে চেনেন না, অথচ কুকুরটা এবার ওই ভদ্রলোকটিকেই মারবে, সেটা আপনি জানেন। কী করে জানলেন?'

'দেখুন, সেটা আমি বলতে পারব না। কারণ, বললে আপনি হাসবেন, আমার কথায় গুরুত্ব দেবেন না। তবে যে-ভাবেই হোক, আমি জানতে পেরেছি। এর আগে কুকুরটা যে তিনজনকে মারে, তাদের খবরও আমি পেয়েছিলুম। প্রথমটা পাত্তা দিইনি। দ্বিতীয়টা ভেবেছিলুম কাকতালীয় ব্যাপার। কিন্তু তৃতীয়টা যখন মিলে গেল, তখন আর ব্যাপারটা হালকাভাবে নেওয়া গেল না। তাই বিবেকের তাড়নায় আপনার কাছে ছুটে এসেছি।'

বিজয় চৌধুরির পেনিসিল ইতিমধ্যে আবার তাঁর কানে ঢুকে গেছে। সেটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, 'তা বেশ করেছেন, অরিন্দমবাবু। আপনি বাড়ি যান। আমরা যা করবার, ঠিক করব।' বলে আবার প্রকাণ্ড একটা হাই তুললেন।

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অসিতবরণ আইচের ঘরে কথা হচ্ছিল। বিজয় চৌধুরি বলছিলেন, 'আমি তো স্যার লোকটাকে পাত্তাই দিইনি। ভেবেছিলুম আর একটা পাগল। আর না-ভেবেই বা কী করব স্যার? প্রত্যেকদিনই তো সমস্ত থানায় তিন-চারজন করে এই 'সংহারক সারমেয়' আর তার মালিকদের খোঁজ নিয়ে আসছে। সব ক-টা উন্মাদ। তবে, আমার কপাল ভালো যে আমার থানায় এরকম যারা আসে তাদের প্রত্যেকের নাম-ঠিকানা আর বক্তব্য আমার ডায়েরিতে লিখে রাখি। নইলে স্যার, হয়তো এই অরিন্দম ঘোষালকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না।'

অসিতবরণ বললেন, 'এই অরিন্দম ঘোষাল সম্পর্কে কী খোঁজখবর পেলে?'

বাইশ নম্বর বৃন্দাবন গোস্বামী লেনে থাকেন। স্ত্রী আর এক ছেলে নিয়ে সংসার। জন্মেছেন ঢাকায়, সেখানেই বড়ো হয়েছেন। বাইশ বছর বয়সে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে এমএ পাশ করে আটাত্তর সালে কলকাতায় চলে আসেন। এখন ব্যাঙ্ক অব কেরালায় চাকরি করেন। বয়েস চুয়াল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ। ভদ্রলোক কুকুর পোষেন না। ওঁর স্ত্রী কোনোরকম জীবজন্তুই পছন্দ করেন না। পাড়ার লোক সকলেই একবাক্যে বলেছে ভদ্রলোক অত্যন্ত ভালোমানুষ। কারুর সাতে-পাঁচে নেই। পলিটিকসে নেই। তাঁর কোনো শত্রু আছে সেরকম কোনো সম্ভাবনার কথাই কেউ ভাবতে পারে না। তবে ওঁর স্ত্রী কিন্তু একেবারে অন্যরকম। তিনি প্রচণ্ড ঝগড়াটে, অভব্য এবং রেগে গেলে মাথার ঠিক থাকে না। ভদ্রলোক নাকি প্রায় রোজই তাঁর স্ত্রী হাতে বেধড়ক মার খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলির মোড়ে চায়ের দোকানে গিয়ে বসে থাকেন। শুধু উনিই নন, পাড়ার আরও কয়েক

জন ভদ্রলোক তাঁর হাতে মার খেয়েছেন। দু-জন মস্তানও বাদ যায়নি। এর ফলে ওঁদের ছেলেটি কেমনধারা হয়ে গিয়েছে। সে শুনলুম কারুর সঙ্গে কথা বলে না, হাসে না, প্রশ্ন করলে হাঁ-হাঁ করে গলার মধ্যে একটা শব্দ করে। যার মা-র অমন ভয়ংকর স্বভাব, সে এমন হবে না-তো কী হবে?'

'তোমরা যে ইনভেস্টিগেশনে গিয়েছিলে, কীরকম সংবর্ধনা পেলে?'

'আমরা স্যার, ওই বাড়িতে আর ঢুকিনি। লোকাল কমিটির চেয়ারম্যান শিবদাস দে আর ও-পাড়ার ক্লাব কল্যাণ সংঘের ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে এইসব খবর পেয়েছি। আপাতত আর তো জানবার কিছু নেই। যদি ও-বাড়িতে ঢুকতে বলেন, তাহলে কিন্তু স্যার, সার্চ-ওয়ারেন্ট নিয়ে পুরো ফোর্স নিয়ে যেতে হবে।'

ফিক করে হেসে অসিতবরণ বললেন, 'ঠিক আছে, তাই হবে।' তারপর ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর সিদ্ধার্থ বাগচির দিকে ফিরে বললেন, 'দ্যাখো সিদ্ধার্থ, আমরা যে ভাবছিলুম—যে ব্যাপারটা একটা পাগলা কুকুরের কাজ, মনে হচ্ছে সেটা ঠিক নয়। এই অরিন্দম ঘোষালের কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে এই ঘটনাগুলোর মধ্যে কোথাও একটা যোগসূত্র আছে। সেটা বের করতে পারলে হয়তো রহস্যটা পরিষ্কার হবে।'

সিদ্ধার্থ বললেন, 'যোগসূত্রের যে খোঁজ করিনি, তা নয় স্যার। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি। দুটো জায়গায় মিল আছে। প্রথমত, এঁরা প্রত্যেকেই রট ওয়াইলার জাতীয় কোনো কুকুরের আক্রমণে মারা গেছেন নির্জন জায়গায় মর্নিংওয়াক করতে বেরিয়ে। আর দ্বিতীয়ত, এঁরা প্রত্যেকেই অর্থশালী প্রৌঢ়-ভদ্রলোক। ডাক্তার হরিমোহন কুণ্ডু নামজাদা হোমিয়োপ্যাথ, চেম্বার ঢাকুরিয়ায়। বিবেক বিশ্বাস কাগজের ব্যাবসা করতেন, থাকতেন এলগিন রোডে। শান্তিময় ঘোষ কনট্রাক্টর, থাকতেন বাগবাজারে। আর এই কমলেশ্বর নন্দী একটা ফ্যাব্রিকেশন শপের মালিক ছিলেন। আমরা এঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলে যা জেনেছি, তাতে মনে হয় এঁরা পরস্পরকে চিনতেনই না। মিল অবশ্য আরও একটা অছে। এঁরা প্রত্যেকেই আশির দশকের গোড়ায় সপরিবারে বাংলাদেশ থেকে ভারতবর্ষে আসেন। ওখানেও ওঁরা যা করতেন, এখানে এসে সেই ব্যাবসাই শুরু করেন। প্রথমদিকে কষ্ট হয়তো হয়েছিল, পরে সকলেই দাঁড়িয়ে যান। এখন স্যার, এই মিলগুলো যে কিছু প্রমাণ তা আমার মনে হয় না।'

'বাংলাদেশে এরা কি একই জায়গায় থাকতেন?'

'না, স্যার। ডা. কুণ্ডু থাকতেন ঢাকায়, বিবেক বিশ্বাস যশোরে, শান্তিময় কুষ্ঠিয়ায় আর কমলেশ্বর চট্টগ্রামে।'

'চমৎকার! বিজয়, তুমি একটা কাজ করো। ওই অরিন্দম ঘোষালকে আবার ভালো করে জেরা করো। দ্যাখো, কিছু বের করতে পারো কিনা। আর সে কীভাবে খবরটা পায়, সেটা

বের করবার চেষ্টা করো। ভয়-টয় দেখাও, কাকুতি-মিনতি করো। যাহোক, কিছু একটা করো। আজকের কাগজগুলো আমাদের যা গালাগাল করছে, তা আর সহ্য হচ্ছে না।'

সিদ্ধার্থ বললেন, 'একটা কাজ করলে হয় না স্যার? কলকাতায় যাদের রট ওয়াইলার বা ওই জাতীয় কুকুর আছে, তাদের থানায় ডেকে এনে জেরা করলে হয় না? হয়তো কিছু সূত্র বেরিয়ে পড়তে পারে।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? রট ওয়াইলার তুমি চেনো? আমি তো চিনি না। ওই কর্ম করতে গেলে তোমার লোকেরা কলকাতা সুদ্ধু নেড়ী থেকে গ্রেট ডেন সবার মালিকদের থানায় টেনে আনবে আর আবার একটা হুলুস্থুল পড়ে যাবে। তা ছাড়া, কুকুরটা যে রট ওয়াইলার সেটা তো কাউকে জানানো হয়নি। সে-কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়লে তার মালিকটি সাবধান হয়ে যাবে না? ওভাবে হবে না।'

'তাহলে কীভাবে এগোব স্যার? আর কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু কলকাতা সুদ্ধু লোক খেপে যাবে। কেউ বেলা আটটার আগে বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে না। কাগজ আসছে দশটায়, দুধ আসছে তারও পরে। মর্নিংওয়াকাররা নুনওয়াকার হয়ে রোদে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এমনভাবে আর বেশিদিন চলবে না স্যার। যা করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

'এক কাজ করো। তুমি যে চারজন মারা গেছেন তাঁদের বাড়িতে যাও, তাঁদের যাবতীয় কাগজপত্র ভালো করে ঘেঁটে দ্যাখো, এঁদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ ছিল কি না। তবে কাজটা সাবধানে কোরো, তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের মনে যেন কোনোরকম আঘাত না-লাগে। আর বিজয়, তোমাকে যেরকম বললুম, সেইরকম করো। ওই অরিন্দম ঘোষালকে বাজিয়ে দ্যাখো।'

বিজয় চৌধুরি বললেন, 'আপনাকে এত সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে কেন অরিন্দমবাবু? আপনি কি ভাবছেন যে আমি আপনাকে হাজতে ঢোকাব বলে ডেকে পাঠিয়েছি? একেবারেই তা নয়। আমি শুধু একটা অনুরোধ করব আপনাকে। ওই রহস্যময় খুনে কুকুরটার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের একমাত্র সূত্র আপনি। কাজেই, জনসাধারণের নিরাপত্তার কথা ভেবে, আপনাকে অনুরোধ করছি যে অসম্ভব না-হলে প্রত্যেকদিন একবার করে এসে যদি আমার সঙ্গে দেখা করে যান তো বড়ো ভালো হয়। সকাল, বিকেল বা দুপুর— যখন আপনার সুবিধে।'

অরিন্দম বিমর্ষ মুখে বললেন, 'রোজ হাজিরা দিতে হবে?'

'আহা-হা, হাজিরা কেন বলছেন? সে তো দেবে ক্রিমিন্যালরা। আপনি তো তা নন। আপনি তো আমাদের সাহায্যই করতে চান, তাই না? আচ্ছা, অরিন্দমবাবু, আপনি তো এই হত্যাকাণ্ডগুলোর খবর কী করে পান সেটা বলবেন না। বেশ, না-ই বললেন। কিন্তু এই খুনে কুকুরটা কী জাতীয় কুকুর তা কি আপনার জানা আছে?'

'আছে। রট ওয়াইলার।'

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সোজা হয়ে বসলেন বিজয়। বললেন, 'কী করে জানলেন? রট ওয়াইলার আপনি চেনেন?'

'চিনি। আমার ছোটোমামার একটা ওই কুকুর ছিল। তার ভয়ে আমাদের তাঁর বাড়িতে যাওয়াই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।'

'কোথায় থাকেন আপনার ছোটোমামা? কী করেন?' উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করলেন বিজয়।

'ঢাকার কাছে টঙ্গি বলে একটা শহর আছে। সেখানে থাকতেন। কলেজে পড়াতেন। সাতাত্তর সালে মারা যান।'

'মারা গেছেন?' বিজয়ের গলাটা একটু হতাশই শোনাল। 'তাঁর কুকুরটা কোথায়?'

'জানি না। শুনেছি, ছোটোমামা মারা যাওয়ার পর তার আর হদিশ পাওয়া যায়নি।'

'আপনার মামাবাড়ির অন্যান্য আত্মীয়রা কোথায় থাকেন? মানে কলকাতার কাছে-পিঠে কেউ থাকেন কি?'

'অনেকেই থাকেন। বড়োমামা থাকেন গড়িয়ায়, মেজোমামা ভবানীপুরে। আমার দিদিমা মেজোমামার সঙ্গে থাকেন।'

'আপনার ছোটোমামা তাহলে বেশ অল্প বয়সেই মারা যান, তাই না? কী হয়েছিল?'

ভাবলেশহীন গলায় অরিন্দম বললেন, 'খুন হয়েছিলেন। ওঁর বাড়ির সামনে ওঁকে গুলি করে মেরেছিল কেউ। ঢাকা পুলিশ তদন্ত বেশি করেনি। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ব্যাপার বলে ফাইল ক্লোজ করে দিয়েছিল।'

'বলেন কী? আপনার মামাদের ঠিকানাগুলো আমাকে দিতে পারেন?'

'হ্যাঁ, পারি।' বলে অরিন্দম একটা কাগজ টেনে নিলেন।

অসিতবরণ বললেন, 'বিজয়ের রিপোর্টটা পড়েছ সিদ্ধার্থ? কোথায় যেন একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে, তাই না?'

সিদ্ধার্থ ব্যাজার মুখে বললেন, 'কী জানি স্যার। আমি তো কোনো আলোই দেখতে পাচ্ছি না। আজ থেকে তেইশ বছর আগে টঙ্গিতে প্রফেসর কৃষ্ণদেব চক্রবর্তীর একটা রট ওয়াইলার কুকুর ছিল, আর তার তেইশ বছর বাদে কলকাতায় চারজন লোক ওই জাতীয় কুকুরের আক্রমণে বীভৎসভাবে মারা গেছেন। টঙ্গির কুকুরটা নিরুদ্দেশই হোক আর যাই হোক, এত বছর বাদে কলকাতায় এসে এই খুন-খারাপি শুরু করবে, এ কখনোই হতে পারে না। একটা রট ওয়াইলার বারো বছরের বেশি বাঁচতেই পারে না।'

'এমন তো হতে পারে যে, কৃষ্ণদেব দাঙ্গায় মারা যাননি। এই চারজনে তাঁকে ষড়যন্ত্র করে মেরেছিল। এখন কেউ তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। রট ওয়াইলার দিয়ে খুন করিয়ে ব্যাপারটা বেশ নাটকীয় করা হচ্ছে।'

'এটাও স্যার, খুব জোরালো অনুমান হচ্ছে না। প্রথমত, এত বছর বাদে কেন? দ্বিতীয়ত, এই চারজনের মধ্যে কিন্তু কোনোরকম যোগাযোগের খবর আমরা পাইনি। আর স্যার, নাটকীয়তার একটা সীমা আছে। রট ওয়াইলার ভয়ংকর খুনে কুকুর তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে নাটকীয়তার জন্য শিখিয়ে পড়িয়ে কেউ চার-চারটে লোককে মারবে— এটা যেন কেমন ঠিক হচ্ছে না বলে মনে হয়।'

অসিতবরণ চিন্তিতভাবে কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই ভয়ানক উত্তেজিত বিজয় চৌধুরি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। বললেন, 'কুকুরটার পরের শিকারের নাম জেনেছি স্যার। আজ সকালে অরিন্দম ঘোষাল এসেছিলেন। বললেন, সংহারক সারমেয় এবার যাকে মারবে তিনি শোভারাম মল্লিক লেনের সনাতন হালদার।'

অসিতবরণ বিস্ফারিত চোখে বললেন, 'বলো কী? সনাতন হালদার মানে আমাদের হায়না হালদার? শোভারাম মল্লিক লেন যখন তখন হায়নাই বটে। ইস! ব্যাটাচ্ছেলে আমাদের কী-জ্বালান জ্বালিয়েছে! আগে যখন স্মাগলিং আর জাল নোটের ব্যাবসা করত তখন ছিল একরকম। ইদানীং পলিটিশিয়ান হয়ে একেবারে সাপের পাঁচ পা দেখেছে।'

সিদ্ধার্থ বললেন, 'যা বলেছেন স্যার। ওই হায়না হালদার আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা সকলেই একেবারে নরকের জীব। সংহারক সারমেয় যদি হায়নাকে মারে তাহলে অন্তত আমার মনে কোনো দুঃখ থাকবে না।'

'অত রেগে যেও না সিদ্ধার্থ। হায়নাকে শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। সেটা অন্য কারুর ওপর ছেড়ে দিলে তো চলবে না। তুমি আজ থেকেই চারজন দায়িত্বশীল অফিসারকে হায়নার ওপরে সর্বত্র আর সর্বক্ষণ নজর রাখার কাজে লাগিয়ে দাও। তবে, হায়না যেন কিছু জানতে না-পারে। যে বা যা-কিছু হায়নাকে আক্রমণ করবে, তাকে যেন যেন-তেন-প্রকারেণ আটকে ফেলা হয়।'

'ঠিক আছে স্যার। তা আপনি যখন বলছেন তখন লোক লাগিয়ে দিচ্ছি। তবে, এর কিন্তু কোনো দরকার ছিল না স্যার।'

'কেন? দরকার নেই কেন?'

'আগে তো হায়না দু-জন বডিগার্ড নিয়ে ঘুরত, ইদানীং ঘুরছে ছ-জনকে নিয়ে। সে যেখানেই যায়, তার গাড়ির পেছনে একটা সুমো যায়। এই বডিগার্ডরা তাকে সবসময় ঘিরে থাকে, এমনকী সে যখন কোনো জনসভায় বক্তৃতা দেয় তখনও। সেদিন টিভি-তেও তাই দেখাল। আমরা নিজেদের মধ্যে এ ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনাও করেছি।'

'তার মানে, সে তার বিপদটা আঁচ করেছে। কী করে করল? তবে কি এই অরিন্দম ঘোষাল তাকে জানিয়েছে? নাঃ, এই ঘোষাল লোকটাকে আমার সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না, বিজয়। যতই শান্তশিষ্ট দেখাক, লোকটা কিন্তু ঘোড়েল আছে। সে সবকথা আমাদের

বলছে না। কিছু চেপে যাচ্ছে। এবার তুমি ওকে থানায় এনে একটু কড়কাও তো।'

বিজয় বললেন, 'একটা কথা বলব স্যার? আমি বরং এখুনি গিয়ে অরিন্দমের ছেলেটাকে ধরে লক-আপে ঢুকিয়ে দি। সে উদয়গড় কলেজে পড়ে, ফার্স্ট ইয়ারে। সে যখন কলেজ থেকে ফিরবে তখন রাস্তা থেকে তাকে তুলে নেব।'

'অরিন্দমের ছেলেটাকে লক-আপে ঢোকাবে কেন? সে আবার কী করল?'

'আমার ধারণা যে, ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয় স্যার। আপনি তো অক্ষয়, মানে এই ছেলেটিকে দেখেননি, আমি দেখেছি। আপনি দেখলেই বুঝতে পারতেন যে তার মধ্যে একটা জটিল গণ্ডোগোল আছে। কেমন যেন ভূতুড়ে ছেলেটা। গায়ের রং ঘোর কালো, মুখে অবিন্যস্ত দাড়িগোঁফ, দাঁতগুলো বড়ো বড়ো আর ছুঁচোলো, চোখ দুটো লাল। কোনো কথাই প্রায় বলে না ছেলেটা।'

'গায়ের রং আর দাড়ি গোঁফের জন্য তুমি অক্ষয়কে লক-আপে ঢোকাতে চাও? কী ভাবছ বলো তো তুমি? এই অক্ষয় ছেলেটি চারজনকে কামড়ে খুন করেছে আর আমাদের ফরেন্সিক এক্সপার্টরা সেটা রট ওয়াইলারের কাণ্ড বলে সনাক্ত করেছেন?'

'সেটাও হতে পারে স্যার। তবে আমার ধারণা ঘটনাটা অলৌকিক। আমার বিশ্বাস অক্ষয় কুকুরে রূপান্তরিত হয়, অনেকটা ওয়্যারউল্ফের মতো।'

'অলৌকিক! তুমি না পুলিশ? তুমি এসবে বিশ্বাস করো? আরে, অলৌকিক উপায়ে যদি খুনখারাপি করা যেত তাহলে লোকে পুলিশ না-ডেকে ওঝা ডাকত, বুঝেছ? এইরকম গেঁয়ো কুসংস্কার মন থেকে বের করে দাও তো।'

পরদিন সকাল থেকে কলকাতায় হুলুস্থুল পড়ে গেল। দলেদলে সাংবাদিক, ফোটোগ্রাফার আর টিভি ক্যামেরাম্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের ঘরে ঢুকে প্রচণ্ড চেঁচামেচি জুড়ে দিল। সবাই একসঙ্গে কথা বলছে। কে কার কথা শোনে তার ঠিক নেই।

অসিতবরণ কিন্তু মাথা ঠান্ডা করে রইলেন। ধৈর্য ধরে সবার কথা শুনে, উত্তর দিতে শুরু করলেন। গত কাল সন্ধ্যায় জননেতা সনাতন হালদার ফকিরহাটে একটি জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে কলকাতা ফিরতে ওঁর রাত এগারোটা হয়ে যায়। ওঁর সঙ্গে ছ-জন বডিগার্ড ছিল। শোভারাম মল্লিক লেনে ওঁরা যখন পৌঁছল তখন রাত সাড়ে এগারোটা। তখন লোডশেডিং চলছিল আর এই জানুয়ারি মাসে যেরকম কুয়াশা হয় সেইরকমই ছিল। সনাতনবাবু গলির মুখে গাড়ি থেকে নামামাত্র কুয়াশার ভেতর থেকে কালো র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া কিছু একটা বেরিয়ে এসে ওঁকে আক্রমণ করে। ব্যাপারটা এতই অতর্কিতে ঘটে যায় যে ওই বডিগার্ডরা বাধা দেওয়ারও সময় পায়নি। প্রথমদিকে তারা গুলিও চালাতে পারেনি পাছে সেই গুলি সনাতনবাবুর গায়ে লাগে এই

ভয়ে। পরে কোনোরকমে আততায়ীকে ছাড়িয়ে খুব কাছ থেকে তাকে গুলি করা হয়। সেটা পালিয়ে যায়। এই আততায়ী কে বা কী তা নিয়ে বডিগার্ডদের মধ্যে মতভেদ আছে। যারা খুব কাছে ছিল তারা বলছে সেটা নেকড়ে জাতীয় কোনো জানোয়ার আর যারা একটু দূরে ছিল তারা বলছে আক্রমণকারী ছিল মানুষ। আমাদের ধারণা প্রথম মতটিই ঠিক। সনাতনবাবুর গলায় যে দাগ তা কোনো জানোয়ারের দাঁতের বলেই মনে হয়।

যাই হোক আমাদের দু-জন অফিসার হঠাৎই ওখানে গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁরা সনাতনবাবুকে নিয়ে সঙ্গেসঙ্গে হাসপাতালে চলে যান। ডাক্তারদের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি। যেতও না, কারণ গলাটা একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আজ ভোররাতে এই মহান সমাজসেবীর জীবনাবসান ঘটে।

এই ঘটনাগুলো থেকে মাইল দুয়েক দূরে প্রাণকৃষ্ণ সরকার রোডের ওপরে একজন অজ্ঞাত পরিচয় মধ্যবয়স্কা মহিলার গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। তাঁকে এখনও কেউ সনাক্ত করেনি। তবে, এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক আছে, তা আমাদের মনে হয় না। যাহোক, আমরা তদন্ত করে দেখছি। তবে একটা ব্যাপার আমরা নিশ্চিত যে এরকম ঘটনা ভবিষ্যতে আর ঘটবে না। কারণ সনাতন হালদারকে যে আক্রমণ করেছিল, সে মানুষই হোক বা জানোয়ারই হোক, আটটা গুলি খেয়ে সে বেঁচে থাকতে পারে না।

অসিতবরণের ঘরে তিনি ছাড়া আর ছিলেন বিজয় চৌধুরি, সিদ্ধার্থ বাগচি আর অরিন্দম ঘোষাল। ঘরের বাইরে লাল আলো জ্বলছিল। অসিতবরণ বলছিলেন, 'আমরা অত্যন্ত দুঃখিত অরিন্দমবাবু যে আপনার স্ত্রীর মৃতদেহ বেওয়ারিশ বলে আমাদের দাহ করতে হল। তবে সাধারণ মানুষের কথা ভেবে এবং ব্যাপারটা নিয়ে আর কোনো গোলমাল যাতে না-হয়, যার মধ্যে নিরপরাধ হলেও আপনাকে জড়িয়ে পড়তেই হত, আমরা এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছি। আশা করি, আপনি আমাদের অবস্থাটা বুঝতে পারবেন এবং আমাদের ক্ষমা করবেন। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই...'

অরিন্দম বাধা দিয়ে বললেন, 'আপনারা যা করেছেন ঠিকই করেছেন। সত্যি এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। আমি সবাইকে বলেছি উনি বদ্রীনাথে ওঁর গুরুর আশ্রমে চলে গিয়েছেন। সম্ভবত সন্ন্যাস নেবেন। তাই শুনে সবাই এতই স্বস্তি পেয়েছেন যে, আর কেউ কোনোরকম প্রশ্নই করেননি।'

'এইবার ব্যাপারটা আমাদের একটু খুলে বলবেন?'

'কী আর বলব? অবিশ্বাস্য ব্যাপার! আমি তো নিজেই ভালো করে সব ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারিনি। তাহলেও বলছি শুনুন।' বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অরিন্দম শুরু করলেন— 'প্রথমেই বলি আমার ছোটোমামার কথা। উনি লেখাপড়ায় ভালো

ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর স্বভাবচরিত্র ভালো ছিল না। তাঁর একটা স্বাভাবিক অপরাধপ্রবণতা ছিল। সেজন্য আমার দাদু তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। আমার মামাবাড়ি ছিল ঢাকায়। ছোটোমামা টঙ্গিতে চলে গেলে সবাই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। টঙ্গিতে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই ছোটোমামা একটা স্মাগলিং-এর চক্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। আজ বুঝতে পারছি যে-পাঁচজন মারা গেছেন, তাঁরাই এই চক্রটা চালাতেন। সারা বাংলাদেশে এদের জাল ছড়ানো ছিল। এঁরাই কোনো কারণে ছোটোমামাকে খুন করেছিল।'

অসিতবরণ বললেন, 'আপনার অনুমান ঠিক। হায়না তার মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে সেই কথাই বলে গেছে। এদের নিজের নিজের ব্যাবসার আড়ালে এরা এই কাজ চালাত। আপনার ছোটোমামা কৃষ্ণদেব চক্রবর্তী এদের একটা বিরাট অঙ্কের টাকা সরিয়ে আমেরিকায় পালিয়ে যাওয়ার সব ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছিলেন। শেষমুহূর্তে ধরা পড়ে যান আর চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে গিয়ে খুন হন। ওরা আপনার ছোটোমামা আর কুকুরটাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আর নৃশংসভাবে মেরেছিল।'

'তাই হবে। তবে ছোটোমামা মারা যাওয়ায় আমার মা খুব ভয় পেয়ে যান আর আমাকে প্রায় ঠেলে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন।

এই ঘটনার প্রায় পঁচিশ বছর বাদে এই কয়েক মাস আগে আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। কালীপুজোর তিন-চারদিন আগে রাত তিনটে নাগাদ লোডশেডিং-এ গুমোট সহ্য করতে না-পেরে বাড়ির সামনে রোয়াকে বসে আছি। হঠাৎ দেখি সামনে ছোটোমামা দাঁড়িয়ে আর তাঁর পাশে গলায় চেন-বাঁধা একটা ভয়ংকর দর্শন কালো কুকুর। আমি প্রথমটা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম কারণ দৃশ্যটা যে অনৈসর্গিক তাতে সন্দেহের তো কোনো অবকাশ ছিল না। তার ওপর দেখলুম ছোটোমামা আর তাঁর কাকুরটার চারপাশে একটা অপার্থিব অস্পষ্ট আলোর বলয়। অনেক কষ্টে নিজেকে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচালুম।

ছোটোমামা বললেন, "ভয় পাস না, মৈন্টা।" মৈন্টা বা মন্টু আমার ডাকনাম। তারপর বললেন যে, একটা বিশেষ ব্যাপারে তাঁকে আমার কাছে আসতে হয়েছে। ব্যাপারটা কী? না তিনি শত্রু নিধন করতে চান। সেই কাজের জন্য একজন দেহধারীর দরকার। গত পঁচিশ বছর যাবৎ তিনি একজন উপযুক্ত লোক খুঁজে বেরিয়েছেন, কিন্তু পাননি। এদিকে তাঁর শত্রুদের বয়েস বেড়ে যাচ্ছে। ষাট-সত্তর পেরিয়ে এমনিতেই মারা যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। তাহলে, প্রতিশোধ এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়ে ফেলতে হয়। সেজন্য, খুব একটা পছন্দ না-হলেও তিনি আমার পরিবারকেই বেছে নিয়েছেন।

ততক্ষণে আমার ভয় কিছুটা কেটেছে। বললুম, "ওসব প্রতিশোধ-টতিশোধ আমি নিতে পারব না।"

ছোটোমামা বললেন, "তা আমি জানি। তুমি একটা বিশ্বন্যাকা আর তোমার ছেলেটা একটা আস্ত গবেট। এ-কাজ আমি করাব তোমার পরিবার, মানে তোমার স্ত্রীকে দিয়ে। তুমি বাধা দেওয়ার চেষ্টা কোরো না। কোনো লাভ হবে না। তোমাকে কথাটা জানালুম এইজন্য যে এখন তোমার বাড়িতে কিছু ঘটনা ঘটবে যা দেখলে তোমার দাঁতকপাটি লাগতে পারে, হার্টফেল হওয়াও অসম্ভব নয়। শত হলেও তুমি আমার ভাগনে, তোমার এই ধরনের কোনোরকম ক্ষতি তো আমি চাই না। শুধু তোমাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে দেওয়ার জন্যেই আমি এসেছি।"

আমি পরে ভেবে দেখেছি, মালতী মানে আমার স্ত্রীকে এই কাজের জন্য আন্দাজে বা ঝোঁকের মাথায় নির্বাচিত করা হয়নি। মালতীর মধ্যে স্পষ্টতই দুটো আলাদা ব্যক্তিত্ব ছিল। একটা ব্যক্তিত্ব ছিল মোটামুটি স্বাভাবিক কিন্তু অন্যটা ছিল ভীতিজনক। রেগে গেলে তার রূপটাই পালটে যেত। তার ভেতর থেকে তখন একটা আদিম জান্তব ব্যক্তিত্ব বেরিয়ে আসত। তার সেই চেহারা শুধু আমি নয়, আমাদের পাড়ার অনেকেই দেখেছে এবং তাদের মধ্যে বেশ কয়েক জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সন্দেহ নেই যে ছোটোমামা তার চরিত্রের এই পাশবিক অংশটিকেই কাজে লাগিয়েছিলেন।

আপনারা হয়তো প্রশ্ন করবেন যে, মালতীকে সাইক্যায়াট্রিস্ট দেখানো হয়েছিল কি না। হয়নি। তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার কোনো প্রস্তাব তোলবার সাহসই হয়নি আমার। শেষ পর্যন্ত বারাসতে ওদের বাপের বাড়ির গুরুদেব স্বামী সীতানাথানন্দের কাছে নিয়ে যেতে শুরু করেছিলুম। তাতে লাভ বিশেষ হয়নি। আমার কেবল ভয় হত যে স্বয়ং গুরুদেবই না কোনোদিন মারধোর বা আচড়-কামড় খেয়ে বসেন।

এরপর সত্যিই আমাদের সংসারে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে শুরু করল। একদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে শুনি মালতী ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কী বলছে। কান পেতে শুনলুম কোনো এক ঘোষের নাম বলছে বার বার আর সেইসঙ্গে নয়নকৃষ্ণ সাহা লেনের একটা ঠিকানা। আমি পাত্তা না-দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। দু-দিন পরে কাগজে যখন শান্তিময় ঘোষের মৃত্যুসংবাদ পড়লুম তখন তাঁর ঠিকানাটা কেমন চেনা চেনা লাগল। মনের মধ্যে কেমন একটা ধন্দ লেগে গেল। এর কিছুদিন বাদে আবার সেই ব্যাপার, এবার শুনি মালতী কোনো এক হরিমোহন কুণ্ডুর নাম আওড়াচ্ছে আর সেইসঙ্গে শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোডের একটা ঠিকানা। আমি নাম-ঠিকানাটা মনে করে রাখলুম। দু-দিন পরে কাগজে সংহারক সারমেয়র ঘটনা পড়ে দেখলুম, তার শিকারের নাম-ঠিকানা আর আমার মনে করে রাখা নাম-ঠিকানা এক। কী করে হল? এটা বুঝলুম যে এর পেছনে ছোটোমামার কারসাজি রয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কী করে? তৃতীয়বার যখন মালতী কোনো এক বিশ্বাস আর এলগিন রোডের ঠিকানা আওড়াল, আমি তার পরদিন থেকে রাত জাগার সিদ্ধান্ত নিলুম।

এর দু-দিন পরে, মশায়, যা ঘটল তাতে তো সত্যি-সত্যি আমার হার্টফেল হওয়ার অবস্থা! শেষরাত্রে প্রায় তিনটে নাগাদ হঠাৎ মালতী খাটের ওপর উঠে বসল। আমাদের শোওয়ার ঘরটা নিশ্ছিদ্র নয়। রাস্তা থেকে এসে পড়া আলোয় আমি সব দেখতে পাচ্ছিলুম। বললে বিশ্বাস করবেন না, আমার চোখের সামনে মালতীর মুখটা বড়ো বড়ো কালো লোমে ভরে গেল, ওর এমনিতে ছুঁচোলো মুখ আরও ছুঁচোলো হয়ে লম্বা হয়ে গেল, দাঁতগুলো বড়ো বড়ো হয়ে গেল আর তার চোখে সে-এক কী ভয়ংকর জিঘাংসা! সে কিছুটা হামাগুড়ি দিয়ে কিছুটা হেঁচড়ে খাট থেকে নেমে কেমন একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে দুলতে-দুলতে গিয়ে দরজা খুলে বিদ্যুদ্বেগে বেরিয়ে গেল। আমি অজ্ঞান হয়ে ধপাস করে খাটের ওপর পড়ে গেলুম। পরদিন সকাল সাতটায় যখন জ্ঞান ফিরল, দেখি মালতী নির্বিকার মুখে ঘরের কাজকর্ম করছে।'

এইখানে বিজয় চৌধুরি বললেন, 'আমি তো এইরকমই সন্দেহ করেছিলুম স্যার। আপনি বললেন, গেঁয়ো কুসংস্কার।'

অসিতবরণ চোখ পাকিয়ে বললেন, 'চোপ!' তারপর অরিন্দমকে বললেন, 'তারপর? বলে যান।'

অরিন্দম মাথা নেড়ে বললেন, 'আর বলবার কিছু নেই। চতুর্থ ব্যাক্তির নাম শুনেই আমি থানায় চলে যাই। এর পরের ঘটনা আপনারা সবাই জানেন।'

'হুঁ, তা জানি। আচ্ছা, অরিন্দমবাবু, এ-কথাগুলো আপনি গোড়াতেই পুলিশকে বলেননি কেন?'

'কী করে বলি? আপনারা কি আমার কথা বিশ্বাস করতেন? উলটে আমাকেই পাগলাগারদে পাঠিয়ে দিতেন।'

'তা তো না-ও হতে পারত। অন্তত পুলিশ আপনার বাড়ির চারদিকে পাহারা বসাতে পারত। আপনার বাড়ি থেকে সকলের ঢোকা-বেরুনো মনিটর করতে পারত।'

অরিন্দম চুপ করে রইলেন। অসিতবরণ বলে চললেন, 'আপনি জানতেন যে আপনি যাদের নাম করেছেন, পুলিশ তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করবে আর মানুষই হোক বা কুকুরই হোক, যে তাদের আক্রমণ করবে তাকে তারা গুলি করে মারবে। আপনি নিখরচায় বেঁচে যাবেন। আমি এদের সেই কথাই বলেছিলুম যে আপনাকে দেখতে যতটা বোকাসোকা মনে হয়, আপনি মোটেই তা নন। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে আপনি আপনার ছোটোমামার চেয়ে কিছু কম যান না।'

সিদ্ধার্থ বাগচি নীচু গলায় বললেন, 'নরানাং মাতুলক্রমঃ'।

স্বভাব

ব্যানার্জীহাটের নবগোপাল সামন্ত হাড়কিপটে লোক। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, অথচ কখনো একটা পয়সা উবুড়হস্ত করেন না। মহেশডাঙায় তিনপুরুষের কাপড়ের দোকান, নুঙ্গী বাজারে ফুলের দোকান, বাঁশতলার মোটর সারাই-এর গ্যারেজ অথচ এমনভাবে থাকেন যেন দিন চলে না। ছেঁড়া জামাকাপড়, তিন দিন অন্তর দাড়ি কামান, পায়ে সেফটিপিন দিয়ে আটকানো হাওয়াই চপ্পল। বাড়িতে কোনো আত্মীয়স্বজন আসে না, পুজোপার্বণের তো বালাই-ই নেই। স্ত্রী মারা গেছেন অনেক দিন। একমাত্র ছেলে সুনীলকে নিয়ে বিরাট পোড়ো বাড়িটাতে ভূতের মতো থাকেন।

সুনীল অবশ্য ভালো ছেলে। মুখুজ্জেদের অবৈতনিক স্কুলে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়ে প্রাইভেটে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেছে। তার নাকি ডাক্তার হবার ইচ্ছে ছিল। তা আর হওয়া যায়নি। সে-এখন বাঁশতলার গ্যারেজটা দেখাশোনা করে।

স্বভাবতই, নবগোপালের সঙ্গে পাড়ার ছেলেদের সম্পর্ক ভালো নয়। দুর্গাপুজো, কালীপুজো তো দূরস্থান, পুকুরসংস্কার বা দরিদ্রনারায়ণ সেবার মতো সৎকাজেও অনেক চেষ্টা করেও তাঁর কাছ থেকে একটা আধলাও চাঁদা আদায় করতে পারেনি ছেলেরা। 'উদয়ের পথে' ক্লাবের সেক্রেটারি উজ্জ্বল হাজরার জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেবার যতই ক্ষমতা থাক, নবগোপাল সামন্তকে সে একচুলও টলাতে পারেনি। অনুরোধ, উপরোধ, ভয় দেখানো, আপনি-কি-মানুষ-না-অন্যকিছু জাতীয় গালমন্দ— কোনো কিছুতেই কোনো ফল হয়নি। এর বেশি কিছু করাও যায় না। শত হলেও নবগোপাল সুনীলের বাবা। সুনীল তো শুধু বন্ধু নয়, 'উদয়ের পথে' অ্যাথলেটিক ক্লাবের গোলকিপারও বটে।

সুতরাং, নবগোপাল সামন্তের সঙ্গে 'উদয়ের পথে' ক্লাবের, বিশেষত উজ্জ্বলের

একটা অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মারামারি নয়, অন্যরকম লড়াই। শত্রুকে আঘাত করাই আসল উদ্দেশ্য।

ব্যাপারটা হল, নবগোপাল তাঁর বাড়ির পেছনে প্রায় পাঁচ বিঘে পরিমাণ জমিতে ফুলের চাষ করেন আর সেই ফুল যায় তাঁর নুঙ্গী বাজারের দোকানে। যেখানে পাঁচটা মালি রাখার কথা সেখানে রেখেছেন একজন। বাকি কাজ নিজেই করেন। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, সারাবছর খালি গায়ে আধময়লা ধুতি হাঁটুর ওপর তুলে বাগানের পরিচর্যা করে যান। সেটা করেন, ফুল ভালোবাসেন বলে নয়, পয়সা রোজগারের জন্য। হাড় বের করা শরীর যে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, কাঠকয়লার মতো হয়ে গেছে, সে দিকে খেয়াল নেই।

অদ্ভুত প্রতিভা নবগোপালের। প্রত্যেকটি ফুল তাঁর হিসাবের মধ্যে থাকে। পাশের বাড়ির হাঁদুর ঠাকুমা খুনখুনে বুড়ি। রোজ সকালে গঙ্গাস্নান করতে যান। ফেরার পথে যদি একটা ফুলও তোলেন তো নবগোপাল চিৎকার শুরু করে দেন। হাঁদুর ঠাকুমাও ছেড়ে কথা কইবার লোক নন। ফলে ঝগড়ার চোটে পাড়ায় সেদিন আর কাকচিল বসতে পারে না।

এই বাগানই উজ্জ্বল রণক্ষেত্র রূপে বেছে নিল।

কালীপুজোর তিন-চার দিন পর অ্যাকশন শুরু হল। কাকভোরে উঠে পশের বাড়ির চন্দনকে সঙ্গে নিয়ে উজ্জ্বল সামন্ত বাড়ির বাগানে গিয়ে একটা লাল আর একটা ড্যাফোডিল জবাগাছ প্রায় সাফ করে দিয়ে চলে এল। সেদিন সন্ধে বেলা ক্লাবঘরে সেই ফুল সাজিয়ে একটা ছোটোখাটো বিজয়-উৎসব পালিত হল। সদস্যরা সকলেই একমত হল যে এটা চুরি বা ডাকাতি নয়, এ হল বকেয়া চাঁদা আদায়।

তার আগে অবশ্য পাড়ার লোকেরা সারাসকাল ধরে নবগোপালের একতরফা চিৎকার শুনে গেছে। পাড়ার হেন লোক নেই যাকে ভদ্রলোক সন্দেহ করে গাল পাড়েননি। বাড়ির সামনে ভিড় জমে গিয়েছিল। তবে, জনতা মোটেই উত্তেজিত হয়নি, উলটে ব্যাপারটা সবাই বেশ উপভোগ করছে বলেই মনে হচ্ছিল। অন্তত তাদের দন্তবিকশিত সে রকমই ইঙ্গিত দিচ্ছিল।

বিজয়-উৎসবের পর সুনীল উজ্জ্বলকে বলল, 'যা করেছিস, করেছিস। এরপর সাবধানে থাকবি।'

উজ্জ্বল বলল, 'কেন? তোর বাবা কি দরওয়ান বসাবেন নাকি?'

'ক্ষেপেছিস? দরওয়ানকে মাইনে দিতে হবে না?'

'তবে কি কুকুর পুষবেন?'

'নাঃ। কুকুরকে খেতে দিতে হবে। ওসব নয়। বাবা বাগানের পাশে দক্ষিণের ঘরটায়

বিছানা সরিয়ে নিয়ে গেছে। ঠাকুরদার আলমারি থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আমলের একটা বন্দুক বেরিয়েছে। কিছু কার্তুজও রয়েছে দেখলুম। সেগুলো চলবে কি না জানি না, তবে সাবধানের মার নেই। আর আমি জানি, বাবার ঘুম অসম্ভব পাতলা। তাই বলছি, যা করবি, ভেবেচিন্তে করবি।'

সুনীলের কথা শুনে চন্দন পেছিয়ে গেল। দুষ্টুমি করতে তার আপত্তি নেই কিন্তু গুলি খেতে সে একেবারেই রাজী নয়। উজ্জ্বল কিন্তু পেছোল না। তার কেমন যেন একটা রোখ চেপে গিয়েছিল। চাপারই কথা। নবগোপাল তাকে যে সব কথা বলেছেন তাতে নিজেকে শান্ত রাখতে তাকে যথেষ্ট কষ্ট করতে হয়েছে। নেহাত সুনীলের বাবা তাই। অন্য কেউ উজ্জ্বলকে গুণ্ডা, সমাজবিরোধী, অশিক্ষিত বাঁদর ইত্যাদি বললে ওপর থেকে তাকে ছ-ইঞ্চি ছোটো হয়ে যেতে হত। কাজেই তার অভিযান অব্যাহত রইল।

দুঃখের বিষয়, উজ্জ্বলের বেশিরভাগ অভিযানই ব্যর্থ হতে লাগল। রাত্তির বারোটাই হোক আর সাড়ে তিনটেই হোক, সে বাগানে ঢুকলেই পেছনের বারান্দায় খুট করে আলো জ্বলে উঠত। শেষ রাতের ঘন কুয়াশার মধ্যেও নবগোপাল যে কী করে টের পেতেন যে বাগানে কেউ ঢুকছে সেটা একটা রহস্যময় ব্যাপার।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি প্রচণ্ড শীত পড়ল। সেদিন রাত আড়াইটে নাগাদ উজ্জ্বল একটা কালো র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে নবগোপালের বাড়ির দিকে রওনা হল খিড়কির দরজা খুলে। ঝকঝকে তারাভরা অমাবস্যার আকাশ, গঙ্গার দিক থেকে তখন একটা কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। এই শীতে কি আর নবগোপাল বেরুবেন? মনে হয় না। উজ্জ্বলের মনে হল, আজ তার অভিযান সফল হবেই।

সমস্ত বাড়ির পেছনের পাঁচিলের একটা ভাঙা অংশ টপকিয়ে বাগানে ঢুকল উজ্জ্বল। ওর একপাশে ন্যাসটারশিয়াম আর অন্যপাশে গাঁদাফুলের বেড। তবে, এগুলো নয়, ওর আসল লক্ষ্য গোলাপ বাগানটা। দুপুর বেলা দেখে গেছে যে বাগান ফুলে ভরে রয়েছে।

চুপিসাড়ে অনেকটাই এগিয়ে গেল উজ্জ্বল। গোলাপ বাগানটা যখন আর মাত্র কয়েক হাতের মধ্যে, হঠাৎ ওর পা লেগে একটা কালো লোহার বালতি সশব্দে পড়ে গেল। নিস্তব্ধ রাত্রে সেই সামান্য আওয়াজটাই বোমা ফাটার শব্দ বলে মনে হল।

সঙ্গেসঙ্গে বারান্দার আলোটা জ্বলে উঠল। উজ্জ্বল দেখল সাদা শাল মুড়ি দেওয়া নবগোপাল তারই দিকে বন্দুক তাক করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। উজ্জ্বল তৎক্ষণাৎ র‍্যাপারে মুখ-মাথা ঢেকে পেছন ফিরে দৌড় মারতে যাচ্ছিল, তার আগেই নবগোপাল তাঁর

স্বভাবসিদ্ধ খনখনে গলায় বললেন, 'দাঁড়াও উজ্জ্বল। একটুও নড়বে না। পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি চালাব।'

নিরুপায় উজ্জ্বল স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। বারান্দা থেকে বেশ একটা গর্বিত ভঙ্গিতে নেমে এলেন নবগোপাল। উজ্জ্বলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'র‍্যাপারে মুখ ঢেকে কোনো লাভ নেই উজ্জ্বল। আমি জানি এসব হল গে তোমার কীর্তি। তুমি জানো, আমি তোমাকে এখনই গুলি করে মারতে পারি? আর সে জন্যে পুলিশ আমাকে কিচ্ছু বলবে না।'

উজ্জ্বল দেখল যে বাঁচার একমাত্র উপায় হল নবগোপালের হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নেওয়া। সে স্বাস্থ্যবান ছেলে, স্কুলের ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন। তার পক্ষে হাড়-জিরজিরে নবগোপালকে কাবু করাটা কঠিন হবে না। কিন্তু তার আগে তাঁকে অন্যমনস্ক করে ফেলতে হবে। নইলে, বিপদের সমূহ সম্ভাবনা। সে জন্য একটু সময়ের দরকার।

কাজেই, উজ্জ্বল বলল, 'আপনার ওই মান্ধাতার আমলের বন্দুক দিয়ে কি গুলি বোরোয় মেসোমশাই? চেষ্টা করে দেখেছেন কখনো?'

নবগোপাল দাঁত বের করে হাসলেন। বললেন, 'এটা হল উইনচেস্টার রাইফেল, বুঝেছ? এটা খারাপ হবার জিনিস নয়। আর তুমি যে ভাবছ আমাকে চটিয়ে দিয়ে অন্যমনস্ক করে ফেলে আমার হাত থেকে এটা কেড়ে নেবে, সে আশার গুড়ে বালি। তবে, তোমাকে গুলি করে মারলে আমার একটা কার্তুজের বাজে খরচ হবে, এটাই যা চিন্তা।'

প্রবলবেগে মাথা নেড়ে উজ্জ্বল বলল, 'ঠিক কথা! একটা কার্তুজের কি দাম কম?'

'সে কথা তোমাকে ভাবতে হবে না হে, ছোকরা! সমস্যা হচ্ছে, তোমাকে গুলি করে মারব, না জেলে দেব। তবে হ্যাঁ, একটা শর্তে আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি।'

উজ্জ্বল যথাসাধ্য বিনীত কণ্ঠে বলল, 'কী শর্ত, মেসোমশাই?'

'শর্তটা হল, কাল সকাল বেলা তুমি সুনীলের সঙ্গে দেখা করবে। কাল তার কিছু সাদা ফুলের দরকার। তাকে বলবে যে সেই ফুল যেন সে এই বাগান থেকে নেয়। তবে, বেশি নয়, অল্প করে। সে হয়তো রজনীগন্ধা চাইবে। সে ফুলটা এখানে নেই আর তার কোনো দরকারও নেই। তাকে বলবে যে আমি বলেছি একথা। বাজার থেকে যেন পয়সা খরচা করে না-কেনে।'

'একথা তো আপনিই তাকে বলতে পারেন, মেসোমশাই!'

'না, একটা বিশেষ কারণে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তুমি বলতে পারবে কি না তাই বলো।'

'নিশ্চয়ই বলতে পারব। এ আর এমন বেশি কথা কী?'

'ঠিক আছে। তবে যাও। কথাটা ভুলো না কিন্তু। আর মনে রেখো, ফের যদি কোনোদিন এই বাগানে পা রেখেছ, তো তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।'

'মনে থাকবে, মেসোমশাই।' বলে উজ্জ্বল এক দৌড়ে ভাঙা পাঁচিলের দিকে চলে গেল।

পরদিন সকাল বেলা উজ্জ্বল সামন্ত বাড়িতে গিয়ে দেখে বাড়ির সামনে কিছু লোকের জটলা। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ভেতর থেকে সুনীল বেরিয়ে এল। তার মাথার চুল উসকোখুশকো, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত।

উজ্জ্বলকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, 'কাল মাঝরাতে বাবা মারা গেছেন। আমি ঘুমিয়েছিলাম। টের পাইনি। আজ সকালে জানতে পেরেছি।'

শুনে আঁ আঁ করতে করতে উজ্জ্বল অজ্ঞান হয়ে ধপাস করে রাস্তার ওপর পড়ে গেল।

সব শুনে হাঁদুর ঠাকুমা বললেন, 'এ আর এমন বেশি কথা কী? আমাদের শাস্তরে তো কবেই বলে গেছে যে স্বভাব যায় না মলে আর ইল্লুত যায় না ধুলে। সে কথা তো আর মিথ্যে হতে পারে না!'

নিমন্ত্রণ

শশধরবাবু টি-পটের ঠিক পাশেই পটাশিয়াম সায়ানাইড মেশানো চিনির কৌটোটা যত্ন করে সাজিয়ে রাখলেন। পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে তার চেম্বারটা পরীক্ষা করে দেখলেন সব ক-টা গুলি ঠিকমতো আছে কি না। বলা তো যায় না। রাসপুটিন নাকি পটাশিয়াম সায়ানাইড মেশানো একগাদা কেক চেটেপুটে খেয়ে দিব্যি বহাল তবিয়তে হেঁটে চলে যাচ্ছিল। তখন, পেছন থেকে গুলি করে তাকে মারতে হয়। বিষটা হয়তো ভেজাল ছিল, কিন্তু শশধরবাবু শুনেছেন যে অনেক লোকের নাকি ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা থাকে বিষ খেয়ে বেবাক হজম করে ফেলার। কাজেই, কোনোরকম ঝুঁকি তো নেওয়া যায় না। শশধরবাবু অত্যন্ত সাবধানী লোক। বিকল্প ব্যবস্থা না-করে তিনি কক্ষনো কোনো কাজ করেন না। তাই পটাশিয়াম সায়ানাইডও রইল, পিস্তলও রইল। তা ছাড়া, সোফার নীচে একটা বড়ো ছোরাও গোঁজা আছে। সেটাও কাজে লাগানো যাবে যদি দরকার পড়ে।

তবে, অতটা দরকার পড়বে বলে মনে হয় না। কারণ, তড়িতের শরীরটা যতই ভীমাকৃতি হোক না-কেন, সে তো রাসপুটিন নয়। রাসপুটিনের কতগুলো অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। তড়িৎ নেহাতই রক্ত-মাংসের সাধারণ মানুষ। একটা অপদার্থ, নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ। তাকে খুন করতে খুব বেশি ঝামেলা পোয়াতে হবে না। শশধরবাবুর এখন বয়স হয়েছে, তা হলেও এখনও তড়িতের মতো একটা গাড়লকে মারা তাঁর কাছে একটা মশা মারার চেয়েও সহজ ব্যাপার। এই তো, আজ সন্ধে বেলা মাত্র একঘন্টার মধ্যে পেছনের বাগানে যে একটা পরিষ্কার, সুন্দর কবর খুঁড়ে রেখেছেন, আজকালকার কোনো জোয়ানেরও সাধ্যি আছে অমন চমৎকার কাজ করতে পারে? শশধরবাবুর বয়েস হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই হাড়েই এখন ইচ্ছে করলে তিনি ভেলকি দেখিয়ে দিতে পারেন।

তৃপ্ত মুখে শশধরবাবু সোফায় এসে বসলেন। বাইরে সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ জাপানি ঘড়ি টংটং করে সাতটা বাজল। এখন প্রতীক্ষা। তড়িৎ সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে

আসবে বলেছে। ছোঁড়ার আবার সময় জ্ঞান ভীষণ টনটনে। আটটা বলল তো আটটাই। এমন ছেলে জীবনে কখনো উন্নতি করতে পারে?

বাড়িটা যেন আজকে ভীষণ নির্জন বলে মনে হচ্ছে। অবিশ্যি, জনমনিষ্যি নেই, নির্জন তো হবেই। বাড়ির চাকর, মালি সবাইকে দুপুর বেলা ছুটি দিয়ে দিয়েছেন শশধরবাবু। আহা, বেচারিরা। শশধরবাবু এলে ওরা কী পরিশ্রমই না করে। গত দু-মাস ধরে প্রায় নাওয়া-খাওয়া ভুলে ওরা শশধরবাবুর সেবা করছে। মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম না-পেলে ওরাই বা কাজকর্ম করে কী করে? তা, সেইজন্যে শশধরবাবু সবাইকে দশটা করে টাকা দিয়ে শ্যাওড়াফুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওরা ওখানে সিনেমা-টিনেমা দেখবে, একটু খাওয়া-দাওয়া করবে, একটু মেয়েছেলে নিয়ে আনন্দফূর্তি করবে। ফিরতে ফিরতে সেই কাল দুপুর। শশধরবাবুর তাতে কোনো কষ্ট নেই, ওদের আনন্দেই ওঁর আনন্দ। নিজের জন্যে দুটো ভাতে ভাত উনি নিজেই ফুটিয়ে নিতে পারবেন। মাছ-মাংস খাওয়া অনেক দিনই ছেড়ে দিয়েছেন, কাজেই অসুবিধে তো কিছু নেই। যবে থেকে শ্রীশ্রীসন্তাপহারী ঈশ্বরানন্দ অবধূতের শ্রীচরণে ঠাঁই মিলেছে, তখন থেকে তো শুধু আনন্দ, পরিপূর্ণ হৃদয়।

তাহলেও বাড়িটা যেন বড়োই নির্জন লাগছে। তার ওপর সন্ধে থেকে কেমন একটা ঝোড়ো হাওয়া উঠেছে। একতলার বিরাট বিরাট ঘর আর প্যাসেজের মধ্যে সেই হাওয়া পাক খেয়ে খেয়ে একটা অদ্ভুত গোঁ গোঁ করে আওয়াজ করছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বারংবার মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন শশধরবাবু। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে, হিমানী মরবার আগে ঠিক এমনি করেই গোঁ গোঁ আর্তনাদ করেছিল। অথচ, উনি ঠিকই বুঝতে পারছেন যে, আজ তড়িৎ আসছে বলেই তাঁর হিমানীর কথা মনে পড়ছে। এতে তাঁর বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাঁর স্নায়ু কোনোদিনই এত দুর্বল নয়। আজ পর্যন্ত কম মেয়েকে তো তিনি গলা টিপে মারেননি। তাদের অনেকেই তো তাঁর পা জড়িয়ে ধরে হাহাকার করে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল। কিন্তু তিনি কি বিচলিত হয়েছিলেন? মোটেই না। কর্তব্য হল কর্তব্য। কিন্তু, আজ যে হিমানীর কথা মনে পড়ে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠছেন, এতেই তাঁর আশ্চর্য লাগছিল।

আসলে, সব নষ্টের গোড়া হল ওই হারামজাদা তড়িৎ মজুমদার। বিয়ে যেন আর কেউ করে না, আর বউ যেন কারোর হয় না। বউ মরেছে, কোথায় নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবি, আর-একবার ছাদনাতলায় গিয়ে দাঁড়াবি— তা নয়, শোকের ঠ্যালায় একেবারে গৃহত্যাগ! আচ্ছা, তা-ও না-হয় বুঝলুম বেদনা-টেদনায় কাতর হয়ে গৃহত্যাগ করেই ফেলেছিস, তাহলে সন্ন্যাস নে, হিমালয়ে গুহায় গিয়ে তপস্যা করে শান্তি খোঁজবার চেষ্টা কর। তা নয়, ছোঁড়া বলে কিনা হত্যাকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে! কী গোঁয়ার গোবিন্দ ছেলে রে বাবা! হত্যাকারীকে তুই খোঁজার কে রে? পুলিশ রয়েছে কোন কর্মে? তারা যদি খুঁজে

না-পায়, মিটে গেল ঝামেলা। শশধরবাবু যদি আগে জানতেন যে তড়িৎ ছোকরা এতদূর গাধা, তাহলে কি আর ওর মুখদর্শন করতেন?

অবিশ্যি, তড়িতের মুখদর্শন তো আর তিনি তড়িতের জন্যে করেননি, করেছিলেন হিমানীর জন্যে। হিমানীর দারিদ্র্যক্লিষ্ট মুকখানি দেখে ওঁর কোমল হৃদয় গলে জল হয়ে গিয়েছিল। ওদের সাহায্য করার জন্যেই না নিজের হাতখানি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ওদের দিকে। এরকম অসহায়, দুর্বল লোকেদের সাহায্য করাই তো তাঁর ধর্ম এবং তাঁর ব্যাবসা।

না হলে কী ছিল তড়িৎ? এম এ পাশ করে একটা বাসনের দোকানে সেলসম্যানের কাজ করছিল। হিমানীকে পুজোয় একটা শাড়িও কিনে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। আর, হিমানী বাচ্চাদের স্কুলে পড়াত আর উদয়াস্ত পরিশ্রম করত। শশধরবাবু যদি এগিয়ে না-আসতেন, ওদের কাকে-চিলে তুলে নিয়ে যেত না? তড়িৎ কি জীবনে কোনোদিন ফিল্‌মস্টার হতে পারত, না হিমানী টালিগঞ্জের বিলাসী ফ্ল্যাটে আয়েশ করে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে দিন কাটাতে পারত? কিন্তু, তার প্রতিদানে শশধরবাবু কী পেলেন? আজকের এই ঝামেলা। এই জন্যেই কখনো পরের উপকার করতে নেই।

অথচ শশধরবাবু কিন্তু ওদের উপকারই করতে চেয়েছিলেন। বিশেষ করে হিমানীর। শশধরবাবুর মায়ের স্মৃতি বিজড়িত নগেন্দ্রবালা শিশুমন্দিরে যখন হিমানী প্রথম টিচার হয়ে এল, তখন থেকেই তার উপকার করবার জন্য শশধরবাবু ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। শিশুমন্দিরের হেডমিস্ট্রেস মিস মনোলোভা চক্রবর্তী তাঁর অনেক দিনের বিশ্বস্ত সঙ্গিনী— প্রথম দিকে শয্যায়, পরের দিকে অন্যত্র। তিনিই হিমানী যাতে শশধরবাবুর সাহায্য পায়, সেদিকে নজর রাখবেন বলেছিলেন।

না রাখবেনই বা কেন? তিনিও তো শশধরবাবুর সাহায্যেই আজ নিউ আলিপুরে একটি বারো-শো স্কোয়ারফুট ফ্ল্যাটের মালিক। না-হলে আজ কোথায় থাকতেন তিনি? বেলেঘাটার একটা এঁদো গলিতে শ্বশুরবাড়ির বাসন মাজতে-মাজতেই তাঁর সেদিনের অসাধারণ রূপ নষ্ট করে ফেলতেন! আজ অবশ্য তাঁর সেই রূপের আর অবশিষ্ট বিশেষ কিছু নেই। শশধরবাবু যাদেরই ফুসলিয়ে ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছেন, তারা প্রত্যেকেই যে খুবই রূপসী ছিল তা তো বলাই বাহুল্য। শশধরবাবু সুন্দরের পূজারি, কুৎসিত কোনো কিছুই তিনি সহ্য করতে পারেন না। তবে সুন্দরের পূজারি বলেই তো তিনি মাত্র একটি সুন্দরীকে নিয়েই দিন কাটাতে পারেন না। তাহলে, অন্যান্য সুন্দরীরা কি ভেসে যাবে নাকি? কাজেই, কিছুদিন বাদেই তাদের শশধরবাবু পাঠিয়ে দেন তাঁর অন্যান্য কর্মকেন্দ্রে। কেউ যায় তাঁর সিনেমা ব্যাবসায়ে, কেউ স্মাগলিংয়ে, কেউ জাল নোট পাচারের কাজে, কেউ বা সারা শহরের ছড়িয়ে থাকা তাঁর বেশ্যাগারগুলোয়। এসব জায়গাগুলো থেকে তারা যে আয় করে, তার এক-শো ভাগের এক ভাগও

তারা তাদের সংসারে থাকলে করতে পারত না। সকলেই কী সুখী। তবে কিছু কিছু মেয়ে থাকেই যারা গাধারও অধম। যেমন ছিল হিমানী। তারা প্রতিবাদ করে, কান্নাকাটি করে। দুঃখ পান শশধরবাবু। কিন্তু এত প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। তাই তাদের আর বেঁচে থাকতে দেন না তিনি, খুন করে ফেলেন।

এসব অত্যন্ত পরিষ্কার ব্যাপার। এর মধ্যে কোনোই গণ্ডোগোল নেই। এসব তাঁর মনে কোনোদিনই রেখাপাত করে না। যে ক-টা মেয়েকে তিনি খুন করেছেন তাদের প্রত্যেকের নাম মনে আছে, কণ্ঠস্বর মনে আছে, তারা কে কোন রং পছন্দ করত তা-ও মনে আছে। এখনও সেইসব গান শুনলে, রং দেখলে তাদের কথা তাঁর মনে পড়ে। কিন্তু, কই তিনি তো কোনোদিনই বিচলিত বোধ করেননি। অথচ আজ হিমানীর কথা মনে পড়তেই তাঁর কীরকম মনে হচ্ছে— যেন তাঁর মনের মধ্যে কোথায় একটা বিরাট জট পাকিয়ে গেছে। কেন যেন মনে হচ্ছে তিনি ভয়ংকর একা। তাঁর অন্তরাত্মা যেন বারংবার বলছে, 'সাবধান শশধর, তোমার সামনে ভীষণ বিপদ!'

এসব তো ভালো কথা নয়। আচ্ছা, ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করা যাক। কীসের বিপদ? স্পষ্টতই তড়িৎ। আসলে তাঁর মনে ভয় ঢুকেছে যে, তড়িৎ জেনে গেছে যে তিনিই হিমানীর হত্যাকারী এবং তিনি ওকে হত্যা করার আগেই ওই তাঁকে খুন করে বসবে। এটা একটা নিতান্তই অবাস্তব ভয়। দেউকিপুর স্টেশনের গায়ে চায়ের দোকানে তড়িতকে যখন তিনি বসে থাকতে দেখেছিলেন, তখন তড়িৎ ওঁকে দেখতে পায়নি বা তার পক্ষে দেখা সম্ভবও ছিল না। তড়িতকে দেখেই তাঁর বুক ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। তাহলে কি তড়িৎ সব জেনে গেছে এবং তাঁকেই তাড়া করে এতদুরে তাঁর এই গোপন বাসের কাছে এসে পৌঁছেছে? চট করে একটা পাশের দোকানে ঢুকে দ্রুত চিন্তা করে নিলেন তিনি। তখন সকাল আটটা, চারদিকে গিজগিজ করছে লোক, চায়ের দোকানের মালিক নিত্যানন্দ তাঁর মাইনে করা গুণ্ডা, কাজেই এর মধ্যে তড়িৎ কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু কোনো কিছু করার আগে, জানা দরকার তড়িৎ ওখানে কী করছে। তড়িৎ ভালো অভিনেতা হতে পারে, কিন্তু হঠাৎ ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ও মনের ভাব গোপন করতে পারবে না। হয় গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, নয়তো পুরোনো দিনের মতো পরামর্শ শুরু করবে। ঝাঁপিয়ে যদি পড়ে, তাহলে তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দকে দিয়ে ওর মাথাটা দু-ফাঁক করে দেওয়া যাবে। যদি না-পড়ে, তাহলে কর্তব্য পরে স্থির করলেই চলবে। এইভেবে হঠাৎ দুম করে তিনি তড়িতের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তড়িৎ কি তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল? মোটেই নয়। বরং স্বভাবসিদ্ধ সরল হাসিতে তৎক্ষণাৎ ওর সমস্ত মুখটা ভরে গিয়েছিল। খুশি-খুশি গলায় বলে উঠেছিল, 'আরে, কাকাবাবু! আপনি এখানে কী করছেন?'

তাহলে এত অস্বস্তির কী আছে? ভুল তাঁর হয়নি। মানুষ চেনায় তাঁর ভুল হয় না।

তবে কি নীচের ঘরগুলোয় ওই বাতাসের শব্দটা? কী অদ্ভুত ব্যাপার! বাতাসের শব্দে শশধরবাবু ভয় পাচ্ছেন শুনলে যে একটা বাচ্চা ছেলেও হাসবে।

আসলে, দুপুরে বোধ হয় ভালো ঘুম হয়নি, সেইজন্যেই এরকম হচ্ছে। তড়িতকে বিনা ঝামেলায় খুনটা করে ফেলতে পারলে চিত্তও প্রফুল্ল হবে, এসব অস্বস্তিও চলে যাবে এবং হয়তো আর কোনোদিন হিমানীর কথা মনেও পড়বে না।

মনে পড়ার তো কোনো কারণ নেই। তিনি তো আর হিমানীকে উপভোগ করেননি। স্ত্রীলোকের সতীত্বে তিনি কোনোদিনই বিশ্বাস করেন না, যেমন করেন না সোনার পাথরবাটিতে। কিন্তু হিমানীর সতীত্ব হয়তো অন্য কেউ হরণ করে থাকতে পারে, তিনি পারেননি। এ হেন ব্যর্থতা তাঁর জীবনে খুবই কম হয়েছে। উপভোগটা না-করেই আর কোনো মেয়েকে তিনি মেরে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন— এরকম কথা তাঁর স্মরণে আসে না। সেইজন্যেই কি তাঁর বার বার হিমানীর কথা মনে পড়ছে আজ? তাহলে অস্বস্তি হওয়ার কী কারণ? বরং রাগ হওয়া উচিত।

রাগও যে হচ্ছে না তা নয়। কী অদ্ভুত বুদ্ধিহীন, গণ্ডমূর্খ মেয়েই না ছিল হিমানী। এম এ পাশ করেছিল না কি। কী করে করেছিল, কে জানে। শশধরবাবু তো কল্পনাই করতে পারেন না যে কোনো শিক্ষিত মেয়ে এমন বোকা হতে পারে!

মনোলোভা অবশ্য গোড়াতেই বলেছিল, 'হিমানী বড়ো কঠিন ধাতুর মেয়ে শশধরবাবু। আমাদের মতো লোভী, দুর্বল চরিত্রের মেয়ে ও নয়। আপনার জালে ধরা পড়বে কি না বুঝতে পারছি না।'

এসব কথা শুনলে শশধরবাবুর হাসি পায়। মেয়েরা যে কী ধাতুর, তা তাঁর আর জানতে বাকি নেই। একটিমাত্র ধাতুই ওদের আছে, সেটি হল সোনা। সোনা ছাড়া ওরা কিছু বোঝেও না, জানেও না। সোনার লোভ দেখালে ওদের দিয়ে সবকিছু করানো যায়। বাড়ি, গাড়ি, গহনা ব্যস! তবে কারোর লোভ বেশি, কারোর কম।

কিন্তু হিমানী যেন কেমন একটা ছিল।

প্রথম দিকে শশধরবাবুর ধারণা হয়েছিল, হিমানীকে বাগানো খুব কঠিন হবে না। উনি যে উপহারগুলো দিতেন সেগুলো নিত, কিন্তু তার পরেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত। বলত, 'আমার বাবা নেই। আপনাকে দেখলে, আমার বাবার কথা মনে পড়ে যায়।' এসব কথায় শশধরবাবুর হৃদয় বিচলিত হয় না। অনেক মেয়েই ধর্ষিতা হওয়ার আগে তাঁর পা ধরে তাঁকে পিতৃসম্বোধন করেছে। কিন্তু হিমানীর মধ্যে এমন একটা অসংকোচে সারল্য ছিল যে, তিনি চট করে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতেন না। তারপর যখন তিনি ওকে সিনেমায় চান্স দেওয়ার কথা পাড়লেন, হিমানী বলল, 'কী যে বলেন জ্যাঠামশাই! আমি আবার অভিনয় করতে পারি না কি? বরং ওকে একটু চান্স দিন না। ও কলেজে

পড়ার সময় খুব থিয়েটার-টিয়েটার করত। আর ওর চেহারা যা সুন্দর, আপনার দেখলেই পছন্দ হবে।' বলে সলজ্জ হাসল।

এই 'ও' হল তড়িৎ। তা তড়িৎ দেখতে সত্যিই সুদর্শন ছিল। আর হিমানীকে পাওয়ার জন্য তখন হেন কাজ নেই, যা তিনি করতে পারেন না। অগত্যা, সেই ছোকরাকে তাঁর সিনেমা কোম্পানিতে ঢুকিয়ে নিলেন শশধরবাবু।

তখন মহা হইচই পড়ে গেল। শশধরবাবু কস্মিনকালেও সিনেমা দেখেন না, কিন্তু তিনি শুনতে পেলেন, সেই ছোকরার অভিনয় দেখে না-কি সবার তাক লেগে গেছে। সূর্যকুমার বলতে সবাই অজ্ঞান। তড়িৎ ওই নামেই সিনেমায় নেমেছিল।

তড়িতের হয়তো মাথা ঘুরে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কে জানে কেন ছোকরা অজস্র অফার নাকচ করে দিয়ে তাঁর কোম্পানিতেই রয়ে গেল। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাকে যে কত টাকা দিতে চেয়েছিল সে খবর শশধরবাবু রাখতেন, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তড়িৎ তাদের সকলকেই প্রত্যাখ্যান করেছিল। তড়িতের বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে গোপনে তিনি খোঁজ নিয়েছিলেন এবং তারা সকলেই বলেছিল যে এই প্রত্যাখ্যানের কারণ তাঁর প্রতি তড়িতের কৃতজ্ঞতা। শুনে শশধরবাবু স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

কৃতজ্ঞতা? সে আবার কী? সেরকম কোনো কিছু আবার হয় না কি? হুঁ, হুঁ। শশধরবাবুকে দেখলে যতটা বোকা বলে মনে হয়, আসলে তিনি মোটেই তা নন। আসল ব্যাপারটা বুঝতে তাঁর খুব বেশি দিন লাগেনি।

খুবই সোজা ব্যাপার। কৃতজ্ঞতা-টৃতজ্ঞতা বাজে, আসল কথা গলায় গামছা দিয়ে আরও টাকা আদায়ের ধান্দা। এখন খুব সরল হেসে 'আপনি যা দেবেন তাই নেব, কাকাবাবু!' যতই বলো না কেন, আরও কিছু দিন গেলে আরও একটু নাম করলে, চেহারা যে কতদূর পালটাবে শশধরবাবুর তা জানা আছে। আর বাকি সব প্রডিউসাররা তো চুনোপুঁটি, তাঁর মতো টাকার কুমির বাংলাদেশে আর ক-টা আছে। খসাতে হলে, এখানে খসানোই ভালো।

তড়িৎকে তখন তাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হিমানীর জন্য পারা গেল না, মেয়েটা তখনও তাঁর কাছে দূর অস্ত। তিনি যতই হিমানীর দিকে এগিয়ে যান, তাকে কাছে টানতে চান, সে ততই মিষ্টি হেসে ভক্তি-টক্তির ভাব দেখিয়ে এড়িয়ে যায়। প্রথম দিকে শশধরবাবু ভেবেছিলেন মেয়েটা ওঁকে খেলাচ্ছে। ভেবে খুশিই হয়েছিলেন। কিন্তু, পরে দেখলেন তা তো নয়। খেলাটা যে বড্ড বেশি লম্বা হয়ে যাচ্ছে। আস্তে-আস্তে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন শশধরবাবু। শেষপর্যন্ত মনস্থিরই করে ফেললেন। সূক্ষ্ম ব্যাপার-ট্যাপারে কিসসু হবে না, হিমানীর গোবর-পোরা মাথায় কোনো ইঙ্গিতই ঢুকবে না, সোজা বাংলায় বলতে হবে! তারপর, ধর তক্তা মারো পেরেক, অর্থাৎ বিশুদ্ধ বলপ্রয়োগ।

শশধরবাবু কিন্তু ফেল করে গেলেন। হিমানীকে তাঁর চৌরঙ্গীর বাড়িতে ডেকে যখন সবকথা খুলে বললেন, তাকে সোনায় মুড়ে দেবেন, বাগুইহাটির বাগানবাড়ি লিখে দেবেন বললেন, নতুন মার্সিডিজ বেঞ্জ কিনে দেবেন বললেন, তখন লোভে তার দুই চোখ চকচক করে ওঠার বদলে অপরিসীম ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বিকৃত কণ্ঠে সে বলল, 'আপনি যে এতদূর নারকীয় শয়তান তা আমার জানা ছিল না শশধরবাবু, জানলে আপনাকে জ্যাঠামশাই বলে সম্বোধন করতুম না। আপনার সমস্ত টাকাপয়সা আপনি ফেরত নিয়ে যেতে পারেন। আমি আর তড়িৎ একবস্ত্রে এ শহর ছেড়ে চলে যাব এমন জায়গায়, যেখানে আপনার ক্লেদাক্ত হাত গিয়ে পৌঁছবে না।

অতঃপর বলপ্রয়োগ। কিন্তু সেখানেও ফেল। হিমানীর গায়ে যে এত জোর ছিল, আর সে যে ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মতো লড়াই করতে পারে কে ভেবেছিল। শেষপর্যন্ত মুস্তাফা আর জমরুকে দিয়ে মেয়েটাকে বেঁধে ফেলতে হল।

হিমানী তখন খাঁচায় বদ্ধ জন্তুর মতো গর্জন করতে লাগল, 'আপনি আমার ওপর অত্যাচার করতে পারেন শশধরবাবু, কিন্তু আমি আপনাকে ছেড়ে দেব না। বাইরে সমস্ত লোককে ডেকে বলব, ওই দ্যাখো, ভদ্রতার মুখোশ পরা কী ভয়ংকর এক পিশাচ তোমাদের বুকের ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছে। পুলিশ হয়তো কিছু করবে না, আপনি টাকা ঢেলে অনেকের মুখ বন্ধ করতে পারেন। কিন্তু আমার মুখ বন্ধ করতে আপনি পারবেন না। আমি রাস্তার মোড়ে মোড়ে চিৎকার করে সবাইকে সাবধান করে দেব, আপনার ওই মুখোশ আমি খুলে দেব। প্রতিশোধ আমি নেবই।'

শশধরবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'সে কী কথা? তুমি সবাইকে ডেকে বলবে যে, একজন তোমার সতীত্বনাশ করেছে? তোমার লজ্জা-শরম নেই, তুমি না কুলবধূ?'

'না, আমার লজ্জা-শরম নেই। আমি যদি না-বলি, যদি আপনার স্বরূপ না-সকলকে জানাই, তাহলে তো কাল আপনি আর একটি নিরপরাধ মেয়ের ওপরে অত্যাচার করবেন। তা আমি হতে দেব না।'

শশধরবাবু মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'আহা, কী আমার রানিভবানী এলেন রে! তোর বর তো তোকে রাস্তায় দূর করে তাড়িয়ে দেবে। তখন খাবি কী? তখন তো আমার বেশ্যাবাড়িতেই আশ্রয় নিতে হবে।'

'না, তড়িৎ আমায় তাড়িয়ে দেবে না। সে আমার পাশে এসে দাঁড়াবে।'

'ইঃ, কুলটা বউয়ের পাশে এসে দাঁড়াবে?'

'হ্যাঁ, শশধরবাবু, তাই দাঁড়াবে, আমি কুলটা নই। আপনি জোর করে আমার ওপরে অত্যাচার করেছেন জানলে সে আমায় বুকে তুলে নেবে, এবং তারপর আপনাকে সে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলবে। হাজার মুস্তাফা এলেও কেউ আপনাকে বাঁচাতে

পারবে না। পুলিশের দরকার নেই, আমরা দু-জনেই আপনার ভণ্ডামির, শয়তানির শেষ করে ছাড়ব। আপনি সাপের চেয়েও মারাত্মক, আপনাকে ছেড়ে রাখা আত্মহত্যার সমান।'

এরপরে আর মাথা ঠিক থাকে? শশধরবাবু মানুষ, দেবতা নন। তা ছাড়া, মেয়েটার কথা সত্যি বলেই মনে হচ্ছিল। এসব আজকালকার লেখাপড়া জানা মেয়ে, এরা করতে পারে না হেন কাজ নেই। এইজন্যেই শশধরবাবু মেয়েদের বেশি পড়াশুনো করা পছন্দ করেন না। বেশি পড়াশুনো করলে এমনই সব মারাত্মক কথাবার্তা বলতে শেখে যে মাথায় খুন চেপে যায়। কাজেই, শশধরবাবু মুস্তাফা আর জমরুকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে হিমানীর গলা টিপে ধরলেন। ব্যাপারটা একটু কাঁচা হয়েই গিয়েছিল হয়তো। ফূর্তি করে নিয়ে তারপরে মেয়েটাকে শেষ করাই উচিত ছিল। কিন্তু রাগ চণ্ডাল। আগে তো শশধরবাবুর রাগ আরও বেশি ছিল। আজকাল ঈশ্বরানন্দ অবধূত বাবাজির শ্রীচরণে ঠাঁই পাওয়ার পর মাথা অনেক ঠান্ডা হয়েছে।

শশধরবাবু যখন মানুষ খুন করেন তখন কক্ষনো সাক্ষী রেখে করেন না, তা সে যত বিশ্বস্ত লোকই হোক না-কেন, কিন্তু হিমানীর বেলা সবই কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেল। সবে তিনি মেয়েটার গলা টিপে ধরেছেন আর সে চোখ উলটে গোঁ গোঁ করছে, তখুনি হঠাৎ মুখ তুলে তাকিয়ে দেখেন, ঘরের মধ্যে মুস্তাফা দাঁড়িয়ে। তিনি তো স্তম্ভিত! মুস্তাফা তাড়াতাড়ি তার ফেলে যাওয়া কোটটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

এখানেও আবার গণ্ডগোল। মুস্তাফাকে তাঁর চিরকালের জন্য সরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু লোকটা এতদিন তাঁর সমস্ত দুষ্কর্মে এতরকম সাহায্য করেছে যে, কেমন যেন লোকটাকে একেবারে মেরে ফেলতে ইচ্ছে হল না। তিনি তাকে একগাদা টাকা দিয়ে তার দেশ বিহারের কোনো গণ্ডগ্রামে পাঠিয়ে দিলেন এই কড়ারে যে, যতদিন না তিনি তাকে ডাকছেন, ততদিন সে যেন গ্রাম ছেড়ে কোথাও না-যায়।

তারপর হিমানীর মৃতদেহ কম্বলে মুড়ে গভীর রাত্রে পেছনের গলিতে ফেলে দিয়ে ফ্ল্যাটে তালা লাগিয়ে তাঁর ওল্ড বালিগঞ্জের বাড়িতে চলে গেলেন। ফ্ল্যাটের আসল মালিকরূপে পরিচিত বেঞ্জামিন গোমেস পরের দিন এসে উদয় হল।

গণ্ডগোল কিন্তু এখানেই মিটে যাওয়া উচিত ছিল, অথচ তা গেল না। তার প্রধান কারণ অবশ্য গাধা তড়িৎ আর কলকাতার স্টুপিড কাগজগুলো। সূর্যকুমার যে এত জনপ্রিয়, কে জানত। তার স্ত্রীকে নিহত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যাওয়ায়, কলকাতাসুদ্ধ লোক যেন খেপে গেল। কাগজগুলো যাচ্ছেতাই করে পুলিশকে গালিগালাজ করতে লাগল। কারোর আর খেয়েদেয়ে কোনো কাজ নেই, দিনরাত শুধু এই আলোচনা। এত বিরক্তিকর সব ব্যাপার!

পুলিশ বাধ্য হয়ে তদন্ত শুরু করল। দেখা গেল, সেখানেও গণ্ডগোল। যে ডি এস পি টি

তদন্ত শুরু করলেন, সেই শ্রীমন্ত বোস নাকি তড়িতের ভীষণ বন্ধু। সে কাগজে স্টেটমেন্ট দিল, যেভাবেই হোক, সে হত্যাকারীকে খুঁজে বের করবেই। এইসব ছেলে-ছোকরাদের বাড়াবাড়ি দেখলে রাগে হাড় জ্বলে যায় শশধরবাবুর।

তবে, এতেও তিনি খুব একটা ঘাবড়াননি। এর আগে একবার যখন সুপারিনটেন্ডেন্ট অব পুলিশ স্মৃতিময় ভট্টাচার্যিকে খুন করিয়েছিলেন, তখনও বেশ গোলমাল হয়েছিল। অবশ্য কিছুই হয়নি, সব ধামাচাপা পড়ে যায়। তবে, এবার যেন গোলমালটা আর থামতেই চায় না। রোজই পত্রিকা খুললে সূর্যকুমারের ছবি, তিনি শোকে কাঁদছেন, রাগে কাঁপছেন, মাথার চুল ছিঁড়ছেন। যত্তোসব! কিন্তু শেষপর্যন্ত যখন তড়িৎ বাড়ি ছেড়ে উধাও হল, তখন যেন কেমন একটু ভড়কে গেলেন শশধরবাবু। যাওয়ার আগে তাঁকে একটা চিঠি লিখে গেল, 'কাকাবাবু, হিমানীর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে চললুম। আপনি আমাকে যে খ্যাতির মধ্যে এনে ফেলে দিয়েছেন, তার মধ্যে থেকে কোনো কাজই করা যায় না, তা সে গোপনেই হোক বা প্রকাশ্যেই হোক। যতদিন না সেই নরখাদককে খুঁজে বের করে স্বহস্তে তার মাথাটা ধড় থেকে ছিঁড়ে ফেলছি, ততদিন ফিরব না। সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন।'

এরকম গোঁয়ার্তুমির কোনো মানে হয়? কী সর্বনেশে সব কথা! শশধরবাবু ভাবলেন, কিছুদিন তাহলে বিশ্রামই নেওয়া যাক। দেউকিপুরের বাড়িটা বহুদিন দেখাশোনা করা হয় না। অতবড়ো বাড়ি, কয়েকটা মালি, আর চাকরের ভোগে লাগছে। ওখানে গিয়ে কিছুদিন অজ্ঞাতবাস করলে, বিশ্রাম পেয়ে শরীরটা চাঙ্গা হবে আর কেউ হঠাৎ কোনো কিছু করে বসতে পারবে না। তড়িৎ ছেলেটা যেন একটু কেমন। ওকে কিছুই বিশ্বাস নেই। কী করতে যে কী করে বসে! মাস দু-তিনেক বাদে সব যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন আবার কাজে নামা যাবেখন।

কিন্তু তারমধ্যেই আবার এই ঝামেলা।

আজ সকালে স্টেশনের পাশে চায়ের দোকানে তড়িৎকে দেখে তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলেন শশধরবাবু। স্বাভাবিকভাবেই কী মনে হয়? তড়িৎ সব জেনে গেছে এবং তাঁকে তাড়া করে এখানে এসে হাজির হয়েছে। পরে, তড়িতের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝেছেন যে, না ব্যাপারটা ঠিক তা নয়।

আসলে, শ্রীমান গিয়েছিলেন তারকেশ্বর। সেসব ভালো কথা। আজকালকার ছেলেপুলে, ঠাকুর দেবতায় ভক্তিটক্তি হওয়া ভালো। সেখানে গিয়ে সে ঠাকুরের সামনে হত্যে দেয়। কে নাকি তাকে বলেছে, হত্যে দিলে স্বপ্নে ঠাকুর দেখা দিয়ে সমস্যার সমাধান করে দেন। হুঁ! যেমন তড়িৎ, তেমনি তার বন্ধুবান্ধব। ঠাকুরের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, হত্যে দিল আর তিনিও ছুটলেন তার সমস্যার সমাধান করতে! এসব কি হয় নাকি?

কক্ষনো হয় না। তড়িতের বেলায়ও হয়নি। মাঝখান থেকে বেচারির পকেটটি সাফ হয়ে গেছে। ক্যাবলাকান্ত জানে না, ধর্মস্থানে সাবধানে থাকতে হয়। সে যাহোক। মানিব্যাগ যে খোয়া গেছে, সেটা সে আবিষ্কার করে শ্যাওড়াফুলি যাওয়ার বাসে উঠে মাঝ রাস্তায়। কন্ডাক্টর স্বাভাবিকভাবেই এখানে নামিয়ে দিয়েছে। এখন হাতঘড়ি বাঁধা দিয়ে নিতাই সামন্তের কাছে কিছু পয়সা নিয়ে বসে বসে চা খাচ্ছিল। শশধরবাবুকে দেখে তো ছোকরা যেন আকাশের চাঁদ মুঠোর মধ্যে পেল।

শশধরবাবু ওর সামনে বসে সাবধানে জিগ্যেস করলেন, 'কী হল তোমার তড়িৎ? আর কতদিন এরকমভাবে ঘুরে বেড়াবে? বাড়ি ফিরে চলো। পুলিশ ঠিক সেই লোকটাকে খুঁজে বের করবে। তা ছাড়া আমি তো পুলিশমহলের সকলকেই বলে রেখেছি। চেষ্টার কেউ ত্রুটি করবে না।'

তড়িৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'না, কাকাবাবু। ওঁরা এগোবেন নিয়মমাফিক। তাতে দেরি হবে। কিন্তু আমি তো দেরি করতে পারি না। বেশি দেরি করলে হয়তো তাকে আর ধরা-ছোঁয়াই যাবে না।'

'কী আশ্চর্য। তাই বলে তুমি এমনিভাবে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াবে?'

তড়িৎ মৃদু হাসল। বলল, 'না কাকাবাবু, আর বেশিদিন ঘুরে বেড়াব না। মনে হচ্ছে পথের শেষে এসে প্রায় পৌঁছে গেছি।'

শশধরবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে জিগ্যেস করলেন, 'তার মানে?'

'মানে, এমন একটা সূত্রের সন্ধান পেয়েছি যে, সেই শয়তানটার পরিচয় পেতে আর বেশি বাকি নেই। সে লুকিয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু তার গোপন বাসের সন্ধান আমি এবার বের করবই।'

শশধরবাবুর বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠল। বললেন, 'একটু খোলসা করে বলো, বাবা তড়িৎ।'

'কী জানেন কাকাবাবু, একজনের সন্ধান পেয়েছি, যে নিজের চোখে সেই হত্যাকাণ্ডটা দেখেছে।'

'বলো কী? কোথায় থাকে সে?'

'অনেক দূরে কোথাও থাকে। সেখানেই প্রথমে যাব।'

মানে, মুস্তাফা আর কী। হুঁ, যাওয়াচ্ছি তোমায়, চটপট প্ল্যান ঠিক করে ফেললেন শশধরবাবু। এসব ব্যাপারে তাঁর মগজ খুব দ্রুত কাজ করে থাকে। বললেন, 'অনেক দূরে তো, যাবে কী করে? যেতে পয়সাকড়ি লাগবে না?'

তড়িৎ অন্যমনস্কভাবে বলল, 'কী জানি লাগবে কি না!'

'না-না, ওসব ছেলেমানুষি করো না। বিনা টিকিটে যেতে গিয়ে খুনি ধরা তো হবেই

না, উলটে জেলে পচতে হবে। তার চেয়ে বরং এক কাজ করো। আজ সন্ধে বেলা আমার বাড়িতে চলে এসো, তোমায় কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে দেব। তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করতে পারবে।'

কৃতজ্ঞতায় তড়িতের গলা বুজে এল প্রায়। বলল, 'আপনি আমায় আবার ঋণী করলেন, কাকাবাবু। তবে চিন্তা করবেন না, আপনার সব ঋণ আমি কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে দেব।'

'আরে, না, না। ওসব কিছু নয়। তুমি তাহলে সন্ধে বেলা এসো। তোমাকে এখুনি নেমতন্ন করতে পারতুম, কিন্তু আমাকে এখুনি একবার শ্যাওড়াফুলি যেতে হচ্ছে, সেখানে ইলেকশন সংক্রান্ত কিছু কাজ আছে, সেটা সেরেই আমি বিকেলের মধ্যে ফিরে আসব।'

তড়িৎ মাথা নেড়ে বলল, 'নিশ্চয়ই যাব, কাকাবাবু। সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যেই চলে যাব। আজকাল আর দিনের বেলা কাজ করার তেমন উৎসাহ পাই না, তাই এখন একটু এদিক-ওদিক কোথাও গিয়ে গড়িয়ে নেব। তারপর যাব। কোথায় বাড়িটা আপনার?'

শশধরবাবু ওঁর বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'দেখো, পথ হারিয়ে ফেলো না যেন। বাড়িটা ঘন বাগানের মধ্যে তো, তাই দিনের বেলায়ই ভালো করে কারোর নজরে পড়ে না। রাত্রি বেলা তোমার আবার খুঁজে পেতে অসুবিধে না-হয়।'

তড়িৎ বলল, 'না, না রাত্রি বেলা আমার কোনো অসুবিধে হবে না। আপনি এমন চমৎকার ডিরেকশন দিয়ে দিয়েছেন যখন, দেখবেন চোখ বুজে হলেও চলে যাব।'

শশধরবাবু মনে মনে বললেন, 'হ্যাঁ, চোখ বুজেই যাবে। তবে সে চোখ আর খুলতে হবে না।'

এরপর আর দেরি করা চলে না। শশধরবাবু সঙ্গেসঙ্গে ট্রেন ধরে চলে গেলেন শ্যাওড়াফুলি। সেখান থেকে ফোন করে জমরু আর শোভারামকে তক্ষুনি রওনা হয়ে যেতে বললেন মুস্তাফার বালিয়া জেলার গ্রামের দিকে। সঙ্গে দুটো স্টেনগান নিয়ে নিতে বললেন, যাতে ফসকানোর কোনো সুযোগ না-থাকে। একেবারে গুলি করে যেন ঝাঁঝরা করে দেয়। তারপর বাড়ি ফিরে এসে চাকর-মালিদের ছুটি দিয়ে দিলেন। মুস্তাফার ভুল আর দ্বিতীয় বার করতে রাজি নন তিনি। এমনকী, যে কবরে তড়িৎকে চাপা দেবেন, সেটা পর্যন্ত নিজে খুঁড়েছেন, যাতে কারোর মনে কোনোরকম সন্দেহ না-জাগতে পারে।

এইবার সমস্ত কিছু রেডি। কেবল নিমন্ত্রিতটির আসবার অপেক্ষা। বেচারা জানে না, যাকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে, সেই তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসছে। তা না-হলে এ-বাড়ি সে জীবনে কোনোদিন খুঁজে পেত না।

কিন্তু সব কিছু ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও কোথায় যেন একটা অস্বস্তি ক্রমাগত শশধরবাবুর

মনের মধ্যে খচখচ করে যাচ্ছে। একটা অদ্ভুত ভয় গলার কাছে একটি কঠিন পিণ্ডের মতো দানা বেঁধে উঠছে। বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট চলেছে সমানে। নীচের তলার ঘরগুলোর মধ্যে সেই হাওয়ার গুমরে ওঠা হাহাকার শশধরবাবুর বুকের মধ্যে একটা বরফ-শীতল ভারের মতো ক্রমশ চেপে বসছে। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে, কোথায় যেন কী একটা ভয়ানক গোলমাল হয়ে গেছে। কিন্তু কী যে হয়েছে, কিছুতেই সেটা ধরতে পারছেন না।

শেষপর্যন্ত বিরক্ত হয়ে দুত্তোর বলে শশধরবাবু ট্রানজিসটারটা খুলে দিলেন। বাংলায় খবর শুরু হয়ে গেছে। আজেবাজে যত ভ্যাজভ্যাজানি। কে যে এসব খবর শোনে, কে জানে!

সিঁড়ির ঘড়িতে টং করে সাড়ে সাতটা বাজল। একটু বাদেই বাগানের দরজাটা খড়খড় করে খুলে যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। বাগানের নুড়ি বিছানো রাস্তার ওপর একটি ভারী পদশব্দ এগিয়ে আসছে।

এইবার। এইবার অ্যাকশন।

শিকার দেখলে একটা ক্ষুধার্ত বাঘ যেমন প্রথমে ধীরে ধীরে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ায়, তেমনিভাবে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াতে গেলেন শশধরবাবু, কিন্তু পারলেন না। একটা ভয়ংকর আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে ধপ করে বসে পড়লেন।

কারণ, রেডিয়োর সংবাদপাঠক তখন বলছেন, 'আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে বাংলা চলচ্চিত্রের বিখ্যাত অভিনেতা সূর্যকুমার, আজ সকালে পরলোক গমন করেছেন। তারকেশ্বর স্টেশনের বাইরে রেললাইনের ধারে তাঁর মৃতদেহ আজ পুলিশ আবিষ্কার করে। তাঁর মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি, তবে পুলিশের ধারণা এটা হত্যাকাণ্ড নয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, কিছুদিন পূর্বে তাঁর স্ত্রীর রহস্যময় মৃত্যুর পর তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন।'

বাইরে তখন ঝোড়ো হাওয়া যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে। আর পায়ের শব্দটা এগিয়েই আসছে, এগিয়েই আসছে।

গঙ্গাধরের সাংবাদিকতা

জীবনবল্লভ কুণ্ডু কিছু না-হোক বিশবছর ধরে বাড়ির দালালি করছেন। খদ্দেরের মুখ দেখলেই বুঝতে পারেন যে বাড়ি তাঁর পছন্দ হয়েছে কিনা। কিন্তু জয়ন্ত সরকার এতই বিমুগ্ধ-নয়নে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ছিল যে তার মনের অবস্থা বোঝার জন্য বিশবছর তো দূরস্থান, কোনো অভিজ্ঞতারই দরকার হয় না।

অনেকক্ষণ বাড়িটা দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যেন অনেক কষ্টে চোখ ফিরিয়ে জয়ন্ত সরকার জীবনবল্লভকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা জীবনবাবু, বাড়িটা হানাবাড়ি, তাই না?'

এরকম একটা প্রশ্নের জন্য জীবনবল্লভ একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। হ্যাঁ-না কিছুই না-বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে হাতের প্রাগৈতিহাসিক পোর্টফোলিয়ো ব্যাগটা দোলাতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে জয়ন্ত আবার জিগ্যেস করল,' কী হল? কিছু একটা বলুন?'

জীবনবল্লভ কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'কী আর বলব স্যার? আপনি সাংবাদিক, সব খোঁজখবরই নিয়েই তো এসেছেন। আপনার কাছে মিথ্যা বলে আমার তো কোনো সুবিধে হবে না। সব-ই যখন জানেন, তখন আর আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন কেন?'

'না-না, আমি কিছুই জানি না, আর কোনোরকম খোঁজখবর নিয়েও আসিনি। বাড়িটা দেখে আমার কীরকম মনে হল যে বাড়িটাতে ভূত আছে। সেটা কি সত্যি?'

'সত্যি-মিথ্যে তো জানি না, স্যার। তবে লোকে নানান কথা বলে। বাড়িটা এর আগে যতবার ভাড়া নিয়েছে, ভাড়াটে সাতদিনের মধ্যে তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালিয়েছে। কেন পালিয়েছে, কোথায় পালিয়েছে সেসব কেউ জানে না। অ্যাডভান্সের টাকা পর্যন্ত ফেরত নিতে আসেনি।'

পুলকিত-মুখ জয়ন্ত বলল, 'বলেন কী?'

জীবনবল্লভ অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলেন, জয়ন্তর মুখের দিকে লক্ষ করেননি।

বিমর্ষভাবে বললেন, 'হ্যাঁ, স্যার। সত্যিই বলছি। চলুন তাহলে, লেক স্কোয়ারের বাড়িটাই দেখতে যাই।'

জয়ন্ত বলল, 'সে কী কথা? এমন বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে যাব কেন?'

'এ-বাড়ি আপনি নেবেন স্যার? তার আগে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একবার কথা বলে নিলে হত না?'

'কথা বলব বই কী। সে যখন জানবে যে শেষপর্যন্ত একটা সত্যিকারের হানাবাড়ি পাওয়া গিয়েছে, তখন সে এত খুশি হবে যে সে আর বলার নয়।'

ব্যাগ দোলানো বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়ালেন জীবনবল্লভ। বললেন, 'ব্যাপারটা কী বলুন তো? লোকে ভূতের বাড়ি শুনলে রাম রাম করতে করতে পালায় আর আপনারা খুশি হয়ে উঠছেন! এটা তো ভারি আশ্চর্য ব্যাপার!'

'এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমার স্ত্রী প্যারাসাইকোলজি আর অকাল্ট মানে ভূতপ্রেত, মন্ত্রতন্ত্র এইসব ব্যাপার নিয়ে রিসার্চ করছে। আমিও এসব ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড। আসলে প্ল্যানচেটের আসরেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সেদিন সেখানে আমরা সম্রাট ধর্মপালকে ডেকেছিলুম। তিনিই আমাদের বিয়ে করতে বলেন। তা সম্রাট বলে কথা। তাঁর কথা তো আর অমান্য করা যায় না। তার থেকেই বিয়ে হল আমাদের।'

জীবনবল্লভ একটা মস্তবড়ো হাঁ করে জয়ন্তর কথা শুনছিলেন। বললেন, 'সম্রাট ধর্মপাল আপনাদের বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন? মানে সেই পালরাজাদের ধর্মপাল? বলেন কী মশাই?'

'হ্যাঁ, সেই সম্রাট ধর্মপাল। এতে এত আশ্চর্য হবার কী আছে? সম্রাটরা কি আর মানুষ নয়? তারাও খায়দায়, চান করে, ঘুময়। ঘটকালি করতে পারবে না কেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। পারবে বই কী। নিশ্চয়ই পারবে। কেন পারবে না? আমি তাহলে এই বাড়িটাই ঠিক করে ফেলছি কী, বলেন?' বলে ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁটা লাগালেন জীবনবল্লভ।

জায়গাটা বেশ ভালোই। যাদবপুর রেলস্টেশন থেকে পনেরো মিনিটের হাঁটাপথ, চারদিকে ফাঁকা-ফাঁকা। বাড়িটার দক্ষিণে রাস্তা, তারপরে একটা পুকুর। পেছনে আর দু-পাশে অনেকটা জমিজমা নিয়ে বাংলো-টাইপের বাড়ি। ফলে বেশ একটা নির্জন নির্জন ভাব। ট্রেনের শব্দ বা সুকান্ত সেতু থেকে আসা বাসের হর্নের আওয়াজ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেটা কর্ণবিদারী কিছু নয়।

বাড়িটা একতলা। রঙিন কাচ-বসানো খিলেন করা চকচকে দরজা-জানলা। বাইরের দেওয়ালে হলদেটে আর টেরাকোটায় কম্বিনেশন করা সিমেন্ট পেন্ট, বাইরের বারান্দার দেওয়ালে ঝকঝকে সাদা ডিসটেম্পার। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বাড়িটা কেমন যেন বিষণ্ণ,

প্রাণহীন। হানাবাড়ি বললেই যেমন মনে হয়— ভাঙাচোরা দেওয়াল, ফাটলে অশ্বত্থগাছ, খসে-পড়া পলেস্তারা খুলে পড়া দরজা-জানলা, সেরকম কিন্তু এ-বাড়িটা একেবারেই নয়। তবুও এর বারান্দায় পা রাখলে গা ছমছম করে।

জয়ন্ত আর পারমিতা মহাখুশি। পারমিতা বলল, 'দারুণ বাড়ি। ঢুকতেই যেন শরীরটা কেমন কেমন করছে।'

জয়ন্ত বলল, 'যা বলেছ। এই তো দ্যাখো না, আমার গায়ের লোম সব খাড়া হয়ে উঠছে, বুকের ভেতরে ঢিপঢিপ করছে। বেশ জমবে, কী বলো?'

'তা আর বলতে। শুধু যারা আমাদের মালপত্র নিয়ে এল, তাদের কথা ভেবে আমার একটু দুঃখ হচ্ছে। যা পয়সা দিলুম, তাই নিয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাল। বখশিশ চাওয়া তো দূরস্থান, গুনে দেখল না পর্যন্ত। আবার যাবার সময় বলে গেল, এ-বাড়িতে থাকবেন না মেমসাহেব, পালান!'

মাসখানেক কেটে গেছে। পরমানন্দে দিন কাটছে জয়ন্ত-পারমিতার। এর মধ্যে অবশ্য অনেক কিছুই ঘটে গেছে। প্রায় প্রত্যেক রাত্রেই তাদের প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে খাটের থেকে ছিটকে মেঝেয় পড়তে হয়েছে। রান্নাকরা মুসুরির ডালের রং কখনো লাল, কখনো বা সবুজ হয়ে গিয়েছে। টেবিল-চেয়ার মেঝে থেকে উঠে শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দরজা-জানলা কখনো খুলছে, কখনো বন্ধ হচ্ছে। সেই সঙ্গে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ। জানলার নীচে দুটো বেড়াল রাত বারোটা বাজলেই বিকট সুরে ঝগড়া করছে।

এর ফলে পারমিতার আনন্দ আর উত্তেজনার শেষ নেই। তার নোটবই-এর পাতার-পর-পাতা ভরতি হয়ে উঠছে। সে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, কোথায় কী ঘটছে সে-ব্যাপারে লিখে ফেলবার জন্য। আর জয়ন্তর কাজ হচ্ছে বাড়িটার অদৃশ্য বাসিন্দা বা বাসিন্দাদের সঙ্গে একটা যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। কখনো চিৎকার করে ডেকে, কখনো বা ধ্যানস্থ হয়ে সে একটা কথাবার্তা শুরু করার চেষ্টা করে যাচ্ছে, যদিও তাতে কোনো ফল এখনও পাওয়া যায়নি।

অবশেষে বাড়িটার আদি-বাসিন্দার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

সেদিন রবিবার। পারমিতা গেছে বাজার। জয়ন্ত সন্ধে বেলা বসবার ঘরে বসে টেলিভিশনে মনোসন্নিবেশ করার চেষ্টা করছিল। এত আজেবাজে সব প্রোগ্রাম যে কিছুতেই তার চেষ্টা সফল হচ্ছিল না।

হঠাৎ দপ করে বাড়ির সব আলো নিভে গেল। জয়ন্ত গলা বাড়িয়ে দেখল আশেপাশে সর্বত্র আলো জ্বলছে, অর্থাৎ লোডশেডিং নয়। তার মানে এখনই ভৌতিক কার্যকলাপ শুরু হবে। টেলিভিশনের জঘন্য প্রোগ্রামের চেয়ে সেটা শতগুণে ভালো।

ঠিক তাই হল। হঠাৎ ঘরের মাঝখানে মেঝে থেকে ফুট তিনেক ওপরে একটা নীলাভ আলোর বিন্দু দপ করে জ্বলে উঠল। সেটা বোঁ করে একবার সারাঘরে ঘুরে এসে জয়ন্তর নাকের ঠিক সামনে দুলতে লাগল। সেই আলোর বিন্দুটার ভেতর থেকে একটা ক্ষীণ কিন্তু স্পষ্ট গলা শোনা গেল, 'কীরকম লোক মশাই আপনারা? মানুষ না-আর কিছু?' গলাটা মোটা আর চেরা চেরা।

জয়ন্ত হাত নেড়ে বলল, 'কেন? দিব্যি সুস্থ-সবল দু-জন মানুষ। হাত আছে, দুটো পা আছে।'

'ছাই আছে। দুটো হাত-পা থাকলেই মানুষ হওয়া যায় না, বুঝলেন? বুদ্ধি! বুদ্ধি থাকা চাই। সেই বস্তুটিই তো আপনাদের ঘটে নেই। আপনারা যে কী ভয়ানক বিপদের মধ্যে রয়েছেন সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন না।'

'বিপদ? কীসের বিপদ?'

'ভূতের। আবার কীসের? বুদ্ধিমান লোকমাত্রেই ভূতের ভয় পায়, তা জানেন?'

'আজ্ঞে না তো।'

'সেই জন্যই তো বলছি, ঘটে কিসসু নেই। এই যে আমি আপনাদের ঘাড় মটকে দিতে পারি, তা জানেন?'

'আজ্ঞে না, এত সোজা নয়। আমরা দু-জনেই ক্যারাটে ব্ল্যাকবেল্ট। আমাদের ঘাড় মটকাতে এসে আপনারাই মুণ্ডু ঘুরে যেতে পারে।'

আলোর বিন্দুটা চট করে একটু পেছিয়ে গেল। গলা শোনা গেল, 'দু-জনেই ব্ল্যাকবেল্ট? ওরে বাবা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঘাড় মটকানো-ফটকানো পরে দেখা যাবে। এখন বলুন, আমারই বাড়ি থেকে আমাকে কেন আপনারা বিতাড়িত করতে চান?'

'আপনাকে বিতাড়িত করতে যাব কোন দুঃখে? উলটে আমরা তো একসঙ্গেই থাকতে চাই। আপনি আপনার মতো থাকবেন, আমরা আমাদের মতো থাকব। যখন সময় পাব বেশ জমিয়ে আড্ডা মারব।'

'দূর! কী যে বলেন তার ঠিক নেই। ভূত আর মানুষ কখনো একসঙ্গে থাকতে পারে?'

'কেন পারবে না? আপনি হলেন অতীতের মানুষ, বর্তমানের ভূত। আমরা হলুম বর্তমানের মানুষ, ভবিষ্যতের ভূত। এই তো তফাত। তাহলে না-পারার কী আছে?'

'হেঁ-হেঁ। না, মানে আপনার প্রস্তাবটি খুবই লোভনীয়। একা-একা থাকি তো। সবাই ভয় পায় বলে আমিও ভয় দেখাই। নইলে আমি কিন্তু আড্ডাবাজ লোক। তা ছাড়া ইয়ে, আপনার স্ত্রী রাজি হবেন তো?'

'হবেন মানে? হয়েই আছেন বলতে পারেন। তাহলে এবার বলুন, জীবন্তদশায় আপনি কে ছিলেন, মানে আপনার পরিচয় কী ছিল?'

'কলকাতায় উষার আলো বলে একটা খবরের কাগজ ছিল। নাম শুনেছেন?'

জয়ন্ত চিন্তিত-মুখে বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ। শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু সে তো বহুকাল আগেকার কথা। বোধহয় আমার জন্মেরও আগে কাগজটা বন্ধ হয়ে যায়।'

'তাই হবে। উনিশ-শো সাঁইত্রিশ সালে আমি মারা যাবার পরের বছর আমার গুণধর পুত্র সেটা বন্ধ করে দেয়। যাই হোক, আমি ছিলুম সেই পত্রিকার মালিক এবং সম্পাদক। আমার নাম ছিল গঙ্গাধর নন্দী। এ-বাড়িটা বানাই ছত্রিশে, মারা যাবার আগের বছর।'

উল্লসিত হয়ে জয়ন্ত বলল, 'আপনিও সাংবাদিক? মানে ছিলেন? তবে আর কী। আমাদের আড্ডা তো তাহলে দারুণ জমবে।'

দুদিন পরের কথা।

পারমিতা পড়ায় মহামায়া কলেজে। বাড়ি থেকে ন-টায় বেরিয়ে যায়। জয়ন্ত বের হয় বেলা বারোটায়। সেদিন দশটা বাজতে-না-বাজতে জয়ন্তর কাঁপ দিয়ে জ্বর এল। গায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। সে খাটে শুয়ে পড়ে চিঁ-চিঁ করে, 'জ্যাঠামশাই! ও জ্যাঠামশাই!' বলে ডাকাডাকি শুরু করল।

একটু পরেই খাটের পাশে দপ করে নীল আলোর বিন্দুটা জ্বলে উঠল। কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কী হল? ডাকছ কেন? ও বাবা, জ্বর হয়েছে দেখছি।'

জয়ন্ত বলল, 'হ্যাঁ, ভাইরাল ফিভার। কলকাতায় কিছুদিন হল এসেছে। সকলের হচ্ছে। আমাদের অফিসসুদ্ধু সবাই বিছানায় শুয়ে পড়েছে। আমার যা স্বাস্থ্য, তাতে আমারও যে হবে ভাবিনি। দু-দিন খুব ভোগাবে।

'তা আমাকে ডাকছ কেন বললে না তো?'

'আমি ভয়ানক বিপদে পড়ে গেছি জ্যাঠামশাই। এখন এই বিপদ থেকে একমাত্র আপনিই উদ্ধার করতে পারেন।'

'কীসের বিপদ?'

'আপনি কি জানেন যে আজ ইস্ট পুটিয়ারী আর কালীগঞ্জ অগ্রগামীর ফুটবল খেলা? ভয়ানক ইম্পর্ট্যান্ট খেলা। এর ওপর লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ভর করছে। আমার খেলাটা কভার করার কথা ছিল। অথচ এই তো অবস্থা। অফিসে যে খবর দেব, তার উপায় নেই। দিলেই বা কী হবে? কেউ নেইও যে আমার জায়গায় যাবে। আপনি যদি দয়া করে খেলাটা দেখে একটা রিপোর্ট বানিয়ে দেন তাহলে আমি বাঁচি। আপনি অভিজ্ঞ সাংবাদিক। কী করতে হবে তার সবই তো আপনি জানেন। আমি আজ সন্ধে বেলায় পারমিতাকে দিয়ে রিপোর্টটা অফিসে পাঠিয়ে দেব।'

'টেলিভিশনে দেখে নাও না।'

'ওটার দিকে তাকাতে পারছি না। তাকালেই মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। যান-না জ্যাঠামশাই! বেশি দূর তো নয়।'

'যাচ্ছি রে বাবা যাচ্ছি, আজ সন্ধে বেলা রিপোর্ট পেয়ে যাবে।'

সন্ধে বেলা নীল আলোর বিন্দুটার ভেতর থেকে একটা পাকানো কাগজ ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে এসে জয়ন্তর বুকের ওপর পড়ল। গঙ্গাধরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'এই নাও তোমার রিপোর্ট।'

জয়ন্ত প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে রিপোর্টটা পড়তে শুরু করল। পড়তে পড়তে ওর চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল, ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল। তারপর পড়া শেষ করে অনেকক্ষণ স্তম্ভিত-দৃষ্টিতে কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইল। অবশেষে পারমিতার হাতে দিয়ে জয়ন্ত বলল, 'এই এতদিনে আমার চাকরিটা গেল।' বলে ধপাস করে চোখ বুজে শুয়ে পড়ল।

পারমিতা রিপোর্টটা পড়তে শুরু করল।

প্রথমে হেডলাইন— লিগ ম্যাচে তাণ্ডব। খেলা অর্ধপথে পরিত্যক্ত। রেফারি গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভরতি।

আজ ছিল ময়দানে ইস্ট পুটিয়ারী আর কালীগঞ্জ অগ্রগামীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেলা। উভয় পক্ষই যে এই ম্যাচে প্রাণ দিয়ে লড়বে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। এটা ছিল দুই দলেরই কেবল বাঁচার লড়াই নয়, সম্মানেরও প্রশ্ন।

ফলে দর্শক-গ্যালারিতে তিলধারণেরও জায়গা ছিল। র‍্যামপার্টও ভরতি হয়ে গিয়েছিল। কলকাতা ফুটবলের অনেক দিকপাল তারকাই খেলা দেখতে উপস্থিত ছিলেন। পূর্বদিকের পাঁচিলের ওপর পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন সুন্দরকাননের স্বনামধন্য ফুলব্যাক গোপীকৃষ্ণ দত্ত, যাঁকে একসময় কলকাতার মাঠের ম্যাজিনো লাইন বলা হত। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁরই ক্লাবের গুরুদাস ভাদুড়ি আর বিজয় শুক্লা। স্বাধীনতার আগে মিলিটারি টিমের সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দিয়ে খেলে এঁরা নিজেদের বাংলার তথা ভারতের আত্মসম্মানের প্রতীক করে তুলেছিলেন। উত্তরদিকের গোলপোস্টের ওপর বসেছিলেন ইস্ট পুটিয়ারীর অরুণ সোম, চিত্ত দাশগুপ্ত, রণেন গুহ এবং আরও অনেক বিখ্যাত খেলোয়াড়। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, দক্ষিণদিকের গোলপোস্টের ওপর বসেছিলেন বিংশ শতাব্দীর গোড়োর দিকের বেশ কিছু মিলিটারি টিমের নামজাদা খেলোয়াড়, যথা প্ল্যাংকটন, ডোডো, রকি প্রভৃতি।

খেলা প্রথম থেকেই খুব জমে ওঠে। পাঁচ মিনিটের মাথায় কালীগঞ্জ অগ্রগামীর ইতালিয়ান স্ট্রাইকার আন্তেগিয়েও আনিনি মাঝমাঠ থেকে একক প্রচেষ্টায় বল টেনে নিয়ে গিয়ে গোলে যে প্রচণ্ড শটটি করেন, সেটি ইস্ট পুটিয়ারীর সাউথ কোরিয়ান গোলরক্ষক কিম নো ভ্যাক অনেক কষ্টে আটকান। এর তিন মিনিটের মধ্যেই ইস্ট পুটিয়ারীর নাইজেরিয় ফরোয়ার্ড

কিমা তর্কারি এবং কালীগঞ্জ অগ্রগামীর ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার জোসে মারিও-র মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। ফলে দু-জনকেই কিছুক্ষণের জন্য মাঠের বাইরে যেতে হয়। রেফারি প্রশান্ত ভদ্র ইস্ট পুটিয়ারীর পক্ষে ফ্রি-কিক দিলে দর্শকদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাধতে থাকে। ফ্রি-কিক নিতে যাচ্ছিলেন ইস্ট পুটিয়ারীর ইউক্রেনীয় রাইট ফুলব্যাক কিকরিস্কি। এই সময় হঠাৎ দেখা গেল, উত্তরের গোলপোস্ট থেকে অরুণ সোম হুপ করে নেমে এসে কিকরিস্কির ঘাড়ে চড়ে বসলেন। তখন দক্ষিণের গোলপোস্ট আর পূর্বদিকের পাঁচিল থেকে সমস্বরে শেম-শেম আওয়াজ উঠল। তাতে লাভ কিছু হল না। কিকরিস্কির ফ্রি-কিক কামানের গোলার মতো প্রচণ্ডবেগে বিপক্ষের গোলে ঢুকে গেল।

এবার গোলমাল বাড়তে শুরু করল। কুড়ি মিনিটের মাথায় গোলপোস্ট থেকে লাফ দিয়ে এসে ডোডো কালীগঞ্জের জাপানি স্টপার টাকামাটি মাটিটাকার ঘাড়ে চড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাস্য ক্ষীপ্রতায় বিপক্ষের সমস্ত বাধা লঙ্ঘন করে তিনি গোলে বল ঢুকিয়ে দিলেন। তারপরেই কিকরিস্কি আর টাকামাটির মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। তাই দেখে যত প্রাক্তন খেলোয়াড়দের প্রেতাত্মা দু-দলের প্লেয়ারদের ঘাড়ে চড়ে প্রচণ্ড মারামারি শুরু করে দিলেন। এরপরই গ্যালারির তলা থেকে উভয়দলের মৃত সমর্থকরা বেরিয়ে এসে দর্শকদের কাঁধে বসে মাঠে নেমে পড়লেন। মাঠের মধ্যে ভূতের নৃত্য শুরু হয়ে গেল। রেফারি ভদ্র খেলা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন।

তাতে কিন্তু মারামারি বন্ধ হল না। নিরুপায় হয়ে রেফারি ভদ্র হাতজোড় করে সকলকে শান্ত হবার জন্য অনুরোধ করতে গেলেন। তৎক্ষণাৎ উভয়পক্ষই পরস্পর বিদ্বেষ ভুলে তাঁকে ধরে আপাদমস্তক পেটাতে শুরু করল। ফলে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভরতি হতে হয়েছে।

মেঘমালা

আমি সরকারদের রোয়াকে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলুম। আমার চারদিকে নানারকম শব্দ আর সেইসঙ্গে একটা তালগোল পাকানো স্রোত বইছিল, যার কিছুই আমার বোধগম্য হচ্ছিল না। মাঝে মাঝে দু-একটা শব্দ কানে আসছিল। যেমন কেউ একজন বললেন, 'কেমন পাথরের মতো বসে আছে দেখুন, মনে হয় দেহে প্রাণ নেই।' তার উত্তরে কোনো একটি নারীকণ্ঠ বলল, 'তাতো হবেই। যা বাঁচা বেঁচেছে ছেলেটা।' কে একজন মোটা গলায় ঘোষণা করলেন, 'মিরাকল, মিরাকল!' কিন্তু আমি একথাগুলোর কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছিলুম না। এগুলো কি আমার সম্বন্ধেই বলা হচ্ছে? আমি কিছু চিন্তা করতে পারছি না। আমার মনটা যেন অসাড় হয়ে গেছে।

আসলে এসব কথাগুলো আমার মনে কোনোরকম দাগই কাটতে পারছিল না, কারণ আমি তখন আমার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে আমাদের বাড়িটার কথা ভাবছিলুম। বাড়িটা আর নেই। একটু আগেও যেটা আমার আশ্রয় ছিল সেটা তখন একটা প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসস্তূপের মতো আমার সামনে পড়ে আছে। পাড়ার লোকেরা আর দমকল কর্মীরা বড়ো বড়ো ইটের চাঙড় সরিয়ে মৃতদেহ খুঁজছে। ফুটপাথের ওপর চাদর ঢাকা দিয়ে চারটে মৃতদেহ পাশাপাশি রাখা আছে। আমি জানি ওরাই ছিল, আর কেউ নেই। কিন্তু সে কথাটা বলতে ইচ্ছে করছে না। কী হবে বলে?

আমি শুধু বাড়িটার কথা ভাবছিলুম।

এমন কিছু আহামরি বাড়ি তো ছিল না। ষোলো নম্বর জানকীনাথ চাটুজ্জে স্ট্রিটে দশকাঠা জমির ওপর এই বাড়িটা বানিয়েছিলেন আমার ঠাকুরদাদা উনিশ-শো চল্লিশ সালে, যে বছর আমার বাবার জন্ম হয়। মাঝারি চারটে ঘর নিয়ে একতলা তুলেছিলেন। কোনো আড়ম্বরপূর্ণ ছিল না, কোনো চাকচিক্যও ছিল না। উনিশ-শো

পঁয়ষট্টিতে বাবার বিয়ে হয়েছিল। তখন দোতলায় দুটো ঘর তোলা হয়। সত্তর সালে আমার জন্ম। সেই তখন থেকে আর একটু আগে পর্যন্ত, এই চব্বিশ বছর ওই দুটো ঘরই ছিল আমার রাজত্ব। সে রাজত্বে বিলাসিতা ছিল না, তবে সুখ ছিল। আমাদের ঘরের সামনে ছিল খোলা ছাদ। সেখানে বিকেল হলে মা মাদুর পেতে বসত। গোধূলির ম্লান আলোয় চাপা শান্ত গলায় মা কখনো গানের পর গান গাইতো, কখনো সঞ্চয়িতার কবিতা পর পর মুখস্থ বলে যেত। মার মুখেই আমি প্রথম শুনেছিলুম, 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা।' মা গানটা কখনোই শেষ করতে পারত না, গলা বুঁজে আসত। শুনেছি, এই গানটা না কি বাবার খুব প্রিয় গান ছিল।

আমার বাবাকে আমার খুব আবছা মনে পড়ে। একজন দীর্ঘদেহী মানুষ একটা শুকনো গাছের ভাঙা ডাল নিয়ে আমার সঙ্গে তরোয়াল খেলছেন— এ-ছবিটা আমার মনে আছে। তাঁর ফোটোগ্রাফ যা দেখেছি তাতে দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ তো বোঝা যায় না, কিন্তু তাঁর শান্ত সজল চোখদুটো তাঁর মেধা আর ব্যক্তিত্বের একটা পরিচয় দিত। বাবা কলকাতার একটা নামজাদা কলেজের নামজাদা ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। মা না কি তাঁর ছাত্রী ছিল। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসে ব্লাড ক্যান্সারে বাবা মারা যান। ঠাকুরদাদা আর ঠাকুমা দু-জনেই তখন জীবিত। ঠাকুরদাদার বয়েসও তখন ভয়ংকর রকমের বেশি নয়। বোধ হয় পঁয়ষট্টি হবে। তাঁর শরীর ও মন, দুই-ই শক্ত ছিল, নিজেকে সামলে নিতে পেরেছিলেন। তবে ঠাকুমা পারেননি। দু-বছর পরেই সন্ন্যাস রোগে মারা যান।

তখন আমাদের সংসারে শুধুমাত্র তিনজন লোক। কিংবা আড়াইজন। মা স্কুলে পড়ানো শুরু করল। সে যুগে স্কুলে পড়ানো টাকাপয়সার দিক থেকে একেবারেই লোভনীয় ছিল না; বরং তার পরিমাণ এতই কম ছিল যে ঠাকুরদাদার পেনশনের টাকা যোগ দিয়েও তিনজনের সংসার চালানো কঠিন ব্যাপার ছিল। ফলে মাকে একটা টিউশনি নিতে হয়েছিল। শুনেছি, ঠাকুরদাদা না কি আবার চাকরির চেষ্টায় নেমেছিলেন, কিন্তু পরে হাল ছেড়ে দেন। তাঁর প্রৌঢ়ত্ব আর সামান্য একটা এমএ ডিগ্রি জীবনযুদ্ধে লড়াই করার সুযোগ তাঁকে দেয়নি। ফলে, তিনি আমাকে মানুষ করার দুরূহ চেষ্টায় বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

লড়াই করে গেল মা— অবিশ্রান্ত, ক্লান্তিহীন; কিন্তু সেজন্য কোনোদিনও মাকে বিষণ্ণ বা বিরক্ত হতে দেখিনি। অবসন্ন দেখেছি কিন্তু নিজের ভাগ্যকে কখনো অভিসম্পাত দিতে শুনিনি। কেবল আমার যখন জন্ডিস হয়ে খারাপের দিকে গেল, ডাক্তারবাবু মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে চলে গেলেন, কেবল সেদিন মা-কে

দেখেছিলুম বাবার ছবির দিকে হাতজোড় করে তাকিয়ে অশ্রুবিসর্জন করতে।

আমি কিন্তু মার কথা ভাবছি না। ঠাকুরদাদা বা বাবার কথাও নয়। আমি ভাবছি বাড়িটার কথা আর মেঘমালার কথা। মেঘমালার কথা ভাবতে গেলে, এসব কথা অবশ্য এসেই যায়। আমি যদি জন্ডিস হয়ে মরতে না-বসতুম, তাহলে হয়তো কোনোদিনই আমার মেঘমালার সঙ্গে দেখা হত না।

আমার তখন পনেরো বছর বয়েস। সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা। এই সময় আমার জন্ডিস হয়েছিল। ডাক্তারবাবু জবাব দেওয়া সত্ত্বেও মরিনি, বেঁচে উঠেছিলুম। কিন্তু, নড়াচড়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ঘর থেকে বেরুনোই বারণ ছিল। তখন আমার পড়ার টেবিলটা ঠাকুরদাদার ঘর থেকে আমাদের ঘরে এনে রাখা হল। একটা নতুন চকচকে টেবিল ল্যাম্পও এল। এমনকী নীল রঙের চৌখুপি ডিজাইন করা একটা টেবিল ক্লথ পর্যন্ত পাতা হল।

টেবিলটা রাখা হয়েছিল উত্তর দিকের জানলাটার পাশে। সে জানলাটা জন্মাবধি আমি কখনো খোলা দেখিনি। সেটা যে খোলা যায় তাই কখনো আমার মনে হয়নি। এবার মিস্ত্রি ডেকে জানলাটাও খুলে দেওয়া হল।

জানলাটা বন্ধ করে রাখার অবশ্য একটা কারণ ছিল।

স্বাধীনতার পরের বছর, পূর্ব বাংলা থেকে ঠাকুরদাদার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় এসে এ বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন সপরিবারে। তাঁর নাম ছিল প্রদীপ কুমার ঘোষ। প্রায় একবস্ত্রে এসেছিলেন, কোলে তিনমাসের একটি মেয়ে। উত্তরদিকের একটা ঘরে তাঁদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা সেখানে প্রায় একটানা আঠাশ বছর থেকে পঁচাত্তর সালে অন্যত্র চলে যান। সে বছরই আমার বাবার মৃত্যু হয়েছিল।

ঘোষ পরিবারের আমাদের বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার কারণে অবশ্য বাবার মৃত্যু হয়নি। প্রদীপবাবুর বড়ো ছেলে ব্যাঙ্গালোরে ভালো চাকরি পেয়ে তার বাবা, মা আর ছোটো বোনকে সেখানে নিয়ে চলে যান। তাঁদের কাউকেই আমার মনে পড়ে না। আমি কেবল তাঁদের ফোটোই দেখেছি। প্রদীপবাবুর বড়ো মেয়ের ওই বাড়িতেই বিয়ে হয়েছিল।

এখন অবশ্য ইতিহাস। কথা হচ্ছিল, উত্তর দিকের দোতলার জানলাটা বন্ধ থাকার কারণ নিয়ে; তবে এসব ইতিহাস একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। আসলে আমাদের বাড়ির একতলায় একটাই বাথরুম ছিল। সেটা দুটো পরিবারের একসঙ্গে ব্যবহার করায় ঠাকুমার আপত্তি ছিল। তখন ঠাকুরদাদা উত্তর দিকের খালি জমিটায় একটা কুয়ো খুঁড়ে দেন আর একটা কলঘর বানিয়ে দেন। ফলে ওই উত্তরের জমিটা ঘোষ পরিবারের মহিলাদের যাবতীয় সাজকর্মের জায়গা হয়ে দাঁড়ায়। সেইসব

কাজকর্মের মধ্যে চান করা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা ইত্যাদি সব-ই ছিল। যখন দোতলা উঠল তখন আব্রু রাখার জন্য উত্তর দিকের জানলাটা সবসময়ের জন্য বন্ধই রাখা রইল। না-রাখলে সেটা অন্যায় হত, কারণ প্রদীপবাবুর বড়ো মেয়ের বয়েস তখন সতেরো আর ছোটো মেয়ের চোদ্দো। এরপর যখন বাবা মারা গেলেন, ঘোষ পরিবার একতলাটা খালি করে চলে গেলেন, তখনও জানলাটা বন্ধই রইল। সেটা খোলার কথা কারুর মনেই এল না।

জানলা খুলে দিতেই মনে হল যেন ঘরটা অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমি অনেকক্ষণ গরাদ ধরে বাইরে তাকিয়ে চুপটি করে বসে রইলুম। দৃষ্টিটা অনেকদূর পর্যন্ত যাচ্ছিল। পেছনের জমিটা বেশ বড়োই, তার মাঝখানে একটা কুয়ো, চারদিক বাঁধানো, সামনে বাথরুম। এত বছরের অব্যবহারে সবই জীর্ণ হয়ে এসেছে। বাথরুমের দরজা নেই, ছাদ নেই, কুয়োর ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। ঠাকুরদাদা বললেন, ঘোষেরা চলে যাবার পর ওদিকে আর কেউ যায়নি, কিছুটা অভ্যাসবশতঃ, কিছুটা উৎসাহের অভাবে। জমিটার একপাশে কয়েকটা নারকেল গাছ আর কাঁঠালি চাঁপার গাছ আর অন্যপাশে বাথরুমের সিঁড়ির ধারে একটা কদম গাছ। আমার সমস্ত দৃশ্যটা বড়ো ভালো লাগল। মনে হল, আমার এখানে সময় কাটানোর কোনো সমস্যাই হবে না। গাছে ফুল আছে, পাখি আছে, পাতাগুলোর হাওয়ায় দোলা আছে, কুয়োর চারদিকে শুকনো পাতার ঘুরে ঘুরে ওড়া আছে, কাঠবেড়ালির ব্যস্তসমস্ত যাতায়াত আছে— এসব দেখতে দেখতেই তো আমার সারাদিন কেটে যাবে। আমার একটা সবুজ রেলিসনে বাঁধানো ডায়েরি ছিল। সেটাতে আমি মাঝে মাঝে কবিতা লিখতুম আর বিশেষ যত্ন সহকারে লুকিয়ে রাখতুম। মাকেও দেখাতুম না। সেদিন আমি একটা লম্বা কবিতা লিখে তার দেড় পাতা ভরিয়ে ফেললুম।

প্রথম প্রথম এখানে বেশিক্ষণ টেবিলে বসে পড়াশুনো করতে দেওয়া হত না। বিকেল হতে না-হতেই শুয়ে পড়বার হুকুম হত। তখন ভরা গ্রীষ্মকাল, কাজেই আমি যখন টেবিল ছেড়ে উঠতুম তখনও আকাশে আলোর অভাব থাকত না। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষা যতই এগিয়ে আসতে লাগল, আমার পড়াশুনোর সময়ও ততই বাড়তে লাগল। সন্ধে হয়ে গেলে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিতুম। দারুণ ভালো লাগত সেই আলোয় পড়তে, কোনোদিকে তাকাতুম না।

মাধ্যমিক তখন আরও এগিয়ে এসেছে। রাত তখন ন-টা হবে। কোনো একটা ব্যাপার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল বলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চিন্তা করছিলুম। হঠাৎ দৃষ্টিটা নীচের দিকে পড়ায় বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

স্পষ্ট দেখলুম, ভাঙা বাথরুমের সিঁড়ির ওপর কদম গাছটার নীচে একটি অল্পবয়সি মেয়ে বসে রয়েছে। তার পরনে একটা ছিটের ফ্রক। ফর্সা গায়ের রং। পায়ের ওপর পা তুলে, হাঁটুর ওপর কনুই রেখে, গালে হাত দিয়ে সে যেন আমার দিকেই চেয়ে বসে আছে। তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না বটে; কিন্তু ঘাড় বাঁকানোর ভঙ্গিমা দেখে সন্দেহ থাকে না যে তার নজরটা আমার দিকেই।

এইসময় ওই পোড়ো জমিতে কিশোরী মেয়ে? নির্ঘাৎ ভূত! আমি আতঙ্কে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালুম। সঙ্গেসঙ্গে মূর্তিটা মিলিয়ে গেল। আবার বসলুম, তখন দেখি পুনরায় সেই ছবি সেই জায়গায়। তখন খুব ভালো করে তাকিয়ে দেখি, জানকীনাথ চাটুজ্জে স্ট্রিট আর অনন্ত চৌধুরি লেনের দু-টি রাস্তার আলো আর আমার ঘর থেকে বেরুনো টেবিল ল্যাম্পের আলো গাছের ডালে আর পাতায়, বাথরুমের ভাঙা দেওয়াল আর সিঁড়ির খাঁজে পড়ে আলোছায়ায় এই দৃষ্টিবিভ্রমটি তৈরি করেছে। আমি যেখানটায় বসে আছি কেবল সেখান থেকেই এই ব্যাপারটাকে একটি মেয়ে বলে মনে হচ্ছে, অন্য কোনো জায়গা থেকে নয়।

বেজায় মজা লাগল। তাকিয়ে দেখি একটা হঠাৎ হাওয়ায় গাছের পাতা কাঁপছে আর ঠিক যেন মেয়েটিও দুলে দুলে হাসছে।

বাঃ, এতো বেশ। একে তো আমার বন্ধু করা যেতে পারে। পড়াশুনো করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ব তখন এর সঙ্গে কথা বলা যাবে। প্রাণের বন্ধু বলতে যা বোঝায় তা আমার কেউ নেই। অথচ অনেক কথা জমে ওঠে যা কারুর কাছে বলতে ইচ্ছে করে। তাদের সবকথা আবার মা বা ঠাকুরদাদাকে বলা যায় না। সে সব কথা তো এর সঙ্গে বলা যাবে।

আমি তাকে বললুম, 'তুমি আমার বন্ধু হবে?'

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, হব বই কী। সেই জন্যেই তো কখন থেকে ডাকছি তোমাকে।'

'বটে? তুমি তাহলে আমার প্রথম গার্লফ্রেন্ড।'

মেয়েটি হাসল। বলল, 'তাই না কি?'

আমি বললুম, 'জানো, আমি কবিতা লিখি? কিন্তু কাউকে দেখাতে লজ্জা করে যদি তারা হাসে। অথচ সে কথাগুলো তো আমি বলতে চাই, তার মানে কাউকে শোনাতে চাই। তুমি শুনবে আমার কবিতা?'

সে মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই শুনব।'

'বেশ। কিন্তু, তোমার তো একটা নাম থাকা দরকার। কী নাম তোমার?'

'নাম তুমিই দাও না। যা তোমার পছন্দ।'

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললুম, 'নাঃ, একটাও ভালো নাম মনে আসছে না। পরে ভেবে নাম ঠিক করব।'

'দ্যাখো, আমি প্রায়ই তোমাকে কবিতা শোনাই। কোনো ভালো জিনিস পড়লে তোমাকে বলি। তুমি মাথা নাড়ো, কথা বলো, কিন্তু তোমার মুখ দেখতে পাইনে।'

'আমার মুখ কীরকম বলে ভাব তুমি? হয়তো দেখবে তুমি যেরকম ভাব আসলে সেটা ঠিক সেরকমই।'

'তাই? তাহলে বলি? তোমার তো দেখছি কোঁকড়া চুল, আমার মার মতো নয়। এবারে তোমার ভুরু দুটো একটু মোটা হলে ভালো হয়। খুব সরু ভুরু আমার একেবারে ভালো লাগে না।'

'তোমার মার মতো?'

'ঠিক বলেছ। কিন্তু চশমা থাকলে চলবে না। চোখদুটো কালো মতো হবে, বাদামি বা নীল নয়। নাকটা সিধে সরল হওয়া চাই আর ঠোঁটদুটি মাঝারি— খুব মোটাও নয়, সেটা বিচ্ছিরি লাগে, খুব পাতলাও নয়, সেটা দেখলে ভয় করে।'

'কী আশ্চর্য, সব মিলে গেল যে! এতো একেবারে আমারই বর্ণনা।'

'সত্যি? তাহলে তোমার নামও আজকে ঠিক করে ফেলি?'

'কী নাম?'

'মেঘমালা। আমি তোমার নাম দিলুম মেঘমালা। তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা, মম শূন্য গগন বিহারী।'

'লেখাপড়া কিছু নেই না কি? পরীক্ষার আর বাকি কত?'

'বেশি নয়। তবু, তোমার নামটা আবিষ্কার করে প্রচণ্ড আনন্দ হচ্ছে। আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা।'

'ঢের হয়েছে। এখন "তুমি আমারই তুমি আমারই" বলে চিৎকার জুড়ো না যেন।'

'তা কখনো পারি? ঠাকুরদাদা ছাদে পায়চারি করছে। শুনলে এসে কান মুলে দেবে।'

'কী, খুব তো নার্ভাস হয়ে পড়েছিলে, তই না?'

'সত্যিই তাই। ভেবেছিলুম অঙ্কে জীবনে পাশ করতে পারব না।'

'কত পেলে?'

'সে অনেক। এখন দু-বছর তো নিশ্চিন্ত, তারপরে আবার দেখা যাবে।'

'কোথায় পড়বে? কলেজে?'

'নাঃ, আমার পুরোনো স্কুলেই। সেখানে সবাই আমাকে জানে। ফ্রিতে পড়তে

পাই। তা ছাড়া এখানে মাস্টারমশাইদের কাছে যখন খুশি যেকোনো প্রবলেম নিয়ে যেতে পারি, কলেজে তো আর তা পারব না।'

'স্কলারশিপ পাবে না কলেজে পড়লে?'

'পেতে পারি। কী দরকার? একই তো পড়া, একই পরীক্ষা। কলেজে পড়ায় অহংকারটুকু ছাড়া আর তফাত কোথায়? আমার এত অহংকার নেই। আমি স্কুলেই পড়ব।'

বছরখানেক বাদে একদিন খাবার ঘরে মা বলল, 'বাবা, আর একটা টিউশনি নেব ভাবছি। সপ্তাহে দু-দিন, এক-শো টাকা। কাছেই।'

ঠাকুরদাদা মাথা নীচু করে খাচ্ছিলেন। খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'নিজের ওপর বড়ো বেশি প্রেশার নিচ্ছ মা। সামলাতে পারবে?'

'পারব বাবা। প্রেশার কিচ্ছু নয়। কাছেই তো।'

ঠাকুরদাদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি জানি এই এক-শো টাকাটা আজ আমাদের বড়ো বেশি দরকার। তবে তার জন্য... আচ্ছা বউমা, একটা কাজ করলে হয় না?'

'কী বাবা?'

'দ্যাখো, আমি যদি উত্তরের জমিটার বাথরুম আর কুয়োটা সারিয়ে ফেলি আর প্রদীপদের ঘরটা আর আমার বসবার ঘরটা একসঙ্গে করে ভাড়া দিই, তাহলে তো অনেক সাশ্রয় হতে পারে। আমার একটা আলাদা বসবার ঘরের তো কোনো দরকার নেই। আমার একটা ঘরই যথেষ্ট। আর এই ছিয়াত্তর বছরের বুড়োর প্রায় কোনো বন্ধুই আর জীবিত নেই। থাকার মধ্যে আছে কেবল অবিনাশ। সে যখন আসবে, আমরা শোবার ঘরেই বসব।'

'বাথরুম আর কুয়োটা সারাতে খরচ কত লাগবে?'

'তা হাজার পাঁচ-ছয় তো লাগবেই। তবে খরচের জন্য তুমি চিন্তা করো না। আমি মাড়োয়ারির দোকানে ধার নেব। ভাড়ার টাকা থেকে শোধ দিয়ে দেব। কারুর কোনো গায়ে লাগবে না।'

'না।' মা দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল।

ঠাকুরদাদা করুণ মুখ তুলে বললেন, 'না? না কেন, বউমা?'

'প্রথমত টাকা ধার আপনি করতে পারবেন না। সারাজীবন মাথা উঁচু করে থেকেছেন। চরম বিপদের দিনেও কারোর কাছে নত হতে দেখিনি আপনাকে। আর আজ এই বয়েসে আপনি গিয়ে মাড়োয়ারির কাছে হাত পাতবেন? আমি জীবিত থাকতে তা হতে দেব না, বাবা। তা ছাড়া, ভাড়া দেবেন কাকে? সবাই প্রদীপকাকার মতো ভালো লোক নয়। কীরকম ভাড়াটে আসবে কে জানে? আপনি নীচে একেবারে একা থাকেন।'

'আমাকে কে কী করবে, বউমা? করবেই বা কেন?'

'না, না, আমি করার কথা বলছি না। হই হট্টগোল তো হতে পারে। দোতলায় যদি একটা বাথরুম থাকতো তো আপনাকে ওপরে নিয়ে যেতুম।'

'ও বাবা, তাহলে আমার মর্নিং আর ইভিনিং ওয়াকের কী হবে?'

'কেন, ছাদে?'

'না বউমা। জীবনের শেষে এসে পড়েছি। পৃথিবীটা আরও সংকীর্ণ হলে সইতে পারব না।'

'তাহলে যেমন চলছে, তখনই চলুক, বাবা। আমি টিউশনিটা নিয়েই নিই।'

ঠাকুরদাদা কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। শেষপর্যন্ত ধরা গলায় বললেন, 'যা ভালো বোঝো, করো।' বলে উঠে চলে গেলেন।

ঠাকুরদাদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে, আমি বললুম, 'মা, আমার একটা চাকরি হয় না? আমি তো বেশ বড়ো হয়ে গেছি, মাধ্যমিক পাশ।'

মা সশব্দে হেসে উঠল, 'মাধ্যমিক পাশ? বাপরে। তোর জন্যে তো সবাই অফিস সাজিয়ে বসে রয়েছে! যা না, কোথাও গিয়ে ঢুকে পড়।'

'ঠাট্টা নয় মা। বলো না, আমি একটা চাকরি নিই?'

'কী চাকরি নিবি তুই? ওই তো টিংটিঙে স্বাস্থ্য, তোকে তো কেউ কুলির কাজও দেবে না। রিকশাও টানতে পারবি না।'

'তুমি শুধু ঠাট্টা করছ। আমি তো তোমাকে সাহায্য করতে চাইছিলুম।'

'তা তো বুঝতেই পারছি। তবে বলি শোন, আমাকে যদি সাহায্যই করতে চাস তাহলে মন দিয়ে পড়াশুনো কর। তোর থাকার মধ্যে আছে ওই মাথাটা। সেটাকে কাজে লাগা। তারপর, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আমাকে দোতলায় ছাদের পাশে একটা বাথরুম করে দিবি। তাহলেই যথেষ্ট সাহায্য হবে। তখন আমি আরও বুড়ো হয়ে যাব, রাতবিরেতে সিঁড়িভাঙার কষ্ট আর সহ্য করতে হবে না।'

সেই বাথরুম আর কোনোদিনও তৈরি হবে না।

সেদিন রাত্রে পড়ার টেবিলে এসে বসলুম। মা মৃদু হাসল। বোধ হয় ভাবল যে ওঁর কথাটা আমার মনে ধরেছে। আসলে, আমি কিন্তু পড়তে বসিনি। বসেছিলুম, মেঘমালার সঙ্গে কথা বলতে।

টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিলুম। মেঘমালাকে বললুম, 'খুব বেঁচে গেছ, জানো? ঠাকুরদাদা যে প্ল্যান করেছিলেন তাতে তোমার এখানেই ইতি হত।'

মেঘমালা গম্ভীর মুখে বলল, 'হলে হয়তো ভালোই হত। তোমার মার এই

উদয়াস্ত পরিশ্রমের একটা সুরাহা হত। কী চেহারা হয়েছে ওঁর, দেখেছ? কত বয়েস হবে তোমার মার? চল্লিশ? অথচ, এখনই মাথার চুলে কীরকম পাক ধরেছে।'

'দাঁড়াও না। আগে আমি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে নিই, তারপরে দেখবে কে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে আর কার মা চাকরি-বাকরি ছেড়ে ওই ইজিচেয়ারটায় বসে কেবল বই পড়ে আর গান শোনে।'

'তার আর বাকি কত?'

'অনেক। অন্তত বছর সাতেক তো বটেই। বড়ো ভয় হয় মা কি অতদিন এই বোঝা টেনে বেড়াতে পারবে?'

'কোথাও বাইরে যাও না। ছুটিতে তো সবাই বেড়াতে যায়, তোমরাও যাও।'

'বেড়াতে অমনি গেলেই হল? খরচ আছে না? আর মা ঠাকুরদাদাকে ফেলে কোথাও যাবে না। আমাদের যদি কোনো আত্মীয়স্বজন থাকতো, তাহলে হয়তো তাদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া যেত। বাইরে নয়, কলকাতাতেই। ধরো, বালিগঞ্জে কিংবা যাদবপুরে। তাহলেও একটা পরিবর্তন হত।'

'কেউ নেই?'

'একেবারে নেই তা নয়। আছে। আমার মামা আছেন দু-জন, আরও কারা সব আছেন মার দিকে। বাবার দিকটা অবশ্য একেবারে ফাঁকা। আমি শ্রী দেবপ্রিয় দত্ত ঈশ্বর দীপক দত্তের একমাত্র সন্তান। আবার ঈশ্বর দীপক দত্ত ছিলেন শ্রী দিননাথ দত্তের একমাত্র সন্তান। শুনেছি দিননাথও নাকি তাঁর বাবার একমাত্র সন্তান ছিলেন।'

'চমৎকার! কিন্তু তোমার মামারা তো কখনো আসেন না।'

'নাঃ, কক্ষনো না। শুনেছি মার বিয়েতে না কি ওঁদের আপত্তি ছিল। ওঁরা বাবাকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছিল। ফলে, বাবা আমার মামাবাড়ির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তুলে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর মামারা না কি এসেছিলেন, কিন্তু মা তাঁদের চৌকাঠ পেরুতে দেয়নি। ধুলো পায়ে বিদেয় দিয়েছিল।'

'বাঃ, এরকম করলে কি আত্মীয়তা থাকে?'

'কখনো নয়। আমি কোনোদিনও মামাবাড়ি যাইনি। শুনেছি, উলটোডাঙায় ওঁদের বিরাট বাড়ি, বর্ধমানের কোনো গ্রামে অনেক জমিজমা।'

'তার মানে ওঁরা তো বেশ বড়োলোক। তোমার মাকে সাহায্য করতে পারেন না?'

'পারেন হয়তো। কিন্তু মা কি সাহায্য নেবে? কক্ষনো নয়।'

'তোমার বাবা-মার বিয়েতে ওঁরা কেন আপত্তি করেছিলেন, জানো?'

'ঠাকুরদাদার মুখে শুনেছিলুম, বাবা গরিব কলেজ লেকচারার বলে ওঁদের আপত্তি ছিল। ওঁদের ইচ্ছে ছিল মা-র একজন খুব বড়োলোকের ছেলের সঙ্গে

বিয়ে হোক। মা বেঁকে বসেছিল। কিছুতেই রাজি হয়নি।'

'তোমার খুব মামাবাড়ি যেতে ইচ্ছে করে, না?'

'হ্যাঁ। করে। ট্রেনে চড়ে যাব, সারাদিন শুধু খাব আর মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াব। জানো, আমি জীবনে একবারই বাইরে গিয়েছিলুম। গয়ায়। ঠাকুরদাদা গিয়েছিলেন বাবার পিণ্ড দিতে, আমাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি না কি ট্রেনের বাইরে পাহাড় দেখে মাকে বলেছিলুম, 'মা, মা, ওগুলো কি সত্যিকারের পাহাড়?' তাই শুনে ট্রেনসুদ্ধু লোকের কী হাসি। কী হল? গম্ভীর হয়ে গেলে যে! কী ভাবছ?'

'ভাবছি, আমিও তোমারই মতো। কোথাও যাইনি কোনোদিন। শুধু এই খানেই আটকা পড়ে গেছি। এই বাড়ির এই কোণাটায়।'

মেঘমালা আজ কিন্তু মুক্তি পেয়েছে। আমাদের বাড়িটা আর তাকে আটকে রাখতে পারল না।

এরপর থেকে ঠাকুরদাদা যেন কেমন পালটে গেলেন। আমি ওঁর নাম দিয়েছিলুম পোলোনিয়াস কিন্তু কখন যেন ওঁর কথার স্রোত ক্রমশ কমে এল। হাস্যোজ্জ্বল চোখদুটো মাঝে মাঝেই দেখি বিষণ্ণ। ইংরেজি কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় ওঁর মাধ্যমেই অথচ সে ব্যাপারেও ওঁর উৎসাহ আর তেমন দেখি না।

একদিন মেঘমালাকে বললুম, 'ঠাকুরদাদাকে দেখলে বড়ো ভয় করে। ওঁর মনটা ভেতরে ভেতরে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।'

মেঘমালা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'অসম্ভব নয়। উনি যে সংসারে কোনো সাহায্য করতে পারছেন না, সেই যন্ত্রণাটা ওঁকে কুরে কুরে খাচ্ছে।'

'হ্যাঁ। আর তার ওপরে কানে কম শুনছেন। সেটাও কম দুঃখের কথা নয়। হয়তো এইসব মিলিয়ে কেমন যেন সকলের কাছ থেকে, সব কিছুর থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চেষ্টা করছেন— এটা তো ভালো নয়।'

উচ্চ মাধ্যমিকের মাস ছয় আগে আমার ভয়টাই সত্যি বলে প্রমাণিত হল। ঠাকুরদাদা ঘুমের মধ্যে চলে গেলেন। আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছিল কিন্তু মার অশ্রুহীন নির্নিমেষ দু-টি চোখের দিকে তাকিয়ে আর কাঁদতে পারলুম না। যথাসাধ্য নির্বিকার মুখে সমস্ত কাজ করে গেলুম।

সেদিন থেকে অনেকদিন পর্যন্ত প্রায় রোজ রাত্রে মেঘমালার সঙ্গে ঠাকুরদাদার কথা আলোচনা করতুম। আলোচনা আর কোথায়? কেবল আমিই বলে যেতুম আর মেঘমালা শুনে যেত। মা মাঝে মাঝে বলত, 'চুপ করে বাইরে তাকিয়ে কী ভাবিস অত?'

আমি মাথা নেড়ে বলতুম, 'কিছু না মা।' মা বুঝতে পারত না যে আমি চুপ করে থাকি না, অনর্গল কথা বলে যাই।

'ঠাকুরদাদার কথা ভাবিস?'

আমি আবার মাথা নাড়তুম, 'না, মা। কিছু না।'

আমি উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভরতি হলুম।

মা বলল, 'হ্যাঁরে, পারবি তো?'

আমি হেসে বললুম, 'কেন পারব না, মা? তুমি দ্যাখোই না, কীরকম রেজাল্ট করি।'

'তোর রেজাল্ট নিয়ে আমি ভাবি না। আমি ভাবছি কাঠখোট্টা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গিয়ে ভুল করলি না তো? তোর ঠাকুরদাদা বলতেন, তোর না কি সাহিত্যে খুব ন্যাক। আমাকে বলতেন, ওকে ইংরেজি সাহিত্য পড়িও। দেখবে ও একদিন খোকনের মতো ডাকসাইটে অধ্যাপক হবে।'

'দুর, দুর ওসব বাদ দাও তো। আজকাল সাহিত্য কেউ পড়ে? আমার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ কোনো অসুবিধে হবে না, দেখো তুমি। তা ছাড়া তুমি তো আছই। যখনই কিছু ফাঁকা সময় পাব, তোমার কাছে সাহিত্য পড়ে যাব।'

'পাগল নাকি? আমি ইশকুলের মাস্টারনি। আমার কাছে কী পড়বি তুই?'

'তুমি যা যা বাবার কাছে পড়েছিলে তাই পড়াবে আমাকে। আর ওই বইগুলো। ওগুলোর ওপর আমার বড়ো লোভ। ওদের কিছু কিছু আমি পড়েছি। বেশ শক্ত। দেখেছি মার্জিনে তোমার আর বাবার নোট। ওগুলো পড়িও আমাকে।'

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল। বলল, 'কী জানি, মনে হচ্ছে তোকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ দিয়ে বোধ হয় ভুলই করলুম।'

'কিচ্ছু ভুল করোনি। আমি ইঞ্জিনিয়ার না-হলে দোতলার বাথরুমটা বানাবে কে?'

মা হেসে উঠল। বলল, 'তুই ওকথা মনে করে বসে আছিস?'

'নিশ্চয়ই। তুমি কিচ্ছু ভেব না মা। আমি ইঞ্জিনিয়ারিংও পড়ব, সাহিত্যও পড়ব। একটা ইউনিভার্সিটিতে অন্যটা এখানে। তুমি আছ আর ওই বইগুলো আছে। তবে আবার চিন্তা কীসের?'

আজ মা নেই, বইগুলোও গেল। ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে তাদের একটাকেও আর বোধ হয় উদ্ধার করা যাবে না।

মাসদুয়েক বাদে সন্ধে বেলা ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে পড়ার টেবিলে বসে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালতেই দেখি মেঘমালা খুব ভুরু কুঁচকে আমার দিকে চেয়ে আছে। বলল, 'ব্যাপারটা কী বলোতো? তোমাকে যে আজ বেজায় খুশি খুশি দেখাচ্ছে।'

'আছে, আছে। ব্যাপার গুরুতর।'

'বলে ফ্যালো।'

'আজ একটা যা কাণ্ড হয়েছে। আমাদের ফ্যাকাল্টির আজ সোশ্যাল ছিল। আমার স্কুলের বন্ধু প্রিয়ব্রত চ্যাটার্জী, ওর কথা তো তোমাকে বলেছি, কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ সোশ্যালের মধ্যে মাইকে অ্যানাউন্স করল, এখন গান শোনাবে ফার্স্ট ইয়ারের দেবপ্রিয় দত্ত। আমি অনেক আপত্তি করলুম কিন্তু কেউ আমার কথাই শুনল না, জোর করে স্টেজে তুলে দিল।'

'গাইলে?'

'গাইলুম। মার কাছে শেখা দুটো গান। একটা, বিরহ মধুর হল আজি আর অন্যটা দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি।'

'শ্রোতারা ঢিল মারেনি?'

'বাজে বোকো না। ঢিল মারবে! প্রচণ্ড হাততালি দিল। ফাংশনের শেষে কতলোক এসে আমকে কনগ্র্যাচুলেট করে গেল।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কী? তারপর বাড়ি চলে এলুম।'

'উঁহু! তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তারপরেও আরও কিছু আছে। তাই না?'

'হ্যাঁ, আছে। সত্যিই আছে। আমাকে যারা কনগ্র্যাচুলেট করে গেল তাদের মধ্যে একজনকে কিছুতেই, কী বলব মন থেকে সরাতে পারছি না। বার বার তার চোখদুটো মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে আসছে। এত শান্ত, গভীর আর সুন্দর চোখদুটো!'

'বটে? কী নাম?'

'স্রগ্ধরা, স্রগ্ধরা রায়চৌধুরি। আমাদেরই ইয়ারে; তবে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে।'

'স্রগ্ধরা? এঃ বড্ড কটমট নাম!'

'হ্যাঁ, তা একটু ঠিকই। কিন্তু স্রগ্ধরা মানে জানো? একটা সংস্কৃত ছন্দের নাম। যেমন মন্দাক্রান্তা, ভুজঙ্গপ্রয়াত বা শার্দূলবিক্রীড়িত তেমনই। শুনলুম, ওরা তিনবোন। গায়ত্রী, মালিনী আর স্রগ্ধরা— তিনটেই ছন্দের নাম।'

একটা ঝোড়ো বাতাস উঠল। দেখি মেঘমালা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। আমি একটু রেগেই গেলুম। বললুম, 'অত হাসির কী আছে?'

'ভাবছি, জোর বেঁচে গেছ। ভাগ্যিস ওর বাবা ওর নাম শার্দূলবিক্রীড়িত রাখেননি। তাহলে তোমার যে কী অবস্থা হত!'

'কেন, কী হত?'

'জীবনেও ওকে কোনোদিন একটি চিঠি লিখে উঠতে পারতে না। ভাঙা কলমে কি আর চিঠি লেখা চলে?'

'ফের বাজে কথা। আমার বাংলা বানানে যথেষ্ট, যাকে বলে, ব্যুৎপত্তি আছে। তবে কিনা, আমি ওকে কোনোদিন চিঠি লেখার কোনো সুযোগই পাব না। আমাকে পাত্তাই দেবে না।'

'খুব সুন্দরী?'

'তেমন কিছু নয়। মোটামুটি বলতে পারো। তা নয়, শ্রদ্ধরা ভীষণ বড়োলোক পরিবারের মেয়ে। প্রকাণ্ড একটা গাড়ি চড়ে কলেজে আসে। প্রিয়ব্রত বলল, ওর বাবা না কি বম্বের একজন প্রচণ্ড নামকরা ডাক্তার।'

'মেয়েটা খুব চালিয়াত বুঝি?'

'না না, একেবারেই নয়। পোশাক-আশাক বা চালচলন, কোনোটাই ঠিক বড়োলোকসুলভ নয়। বরং, খুব সাধারণ। কেবল ওই গাড়িটা ছাড়া।'

'পাত্তা দেবে না বলছ?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

ঠাকুরদাদা চলে গেলেন সংসারে একজন লোক কমে গেল অথচ মার পরিশ্রম কমল না। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তে যে এত খরচ, কে জানতো? তার ওপর আমাদের বাড়িটা কলকাতা কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে চলে এল, যে-জন্য অনেকটা ট্যাক্স বেড়ে গেল। সেইসঙ্গে ইনফ্লেশন তো আছেই। ফলে, আর টিউশনিগুলো ছাড়া সম্ভব হল না। আমি একতলাটা ভাড়া দেবার কথা আবার তুলেছিলুম, মা এবারেও রাজি হল না। বুঝলুম, ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে মায়ের মনে একটা বাধা আছে অথবা ভয়— যদি ভাড়াটে ভালো না-হয়! চারদিকে নানারকম কাহিনিও তো কানে আসত। একদিন আমিও টিউশনি করব বলেছিলুম। মা তাতেও রাজি হল না। উলটে রেগে গেল। বলল, 'যতটুকু সময় পাও পড়াশুনো করো। টিউশনি করে সময় নষ্ট করো না। ফাজলামোর একটা সীমা আছে।'

মাকে সাহায্য করার চেষ্টা করাটা নাকি ফাজলামো!

'দ্যাখো মেঘমালা, তুমি এখন যথেষ্ট বড়ো হয়েছ। তোমার ওই ফ্রক পরা চেহারাটা আর সহ্য করা যাচ্ছে না। এবার শাড়ি ধরো।'

'কেন শাড়ি পরলে তোমার কী সুবিধে?'

'তাহলে তোমার সঙ্গে অনেক কথা বলা যায় যা বড়োদের সঙ্গে ছাড়া আলোচনা

করা চলে না। ফ্রক পরা মেয়েদের সঙ্গে তো নয়ই।'

'বেশ, আমার শাড়ির ব্যবস্থা তুমিই করে দাও।'

'হ্যাঁ, তাই করছি। এই যে, সে জন্যে আজ ঘুড়ির কাগজ কিনে এনেছি।'

'ঘুড়ির কাগজ দিয়ে কী হবে?' মেঘমালা উদ্‌বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করল।

'দ্যাখোই-না কী করি।' বলে আমি একটা হলুদ পাতলা কাগজ আমার টেবিল ল্যাম্পের পেছনে লাগিয়ে দিলুম। একটু এদিক-ওদিক করতে হল। তারপরেই যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই হল। দেখি মেঘমালার পরনে হলদে রঙের ছাপা শাড়ি আর গায়ে কালো ব্লাউজ। ফর্সা রঙে খুব মানিয়েছে।

বললুম, 'আরিব্বাস, দারুণ দেখাচ্ছে তোমাকে।'

মেঘমালা লাজুক হাসল। বলল, 'সত্যি?'

'একেবারে। এটা তো হলুদ কাগজ, এ ছাড়া লাল আর সবুজ রঙের কাগজও এনেছি। এখন থেকে তুমি এক একদিন এক এক রঙের শাড়ি পরবে।'

মা বলল, 'টেবিল ল্যাম্পের পেছনে একটা ফনফনে কাগজ লাগিয়েছিস কেন রে?'

আমি বললুম, 'সে তুমি বুঝবে না মা। একে বলে রিফ্লেক্টর। এতে টেবিলের ওপর আলোর ডিস্ট্রিবিউশনটা বেটার হয়, সেটা রেগুলেটও করা চলে।'

মা হাত নেড়ে বলল, 'কী জানি বাপু। এমন জিনিস জন্মে দেখিনি। ওরে তোর যদি সুবিধে হয়, যা ভালো বুঝিস করিস।'

মা বই পড়ার মধ্যে ফিরে গেল। আমি আর মেঘমালা চোখে চোখে হাসলুম।

ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ারে ওঠার পরীক্ষাটা বেশ ভালোই হল।

আমি মাকে প্রণাম করে প্রাইজের বইগুলো হাতে দিলুম। বললুম, 'কী মনে হচ্ছে, মা? আমাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়ে ভুল করেছিলে?'

মা আমার চুলে হাত বুলিয়ে বলল, 'তোর সত্যিই পড়তে ভালো লাগছে, না রে?'

'হ্যাঁ মা, খু-উ-ব।'

'কী বই দিলে?'

'খুলে দ্যাখো।'

'ও বাবা, এ যে সব ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ওপর।'

'তবে তুমি কী ভেবেছিলে? *কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ অস্কার ওয়াইল্ড* অথবা কালেকটেড *শর্ট স্টোরিস অফ ও'হেনরি* দেবে? সে সব বই দিলেই অবশ্য তুমি

খুশি হতে কিন্তু এগুলোও কম কাজের নয়। এসব বই তো পয়সা দিয়ে কেনা যায় না। অথচ, এগুলো সারাজীবন কাজে লাগবে। সেটা কম কথা নয় বলো?'

মা উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'পয়সার কথা কেন অত চিন্তা করিস, দেবু? আমি যেন কখনো না-শুনি যে দামের কথা ভেবে তুই কোনো দরকারি বই কিনিসনি।'

সেদিন সন্ধে বেলা মা ছাদে বসে গাইল, 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।'

'জানো মেঘমালা, আমার মনে হয় আমার মধ্যে বোধ হয় মস্ত বড়ো একটা ফাঁক আছে। তা না-হলে আমি কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারি না কেন? আমার বেশিক্ষণ আড্ডা মারতে ভালো লাগে না, দলবেঁধে পিকনিকে যাওয়ার নামে কান্না আসে, হিন্দি সিনেমা তো কোনোদিনই সবটা দেখে উঠতে পারি না; অথচ, এসবের মধ্যেই সবাই কত আনন্দ খুঁজে পায়। আমি সবার সঙ্গেই থাকি, আড্ডাও মারি, গান গাই, সিনেমায় যাই কিন্তু এত লোকের মধ্যে থেকেও আমার কেবল নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয়। এটা বড়ো কষ্টকর।'

'তোমাকে কিন্তু এই স্বভাবটা কাটিয়ে উঠতে হবে। ছোটোবেলা থেকে এই বাড়িতে একা একা থেকে নিঃসঙ্গতাটা তোমার মনের একেবারে ভেতরে ঢুকে গেছে।'

'আমি তো কাটিয়ে উঠতেই চাই। এ কি আমার ভালো লাগে, বলো? প্রত্যেক দিন কত রকমের নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন অনুভূতি। মনের ভেতরে কথার পাহাড় জমে উঠছে। মাকে কত বলব? আর সবকথা বলা যায় না। তোমাকেই বলি। তবু মনে হয়, কেউ যদি ধরাছোঁয়ার মধ্যে থাকত যাকে মনোভার নামিয়ে দিতে পারতুম তাহলে বোধ হয় অনেক হালকা হওয়া যেত।'

'বুঝেছি।'

'কী বুঝেছ?'

'বুঝেছি, যে তুমি প্রেমে পড়েছ। একগলা জল। স্রগ্ধরা?'

'হ্যাঁ।'

'খুলে বলো।'

'কী বলব? সেই ফাস্ট ইয়ারের সোশ্যালের পর মাঝে মাঝেই ওর সঙ্গে দেখা হয়। ভেবেছিলুম খুব বড়োলোকের মেয়ে, আমাকে বোধ হয় পাত্তাই দেবে না। কিন্তু তা নয়; বরং আমার সঙ্গে বেশ আগ্রহের সঙ্গে কথা বলে। আমাকে দূর থেকে আসতে দেখলে নিজেই এগিয়ে আসে। হাসে। আর সেই হাসিটা কিন্তু লোক-দেখানো নয়।'

'বলো কী? ভয়ানক ব্যাপার দেখছি।'

'না না, তেমন ভয়ানক কিছু নয়। ওর ব্যবহারটা খুবই স্বাভাবিক; কেবল আমারই বুকের ভেতর অস্বস্তি হতে থাকে।'

'অস্বস্তি কেন?'

'খালি মনে হয় কথাটা যেন এখনই শেষ না-করে। এখনই যেন চলে না-যায়।'

'তার মানে, এই একজনই আছে যার সান্নিধ্যে তোমার নিজেকে নিঃসঙ্গ বলে আর মনে হয় না, তাই না?'

'না, না আরও দু-জন আছে। তুমি আর মা। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারটা অন্যরকম। আর স্রগ্ধরার ব্যাপারটা আলাদা। সত্যিই, ওর কাছে আমাকে কখনোই একা বলে মনে হয় না। আর আমি দেখেছি আমাদের দু-জনের ব্যাকগ্রাউন্ড যতই ভিন্ন হোক না-কেন, ওর পছন্দ-অপছন্দের সঙ্গে আমার পছন্দ-অপছন্দের কোথায় যেন একটা আশ্চর্য মিল আছে।'

'হুঁ! কিন্তু স্রগ্ধরা তোমার সম্বন্ধে কী ভাবে সে ব্যাপারে কোনো বিস্তৃত সংবাদ পেয়েছ কি?'

'নাঃ, কিছু না। তা, সে যাই ভাবুক না-কেন, আমাকে তো বন্ধু বলে স্বীকার করেছে। সেটাই তো যথেষ্ট।'

'যথেষ্ট কী? কী জানি।'

সেকেন্ড ইয়ারটা কাটল নিস্তরঙ্গভাবে। ক্লাস করি, পড়াশুনো করি, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা মারি, গান গাই। তার মধ্যে স্রগ্ধরাও থাকে, কিন্তু বাইরে কারোরই কোনো চিত্তবৈকল্যের লক্ষণ দেখা যায় না। আমি কিন্তু বুঝতে পারছিলুম যে এই মেয়েটিরই প্রেমে পড়ে গেছি, উদ্ধারের আশা নেই, কিন্তু স্বাভাবিক বন্ধুত্বের সীমাটা পার হতে চাইছিলুম না।

মেঘমালাকে বললুম, 'এই তো বেশ আছি। রোজ দেখা হচ্ছে। গল্প করছি। আর কী চাই, বলো? এর বেশি কিছু চাইতে গেলে যদি এটুকুও যায়, তাহলে কি সেটা কোনো কাজের কথা হবে?'

মেঘমালা বলল, 'তুমি আসলে একটি এক নম্বরের ভীতুরাম। সাহসে বুক বেঁধে এগিয়ে যাও।'

'ইমপ্র্যাকটিক্যাল কথা বললে তো হবে না। এগিয়ে যাও, না? এগিয়ে যাবটা কোথায়? ধরো, আমি সাহসে বুক বেঁধে স্রগ্ধরাকে গিয়ে বললুম, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' তখন যদি সে বলে 'শুনে অত্যন্ত খুশী হলুম। তা, আমাকে কী করতে হবে? তখন আমি কী বলব?'

'খুব সহজ। বলবে হে মা ধরণী, দ্বিধা হস্ত হও, আমি তোমার ভেতরে সেঁধুই।'

'চমৎকার! মা ধরণীকে আর দ্বিধা হবেন না। বরং, কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের ছেলেগুলো কোদাল দিয়ে কবর খুঁড়ে আমাকে জ্যান্ত পুঁতে দেবে। আর স্রগ্ধরা পাশে দাঁড়িয়ে চ্যাটাস চ্যাটাস করে তালি বাজাবে।'

'তাহলে আর ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলা কেন? যেমন চালাচ্ছ, তেমনি চালিয়ে যাও। আর শোনো, অনেকদিন তো এই হলুদ শাড়িটা পরা হল, এবার একটা লাল শাড়ির ব্যবস্থা করো।'

থার্ড ইয়ারে গোড়ার দিকে একটা ঘটনা ঘটল যেটা আমার কাছে নিতান্তই আশাতীত ছিল। আমি বাবার বইগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ একটা বিরাট বাংলা অভিধান আবিষ্কার করলুম। বইটা উলটেপালটে দেখতে দেখতে মনে হল, দেখিতো স্রগ্ধরা কী শুধুই একটা নাম, নিরর্থক শব্দমাত্র, না এর কোনো মানে আছে। দেখে যা জানতে পারলুম তাতে একটা কবিতা না-লিখে আর থাকা গেল না। কবিতাটা এরকম—

স্রগ্ধরা সে তো ছন্দের নাম, নিতান্ত এক শব্দ,
এতদিন এই কথাটাই ছিল অন্তরে উপলব্ধ।
আজকে হঠাৎ হাতে এসেছিল অভিধান এক মস্তো,
ঢাউস শরীর চামড়া বাঁধানো, ওঠাতে ব্যতিব্যস্ত।
দেখে মনে হল, পাতা উলটিয়ে দেখিতো এটা কী সত্যি,
স্রগ্ধরা শুধু শব্দই, কোনো মানে নেই একরত্তি?
কথাটা যখন পাওয়া গেল, দেখি এতো বড়ো আশ্চর্য!
জানাই ছিল না 'স্রগ্ধরা'-এর মাঝে এত তাৎপর্য।
স্রক মানে মালা, স্রগ্ধরা তাই মাল্যধারিণী কন্যে।
আজ জানি, মনে প্রতীক্ষা ছিল এই মালাটারই জন্যে।

কবিতাটা একটা খাতার পাতায় লিখে ফেলা গেল। স্রগ্ধরার থার্ড পিরিয়ডে কোনো ক্লাস নেই জানতুম। আমি ক্লাস কেটে ওকে খুঁজে বের করলুম কেমিস্ট্রি ল্যাবের পেছনের বারান্দায়। সেখানে একা একটা উঁচু টুলে বসে নিবিষ্ট চিত্তে চিনেবাদাম খাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে ল্যাবের ভেতরে কাউকে বাইরে আসার জন্যে হাত নেড়ে ডাকাডাকি করছিল। আমাকে দেখে বলল, 'কী ব্যাপার? তুমি এখানে? ক্লাস নেই?'

আমি বললুম, 'দুত্তোর ক্লাস। বাল্মীকির মুখ দিয়ে যখন ফস করে একটা কবিতা বেরিয়ে গিয়েছিল তখন তিনি কি করেছিলেন জানো?'

'না তো!'

'আশ্রমের ক্লাস-ফ্লাস বন্ধ করে সাত কাণ্ড রামায়ণ লিখে তবে ক্ষ্যান্ত দিয়েছিলেন।'

'বেশ করেছিলেন। কিন্তু তার সঙ্গে তোমার ক্লাস পালানোর সম্পর্কটা কোথায়? তুমিও কি সাতকাণ্ড রামায়ণ লিখবে না কি?'

'আলবাত!'

'আলবাত? কী সর্বনাশ! তুমি কি কবিতা লিখছ না কি?'

'লিখছি মানে? লিখে ফেলেছি।'

'বলো কী? কই দেখাও।'

আমি খাতাটা স্রগ্ধরার হাতে দিয়ে বললুম, 'দ্যাখো, মারধর দিও-না যেন।'

স্রগ্ধরা হাসতে হাসতে কবিতাটা পড়তে শুরু করল। কিন্তু যে দশ লাইনের কবিতাটা পড়তে আধ মিনিটও লাগে না, দেখি সেটা পড়েই যাচ্ছে, পড়েই যাচ্ছে। আর, ওর মুখের হাসিটা আস্তে আস্তে পালটে গিয়ে কেমন যেন হয়ে গেল। কানদুটো আর নাকের ডগাটা লাল হয়ে উঠল। আমি যে মনে মনে একটু উদ্‌বিগ্ন হচ্ছিলুম না, তা নয়, কিন্তু ওর মুখের ভাব দেখে কোনো প্রশ্ন করতেও সাহস হচ্ছিল না।

স্রগ্ধরা অনেকক্ষণ ধরে কবিতাটা পড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে খাতাটা বন্ধ করল। তারপর, বিনা বাক্যব্যয়ে সেটা কাঁধের ঝোলাটার ভেতর ভরে ফেলল।

আমি বলে উঠলুম, 'আরে, ওকী হল? খাতাটা যে আমার।'

স্রগ্ধরা টুল থেকে উঠে দাঁড়াল। বারান্দার রেলিঙের ওপর ঝুঁকে পড়ে যেন নীচে কিছু দেখতে দেখতে বলল, 'কবিতাটা যে আমার। সেটা যে খাতায় লেখা তার ওপর তোমার কোনোই অধিকার নেই।'

'সে কী কথা? আমার তিনটাকা দিয়ে কেনা খাতাটা।'

'তা হোক। ও খাতা এখন আমার কারণ এই কবিতাটা আমার।' বলে স্রগ্ধরা রেলিঙের ওপর আরও ঝুঁকে পড়ে বলল, 'শোনো, এরপর থেকে আমার নাম নিয়ে যে সব কবিতা লিখবে, সেগুলো আরও সিরিয়াসলি লিখবে, বুঝেছ? কোনোরকম হ্যাবলামোর চিহ্ন যেন না-দেখি। আর লেখামাত্র সেগুলো আমাকে দেখাবে, আর কাউকে নয়, বুঝেছ?'

'সিরিয়াস কবিতা লিখতে গেলে সেগুলো যদি প্রেমের কবিতা হয়ে পড়ে?'

'ভেতর থেকে যদি আসে, তাহলে তাই হবে।'

'মার লাগাবে না তো?'

'সেটা কীরকম কবিতা হল, তার পর নির্ভর করবে। আজকেরটার মতো

হলে, ভয় নেই।' বলেই পেছন ফিরে কেমিস্ট্রি ল্যাবের বিশাল গহ্বরের ভেতরে ঢুকে গেল। সেদিন সারাদিন আমার আর ক্লাস করা হল না। স্রগ্ধরাকেও কোথাও দেখতে পেলুম না। বিকেল বেলা যখন বাড়ি ফিরছি, দেখি সায়েন্স ফ্যাকাল্টির সিঁড়ির ওপর ওর ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। ওর চারদিকে সবাই কথা বলছে কিন্তু ওর মুখ দেখে মনে হল ওর কানে কোনো কথাই ঢুকছে না। এমনকী আমাকেও লক্ষ করল না।

মেঘমালা গম্ভীর মুখে আমার সবকথা শুনল। বলল 'ভালো করছ কী?'

'জানি না, সত্যিই জানি না।

'পড়াশুনোর যদি এই কারণে ক্ষতি হয়, মা-কে হয়তো উলটোপালটা বুঝিয়ে দিতে পারবে। তিনি তো তোমাকে বিশ্বাস করবার জন্যেই তৈরি হয়ে আছেন। কিন্তু, নিজেকে বোঝাতে পারবে কি?'

'বোধ হয় না। আমি জানি, প্রেমের জোয়ারে ভেসে যাওয়ার সুযোগ বা সময় আর যারই থাক, আমার নেই। কিন্তু আমি কী করব? যখন প্রথম শুনেছিলুম যে ঘোর প্রেম অন্ধ রাহু প্রায় জীবন যৌবন গ্রাসে, তখন ভেবেছিলুম এসব কবিসুলভ বাড়াবাড়ি। আজ বুঝেছি, মোটেই তা নয়। কী করব, বলো? সবসময় ওর কথা মনে হয়। ক্লাসে কনসেনট্রেট করার যতই চেষ্টা করি না-কেন, মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। এর হাত থেকে বাঁচি কী করে?'

'আমার কি মনে হয় জানো? তুমি এ-প্রশ্নের জবাব স্রগ্ধরাকেই জিজ্ঞেস করো। দ্যাখোই না ও কী বলে।'

আমি সেই সিদ্ধান্তই নিলুম।

এর দু-তিনদিন পরে আমি একটা অফ পিরিয়ডে ক্যান্টিনে বসেছিলুম একা। স্রগ্ধরা ওর ক্লাসের কয়েক জন ছেলেমেয়ের সঙ্গে ভেতরে এল। আমি স্রগ্ধরাকে ডাকলুম। বললুম, 'একটু এদিকে আসবে। একটা কথা আছে।'

আমার মুখের ভাবে বোধ হয় কিছু একটা ছিল। সৌরভ বলল, 'এই যে! স্রগ্ধরা তোকে বোধ হয় দেবপ্রিয় প্রেম নিবেদন করবে।'

কথাটা শুনে সবাই হেসে উঠল, কেবল স্রগ্ধরা হাসল না। আমিও না।

স্রগ্ধরা একটু উদ্‌বিগ্ন মুখে আমার সামনে এসে বসল। ক্যান্টিনে তখন এমন গোলমাল চলছিল যে আমার কথা যে অন্য টেবিলের কেউ শুনতে পাবে না তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। তবুও গলাটা নীচু করে বললুম, 'সৌরভ

প্রায় ঠিকই বলেছে। তোমাকে আজ আমার কয়েকটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। কথাগুলো প্রেম সংক্রান্ত, প্রেম নিবেদন কি না জানি না।'

স্রগ্ধারা গম্ভীর কিন্তু ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'কী কথা?'

'দ্যাখো তোমার কাছে আমার একটা কনফেশন করবার আছে। আমি তোমার প্রেমে পড়েছি। আমার সম্পর্কে তোমার কী মনোভাব আমি জানি না। তবে এটুকু জানি যে তুমি আমাকে অন্তত বন্ধু বলে স্বীকার করো। সেই বন্ধুত্বের জোরে আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

'বলো।'

'আমার বোধ হয়, তোমার প্রেমে পড়া আমার উচিত হয়নি।'

'কেন?'

'আমার ব্যাকগ্রাউন্ড বোধ হয় তোমার জানা নেই। আমি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। আমার মা স্কুলে পড়িয়ে উদয়াস্ত টিউশনি করে আমাদের সংসার চালান। উত্তর কলকাতার একটা গলির মধ্যে একটা প্রাচীন বাড়ি ছাড়া আমাদের নিজস্ব বলতে এ জগতে আর কিছুই নেই। এমনকী আত্মীয়স্বজন বলতে যা বোঝায়, তা-ও নেই।'

স্রগ্ধরার গলাটা কঠিন শোনাল। বলল, 'তুমি কী বলতে চাইছ? আমার বাবা খুব বড়োলোক, আমি গাড়ি চড়ে ঘুরি, তাই...'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'না না না, একেবারেই তা নয়। তুমি গরিব, বড়োলোক, পাগল, ছাগল যাই হও না-কেন, আমার সমস্যাটা তা নয়। আমার সমস্যাটা অন্যত্র।'

'কোথায় তোমার সমস্যা?' স্রগ্ধরার গলাটা তখনও কঠিন।

'সমস্যাটা কোথায় জানো? আমি তোমার প্রেমে পড়ে একেবারে পাগল হয়ে গেছি। দিন নেই রাত নেই, খালি তোমার কথা ভাবি। অঙ্ক না-করে, গাদা গাদা কবিতা লিখে চলেছি। ক্লাসে বসে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছি, এমনকী ড. বিকাশ গাঙ্গুলির ক্লাসেও কনসেনট্রেট করতে পারছি না।'

'তা, প্রেমে পড়লে ওরকম হয়েই থাকে। আমারও হচ্ছে।' স্রগ্ধরার গলাটা এইবার তরল শোনাল।

আমি লাফিয়ে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলুম। গত দু-তিনদিন ধরে যে ডায়ালগগুলো মুখস্থ করেছি সেগুলো পুরোটা না-বলে তো হাসতে পারি না। কম্পিত কণ্ঠে বললুম, 'বটে? কিন্তু আমার তো এরকম হলে চলবে না।'

'তুমি চলবে না বললে তো হবে না। এরকম হবেই, হতে বাধ্য।'

'কিন্তু আমার যে একজন ভদ্রমহিলাকে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার। তিনি যে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। আমি বড়ো হব, টাকাপয়সা রোজগার করব। তা না-হলে তাঁর এই দীর্ঘ পরিশ্রম যে ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমি যদি পড়াশুনো ঠিকমতো না-করতে পারি, তাহলে আমি তো তাঁর সব আশা, সব স্বপ্নই ব্যর্থ করে দেব। এদিকে আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি। পড়েই গেছি। এটা একটা অবধারিত আর অপরিবর্তনীয় ঘটনা। এখন তুমি বলো কী আমার কর্তব্য, কী আমি করতে পারি। তুমি অবশ্য একটা থিয়েটারি ঢঙে হাত নেড়ে বলতে পারো, "আমাকে ভুলে যাও দেবপ্রিয়, মনে করো আমি তোমার কেউ নই" ইত্যাদি আর সেই সঙ্গে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস। সেটা ভুলে যাও। এ ছাড়া অন্যকোনো উপদেশ যদি দিতে পারো তো দাও।'

শ্রদ্ধরা স্মিতমুখে অনেকক্ষণ টেবিলের ওপরে রাখা নুন-গোলমরিচের ডাব্বাদুটো নাড়াচাড়া করল। তারপর বলল, 'তোমাকে এ ব্যাপারে কিছু বলবার আগে, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটাও তোমার জানা দরকার। সেটা বলি শোনো।'

শ্রদ্ধরা যা বলল তাতে বুঝলুম চূড়ান্ত বা নির্ভেজাল সুখ বলে বোধ হয় কিছু হয় না, বা হতে পারে না। যেখানে সুখ ছাড়া কিছু থাকার কোনো প্রয়োজনই নেই সেখানেও অকারণে, ঘুণপোকার মতো নিঃশব্দে এমন একটা কিছু এসে ঢোকে যা মানুষের ভেতরটা ঝাঁঝরা করে দেবার চেষ্টা করতে শুরু করে দেয়।

শ্রদ্ধরার বাবারা দুই ভাই আর এক বোন। বোনই সবার বড়ো, শ্রদ্ধরার বাবা মাঝখানে। শ্রদ্ধরার ঠাকুরদাদা পশ্চিমবঙ্গ সরকারে বড়ো অফিসার ছিলেন, মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন বম্বের এক বড়ো কোম্পানির চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের সঙ্গে। দুই ছেলেই বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে খুব ভালো রেজাল্ট করে পাশ করেছিল। বড়ো ছেলে মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করল আর ছোটো ছেলে ল-কলেজ থেকে উকিল হয়ে বেরুল। এইসময় হঠাৎ ওই যে বললুম— অকারণে সংসারে দুর্যোগ দেখা দিল। শ্রদ্ধরার ঠাকুরদাদা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন আর তার কয়েক মাসের মধ্যে গেলেন ঠাকুমা। দুই ছেলের তখন পসার জমার কোনো লক্ষণই নেই। এদিকে মারা যাবার ঠিক আগে শ্রদ্ধরার ঠাকুমা তাঁর বড়ো ছেলের বিয়েও দিয়েছেন। সেই ঘোর বিপদের দিনে শ্রদ্ধরার পিসিমা ওর বাবাকে বম্বেতে একটা চাকুরি জুটিয়ে দিয়ে ওঁকে ওখানে নিয়ে গেলেন। কলকাতার বাড়িতে ওর কাকা রইলেন একা। এরপর আস্তে আস্তে বম্বের নামিদামি ডাক্তারদের মধ্যে স্থান করে নিলেন বাঙালি ডাক্তার বিশ্বেশ্বর রায়চৌধুরি। কিন্তু ছোটো ভাই মুক্তেশ্বর রায়চৌধুরির কপাল খুলল না।

ব্রিফলেস উকিল হয়ে তিনি যেই তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলেন। কিন্তু তাই বলে যে তাঁর কোনোরকম অর্থাভাব হল তা নয়। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে দাদা ছোটোভাইকে টাকা পাঠাতেন। আর তারপর যখন বিশ্বেশ্বরের অনেক টাকা হল, তখন তাঁর সব ইনভেস্টমেন্টেরই দেখাশোনা করবার দায়িত্ব পেলেন ছোটোভাই। ফলে, মুক্তেশ্বরের বেশ দু-পয়সা হল যার বেশিরভাগটাই, স্রগ্ধরার মতে দাদাকে ঠকিয়ে করা। ইতিমধ্যে তিনি বিয়েও করেছেন। শ্বশুরবাড়ি মানিকতলায়, শ্বশুরমশাই হরশঙ্কর মল্লিক দুঁদে উকিল আলিপুর কোর্টে সবাই ওঁকে এক ডাকে চেনে।

মুক্তেশ্বর হরশঙ্করের মেয়েকে বিয়ে করলেন বটে কিন্তু তাঁর জুনিয়ারদের মধ্যে ঠাঁই পেলেন না। দেমাকি, ঠমকি, কটুভাষিণী গৃহিণীকে সামলাতে সামলাতে তাঁর মুক্তকচ্ছ অবস্থা হল।

এদিকে পুনরায় বিপদ। স্রগ্ধরার জন্মের বছর পাঁচেক বাদে ওর মা-র একটা অদ্ভুত অসুখ করল যেটা সচরাচর দেখা যায় না। এই অসুখের একটা বহির্লক্ষণ হচ্ছে, মুখে গলায় চাকা চাকা আমবাতের মতো বেরুনো। নোনা জায়গায় বিশেষত সমুদ্রের ধারে এ অসুখের তীব্রতা বাড়ে, খুব কড়া ওষুধেও কোনো কাজ হতে চায় না। তখন ডাক্তার রায়চৌধুরি একরকম নিরুপায় হয়েই ছোটো দুই মেয়েকে দিয়ে স্ত্রীকে কলকাতায় রেখে এলেন। বড়ো মেয়ে গায়ত্রী রইল তাঁর কাছে। সে তখন সিনিয়র স্কুলে পড়ছে, তাকে সেখান থেকে না-সরানোই উচিত বলে বিবেচিত হল। মালিনী যখন স্কুল লেভেল পাশ করল তখন সেও বম্বে ইউনিভার্সিটিতে চলে গেল। কিন্তু স্রগ্ধরা কলকাতা ছাড়তে পারল না। কারণ, ও যখন স্কুল ছাড়ছে, ততদিনে ওর মা প্রায় অথর্ব হয়ে পড়েছেন। ভীষণ মোটা হয়ে গেছেন, হাঁটাচলা করতে পারেন না বললেই হয়, পঞ্চাশ পেরুতে না-পেরুতেই বৃদ্ধত্ব যেন নানাদিক দিয়ে তাকে ঘিরে ধরেছে। এ অবস্থায় তাঁকে একা কাকা-কাকিমার হাতে ফেলে রেখে স্রগ্ধরা বম্বে যেতে চাইল না। ভরতি হল আমাদের ইউনিভার্সিটিতে।

এখন ওর মার স্থবিরত্ব আর বাবার প্রবল কর্মব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে স্রগ্ধরার কাকা আর কাকিমা ওর জীবনটা নিয়ন্ত্রণ করবার আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন। ওঁদের দুই ছেলে, মৃগাঙ্ক আর মৃত্যুঞ্জয়। মৃগাঙ্ক ইন্দোরে চাকরি করে আর মৃত্যুঞ্জয় আছে আমেরিকায় গায়ত্রীর কাছে থেকে পড়াশুনো করে। ফলে দু-জনের সম্মিলিত দৃষ্টি এখন এসে পড়েছে স্রগ্ধরার ওপর। সে কী বই পড়বে, কোথায় যাবে, কার সঙ্গে মিশবে— তার সব কিছুর মধ্যে দু-জনের, বিশেষত কাকিমার শ্যেনদৃষ্টি এসে পড়তে শুরু করেছে।

স্রগ্ধরা বলল, 'জানি না কেন হঠাৎ ওঁদের ধারণা হয়েছে যে কো-এডুকেশনে পড়লে আমি খারাপ হয়ে যাবই।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'খারাপ মানে কী?'

'খারাপ মানে, বাজে ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করব, লেখাপড়া না-করে ছেলেদের সঙ্গে সিনেমায় যাব তারপর হয়তো একটা লুচ্চা লোফারের সঙ্গে ইলোপই করে বসব।'

'এই মরেছে!'

'তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?'

'না, না, ভয় পাচ্ছি এই জন্যে যে ওঁরা আমাকে ঠিক কী দৃষ্টিতে দেখবেন তাতো বলা যায় না। মানে, লুচ্চা লোফার তো একটা রেলেটিভ টার্ম, তাই না? যেমন ধরো, যাঁকে সারা বাংলার সাহিত্যজগৎ অমর কথাসাহিত্যিক বলত, সেই শরৎচন্দ্রকে না কি তাঁর ঘনিষ্ঠ কেউ কেউ লুচ্চা লোফার ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারতেন না।'

'ঠিক কথা। কাকিমার কিছু আদর্শ বন্ধুকে আমি দেখেছি, তাদের আমার লুচ্চা লোফার ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি। অতএব, একটা ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো যে ওদের কাছ থেকে তুমি ওই বিশেষণটি ছাড়া আর কিছুই পাবে না।'

'অত্যন্ত সুসংবাদ! তারপর?'

'এখন তুমি বুঝতেই পারছ যে কাকা-কাকিমার চক্রব্যূহ থেকে যদি আমাকে বেরিয়ে আসতে হয় তাহলে আমাকে পরীক্ষায় পাশ করতে হবে, একটা চাকরি পেতেই হবে। নিজের পায়ে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।'

'তোমার বাবা?'

'তার ধারণা, মুক্তার মতো ছেলে আর ভূভারতে নেই— এত সৎ, এত সরল! আর বউমা-র তো কোনো তুলনাই হয় না। ওরা দু-জনে যে কী দারুণ অভিনেতা সেটা দেখেছি আমি। কিন্তু, আমার কথায় বাবার বিশ্বাস টলবে না। ওদের বিরুদ্ধে যদি আমি যাই, বাবা আমাকে সমর্থন করবে না তা আমি জানি।'

'তোমার দিদিরা?'

'বড়দি তো বায়োকেমিস্ট্রি ছাড়া আর জগতে যে দ্বিতীয় কোনো বস্তুর অস্তিত্ব আছে তাই জানে বলে মনে হয় না। বিয়েও করেছে তেমনই এক সাহেবকে। যেমন ডক্টর চার্লস ও'হারা তেমনি তাঁর গিন্নি ডক্টর গায়ত্রী ও'হারা। দু-জনে একসঙ্গে কাজ করছে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে। ওদের একটাই কথা, কোনো প্রবলেম হলেই এখানে চলে আসবি। আর ছোড়দি আছে আটলান্টায়। সে আবার আর

এক পাগল। বিয়ে করেছে এক মারাঠিকে— নাগেশ্বর দত্তাত্রেয় আপ্তে। দু-জনে মিলে পারফরমিং আর্টস না কী-সব নিয়ে দিনরাত্রি লড়ে যাচ্ছে, নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। কিন্তু আশ্চর্য, ওদেরও বক্তব্য একটাই। এখানে চলে আয় সব ঠিক হয়ে যাবে। আরে! চলে আয় বললেই হল নাকি? মাকে কে দেখবে? আমি চলে গেলে স্বর্ণডিম্ব প্রসবিনী বলে হয়তো কিছুদিন জিইয়ে রাখবে। কিন্তু সেটা বেশিদিন নয়। ওরা বলে, এটা নাকি আমার বাড়াবাড়ি। আমি তা বলি না। যতদিন যাচ্ছে, অবস্থা যেন আরও দম আটকানো হয়ে আসছে।'

'তোমার পিসিমা পিসেমশাই কী বলেন?'

'কিছুই না, কারণ দু-জনের কেউই আজ আর বেঁচে নেই। আমার এক পিসতুতো দাদা আছে। নাম শুনে থাকবে হয়তো, সমীর বরাট। বম্বের ফিল্ম প্রোডিউসার। একমাত্র সমীরদাই তার ছোটোমামার স্বরূপ খানিকটা জানে। কিন্তু তাতে লাভ কিছুই নেই। আমার বাবার ধারণা যারা বায়োস্কোপ করে তারা হচ্ছে জগতের নিকৃষ্টতম জীব। কাজেই সেই জীব যাকে পছন্দ করবে না সে যে আসলে অত্যন্ত ভালো লোক তাতে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না।'

'সেকী? সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন... আর্ট ফিল্ম...'

'সব্বাই, সব্বাই খারাপ। বায়োস্কোপ মানেই স্বভাব নষ্ট, চরিত্র নষ্ট, মদ্যপান ইত্যাদি ইত্যাদি। জানো বাবা, যদি কাউকে 'হৃদয় বেদনা বহিয়া প্রভু এসেছি তব দ্বারে' গানটি গাইতে শোনে তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে পাকড়াও করে অপারেশন টেবিলে ফেলে বাইপাস সার্জারি করতে শুরু করে দেবে। একমাত্র ওটাই বাবার কাছে আর্ট, আর কিছু নয়।'

আমার প্রবল হাসির মধ্যে সৌরভ এসে ধপাস করে আমার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল। বলল, 'দেখালি বাবা। প্রেম নিবেদন তো তিনটে কথায় হয়, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তা, এর মধ্যে এত বক্তব্য আসে কোত্থেকে আর এত হাসিরই বা কী আছে?'

আমি বললুম, 'দ্যাখ, যা বুঝিস না তা নিয়ে একদম মাথা ঘামাবি না। প্রেম নিবেদন অত সহজ নয়, বুঝলি? তুই ব্যাটা সিলেটি বাঙাল, এখনও জিভের আড় ভাঙেনি, প্রেম বলতে ফ্রেম বলিস, তুই এসবের কী বুঝবি? আগে উচ্চারণ ঠিক কর, তারপর পাঞ্চালী সান্যালকে একবারও না-থেমে প্রেম নিবেদন করে ওঠ, তখন এ ব্যাপারে তোর সঙ্গে আলোচনা করব।'

বন্ধুরা বলল, 'ঠিক কথা। আর মনে রাখবি, পাঞ্চালী কিন্তু বেজায় বদরাগী। তাকে যদি "ফ্রিয়ে ফাঞ্চালী" বলে ডেকেছিস তো তোর দফা কিন্তু গয়া। ওর

নোট টুকে পরীক্ষা পাশ করা একদম বানচাল হয়ে যাবে।'

সৌরভ অত্যন্ত চিন্তিত মুখে গাল চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'তোদের বাবা-মায়ের কি খেয়ে দেয়ে আর কোনো কাজ ছিল না? এরকম সব বীভৎস বীভৎস নাম রেখেছেন কেন, এ্যাঁ? যেমন তোর তেমনি পাঞ্চালীর আর গাধা অনিরুদ্ধটা যার পেছনে দৌড়ুচ্ছে— কী যেন নাম— শর্মিষ্ঠা। যেমন কঠিন বানান তেমনি কঠিক উচ্চারণ। আমার বয়ে গেছে তোদের প্রেম নিবেদন করতে। আমাদের পাড়ায় উমা, চাঁপা, রমা, শ্যামারা সব রয়েছেন, আমি তাঁদের কাছেই যাব।'

স্রগ্ধরা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আচ্ছা বাবা, তাই যাস। এখন আগে ক্লাসে তো চল।' বলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ছুটির পর গেটের কাছে দাঁড়িও।'

ছুটির পর গেটের কাছে দাঁড়ালুম। স্রগ্ধরা এসে আমার হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিয়ে বলল, 'বাড়ি গিয়ে খুলো এখানে নয়।' বলে এক দৌড়ে গাড়ির দিকে চলে গেল।

বাড়ি পর্যন্ত অপেক্ষা অবশ্য করা গেল না। বাসেই চিঠিটা পড়ে ফেললুম। আমার জীবনের সেই প্রথম প্রেমপত্র। আহা, প্রেমপত্রের কী ছিরি! না-আছে কোনো সম্বোধন, না-আছে কোনো সমাপ্তি। একটার পর একটা পয়েন্ট এক দুই করে নম্বর দিয়ে লেখা; যেন কোনো কেমিক্যাল এক্সপেরিমেন্টের রিপোর্ট।

পয়েন্ট এক, আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি।

দুই, ভালোবেসে মাথা খারাপ করলে চলবে না। বেঁচে থাকার তাগিদে দু-জনকেই পড়াশুনো চালিয়ে যেতেই হবে।

তিন, আমাদের ব্যাপারটা যথাসাধ্য আড়ালে রাখতে হবে, নইলে প্রবল বাধা আসার সম্ভাবনা।

চার, পড়াশুনোর ব্যাঘাত ঘটাতে পারে দুশ্চিন্তা বা অবিশ্বাস। এ দুটোর কোনোটাই আমাদের মধ্যে আসা উচিত নয়; যেহেতু আমরা কেউই নির্বোধ, অশিক্ষিত, অপরিশীলিত বা যুক্তিহীন চঞ্চলমতি নই। আমরা পরস্পরকে জানি, বেশি দূরেও থাকি না। অতএব এই ঘটনাগুলো না-ঘটাই উচিত।

পাঁচ, লেকের ধারে হাত ধরাধরি করে বসে ঝালমুড়ি না-খেলে ভালোবাসা জমে না— এটা আমি বিশ্বাস করি না। বোধ হয় তুমিও না। অথচ, আমাদের অন্যান্যদের চেয়ে ঘনিষ্ঠতর হতে হবে। কারণ তোমাকে আমার অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে যা আর কাউকে আমি বলতে চাইনি কোনোদিন, তোমার অনেক কথা আমার শুনতে ইচ্ছে করে যা অন্য কেউ আমাকে বলুক আমি তা চাই না কখনো। তার জন্যে আমাদের কিছুটা সময় বের করে নিতে হবে। সেটা

ক্লাস পালিয়ে করা চলবে না (পয়েন্ট দুই পশ্য)। সেটা কোনো অস্বাভাবিক উপায়ে করলে চলবে না যাতে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় (পয়েন্ট তিন পণ্য)। অতএব, আমি ঠিক করেছি যে কাল থেকে যে কোনো একটা ছুতো দেখিয়ে গাড়িটা ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত আসা বন্ধ করে দেব। একেবারে বন্ধ করলে সেটা লোকের সন্দেহ জাগাবে। বিপাশা সিনেমা পর্যন্ত এসে ছেড়ে দেব, সেখানে তুমি অপেক্ষা করবে। আমরা হেঁটে আসব। ফেরার সময়ও গাড়িটা ওখানেই দাঁড়াতে বলব। ছুটির পর এখান থেকে হেঁটে যাব। আমার মনে হয় আমাদের এই সময়টাই আপাতত যথেষ্ট হবে।

ছয়, এখান থেকে বিপাশা পর্যন্ত রাস্তায় যা ভিড় তাতে আমরা নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারব। তার পরেও যদি কিছু বলার থাকে সেটা চিঠি দিয়ে জানালেই হবে।

সাত, ছুতোটাও ভেবে রেখেছি। (পয়েন্ট পাঁচ পণ্য) বলব মোটা হয়ে যাচ্ছি। রোজ হাঁটা দরকার।

মেঘমালা বলল, 'ওরে ব্বাবা, একী মেয়ে না কম্পিউটার?'

আমি মাথা চুলকে বললুম, 'বোধ হয় দুই-ই। কিন্তু সেটা তো বড়ো কথা নয়। এই কাকাটাকে সামলাই কী করে? আমার কী রকম সন্দেহ হচ্ছে ইনি এই অক্ষম আমার বক্ষ ভেদ করে লক্ষ মুখ দিয়ে রক্তপান না-করে ছাড়বেন না।'

'ওসব নিয়ে এখন মাথা ঘামিও না তো। সেরকম অবস্থা হলে তখন দেখা যাবে। আপাতত, ভেবে দ্যাখো, তুমি আজ পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি। তাই না?'

'ঠিক তাই, মেঘমালা। আমার এখন চীৎকার করে আকাশ ফাটিয়ে গান গাইতে ইচ্ছে করছে— সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার, তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার...'

ব্যবস্থাটা ভারি চমৎকার হল। বিপাশা থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পথটা আমরা রোজ দু-বেলা হাঁটি। আমাদের চতুর্দিকে উচ্ছ্বসিত জনস্রোত, অন্তহীন কোলাহল অথচ সেসব আমাদের স্পর্শই করে না। আমার মনে হয় যেন এক নির্জন রাস্তা দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি, আমার সর্বাঙ্গ ঘিরে শুধু স্রগ্ধরার অস্তিত্ব— ওর হাসি, ওর কথা বলা। রোজ বাড়ি ফিরি পরিপূর্ণ মন নিয়ে। এটুকু বুঝি যে ফুল গাছের গোড়ার অতিরিক্ত জল দিলে সেটা যেমন শুকিয়ে যায়, তেমনি আমাদের সম্পর্কটা এর বেশি ঘনিষ্ঠ করতে গেলে সেটা বিবিয়ে উঠতে পারে।

আমরা যা করছিলুম সেটা বুদ্ধিমানের মতো কাজ না নির্বোধ কৃচ্ছ্রসাধন, তা

আমার জানা নেই, কিন্তু থার্ড ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ারে উঠতে আমাদের দু-জনেরই কোনো কষ্ট হল না। বরং আমার কপালে একটা স্কলারশিপ জুটে গেল।

মাকে বললুম, 'এবার টিউশনি দুটো ছেড়ে দাও মা। তোমার ওই শনি দুটো তোমাকে যা টাকা দেয় আমার স্কলারশিপ তাদের চেয়ে অন্তত তিরিশ টাকা বেশি। তাহলে তুমি কেন ছাড়বে না বলো?'

মা বলল, 'আচ্ছা রে বাবা, তাই হবে। আমিও আর পারছিলুম না, জানিস। বয়েস তো হল, সেটা মাঝে মাঝে টের পাই।'

সেদিন রোববার। সকাল থেকে শুনছি দূরে সানাই বাজছে। আমাদের গলিটা যে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে সেই ক্রেসেন্ট অ্যাভেনিউতে কোনো বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে বোধ হয়। সানাই শুনলে আমার মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায়। মা-ও দেখলুম বই পড়া বন্ধ রেখে বিষণ্ণ উদাস দৃষ্টিতে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

তখন বোধ হয় এগারোটা বাজে। হঠাৎ শুনি নীচের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। মা বলল, 'দেখতো কে এল এই সময়? নিশ্চয়ই খবরের কাগজওলা। টাকা নিতে এসেছে।' আমি নীচে নেমে দরজা খুলে দেখি সামনে সহাস্যবদনে স্রগ্ধরা দাঁড়িয়ে। আমি পড়ে যেতে যেতে সামলে নিলুম। বললুম, 'একী কাণ্ড! তুমি? কোত্থেকে?'

স্রগ্ধরা বলল, 'হ্যাঁ আমিই, ওই যে সানাই বাজছে শুনছ? ওই বাড়ি থেকে।'

'ব্যাপারটা কী?'

'কিছুই নয়। ওটা আমার মাসির বাড়ি, মার মামাতো বোন। আজ আমার মাসতুতো দাদার বিয়ে। সেই উপলক্ষ্যে কাল রাত্রি থেকে এখানে আছি।'

'আমাদের বাড়িটা কে দেখিয়ে দিল?'

'কেউ না। আজ সকালে কে যেন বললে, জানকীনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রিট এত কাছে, অথচ সেখানকার কেটারারকে অর্ডার না-দিয়ে কেন বাগবাজারের কোনো এক পার্টিকে অর্ডার দেওয়া হল? আমি অমনি মাসিকে গিয়ে বললুম কাছেই আমার এক বন্ধু আছে, তার সঙ্গে চট করে দেখা করে আসছি। ঠিকানাটা তো জানাই ছিল, কাজেই...'

'কেউ বাধা দিল না?'

'দূর! এটাতো আমার মাসির বাড়ি। কাকার এখানে কোনো অর্ডারই চলবে না।'

'একটা খবর দিয়ে আসতে হয়। এরকম ছেঁড়া গেঞ্জি আর ময়লা পাজামা...'

'তোমাকে খুব ভালো দেখাচ্ছে।'

'বাজে কথা বলো না। কিন্তু তোমাকে যা দেখাচ্ছে না, দারুণ। কলেজে যে

কী কতগুলো ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া ছোপওয়ালা সালওয়ার কুর্তা পরে যাও। এই চন্দন রঙের শাড়িটায় তোমাকে যা দেখাচ্ছে ভাবা যায় না।'

'চুপ করো।'

'সত্যি কথা বলব তাতে ভয় কী মশায়?'

এমন সময় দোতলা থেকে মার গলা শুনলুম, 'কে এল রে, দেবু? কার সঙ্গে কথা কইছিস?'

আমি জোরে জোরে বললুম, 'একজন এসেছে মা। আমি তাকে ওপরে নিয়ে আসছি।'

'কে এসেছে?' বলতে বলতে মা সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াল। আমার পেছনে পেছনে স্রগ্ধরাকে আসতে দেখে বলল, 'ওমা, এ কে রে?'

'ঘরে চলো মা। বলছি।'

মা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেল। বুঝলুম, এক, চশমা পরতে আর দুই ঘরটাকে চটপট একটু গুছিয়ে তুলতে।

আমি ঘরে ঢুকে স্রগ্ধরাকে এগিয়ে দিয়ে এক নিশ্বাসে বলে গেলুম, 'মা এ স্রগ্ধরা। স্রগ্ধরা রায়চৌধুরি। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। কেমিস্ট্রিতে এমএসসি-র ফার্স্ট ইয়ার। বিএসসি-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। আমি ওকে বিয়ে করব।'

আমার শেষ কথাটা যখন বলা হচ্ছে স্রগ্ধরা তখন নীচু হয়ে মা-কে প্রণাম করছিল। কাঁইমাঁই করে উঠল, 'ওমা, দেখুন না, কী সব আজেবাজে কথা বলছে।'

মা হো হো করে হেসে উঠল। স্রগ্ধরাকে আশীর্বাদ করে হাত ধরে খাটে নিজের পাশে বসাল। বলল, 'স্রগ্ধরা? কী সুন্দর নাম। হ্যাঁরে দেবু, তুই ওকে বিয়ে করবি? তা, ও তোকে করবে কি না খোঁজ নিয়েছিস?'

'হ্যাঁ, নিয়েছি। করবে বলেছে।'

স্রগ্ধরা আবার কাঁইমাঁই করে উঠল, 'কী খারাপ লোক!'

মা হাসতে হাসতে বলল, 'যা বলেছিস, একদম বিচ্ছিরি। তা হ্যাঁরে, তোর বাবা মা জানেন?'

স্রগ্ধরা মাথা নীচু করে নীরবে ঘাড়া নাড়ল।

'জানেন না না? বাধা আছে?'

'আছে মা, ভীষণ বাধা।'

আমি বললুম, 'মা, তুমি হয়তো ওর বাবার নাম শুনে থাকবে। বঙ্গের বিখ্যাত সার্জন ডাক্তার বিশ্বেশ্বর রায়চৌধুরি, মিডলটন স্ট্রিটে কিংসটন কোর্টে ওঁর ফ্ল্যাট।'

মা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'বুঝেছি।' বলে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

বোধ হয় নিজের অতীতের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'হ্যাঁরে, ভালো করে সব কিছু ভেবে দেখেছিস তো?'

আমি কিছু বলবার আগেই স্রগ্ধরা বলল, 'হ্যাঁ মা, যতদূর সম্ভব, সবরকম সম্ভাবনার কথাই ভেবে দেখেছি। সবকিছুর জন্যই প্রস্তুত আছি। তবে, আমার কাকা উকিল। তাঁর বুদ্ধি যে কখন কোন পথে চলে তার সন্ধান পাওয়া খুব মুশকিল।'

মার মুখে একটা মৃদু হাসি ফিরে এল। বলল, 'যুদ্ধ করতে পারবি?'

'পারব মা, নিশ্চয়ই পারব।'

'বড়ো কষ্ট।'

'আমি জানি। আমি সেজন্য নিজেকে তৈরি করে রাখছি।'

'যদি হেরে যাস...'

স্রগ্ধরা মা-কে কথাটা শেষ করতে দিল না। বলল, 'কখনো হারব না মা। আপনি দেখবেন। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।'

আমি বললুম, 'মা তোমাকে আশীর্বাদ কী করে করবে? মা তো ইন্টারেস্টেড পার্টি। মার আশীর্বাদ আদালত গ্রাহ্য নয়।'

'ফের বাজে কথা। আদালত গ্রাহ্য হোক বা না-হোক তাতে আমার বয়ে গেল।'

মা স্মিত মুখে বলল, 'করব রে বাবা করব। তোদের আশীর্বাদ করব না-তো করব কাকে? তবে কী জানিস, তোদের যুদ্ধজয়টা বোধ হয় আমি দেখে যেতে পারব না।'

'একথা কেন বলছেন মা?'

'কী জানি। কেন যেন মনে হচ্ছে খেলার সাথীর বিদায়দ্বার খোলবার সময় হয়ে এসেছে। তা সে কথা বাদ দে। তোদের বিজয়-উৎসবের জন্য আমার আশীর্বাদ একটা রাখা আছে। দেবুর বাবা আমাকে কোনোদিন কিছু কিনে-টিনে দেয়নি জানিস। খেয়ালও ছিল না, পয়সাও ছিল না। কেবল, আমাদের বিয়ের দশম বার্ষিকীতে একটা সোনার আংটি অর্ডার দিয়ে বানিয়ে দিয়েছিল। তারপর মিনে করে আমার নাম লেখা ছিল।' বলতে বলতে মার মুখে একটা ছেলেমানুষি লাজুক হাসি ফুটে উঠল। সেটা আমার আলমারির বাঁ-দিকের ড্রয়ারে রাখা আছে একটা লাল রঙের বাক্সের ভেতর। দেবু, সেটা তুই ওকে দিস। সেটাই আমার আশীর্বাদ।'

মার সেই আশীর্বাদ আমি রাখতে পারিনি। তবে আমি জানি মা এজন্য কখনোই আমার ওপরে রাগ করতে পারবে না।

রাস্তায় বেরিয়ে স্রগ্ধরা বলল, 'তোমার মা-র গায়ে কী সুন্দর গন্ধ।'

আমি বললুম, 'ওটাই তো মা-র গুণ।'

'তার মানে?'

'জানো না? আমাদের শাস্ত্রে সব কিছুর এক-একটা গুণ বলা আছে। যেমন, দুধের গুণ সাদা রং, আকাশের গুণ শব্দ, তেমনই পৃথিবীর গুণ গন্ধ।'

'বুঝেছি।' বলে শ্রদ্ধরা চুপ করে গেল। গলির মোড় পর্যন্ত আর কোনো কথা বলল না। সেখান থেকে আমি ফিরে চলে এলুম।

শুনতে পেলুম মোটা গলায় কে যেন আবার ঘোষণা করলেন, 'প্রভিডেন্স! প্রভিডেন্স!' এবার গলাটা চিনতে পারলুম। আমাদের বাড়ির দুটো বাড়ি পরে থাকেন। ভোলানাথ পাইন। অতিরিক্ত পড়াশুনো করতে করতে মাথাখারাপ মতো হয়ে গেছে। বাড়ি থেকে বেরোন না, খালি বই পড়েন। তখন বেরিয়েছেন, বোধ হয় বাধ্য হয়ে।

আমার দৃষ্টিটা অল্প অল্প পরিষ্কার হয়ে আসছিল। আমার সামনে দেখলুম দাঁড়িয়ে আছেন অনুভা কাকিমা। বলছেন, 'এভাবে এখানে বসে থাকিসনে, দেবু। আমাদের বাড়ি চল। একটু কিছু মুখে দে।'

আমি মাথা নাড়লুম।

অনুভা কাকিমা বললেন, 'কেন, না কেন? রাত্রে ভাত জুটেছিল প্লেনে? আর জুটলেই বা কী? এখনই পুলিশ এসে পড়বে। তারপর কাল সারাদিন কি আর কোনো খাওয়া জুটবে? চল দেবু, আমার সঙ্গে আয়।'

আমি আবার মাথা নাড়লুম। ভদ্রমহিলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমার পাশে ধপ করে বসে পড়লেন। এই অনুভা কাকিমাই আমার জীবনে প্রথম ভয়ংকর দুর্ভাগ্যের খবর নিয়ে এসেছিলেন।

ক্রেসেন্ট অ্যাভেনিউতে বাস থেকে নেমে আমাদের বাড়িতে আসতে হলে অনুভা কাকিমার বাড়ির সামনে নিয়ে আসতে হয়। কাকিমার স্বামী উমাশঙ্কর হাজরা রেলে ভালো চাকরি করেন। প্রায়ই তাঁকে বাইরে বাইরে থাকতে হয় আর তখন কাকিমা বাড়ির সামনে রোয়াকে বসে থাকেন আর যাবতীয় পথচারীকে ডেকে ডেকে গল্প করেন।

আমার যখন ফোর্থ ইয়ার প্রায় শেষ হয়ে আসছে, সেই সময় একদিন উনি আমাকে ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার সময় ডাকলেন। আমি হাসি মুখেই গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, তখন বুঝিনি হাসিটা ক্ষণস্থায়ী হবে।

কাকিমা বললেন, 'হ্যাঁরে দেবু, তোর মা-র দিকে একবার চোখ তুলে দেখেছিস কখনো?'

আমি হাসতে হাসতেই বললুম, 'কেন কাকিমা, কী হয়েছে? মাকে না-দেখে উপায় আছে?'

'ছাই আছে। কী চেহারা হয়েছে অর্পণার তোর কি নজরেও পড়ে না? কবে একদিন ধপ করে পড়বে আর মরে যাবে। তখন বুঝবি।'

আমার বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। বললুম, 'আমাকে বলুন কাকিমা, আপনি কী দেখেছেন?'

'দেখব আবার কী? একটা রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখ, ভালো করে হাঁটতে পারে না, রোজ বাস থেকে নেমে দশ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপায়। তোর মা-কে এবার কিছুদিন বিশ্রাম নিতে বল, দেবু।'

'ঠিক বলেছেন কাকিমা। এবার সামার ভোকেশনে মা-কে বাড়ি থেকে বেরুতেই দেব না।'

'দুত্তোর সামার ভেকেশন! কাল থেকে... অপর্ণাকে যদি বাঁচাতে চাস তো কাল থেকেই ছুটি নিতে বল।'

মেঘমালাকে বললুম, 'কী করি বলোতো? মা যে কোনো কথাই শুনছে না। ডাক্তার দেখাতে চাইছে না। বলছে, অনুভাদির মাথা খারাপ। ওঁর কোনো কথাই না কি কানে তোলার মতো নয়। বেশি কিছু বললে রেগে যাচ্ছে।'

মেঘমালা বলল, 'অনুভা কাকিমা একটু পাগলাটে ঠিকই কিন্তু একথাটা যা বলেছেন সেটা ভুল নয়। আচ্ছা, তোমার মামাদের খবর দিতে পারো না?'

'তবে তো অশান্তির চূড়ান্ত হবে।'

'আচ্ছা, উনিশ নম্বরের কবিতা মাসিকে একবার বলে দ্যাখো না। ওঁর সঙ্গে তোমার মার কিন্তু খুব ভাব। দু-জনেই স্কুলটিচার তো আর প্রায় সমবয়সি।'

'ঠিক বলেছ। আমি কালই কবিতা মাসির বাড়ি যাব।'

কবিতা মাসি আর তাঁর স্বামী পবিত্র ঘটক, দু-জনেই আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর কবিতা মাসি জিজ্ঞেস করল, 'তোর পরীক্ষা কবে শেষ হবে, দেবু?'

আমি বললুম, 'আর মাসখানেক বাকি আছে।'

'পরীক্ষা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত চুপ করে থাক। তার আগে হাজার চ্যাঁচালেও তোর মা কোনো কথাই শুনবে না। সামার ভেকেশন শুরু হলেই আমরা সবাই মিলে অপর্ণাদিকে চেপে ধরব। আসলে, তুই না বললেও আমরা তাই করতুম। আমরা এ বছরের গোড়া থেকেই তোর মার শরীরের অবস্থা যে ভালো নয়, সেটা

লক্ষ করছি। ভেবেছিলুম, তোকে না-জানিয়ে ওকে প্রথমে ডাক্তার দীপঙ্কর গুপ্তের কাছে নিয়ে যাব। দীপঙ্করদা তোর মেসোর ছেলেবেলাকার বন্ধু। আমরা বললে সব কাজ ফেলে দেখে দেবে। কিন্তু, অনুভাদির পেটে তো কোনো কথা থাকে না। যেহেতু তোকে বলতে বারণ করা হয়েছিল, অতএব তোকেই আগেভাগে ডেকে কথাটা না-বলে আর পারল না।'

'কী হবে কবিতা মাসি?'

'কী আবার হবে? ঠিকমতো চিকিৎসা করলে সব অসুখ সেরে যাবে। তবে কী জানিস, অ্যানিমিয়া সারতে দেরি হয়। বড়ো পাজি রোগ। ডাক্তার যা যা বলবে সব মেনে চলবি। ফাঁকি দিলে হবে না।'

'আমি একটুও ফাঁকি দেব না। দেখো তুমি।'

'তবে আর কী? বাড়ি যা তো। পরীক্ষার পড়া তৈরি কর ভালো করে। এখন ওটাই তোর প্রথম আর প্রধান কর্তব্য।'

পবিত্র মেসো আমাকে সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'ভয় পাচ্ছিস কেন? আমি বলছি তোর মা একদম সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

'ব্লাড ক্যান্সার! মা আর বাঁচবে না, শ্রদ্ধরা। আমি যে মাকে বলেছিলুম, দোতলায় একটা কলঘর করে দেব যাতে বুড়ো বয়সে মাকে সিঁড়ি ভাঙতে না-হয়। সেটার কী হবে? আমার মনে হচ্ছে, ডাক্তারটাই ভুয়ো। যেদিন দেখলো, তারপর দিন থেকেই মা-র শরীর দেখতে না-দেখতে ভেঙে পড়ল। নিশ্চয়ই এতে ডাক্তারবাবুর কোনো হাত আছে। জানো শ্রদ্ধরা, তবু যখন মা-কে আমার রেজাল্টের কথা বললুম, মা যে কী অদ্ভুত একটা হাসি হাসল!'

শ্রদ্ধরা নিঃশব্দে আমার সামনে বসে আমার এই অসংলগ্ন প্রলাপ শুনে গেল। একবারও আমাকে সহানুভূতি জানানোর বা সন্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল না। কোনো কৃত্রিমতার আশ্রয় নেবার চেষ্টা করল না। আমার কথার স্রোত শেষ হবার অনেক পরে শ্রদ্ধরা জিজ্ঞেস করল, 'টাকাপয়সার কী ব্যবস্থা করলে? খরচ তো অনেক।'

'মার স্কুল থেকে প্রভিডেন্ড ফান্ডের পুরো টাকাটা তুলে দিয়েছে। ছাত্রী আর টিচারেরা চাঁদা তুলে অনেক টাকা দিয়েছে। তাতে অনেকটা খরচ মেটানো গেছে। কিন্তু আরও অনেক দরকার হবে। মা-র গয়নাগুলো বোধ হয় বিক্রি করতেই হবে। নেই-ও তো তেমন কিছু। ঠাকুরদাদার সব ক-টা ফার্নিচার আর আমার প্রাইজের বইগুলো বিক্রি করেও বেশ কিছু টাকা পেয়েছি।'

'বইগুলো বিক্রি করে দিলে? আমাকে দিলে না কেন? আমি কিনতুম।'

'দূর পাগল! ওগুলো তো ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বই। তোমার কী কাজে লাগবে?

স্রগ্ধরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমি কী করতে পারি?'

'কী আর করবে? একদিন গিয়ে মা-কে দেখে এসো। মা তোমার কথা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে।'

'যাব। মাসির বাড়ি যাবার নাম করে। কাকিমার ইদানীং আমার ওপরে নেকনজরটা বেড়েছে। কোথাও যাব বললে হাজারটা প্রশ্ন করে। সেদিন দেখি আমার ড্রয়ার খুলে আমার বন্ধুদের চিঠিগুলো পড়ছে। আমি চীৎকার করাতে উলটে আমাকেই পাঁচ কথা শুনিয়ে দিল। সেইসঙ্গে কাকা আর মাও যোগ দিয়েছিল। যাক গে। যাব, শিগ্‌গিরই যাব। ছুটির মধ্যে যদি খবর পেতুম তাহলে আগেই চলে যেতুম।'

স্রগ্ধরা এল পরের রোববার বিকেলে। মা-র বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে মা-র কঙ্কালসার চেহারার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেঁদে ফেলল।

মা ওর হাতদুটো নিজের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে বলল, 'কাঁদছিস কেন? আয়, পাশে বস। আমার চেহারা দেখে কান্না পাচ্ছে, না রে? মাথায় একটাও চুল নেই। জানিসনে বুঝি, কেমেথেরাপি করলে সব চুল উঠে যায়?'

স্রগ্ধরা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি কিচ্ছু জানতে চাই না। মাত্র কয়েক মাস আগে আপনাকে কীরকম দেখে গেলুম। আর আজ...'

মা ক্ষীণ হাসল। বলল, 'দূর বোকা, যে কাঁদে সে কখনো লড়াই করতে পারে? তোরা না এখন লড়াই করছিস?' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমার চেহারা তো খারাপ হবেই। যে রোগে ধরেছে।'

'আপনি জানেন?'

'কেন জানব না? দেবুর বাবাও তো এই রোগেরই শিকার হয়েছিল। নিজে যে কী অসহ্য যন্ত্রণা পেয়েছে অথচ সারাক্ষণ হাসিমুখে আমাকে শুধু সাহস জুগিয়ে গেছে। খালি বলত, "আমি চলে যাচ্ছি বলে দুঃখ করবার কী আছে? যারা থাকছে তাদের কথা ভাব। ভয় পেও না, সাহস হারিও না, ধৈর্য হারিও না।" ভয় আমি পাইনি জানিস? ধৈর্যও হারাইনি। কিন্তু ওই ওটাকে নিয়ে আমার চিন্তা। ও বড়ো সেনসেটিভ, বড়ো সেন্টিমেন্টাল। একটা অবলম্বন ছাড়া ও থাকবে কী করে?'

মা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে বড়ো বড়ো নিশ্বাস নিল। তারপর বলল, 'দেবু, তুই একটু নীচে যা তো। আমাদের মেয়েদের মধ্যে কিছু কথা আছে।'

'মা কী বলল তোমাকে?' আমি রাস্তায় বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

স্রগ্ধরা বলল, 'সে কথা তোমাকে আমি বলব। রাগ কোরো না। মা আমাকে বললেন তোমাকে বলতে যে ওঁর চিকিৎসা যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়।'

'তার মানে?'

'মার ধারণা চিকিৎসা করে কোনো লাভই হবে না, কেবল টাকা খরচই হবে। মা ভাবছেন যে তুমি ধার করে ওঁর চিকিৎসা চালাচ্ছ। আমাকে বললেন, আমিও যাব আর ছেলেটা তখন গিয়ে রাস্তায় দাঁড়াবে।'

'তুমি কী বললে?'

'আমি বললুম, চিকিৎসা করে কোনো লাভ হয় না, আপনার এ ধারণা ভুল। তা ছাড়া এই চিকিৎসা তো কেবল রোগ সারাবার জন্য নয়, যন্ত্রণা লাঘবের জন্যও। আর এই চিকিৎসা চললে আপনার ছেলের যন্ত্রণাও তো কিছু কমে।'

'মা কী বলল?'

'সেই এক কথা। এত খরচ! অথচ সবই নিরর্থক।'

আমি ঘরে ফিরে এসে মাকে ওষুধ খাওয়ালুম কিন্তু কোনো কথা বললুম না। ঘরের আলো জ্বেলে দিয়ে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসলুম। মা বলল, 'কথা বলছিস না কেন রে? রাগ করেছিস আমার ওপর?'

আমি খট করে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিয়ে বললুম, 'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'কারণ আজ আমি বুঝতে পেরেছি যে তোমরা সবাই স্বার্থপর, অহংকারী। যেমন তুমি তেমন ঠাকুরদাদা। তোমার এত পরিশ্রম, এত কষ্ট, এত দুঃখের ভেতর দিয়ে যাওয়া, সেসব আমাকে ভালোবাসার জন্যে নয়, তোমার আত্মম্ভরিতার জন্য, অহংকারের জন্য। অন্যের কাছ থেকে হাত পেতে কিছু নেব না, শুধু আমিই দিয়ে যাব— এটা অহংকার নয়? তোমার ছেলেও তোমাকে কিছু দিতে পারে না, মা?' বলে আমি বাইরে তাকালুম। দেখি মেঘমালা কাতর চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে।

মেঘমালা বলল, 'একী করছ তুমি? মাকে কষ্ট দিচ্ছ? এই অবস্থায়, এমন সময়ে?'

আমার আরও কিছু বলবার ছিল। বলতে পারলুম না, চুপ করে গেলুম। মাও কোনো কথা বলল না। মুখ দেখে বুঝলুম, যন্ত্রণা পাচ্ছে। সেটা আমার কথায় না রোগের, সেটা বুঝতে পারলুম না।

সেরাত্রে একটা প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীটা একটু ঠান্ডা হল। আর যেন তারই জন্য মার অবস্থা হঠাৎ ভালোর দিকে মোড় নিল। আমি মেঘমালাকে বললুম,

'অন্ধরা বেশ পয়মন্ত আছে, কী বলো? যেদিন এল, তার পরদিন থেকেই, দ্যাখো না মার কী রকম উন্নতি হচ্ছে।'

মেঘমালা হাসল। বলল, 'এখনই অনেক কিছু ভেবে বসো না। দ্যাখো না, ডাক্তার গুপ্ত কী বলেন?'

ডাক্তার এলেন আরও তিন-চারদিন পরে। মাকে বললেন, 'এই তো অর্পণাদি, দিব্যি সেরে উঠছেন দেখছি।'

মা ম্লান হাসল। কোনো কথা বলল না।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ডাক্তারবাবু বললেন, 'দেবু, তোমার মা এখন হয়তো শরীরে সামান্য বল পাবেন। তার জন্যে দেখো, যেন কোনোরকম পরিশ্রম না-করে বসেন।' আমার সঙ্গে ছিল ভোলানাথকাকার ভাইপো রামেন্দু। বলল, 'আপনি ভাববেন না ডাক্তারবাবু। অর্পণাকাকি গায়ে জোর পাচ্ছে অথচ পরিশ্রম করছে না— এটা যতই অসম্ভব ব্যাপার হোক না-কেন, আমরা সবাই মিলে সেটা সম্ভব করব। কি বলিস দেবু?'

আমি কিছু বলবার আগেই ডাক্তারবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, সেই চেষ্টাই করো তোমরা।' ওঁর মুখটা কিন্তু গম্ভীর হয়েই রইল।

মার শরীরের উন্নতি অবশ্য চলতেই থাকল। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বিশ্বকর্মা পুজোর দু-একদিন আগে সন্ধে বেলা পাড়ার মহিলারা দল বেঁধে এলেন মার সঙ্গে দেখা করবার জন্য। আমি কবিতা মাসি আর পদ্মা মাসিকে আড়ালে ডেকে বললুম, 'মাকে বেশি কথা বলিও না যেন।'

শুনে দু-জনেই রেগে গেল। বলল, 'সে তোকে ভাবতে হবে না। এক তো অনুভাদিকে নিয়ে চিন্তা। ওকে আমরা সামলাব।'

তা সামলালো ঠিকই। ছাদে মাদুর পেতে বসল সবাই। কবিতা মাসি মা-কে বলল, 'অপর্ণাদি, আজ আমরা কেবল গান গাইব। খুশির গান, আনন্দের গান। বলো, তুমি কী গান শুনতে চাও।'

মা মৃদু হেসে বলল, 'সব গানই তো আনন্দের। বেশ, তা হলে প্রথমে শোনাও, "পথ এখনও শেষ হল না"।'

পদ্মা মাসি গাইল। ওর আশ্চর্য সুন্দর গলা। আমি ঘরের ভেতর থেকে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছিলুম মা যেন গানে ডুবে যাচ্ছে। যখন গাওয়া হচ্ছে 'ছায়ায় ফেরা ধুলায় চলা মনের কথা যায় না বলা' মা তখন পথের শেষে কাকে যেন কতদিনের মনের কথা বলবার প্রতীক্ষায় তন্ময়।

প্রতীক্ষাটা যেন বড়ো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। হঠাৎ। পুজোর যখন আর দিন দশেক বাকি, মা অসুস্থ হয়ে পড়ল। তিন দিনের মধ্যে বুঝতে পারলুম সময় হয়ে এসেছে।

তখন সন্ধে হয়ে গেছে। ডাক্তার গুপ্ত একটু আগেই বিষণ্ণ মুখে ঘর ছেড়ে চলে গেছেন। মার খাটের পাশে একুশ নম্বর বাড়ির গোপাদি একটা চেয়ারে বসে স্থির দৃষ্টিতে মার মুখের দিকে চেয়েছিল। গত বছর গোপাদির বাবা শিবপদ রক্ষিত মারা গেছেন। গোপাদি বোধ হয় সেই কথাই ভাবছিল। রামেন্দু গেছে ডাক্তারবাবুকে গাড়িতে তুলে দিতে। ওর ফিরে আসতে তখনও একটু দেরি আছে।

ঘরের মধ্যে সে সময় কেবল মার কষ্ট করে নিশ্বাস নেবার একটা যন্ত্রণাক্ত শব্দ।

আমি মেঘমালাকে বলছিলুম, 'এতো তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে গেল, মেঘমালা? এই তো, গত সপ্তাহেই ভাবছিলুম, মা বোধ হয় এ যাত্রা সেরেই উঠল। আর আজ?'

মেঘমালা বলল, 'সব তো শেষ হয়নি। ডাক্তারবাবু একটা ইঞ্জেকশন তো দিয়ে দিয়েছেন। দ্যাখো না, তাতে কী হয়।'

'কিছু হবে না, মেঘমালা, কিছু হবে না। আমি আর কিছুই আশা করি না।'

'কেন করো না? এই তো গোপাদি একটু আগে বলছিল, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আশা ছাড়বে কেন?'

হঠাৎ গোপাদি ডেকে উঠল, 'দেবু, শিগ্‌গির আয়।'

আমি একলাফে পড়ার টেবিল থেকে উঠে মার খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখি, মার নিশ্বাসের যন্ত্রণার শব্দ আর নেই, বেশ স্বচ্ছন্দে প্রায় স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস নিচ্ছে। হঠাৎ মার চোখদুটো খুলে গেল। আমরা দু-জনেই মাকে ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারলুম না; কারণ, কোনো সন্দেহ ছিল না যে সেই চোখের দৃষ্টি আমাদের জন্যে নয়। সামনের দেওয়াল ভেদ করে কোথায় চলে গেছে কে জানে! আস্তে আস্তে মার শীর্ণ মুখে একটা কিশোরীসুলভ মিষ্টি লাজুক হাসি ফুটে উঠল। ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট গলায় মা বলে উঠল, 'একী, তোমার দেখছি একটুও পরিবর্তন হয়নি! ভালো আছো?' তারপরেই মা-র চোখদুটো থেকে দৃষ্টি চলে গেল।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেল। নিয়মভঙ্গের দু-দিন পরে আমার ভবিষ্যত কী হবে তা নিয়ে আমাদের বাড়ির একতলায় পাড়ার বড়োদের সভা বসল। সেখানে অবশ্য আমার বয়সি দু-চারজন বন্ধুরও স্থান হল।

উমাশঙ্কর কাকা বললেন, 'এ বাড়িতে তুই একেবারে একা থাকবি কী করে? তার চেয়ে তুই আমাদের বাড়িতে চল। নীচের একটা ঘর তো খালিই আছে।

পাশের ঘরে চঞ্চল আছে। তোর একা লাগবে না।'

আমি বললুম, 'না কাকা। এ বাড়ি ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।'

ভোলানাথ কাকার বড়দা সুধীর জ্যাঠামশাই বললেন, 'সে তো ঠিকই, পিতৃপিতামহের ভিটে ছেড়ে যাবে কোথায়? কিন্তু বাবা দেবপ্রিয়, তোমার অন্নসংস্থানের কী ব্যবস্থা হবে? রামেন্দুর কাছে শুনলুম তুমি না কি তোমার প্রায় সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে মার চিকিৎসা চালিয়েছ। এ অবস্থায় তোমার চলবে কী করে? পড়াশুনোও তো চালাতে হবে?'

উমাশঙ্কর কাকা বললেন, 'অন্নসংস্থান কোনো একটা ব্যাপারই নয় সুধীরদা। আমার বাড়িতে দু-বেলা উনিশটা করে পাত পড়ে। সেখানে যদি একটা বাড়ে তাতে কারুরই কিছু যাবে-আসবে না।'

মাথা নাড়লেন সুধীর জ্যাঠামশাই। বললেন, 'ওর বাবা দীপককে হয়তো তোমার মনে নেই। কিন্তু দীননাথবাবুকে তো দেখছ। এই বংশের ছেলে স্বেচ্ছায় পরান্নে প্রতিপালিত হবে, তা আমার বিশ্বাস হয় না।'

আমি বললুম, 'এটা কোনো সমস্যাই নয়, জ্যাঠামশাই। আমি একটা স্কলারশিপ পাই। তাতেই চালিয়ে নেব।'

শুনে সবাই সমস্বরে হেসে উঠল। পবিত্র মেসো বললেন, 'এই বাড়ি মেনটেন করে কলেজের খরচা চালিয়ে তোর রোজকার বাসে যাতায়াতের পয়সা পর্যন্ত থাকবে না। তোর কোনো ধারণাই নেই। শোন, তোকে কিছু রোজগার করার ব্যবস্থা করতেই হবে।'

আলোচনা চলল অনেকক্ষণ। অবশেষে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল যে আমাদের বাড়ির একতলাটা ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়াটে জোগাড় করার ভার নিলেন উমাশঙ্কর কাকার পাশের বাড়ির রতন দে মশাই। তাঁর না কি একজন জানাশোনা ভালো দালাল আছে। আরও স্থির হল, আমার আইন আদালত সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার দেখে দেবেন সুধীর জ্যাঠামশাই; আর কবিতা মাসির রাধুনি সরমাদি সকালে আর রাত্রে কোনো একসময় এসে আমাকে কিছু রান্না করে দিয়ে যাবে।

মেঘমালা বলল, 'তোমার যেন সবই অদ্ভুত! লোকে ভাড়াটে বললে বোঝে একটা পরিবার, স্বামী স্ত্রী ছেলেমেয়ে। তা নয়, এগুলো সব কী?'

আমি বললুম, 'কেন এই তো ভালো। স্বামী স্ত্রী হলে রাতবিরেতে ক্যাঁও ম্যাঁও করে ঝগড়া আর বাচ্চাকাচ্চা থাকলে— এই যে মামুর কাথে এত্তু লক্ষ্মী হয়ে থাক, আমরা এত্ত সিনেমা থুড়ি তোমার ছোত্ত পুতুল কিনে এক্ষুনি আসছি।

যতো সব ঝামেলা।'

'তাই বলে রঙের গোডাউন?'

'রঙের গোডাউন কী দোষ করল? রতনকাকার বন্ধু তো বেশ ভালো লোকই দিয়েছেন। কোনো ঝুটঝামেলা নেই, সবাই নিঃশব্দে কাজ করে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, তোমার এই পেছনের উঠোনে কেউ পা দিতে পারবে না, আমার শর্তটা তো মেনে নিয়েছেন তুষারবাবু।'

'কী জানি বাপু। ওই তুষার তরফদার লোকটাকে আমার একদম ভালো লাগে না। কীরকম যেন একটা বাঁদর বাঁদর চেহারা।'

'চেহারা যেমনই হোক, অত্যন্ত ভদ্রলোক। আমি তো ওঁর হাঁটুর বয়িসি অথচ দ্যাখো না কী রকম সম্মান দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেন। আর চারজন লোক যে বাড়িতে আছে, কাজকর্ম করছে, টেরই পাওয়া যায় না। আজ এই তিনমাসে কোনোরকম গোলমাল বা চ্যাঁচামেচি এমনকী জোরে কথা বলা পর্যন্ত শুনিনি। মাঝে মাঝে কী একটা কেমিকেলের গন্ধ আসে, এ ছাড়া আর তো কোনো গণ্ডগোল নেই।'

'শ্রদ্ধরা কী বলছে?'

'কী আর বলবে? ওর ওপর এখন প্রচণ্ড চাপ। ঝুলির বাইরে বেড়াল বেরিয়ে এসেছে। সেটি ওর কাকিমার ভাই-এর ছেলে। তার সঙ্গে ওর বিয়ে দেওয়ার জন্য সবাই উঠে-পড়ে লেগেছে।

'ছেলেটা কেমন?'

'আর বোলো না। এই প্রশ্ন করেছিলুম আমি। শুনে শ্রদ্ধরা মার মার করে তেড়ে এল। বলল, ছেলে যেমনই হোক-না, তাতে আমার কী? সে হিরের টুকরো হতে পারে, নোবেল প্রাইজও পেয়ে থাকতে পারে, আমার সে খবরে তো কোনো দরকার নেই। আমি এই দেবপ্রিয় দত্তকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না, ব্যাস।'

'তোমার পরিচয় কি এখনও জানানো হয়নি?'

'না। শ্রদ্ধরা বলছে, আমার পরিচয় জানলে ওর কাকা আর কাকিমা মিলে আমাকে বিপদে ফেলবে। ওরা নাকি পারে না হেন কাজ নেই। তাই, একেবারে শেষ পর্যন্ত আমার নাম বা পরিচয় উহ্য রাখার চেষ্টা করে যাবে।'

'এইভাবে কতদিন চালাবে বা চালাতে পারবে?'

'এ তো আর কয়েকটা মাস। তারপর পাশ করে বেরিয়ে একটা চাকরি যদি পেয়ে যাই, তখন দেখা যাবে কী করা যায়। আর শ্রদ্ধরাও যদি একটা চাকরি জোগাড় করতে পারে, তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। ততদিন এই ভাবেই চলুক।'

মা বলেছিল, যুদ্ধে বড়ো কষ্ট। ফাইনাল পরীক্ষা যত এগিয়ে আসতে লাগল, কথাটা যে কত সত্যি তা হাড়ে হাড়ে টের পেতে শুরু করলুম। তবে আমার আর কী কষ্ট? আসল যন্ত্রণা পেতে শুরু করল স্রগ্ধরা। সব তো খুলে বলত না, তবে মুখ দেখে টের পেতুম অত্যাচার কতখানি বেড়েছে। বিপাশা সিনেমার কাছে গাড়ি রাখা বন্ধ হয়ে গেল। পুরোনো ড্রাইভার বাতিল হয়ে একটা সাক্ষাৎ শকুনের মতো দেখতে নূতন ড্রাইভার এল। সে ব্যাটাছেলে স্রগ্ধরাকে ডিপার্টমেন্ট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে সেখানেই বসে থাকত ও না-বেরুনো পর্যন্ত। আমাদের দেখা হত কেমিস্ট্রি ল্যাবের বারান্দায়। প্রিয়ব্রত আর সৌরভ নীচে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারটার দিকে নজর রাখত।

স্রগ্ধরা বলল, 'ওরা বুঝেছে যে আমি একটা চাকরি জোগাড় করলেই ওদের মুঠোর বাইরে চলে যাব। তখন আর টাকার জন্য কাকার কাছে হাত পাতব না। কাজেই পরীক্ষার আগেই আমার বিয়ে দেওয়ার জন্য ওরা উঠে-পড়ে লেগেছে। বড়দি আর ছোড়দিকে ওরা হিসাবের মধ্যে ধরে না। ওরা জানে বাবার যত টাকা সবই ওদের কুক্ষিগত হবে যদি এই বিয়েটা ওরা দিতে পারে। আমি স্বনির্ভর হলে ওদের এই জোর খাটানো তখন আর চলবে না আর তখন যদি মা-কে ওরা নেগলেক্ট করে তাহলে তার ব্যবস্থাও আমি নিতে পারব।'

'তোমার মা কী বলছেন?'

'মা ভাবতেই পারছে না যে আমি চাকরি-বাকরি করে মা-র ভার নিতে পারব কোনোদিন। মা ভাবছে, সারাজীবনই এদের ওপর নির্ভর করতে হবে। কাজেই এদের সব ব্যাপারেই সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছে, এদের সব কথাই বিশ্বাস করছে।'

'তোমার যে একটি লুচ্চা লোফার লাভার আছে সেটা কি ওঁরা সন্দেহ করেছেন?'

স্রগ্ধরা ক্ষীণ হাসল। বলল, 'করেননি আবার? লোফারটির পরিচয় জানবার জন্য হেন চেষ্টা নেই যা করেননি।'

'পরিচয়টা জানিয়ে দাও না। ওরা আমার কিছু করতে পারবে না।'

'জানাব। পরীক্ষাটা হয়ে যাক। তবে অত কনফিডেন্ট হয়ো না। কাকিমা আর তার বাপের বাড়ি যে কী জিনিস, সেটা যখন টের পাবে তখন বুঝবে।'

খুব অশান্ত মন নিয়ে পরীক্ষা দিলুম। মা চলে যাওয়ার পর প্রথম একমাস একেবারে পড়ায় মন দিতে পারিনি। সন্ধে হলেই টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিয়ে মেঘমালার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করতুম। মা-র কথা, ঠাকুরদাদার কথা। এই অনর্গল স্মৃতিচারণ অনেকদিন ভোররাত্রি পর্যন্ত চলত। শেষপর্যন্ত দেখলুম, এরকম

করলে চলবে না। এই নিশ্ছিদ্র নিঃসঙ্গতা কাটানোর একমাত্র উপায় পড়াশুনোয় মন বসানো। ব্রহ্মরাও বার বার সেই কথাই বলত। বলত, পড়াশুনো যদি না-করো, তাহলে তোমার মা-র স্মৃতিকে অপমানই করা হবে। কাজেই জোর করে পড়তে শুরু করলুম। ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরি রাত ন-টায় বন্ধ হয়। আমি শেষ পর্যন্ত ওখানে বসে থেকে লাস্ট বাস ধরে বাড়ি ফিরতুম। ফলে পরীক্ষা খুব খারাপ হল না। তবে যতটা ভালো হওয়া উচিত ছিল ততটা নিশ্চয়ই নয়।

পরীক্ষার ঠিক আগে ইউনিভার্সিটির কয়েকটা ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ হয়েছিল। পরীক্ষার পর তাদের সব কটাতেই সিলেকটেড হয়েছি বলে খবর পেলুম। চাকরি নিলুম মনট্রেক্স ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড বলে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে। এখানে আমার প্রধান কারণ ছিল যে এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. বিকাশ গাঙ্গুলি আমাদের ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং লেকচারার ছিলেন। ড. গাঙ্গুলিকে আমরা সকলেই একজন আদর্শ মানুষ আর আদর্শ ইঞ্জিনিয়ার বলে মনে করতুম।

প্রথম দিন অফিসে গিয়েই ব্রহ্মরাকে টেলিফোন করলুম। ওর পরীক্ষাও তখন শেষ, জানি বাড়িতেই থাকবে। ফোন প্রথমে ধরলেন একজন মহিলা। রুক্ষ গলা রুক্ষ মেজাজ। পরিচয় জিজ্ঞেস করাতে বললুম, 'বলবেন আমি দেবপ্রিয় দত্ত কথা বলছি। ওর বন্ধু।'

ব্রহ্মরা ফোন ধরল। জিজ্ঞেস করলুম, 'পরীক্ষা কেমন হল?'

'খারাপ।'

'পাশ করবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'মনোসিলেবলে কথা বলছ যখন তার মানে একজন পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'শোনো, আমি মনট্রেক্সে জয়েন করেছি। আমার ফোন নম্বর গাইডে পাবে। সুযোগ পেলে ফোন কোরো। আর বেশি যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে তো সোজা আমার কাছে চলে এসো। রেজাল্ট না-বেরুনো পর্যন্ত চাকরিটা কনফার্মড হবে না। তবে পাশ আমি করবই, কনফার্মেশন কেউ ঠেকাতে পারবে না। ভয় কোরো না কেমন?'

খুব ক্ষীণ গলায় উত্তর এল, 'আচ্ছা।'

মেঘমালা বলল, 'কী ব্যাপার? কী হয়েছে? তোমাকে ভয়ানক উত্তেজিত দেখছি।'

আমি বললুম, 'উত্তেজিত মানে? আমি একেবারে ক্ষেপচুরিয়াস। জানো আজ কী হয়েছে? ড. গাঙ্গুলি বিকেল বেলা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বললেন,

জনৈক মুক্তেশ্বর রায়চৌধুরি আর তাঁর শালক শিবশঙ্কর মল্লিক আজ সকালে তাঁর কাছে এসেছিলেন। তাঁরা বলছেন যে আমি নাকি একজন ভয়ংকর শয়তান ক্রিমিনাল। কাজেই আমাকে যেন পত্রপাঠ চাকরি থেকে বিদেয় দেওয়া হয় এবং ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়।'

'তোমার বিরুদ্ধে তাঁদের কী অভিযোগ?'

'অভিযোগ হচ্ছে যে আমি হা-ঘরে হা-ভাতে বংশের ছেলে। টাকার লোভে ডাক্তার বিশ্বেশ্বর রায়চৌধুরির মেয়েকে ফুসলিয়ে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি এবং আমার মা-র যখন অসুখ করে তখন তার চিকিৎসা চালানোর জন্য তাকে দিয়ে তার মা-র গয়না চুরি করিয়ে সেই টাকা আত্মসাৎ করেছি।'

'ড. গাঙ্গুলি কী বলেছেন?'

'ড. গাঙ্গুলি তাদের কেবল ঘাড় ধাক্কা দিতে বাকি রেখেছেন। বলেছেন, দেবপ্রিয়কে আমি চিনি, তার সম্বন্ধে এসব কথা যদি দ্বিতীয় বার উচ্চারণ করা হয় তাহলে আমি দরওয়ান ডাকব। এমনকী উনি শ্রদ্ধরার সঙ্গে সরাসরি কথাও বলতে চেয়েছিলেন। ওরা বলেছে, এই ঘটনা ধরা পড়ে যাওয়ায় শ্রদ্ধরা ভয়ানক আপসেট— সে কারুর সঙ্গে দেখা করছে না।'

'উনি তোমাকে কী উপদেশ দিলেন?'

'সাবধানে থাকতে বলেছেন। উনি বলছেন এরা দু-জনেই গুণ্ডাশ্রেণির। করতে পারে না এমন কাজ নেই। যেমন ধরো, পুলিশে খবর দিতে পারে। পুলিশ আসবে, জিজ্ঞাসাবাদ করবে, হয়তো থানায় ধরে নিয়ে যাবে এবং যতরকমভাবে সম্ভব হেনস্থা করবে। কোনো কিছুই প্রমাণ হবে না ঠিকই কিন্তু বদনামটা ঠিকই হবে। এর ফলে অন্য কোথাও হলে তৎক্ষণাৎ চাকরি চলে যেত। সেটা অবশ্য মনট্রেক্সে হবে না। উনি বলেছেন, শোনো ভয় নেই, এসব শয়তানির মোকাবিলা করার জন্য আমি তোমাকে সবরকমভাবে সাহায্য করব।'

'তোমার সবকথা ওঁকে বলেছ?'

'হ্যাঁ বলেছি। আমার কী মনে হচ্ছে জানো? ওরা শ্রদ্ধরার মা-র গয়নাগুলো সরিয়েছে। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মরবে। টাকাকে টাকা আসবে, আমারও থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেওয়া সম্ভব হবে।'

'ওরা কি পুলিশে খবর দেবে?'

'দেবে তো বটেই। হয়তো দিয়ে দিয়েছে। মনট্রেক্সে সুবিধে হবে না ঠিকই কিন্তু ডাক্তার রায়চৌধুরিকে তো কনভিন্স করতে হবে।'

'তাহলে কী করবে?'

'কী আবার করব। যেমন চলছে তেমনই চালিয়ে যাব। যুদ্ধ করতে যখন নেমেছি তখন ভয় পেলে চলবে কেন? এখন শুধু ভাবতে হবে স্রগ্ধরাকে কীভাবে বের করে আনা যায়।'

স্রগ্ধরা কিন্তু ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেল। যখন ফোন করি, অশ্রাব্য গালিগালাজ শুনি। কোনো ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা যে এরকম ভাষা ব্যবহার করতে পারেন তা আমার কল্পনার অতীত ছিল। চিঠি লিখি, জবাব আসে না। স্রগ্ধরার মাসির বাড়িতে ফোন করলুম। ওরা বললেন, স্রগ্ধরার খুব অসুখ, ডাক্তার ঘর থেকে বেরুতে বারণ করে দিয়েছে।

এরকম দু-সপ্তাহ চলল। তারপর স্রগ্ধরার মাসিকে ফোন করে সবকথা বললুম। ভদ্রমহিলা আমার সবকথা শুনলেন না। বললেন, 'তোমাকে আমি চিনি না। তবে তোমার সম্পর্কে মেজদি, মানে স্রগ্ধরার মা-র মুখে অনেক খারাপ কথা শুনেছি। আবার, তোমাদের পাড়ার পারমিতা ভট্টাচার্য আমার ছোটো মেয়ের খুব বন্ধু। সে আবার তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যাক, এসব ব্যাপারে আমি নাক গলাতে চাই না। তবে, তুমি যে বললে যে ওরা স্রগ্ধরাকে আটকে রেখেছে, তা আমি বিশ্বাস করি না। তা হলেও, আমি খোঁজ নেবার চেষ্টা করব।'

এই ফোনের দিন চারেক পরে সন্ধে বেলা আমাদের বাড়িতে একটি ছেলে এল। উনিশ-কুড়ি বছর বয়েস হবে। সে দেখলুম বেশ উত্তেজিত। বলল, 'স্রগ্ধরাদি আজ দুপুরে আমাদের বাড়িতে ফোন করেছিল। আমি ধরেছিলুম। আমাকে বলল, ওরা মেজমাসির গয়না সরিয়ে ফেলেছে আর বলছে যে সেগুলো নাকি স্রগ্ধরাদি আপনাকে দেবার জন্য চুরি করেছে। আর বলেছে যে ওরা ওকে ফোন করতে দিচ্ছে না, বাড়ি থেকে বেরুতে দিচ্ছে না। দুপুর বেলা ফাঁক পেয়ে ফোনটা করেছে। ফিসফিস করে কথা বলছিল। আর আপনাকে জানাতে বলেছে যে ওরা পুলিশে খবর দেয়নি। মেসোমশাইকে বলেছে যে পারিবারিক কেচ্ছা প্রকাশ না-করার জন্যই দেয়নি। কিন্তু ওঁকে জানিয়েছে যে আপনি অতি বদমাশ লোক, আপনার বাড়িতে বোমা বানানোর ফ্যাক্টারি আছে। ওরা একটা খুব খারাপ ষড়যন্ত্র কিছু করেছে। স্রগ্ধরাদি বলেছে, আপনি যেন কিছুদিনের জন্য অন্য কোথাও গিয়ে থাকেন।'

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে ছেলেটি হাঁপাতে লাগল। আমি বললুম, 'তুমি যে স্রগ্ধরার মাসতুতো ভাই, তাতো বুঝতেই পারছি। কিন্তু, তুমি আমাকে কষ্ট

করে খবরটা যে দিতে এলে সেকথা তোমার মা জানেন? তাঁর কিন্তু ধারণা আমি অতি বদলোক।'

'মা-র কথা বাদ দিন। ওদের সব ক-টা বোনের মাথায় গণ্ডগোল আছে। তবে আমি জানি আপনি খারাপ লোক নন।'

মেঘমালা বলল, 'কী দরকার এখানে থাকার? একটা মেস-টেস জোগাড় করে নিতে পারো না? সেখানে গিয়েই না-হয় থাক কিছুদিন।'

আমি বললুম, 'পাগলের মতো কথা বোলো না তো। কিছুদিন। কিছুদিন মানে কতদিন? কবে ওরা কী করবে তার ভয়ে আমি বাড়িঘর ছেড়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব?'

'অন্তত তোমাদের রেজাল্ট বেরুনো পর্যন্ত। স্রগ্ধরা এমএসসি পাশ করে গেলে তখন কী আর ওকে আটকে রাখতে পারবে?'

'কেন পারবে না? এখন যেমন, তখনও তেমনি পারবে। ওরা যা করতে পারে করুক। আমি ভয় পেয়ে পালাব না।'

'গোঁয়াতুর্মি হচ্ছে কিন্তু।'

'হোক। তবু যাব না।'

'আমার কিন্তু ভয় করছে। মনে হচ্ছে, কী যেন একটা ভীষণ ব্যাপার হতে যাচ্ছে।'

'কী আবার হবে? তেমন হলে, ছেড়ে যাব তীর মাভৈঃ রবে।'

এটা দিন সাতেক আগেকার কথা। তার দু-দিন পরেই কোম্পানির কাজে আমাকে মাদ্রাজ যেতে হল। কাজকর্ম সেরে কাল বিকেলে যখন এয়ারপোর্টে পৌঁছলুম, দেখি মহা গণ্ডগোল বেধে গেছে। টার্মিনাল বিল্ডিং লোকে লোকারণ্য, সবাই তারস্বরে চ্যাঁচাচ্ছে। ব্যাপার কী? জানা গেল সকাল থেকে সারা দেশে একসঙ্গে তিন তিনটে বম্ব স্কেয়ার হয়েছে তিনটে এয়ারপোর্টে, ফলে সমস্ত ফ্লাইট ডিলেড। আমার প্লেন যে কখন আসবে তার কোনো স্থিরতা নেই। হাপিত্যেশ করে বসে রইলুম। প্লেনে ওঠার ডাক এল রাত সাড়ে এগারোটায়, ছাড়তে ছাড়তে বারোটা। দমদমে নামলুম রাত আড়াইটেয়। মাদ্রাজ এয়ারপোর্টেই বসে থাকার সময় তিনজন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে একটা ট্যাক্সিতে উঠে ক্রেসেন্ট অ্যাভেনিউ-র মোড়ে এসে নামলুম যখন তখন রাত তিনটে।

ওভারনাইট ব্যাকটা হাতে করে আমাদের গলিতে ঢুকতে যাব, পেছন থেকে একটা অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম, 'দাঁড়াও। যেও না।'

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি মোড়ের মাথায় ল্যাম্প পোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেঘমালা। পরনে হলুদ রঙের ছাপা শাড়ি আর কালো ব্লাউজ।

আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এ কী করে সম্ভব? মেঘমালা কি তাহলে! আমি কম্পিত কণ্ঠে বললুম, 'একী তুমি? এ যে অসম্ভব অবিশ্বাস্য ব্যাপার!'

মেঘমালা দৃঢ় গলায় বলল, 'অবিশ্বাস্য হোক বা না-হোক, দাঁড়িয়ে যাও। ওদিকে যেও না। কী চিন্তা যে হচ্ছিল! কেন এত দেরি করে সবাই? বলছি না, যেও না।'

'কেন মেঘমালা? বাড়ি যাব না?'

'না। ওদিকে বিপদ। ভীষণ বিপদ। তর্ক কোরো না, যা বলছি তাই করো।'

'কীসের বিপদ? বাড়ি আমি যাবই। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।' বলতে বলতেই আমাদের পাশ দিয়ে দু-টি ছেলে মোটর সাইকেলে চড়ে গলির ভেতর থেকে বেরিয়ে ক্রেসেন্ট অ্যাভিনিউ দিয়ে চলে গেল।

মেঘমালা উত্তেজিত গলায় বলল, 'নম্বরটা নিয়েছ? ওই মোটর সাইকেলের?'

'না তো। কেন?'

'পরে জানবে। আমি নিয়েছি। লিখে নাও।' বলে একটা নম্বর বলল।

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ডায়েরি বের করে নম্বরটা লিখে নিলুম। লিখতে লিখতেই একটা হালকা হাসির শব্দ শুনলুম। মেঘমালা বলল, 'আচ্ছা, এবার যাও। ক্যাবলা!'

আমি মুখ তুলে আর কাউকে দেখতে পেলুম না। আর ঠিক সেইসময় কে যেন আবার আমাকে পেছন থেকে ডাকল। পুরুষের গলা। দেখি তিন নম্বর বাড়ির অমলেন্দু মুখার্জী। অমলদা বাটা ফ্যাক্টরিতে চাকরি করেন আর সারা বছর সকাল সাড়ে তিনটেয় বাড়ি থেকে বেরোন। কটার সময় ফ্যাক্টরি শুরু হয় কে জানে!

অমলদা বললেন, 'একী দেবু, তুই এসময় হাঁ করে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস যে? কোত্থেকে ফিরছিস বুঝি? কিছু হারিয়েছে?'

আমি বললুম, 'না অমলদা। আচ্ছা, এইমাত্র দুটো ছেলে মোটর সাইকেল করে গেল, দেখেছ?'

'দেখেছি। তোদের বাড়ির দিক দিয়েই এল।'

'ওরা কারা? এত রাতে এপাড়ায়?' আমি কেবল এটুকুই বলতেই হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে চারদিক থরথর করে কেঁপে উঠল। আমি চমকে উঠে দেখলুম আমাদের বাড়ির ওপরে একটা গাঢ় কমলা রঙের আগুনের গোলা আকাশের দিকে উঠে গেল। তারপর সমস্ত দিক থেকে কেবল কাচ ভেঙে পড়ার আওয়াজ।

আমি পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে দেখলুম আমার চোখের সামনে আমাদের বাড়িটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে গেল। আমি মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলুম। বোধ হয় অমলদাই আমাকে উঠিয়ে সরকারদের রোয়াকে বসিয়ে দিলেন।

অনুভা কাকিমা ঘ্যানঘ্যান করে আমাকে কিছু খেয়ে নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করে যাচ্ছে, হঠাৎ ভিড় ঠেলে চঞ্চলদা এগিয়ে এল। বলল, 'দেবু, ওঠ। তোকে এবার থানায় যেতে হবে। দারোগাবাবু ডাকছেন।'

থানায় আমার সঙ্গে কিন্তু কোনোরকম খারাপ ব্যবহার করা হল না। দারোগাবাবু অসংখ্য জেরা করলেন, সেটা না-করাটাই অস্বাভাবিক হত। আমার পেছনে পেছনে অমলদাও এল। ভোরের আলো ফুটতে এল রামেন্দু। বলল, 'জ্যাঠামশাই আসছেন। তোর কোনো ভয় নেই।'

রামেন্দুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থানায় এলেন আর একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। এঁকে আগে কোনোদিন দেখিনি। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, স্যুট পরা, টাইটা ঢিলে হয়ে বুকের ওপর ঝুলছে, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। ভদ্রলোক থানায় ঢুকেই ওসি-র চেম্বারে চলে গেলেন।

একটু বাদে আমার ওসি-র চেম্বারে ডাক পড়ল। সেখানে ঢুকে দেখি টেবিলের চারদিকে বেশ কয়েক জন পুলিশের হোমরাচোমরা বসে রয়েছেন। একজন অফিসার তখন স্যুট পরা ভদ্রলোককে বলছেন, 'ছেলেদুটো মোটর সাইকেল থেকে যে বোমাটা ছুড়েছিল সেটা মারাত্মক রকমের কিছু নয়। উদ্দেশ্য ছিল দুটো— এক, দেবপ্রিয় দত্তকে ভয় পাওয়ানো আর দুই, সে যে বোমা নিয়ে কারবার করে সেটা পুলিশের কাছে প্রমাণ করার একটা রাস্তা তৈরি করা। ওরা যেটা জানতো না যে দেবপ্রিয়বাবু তখন বাড়িতে নেই আর রঙের ড্রামের ওপর বোমা ফাটালে সেটা এক্সপ্লোড করতে পারে? সম্ভবত তরফদার ওখানে রঙের সঙ্গে কিছু কিছু বেআইনি কেমিকেলও রাখত যেগুলো আগুন লাগলে ড্রাম সুদ্ধ ফেটে যেতে পারে। আমার ধারণা এই দুটো ব্যাপারই আনফরচুনেটলি একসঙ্গে ঘটে; যে কারণে অত বড়ো একটা এক্সপ্লোশন হয়। আর ফরচুনেটলি, দেবপ্রিয়বাবু তখন ছিলেন না, থাকলে তাঁরও তরফদারের অবস্থা হত।'

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন কী করবেন? দেবপ্রিয়কে কি অ্যারেস্ট করবেন?'

অফিসারটি ভয়ানক লজ্জিত হয়ে বললেন, 'না, না, স্যার, সে কী কথা? উনি আমাদের কাছে সবকথাই বলেছেন। মোটর সাইকেলটার নম্বরও দিয়েছেন।

ওঁর তো কোনো দোষ নেই। ওঁরই বাড়ি ভাঙল, ওঁর দিকেই বোমা ছোড়া হল, আর আমরা ওঁকেই অ্যারেস্ট করে ফেললুম— এতটা ইয়ে আমরা নই। এই যে দেবপ্রিয়বাবু মোটর সাইকেলের নম্বরটা দিয়ে আপনি দারুণ কাজ করছেন কিন্তু। আপনার এজাহার নেওয়া তো শেষ হয়েছে। এবার আপনি বাড়ি যেতে পারেন।'

কথাটা শুনে আমার ভীষণ হাসি পেল। বললুম, 'বাড়ি যাব? কার বাড়ি?'

নবাগত ভদ্রলোক আমার দিকেই চেয়ে ছিলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'তুমি এখন আমার বাড়িতে যাবে।'

'আপনার বাড়িতে? কে আপনি?'

'আমার নাম ডাক্তার বিশ্বেশ্বর রায়চৌধুরি। আমার ছোটো মেয়ে স্রগ্ধরা থানার বাইরে গেটের পাশে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তুমি এখন গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলো। আমি একটু বাদেই আসছি।'

আমি এক দৌড়ে থানার বাইরে এলুম। দেখি একটা গাছের তলায় পরিচিত গাড়িটা রয়েছে আর তার পেছনের জানলার ফ্রেমে স্রগ্ধরার উদ্‌বিগ্ন মুখ সুহাস রায়ের আঁকা ছবির মতো দেখাচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে নেমে এল।

আমি খাবি খেতে খেতে বললুম, 'তোমার বাবা... ভেতরে...কী করে...'

স্রগ্ধরা এগিয়ে এসে আমার একটা হাত ধরল। বলল, 'বাবা কাল রাত দুটোর সময় হঠাৎ কাউকে না-জানিয়ে বম্বে থেকে চলে এসেছে। প্লেন আসতে দেরি হয়েছিল। বাড়ি এসেই সোজা কাকার ঘরে। আমিও পেছনে পেছনে গিয়েছিলুম। বাবা কাকিমাকে ওর স্টিলের আলমারি খুলতে বলল। খোলামাত্র বাবা একগাদা শাড়ির ভেতরে একবার মাত্র হাত ঢুকিয়ে মা-র হারানো গয়নাগুলো বের করে আনল। তারপর কাকা আর কাকিমাকে সে কী ভয়ানক গালাগালি! বাবাকে কখনো এত রেগে যেতে দেখিনি। কাকা বলল, 'যা করেছি সেটা হয়তো অন্যায় হয়েছে কিন্তু সেটা তোমার মেয়ের ভালোর জন্যই করেছি।' তখন তো একেবারে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। বাবা বলল, 'আমার মেয়ের ভালোর জন্য তুমি একটা নিরাপরাধ ছেলের সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলে? তাকে জেলে পাঠানোর ষড়যন্ত্র করছিলে? এক্ষুনি বাড়ি থেকে বেরোও দু-জনেই।' তখন জানতে পারলুম কাকার নিউ আলিপুরে একটা আর যাদবপুরে দুটো ফ্ল্যাট আছে। সে নিয়েও এক চোট হল। যার এক পয়সা রোজগার নেই তার এসব হয় কী করে ইত্যাদি। কর্তা-গিন্নি কাল রাত্রের মধ্যে আউট। এই সব করতে ভোর হয়ে গেল।'

'কিন্তু আমার ব্যাপারটা জানলে কী করে?'

'কাকা আর কাকিমা বেরিয়ে যেতেই বাবা ঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠল। বলল, 'তুই এক্ষুনি দেবপ্রিয়ের বাড়ি যা। ভীষণ দেরি হয়ে গেছে। ও হয়তো এতক্ষণে আর বেঁচে নেই। তবে ওর যদি কিছু হয় আমি এদের ছেড়ে দেব না।' তারপর কী ভেবে দেখলুম নিজেও গাড়িতে উঠে পড়ল।

তোমাদের বাড়ির অবস্থা দেখে তো আমাদের হয়ে এসেছিল। পাড়ার লোকেদের মুখে জানতে পারলুম তুমি এখানে। এক চুলের জন্যে বেঁচে গেছ।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, একচুলের জন্যেই।' মনে মনে বললুম, 'কার জন্যে সে শুধু আমিই জানি— সেই মেঘমালা এখন কোথায়? জানি না। সেকি আমার জন্যে কোথাও অপেক্ষা করে আছে? হয়তো নয়। কবে আবার দেখা হবে কে জানে। ওই বাড়ি আমি আবার একদিন বানাব, তবে সে তখন আর আসবে না। তার সবকথা আমি শ্রদ্ধরাকে বলব। বিশ্বাস করবে কি না জানি না। যদি বিশ্বাস করে তবে আমাদের দু-জনের মধ্যে সেও থাকবে। শেষ দিন পর্যন্ত। আর যদি না-করে, তাহলেও মেঘমালা থাকবে একান্ত আমার সন্ধ্যাস্বপনবিহারী চিরকালের জন্য।

শ্রদ্ধরা আমার হাত নেড়ে দিয়ে বলল, 'কী ভাবছ?'

'ভাবছি তোমার বাবা এতসব খবর পেলেন কী করে?'

শ্রদ্ধরা বলল, 'সে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। গাড়িতে ওঠো, বলছি। আচ্ছা, তুমি কি মেঘমালা বলে কাউকে চেনো?'

পোকা

দুপুর বেলা কল্যাণী থেকে তাঁর ছোট্ট ফিয়াট গাড়িটা নিয়ে বেরিয়েছিলেন ড. সুরেশ্বর দেবগুপ্ত। এখন বিকেল হয়ে এসেছে। নশীগঞ্জে পৌঁছতে আরও দশ-পনেরো মিনিট লাগবে। রাস্তার যা অবস্থা তাতে কপাল ভালো থাকলে, যাকে বলে, প্রশস্ত দিবালোকে পৌঁছনো সম্ভব হলেও হতে পারে। তবে, আলো কম হলেও কোনো অসুবিধে নেই। সঙ্গে টর্চ তো আছেই।

ড. সুরেশ্বর দেবগুপ্তকে এ তল্লাটে সকলেই চেনে। তিনি একজন নামজাদা কৃষিবিজ্ঞানী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি করে আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিবিজ্ঞানে ডিএসসি করেন। ওদেশে দীর্ঘদিন অধ্যাপনাও করেছেন। আপাতত, তিনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণা বিভাগের প্রধান।

তবে এ ছাড়াও তাঁর সমাজসেবী বলে আর একটা পরিচয় আছে। চাষের জমির উর্বরতা বা উৎপাদনক্ষমতা কী করে বাড়ানো যেতে পারে, তা নিয়ে নদীয়া জেলার চাষিদের তিনি সবসময় উপদেশ দিয়ে সাহায্য করে থাকেন। দূর দুর গ্রামের ভেতর চলে গিয়ে সকলকে একত্রিত করে আর তাদের সঙ্গে আলোচনা করে, তাদের সমস্যা সমাধান করবার জন্যে তিনি বছরের সব সময়েই তৈরি। এই কারণে, এই পণ্ডিত মানুষটিকে সকলেই শ্রদ্ধা করে থাকে।

আপাতত ড. দেবগুপ্ত একটা গভীর সমস্যা নিয়ে অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হয়ে আছেন। সমস্যাটা একটা পোকা। মাজরা পোকার মতো এটা ফসলের ভয়ংকর ক্ষতি করে থাকে। তবে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি। খুব ছোটো ছোটো কালো পোকা, বছর দুয়েক হল এদের অত্যাচার শুরু হয়েছে। এদের প্রথম দেখা যায় দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের কতগুলো দ্বীপে। তারা যে কোত্থেকে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তা কেউ জানে না। এক বছরের মধ্যে সবুজ দ্বীপগুলো মরুভূমিতে পরিণত হয়।

তারপর সেখান থেকে তারা আস্তে আস্তে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। তারা যেখানেই দেখা দিয়েছে, সেখানেই শুধু ফসল নয়, গাছপালা, ঘাস— এককথায় যা কিছু সবুজ সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। ধনী দরিদ্র কোনো দেশই রেহাই পাচ্ছে না। কোথাও কোথাও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে এদের প্রথম দেখা যায় পাঞ্জাবে। তারপর বিহার। এবার নদীয়ার নশীগঞ্জের সুভাষ মণ্ডলের ধান খেতে সম্ভবত তারাই এসে গেছে।

মজা হচ্ছে, এই পোকাগুলোর এখনও কোনো নাম দিয়ে উঠতে পারেনি বৈজ্ঞানিকরা। তার কারণ, অনেক চেষ্টা করেও এই পোকাগুলোর একটাকেও মারা তো দূরস্থান, ধরাই যায়নি আজ পর্যন্ত। অদ্ভুত এদের ক্ষমতা। কোনো কীটনাশক ওষুধে এদের মারা যায় না, তা সে ওষুধ যত বিষাক্তই হোক না-কেন। এদের ফুটদশেকের মধ্যে কোনো মানুষ এলেই এরা চোখের নিমেষে মাটিতে পড়ে এত নীচে চলে যায় যে আর ধরা যায় না। টবে লাগানো গাছে এরা আসে না। রোবোট পাঠিয়েও কোনো লাভ হয়নি। হয়তো সেই যন্ত্রগুলোর মধ্যে কিছু না-কিছু মানুষের গন্ধ থেকেই যায়। একমাত্র দূর থেকে টেলিফোটো লেন্সে এদের ছবি তোলা গেছে। সেই ছবিগুলো থেকে এটুকু বোঝা গেছে যে তারা অপার্থিব নয়। এ ধরনের অন্যান্য পোকাদের সঙ্গে তাদের সামান্য হলেও মিল আছে। সুভাষ মণ্ডল আর নশীগঞ্জের চাষিরা এদের নাম দিয়েছেন— কালোজিরে।

নশীগঞ্জে পৌঁছে ড. দেবগুপ্ত দেখলেন যে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বহু লোক রাস্তার দু-ধারে অপেক্ষা করছে। তারা সবাই তাঁকে পঞ্চায়েত অফিসে নিয়ে গেল। অফিস ঘরে সবার জায়গা হল না। কাজেই সকলে বারান্দায় আর তার সামনে মাঠের ওপর দাঁড়াল। সবাই নিশ্চুপ। এতগুলো মানুষ, অথচ কোনো গোলমাল নেই। শুধু কয়েক জন নীচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় সবাইকে চিন্তিত আর বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

ড. দেবগুপ্তর জন্যে একটা চেয়ার এনে বারান্দায় রাখা হল বটে, কিন্তু তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন।

সুভাষ মণ্ডল বললেন, 'ডাক্তারবাবু, এঁরা সকলেই চাষি, আশেপাশের দশটা গ্রাম থেকে এসেছেন। এঁরাও আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। আমাদের গ্রামের চাষিদের যে সর্বনাশ হচ্ছে, তার হাত থেকে বোধ হয় এঁরাও রক্ষে পাবেন না। তাই আমরা সবাই আপনার সঙ্গে কথা বলে এই ভীষণ বিপদ থেকে কীভাবে বাঁচতে পারব, সেটা জানতে চাই।'

ড. দেবগুপ্ত বললেন, 'আগে আপনাদের এই গ্রামের অভিজ্ঞতার কথা শুনি। একটু জোরে বলবেন যাতে ওঁরা সবাই শুনতে পান।'

সুভাষ মণ্ডল বললেন, 'আপনি তো জানেন ডাক্তারবাবু যে আমাদের খেতে কালোজিরে ধরেছে। এই পোকা যে কী ভয়ংকর তা বলে বোঝানো যাবে না। আপনি এখানে আসবার পথে তো দেখেছেন যে মাত্র দিন দশেকের মধ্যে খেতের পর খেত কীভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলন্ত ধানগাছগুলো মরে গিয়েছে। খেতের ধারে যত গাছ ছিল, সেগুলোর শুধু পোড়াকাঠের মতো কাণ্ডটুকু দাঁড়িয়ে আছে। আমরা তো আজ না-খেয়ে শুকিয়ে মরবার রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের উদ্ধারের বোধ হয় আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু যাদের খেতে এখনও এই পোকা লাগেনি, তাদের বাঁচাবার কি কোনো ব্যবস্থাই করা যায় না?

ড. দেবগুপ্ত বললেন, 'পোকাগুলো কোথা থেকে এল জানেন?'

—'না ডাক্তারবাবু, জানি না।'

—'পোকাগুলো মারবার কি কোনো চেষ্টা হয়েছে?'

—'হ্যাঁ, হয়েছে। বাজারে যত পোকা মারার ওষুধ পাওয়া যায়, সে সব ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো লাভ হয়নি।'

—'পোকাগুলো কি ওড়ে, না মাটির ওপর দিয়ে চলে?'

—'যতদূর মনে হয়, এগুলো ওড়ে না। মাটির তলা দিয়ে চলে। প্রথম আমার খেতে লেগেছিল একধারে। তারপরে ভেতরে ছড়িয়েছে। সেখান থেকে আমার পাশে বংশীবদনের খেতে আমার খেতের দিক থেকেই পোকা ধরল, পরে ভেতর দিকে গেল। পোকাগুলো যদি উড়ত তাহলে এরকম হত না।'

—'পোকাগুলো আপনারা দেখেছেন?'

—'দেখেছি। বেশ কিছুটা দূর থেকে, হ্যাজাকের আলোয়। গাছের গায়ে কালো কালো দাগ। সেগুলো নড়েচড়ে, কখনো বাড়ে, কখনো কমে। আসলে ওই দাগগুলো একটা নয়, অজস্র পোকার পিণ্ড। তারা যে কী তাড়াতাড়ি গাছের সবুজ অংশটা খেয়ে ফেলে, সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ড. দেবগুপ্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আপনারা বুঝতেই পারছেন যে শুধু আপনারা নন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আজ ভীষণ বিপদের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এইভাবে চলতে থাকলে, আর কয়েক বছরের মধ্যেই সর্বত্র ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। বিদেশে টবে ধানগম লাগিয়ে কিছু সুরাহার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু সে আর কতটুকু? সমস্ত সবুজ খুইয়ে সারা পৃথিবী যদি মরুভূমি হয়ে যায়, তখন টবের ধানগমে কতজনকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে? এর থেকে বাঁচার একমাত্র

রাস্তা হল পোকাগুলোকে একেবারে নির্মূল করে দেওয়া। এরজন্যে, যেভাবেই হোক, কয়েকটা পোকা আমাদের ধরতেই হবে। নইলে গবেষণা করে এদের মারণাস্ত্র বের করা যাবে না। আমি জানি, এদের ধরা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব। কিন্তু সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে আপনাদের। কীভাবে করবেন, আমি জানি না। তবে করতে পারবেন আপনারাই যাঁরা মাটির কাছাকাছি আছেন। না করলে, আমরা সকলেই শেষ হয়ে যাব। আজ নয়তো কাল। বলুন, আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে?'

চুপ করলেন ড. দেবগুপ্ত। যত লোক জমায়েত হয়েছিল, তাদের কারো মুখে কোনো কথা নেই। একটু পরে ড. দেবগুপ্ত বললেন, 'আপনারা আজ থেকেই কাজে লেগে যান। চেষ্টা শুরু করলে একটা না-একটা রাস্তা ঠিক বেরিয়ে আসবে। শুনেছি, রাত গভীর না-হলে পোকাগুলো বেরয় না। কাজেই এখন কিছু সময় আছে আমাদের হাতে। আমি এখানে সারারাত থাকব। কাল সকালে আপনারা কতটা সফল হলেন বা কার কী প্রস্তাব আছে এ ব্যাপারে, আমাকে জানাবেন। মনে রাখবেন, একটা পোকা। একটা পোকা পেলেও আমার চলবে। তাহলেই তাদের মারবার উপায় বের করতে পারব।

পঞ্চায়েত প্রধান আর অন্যান্য গণ্যমান্য গ্রামবাসীরা ড. দেবগুপ্তকে অনেক অনুরোধ করলেন তাঁদের বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নিতে আর কিছু খেয়ে নিতে। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। সবাইকে বললেন, বাড়ি থেকে চলে যেতে কারণ তাঁর কিছুক্ষণ একা থাকার দরকার ছিল। আর বললেন, কাজ শুরু করবার আগে রাত ন-টায় সকলে যেন পঞ্চায়েত অফিসের সামনে জমায়েত হন।

সবাই চলে গেলে পঞ্চায়েত অফিসের বারান্দার আলোর নীচে চেয়ার টেনে বসে চিন্তা করতে লাগলেন ড. দেবগুপ্ত। সত্যিই কি কোনো রাস্তা পাওয়া যাবে? পৃথিবী থেকে মানুষকে অবশ্যম্ভাবী বিলুপ্তি থেকে বাঁচান কি সম্ভব? ড. দেবগুপ্ত সাধারণত আশাবাদী কিন্তু আজ যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছেন তাতে আশা করাটা নির্বুদ্ধিতা বলে মনে হচ্ছে। কোথাও কোনো আলো দেখতে পাচ্ছেন না। অথচ, তাঁর বার বার মনে হচ্ছিল যে, এই সমস্যার সমাধান আছে। কিন্তু, সোজা রাস্তায় এই সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

তবে, আশা ছাড়লে চলবে না। কত আবিষ্কার যেগুলো মানুষের অসীম মঙ্গল করেছে তাদের অনেকগুলোই তো ঘটেছে অবিশ্বাস্য অপ্রত্যাশিত যোগাযোগের ফলে। সেসব যোগাযোগকে বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এক্ষেত্রে কি সেরকম কিছু ঘটবে না?

যে স্যাকারিন অসংখ্য ডায়াবেটিক মানুষের প্রাণ বাঁচিয়ে রেখেছে সেটা তো

আবিষ্কৃত হয়েছি অদ্ভুতভাবে। এর আবিষ্কর্তা ১৮৭৯ সালে কোলটার নিয়ে গবেষণা করতে করতে একদিন ভুল করে হাত না ধুয়ে খেতে বসেছিলেন। খেতে গিয়ে দেখলেন যে সব খাবারই মিষ্টি লাগছে। তার কারণ খুঁজতে গিয়েই আবিষ্কৃত হল স্যাকারিন। পেসমেকার কত যে হৃদরুগিকে নতুন জীবন দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অথচ আমেরিকান গবেষক গ্রেটব্যাচ একটা বাক্স থেকে যদি একটা ভুল রেসিস্টার না-তুলতেন, তাহলে হয়তো পেসমেকার আজও অনাবিষ্কৃতই থেকে যেত। আর পেনিসিলিনের কথা তো সবাই জানে। খোলা জানলা দিয়ে উড়ে আসা একটা সামান্য ছত্রাক ড. আলেক্সান্ডার ফ্লেমিংকে দিয়ে গেল এমন একটি ওষুধের সন্ধান যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ তরুণ সৈনিকের প্রাণ বাঁচিয়েছিল সেপটিসিমিয়া থেকে।

ভাবতে ভাবতে ড. দেবগুপ্তর মনে হল তাঁর এরকম চিন্তা করা ঠিক নয়। যে ঘটনাগুলোর কথা তাঁর মনে আসছিল, সেগুলো নেহাতই দুর্ঘটনা। তিনি যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক অথচ তিনি বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর না-করে অনৈসর্গিক বা অলৌকিক পথে সমাধান খুঁজছেন! আমাদের শাস্ত্রে বলে, সর্বনাশ সমুৎপন্ন বলে পণ্ডিত ব্যক্তি অর্ধেক বিজ্ঞান ত্যাগ করে থাকেন। কিন্তু তিনি তো বিজ্ঞানকে পুরোপুরি ত্যাগ করবার কথা ভাবছেন। এ তো একটা চূড়ান্ত অধঃপতন। অথচ, যা পরিস্থিতি, তাতে এরকম একটা ঘটনা ছাড়া মানুষ যে ভয়ংকর পরিণতির দিকে এগোচ্ছে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে কি? বৈজ্ঞানিকভাবে উদ্ধারের রাস্তা খুঁজে পেতে বোধ হয় অনেক সময় লাগবে। অত সময় পাওয়া যাবে তো?

ড. দেবগুপ্ত কিন্তু একাগ্রচিত্তে চিন্তা করতে পারছিলেন না। চিন্তা করবার কি উপায় আছে? সন্ধে হতে না-হতেই চারদিকের অন্ধকার থেকে উড়ে আসা অসংখ্য পোকা তাঁকে উত্যক্ত করে মারছিল। কিন্তু, বারান্দার আলোটা যে নিভিয়ে দেবেন তারও উপায় নেই। কারণ আলোর সুইচটা পঞ্চায়েত অফিসের ভেতরে আর তার দরজায় তালা দেওয়া। কত রকমের পোকা যে তাঁর গায়ে-হাতে-মুখে-মাথায় এসে পড়ছিল তার ইয়ত্তা নেই। ছোটো ছোটো ঘেসো মশা থেকে শুরু করে বড়ো বড়ো গুবরে পোকা পর্যন্ত। শেষপর্যন্ত আর সহ্য করতে না-পেরে ড. দেবগুপ্ত গ্রামের বাইরে স্টেট হাইওয়ের ওপর রাখা তাঁর গাড়িতে গিয়ে বসবেন স্থির করলেন।

এইসময়ে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল।

একটা পোকা অনেকক্ষণ ধরে ড. দেবগুপ্তের মাথার চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছিল। পোকাটা একটু অদ্ভুত। সেটা একটা বেশ বড়োসড়ো গঙ্গাফড়িঙের মতো। বড়ো দুটো ডানা যেন চকচকে রুপোলি মাকড়শার জাল দিয়ে তৈরি। তার শরীরটা

ধূসর বা কালো বা সবুজ নয়, লাল। তার ওড়বার ভঙ্গিটি ভারি সুন্দর, হালকা হাওয়ায় উড়ে যাওয়া ফুলের পাপড়ির মতো সুললিত আর সুষম। অন্য পোকাদের জ্বালাতনে সেটাকে যে ভালো করে দেখবেন, তা আর হয়ে ওঠেনি।

ড. দেবগুপ্ত যেই উঠতে যাবেন, এই পোকাটা একটা বঙ্কিম রেখায় উড়ে এসে তাঁর চেয়ারের হাতলের ওপরে বসল। ড. দেবগুপ্ত ভালো করে তাকিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর মাথার মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। কালোজিরের কথাটাই আর মনে রইল না।

তিনি দেখলেন যে পোকাটার ছ-টা পায়ের জায়গায় চারটে, যেন দুটো হাত আর দুটো পা। আর তার ইঞ্চি তিনেক শরীরটা ঠিক একটা লাল শাড়ি পরা ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ের মতো। পোকাটা দু-দিকে ডানা ছড়িয়ে দু-পায়ের ওপরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে।

ড. দেবগুপ্তর প্রথমেই মনে হল, আরে এটা যে একটা পরি। তাহলে কি তিনি স্বপ্ন দেখছেন? কারণ আজকের বিজ্ঞানের যুগে পরি বলে তো কিছু থাকতেই পারে না। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের রূপকথাতেই এদের কথা আছে ঠিকই কিন্তু তাই বলে তারা যে কাল্পনিক নয় সেটা মনে করবার তো কারণ নেই। কিন্তু তার পরেই তাঁর মনে পড়ল যে স্যার আর্থার কোনান ডয়েল একসময়ে তাঁর বাগানে বক্সক্যামেরায় পরিদের ছবি তুলেছিলেন। সেটা সবাই হেসে উড়িয়ে দিলেও কোডাক কোম্পানি কিন্তু অনেক পরীক্ষার পর সেই ছবিগুলো জাল নয় বলে রিপোর্ট দিয়েছিল। তা ছাড়া, স্যার আর্থারের মতো মানুষের কতগুলো জাল ছবি দেখিয়ে লোককে বোকা বানানোর মনোবৃত্তি থাকার কথাও নয়। তবে কি তিনি জেগেই আছেন আর যা দেখছেন তা সত্যি? তা হতে পারে না। এটা আসলে একটা দুর্লভ বিরল জাতের পোকা, বিজ্ঞানীরা এখনও এর খোঁজ পাননি। বোধ হয়, এই পোকাগুলো দেখেই পরিদের কল্পনা করা হয়েছিল।

ড. দেবগুপ্তর চিন্তায় বাধা পড়ল। তাঁর মনে হল, সরু রিনরিনে গলায় পোকাটা যেন তাঁকে বলছে, 'অত কী ভাবছ? এখন তো তোমার শুধু কালোজিরে নিয়ে ভাবা উচিত। আর কয়েক বছরের মধ্যেই তো সমস্ত পৃথিবীটা মরুভূমি হয়ে যাবে। গাছপালা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে তখন কোনো কিছু বেঁচে থাকতে পারবে? মানুষ তো যাবেই, সমস্ত জীবজন্তু, পোকামাকড় কিচ্ছু বেঁচে থাকবে না। হ্যাঁ, সমুদ্রের তলায় প্রাণ হয়তো থাকবে কিন্তু এই সুন্দর পৃথিবীটা শ্মশান হয়ে যাবে। আজ এই যে ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন তোমরা সৃষ্টি করেছ, তার হাত থেকে পরিত্রাণের রাস্তা খোঁজা ছাড়া অন্য চিন্তা করবার কোনো দরকার আছে কি?'

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে ড. দেবগুপ্ত বললেন, 'এই দুস্বপ্ন আমরা সৃষ্টি করেছি? সে আবার কী?'

'তা নয়তো কী? প্রশান্ত মহাসাগরের বিকিনি দ্বীপে একের পর এক যে হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়েছ তোমরা, তার পারমাণবিক বিকিরণের ফলে ওই দ্বীপের নিতান্ত নিরীহ একশ্রেণির পোকার মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত জৈবিক পরিবর্তন হয়ে এই ভয়ংকর কালোজিরের সৃষ্টি হয়েছে। ওই দ্বীপে তো কোনো কিছুই টিকে ছিল না। কাজেই খাবারের খোঁজে সমুদ্রের জলে ভেসে ভেসে এরা আজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এই দুঃস্বপ্নকে তোমরা তৈরি করেছ, এখন এদের হাত থেকে বাঁচতে হলে আর এই সবুজ গ্রহটাকে বাঁচাতে গেলে তোমাদেরই এদের ধ্বংস করতে হবে।

'কিন্তু করব কী করে? এদের তো ধরাই অসম্ভব। এদের ধরতে পারলে তবে না এদের ধ্বংস করার উপায় বের করা যাবে? কিন্তু, যা মনে হচ্ছে তাতে তো মানুষ তার কোনো যন্ত্রপাতি দিয়েই এদের ধরতে পারবে না।'

'না, তা পারবে না। তবে, যদি এদের ধরতে পারা যায়, এদের নির্মূল করবার পদ্ধতি তোমরা বের করতে পারবে তো ঠিক? সেই প্রযুক্তি তোমাদের এখানে আছে? এদের যদি আবার বিদেশে পাঠাতে যাও, তাহলে কিন্তু সব বৃথা হবে। কারণ, এদের এক-একটা দু থেকে তিনদিনের বেশি বাঁচে না আর তার মধ্যেই প্রবলবেগে বংশবৃদ্ধি করে যায়।'

'তবে কি একটা মরা কালোজিরেও পাওয়া যাবে না?'

'না, সেটাও সম্ভব নয়। কারণ একটা মরলেই অন্যগুলো সঙ্গেসঙ্গে সেটাকে খেয়ে ফ্যালে। তাহলে বলো, এখানে খুব অল্প সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারবে?'

ড. দেবগুপ্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'নিশ্চয়ই পারব! আমাদের ল্যাবরেটরিতে সবাই তৈরি হয়ে রয়েছে।'

'ঠিক আছে। তাহলে আমরা তোমাদের সাহায্য করব। পৃথিবী থেকে সবুজ চলে গেলে তোমরা তো বাঁচবেই না, আমরাও বাঁচব না। কাজেই প্রাণের দায়ে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আমরা তোমাকে কালোজিরে ধরে দেব।'

'ধরবে কী করে? ওদের কাছাকাছি গেলেই যে ওরা মাটির নীচে লুকিয়ে পড়ে।'

'সেটা মানুষ গেলে। আমরা তো মানুষ নই, ওদের মতো পোকাই। আমাদের ওরা ধর্তব্য বলে মনে করে না। আর একটা কথা বলে রাখি। আমরা দেখেছি, যা কিছু আমাদের কাছে প্রাণঘাতি বিষ, তাতে ওদের কিছুই হয় না; উলটে ওদের শক্তি বেড়ে যায়। আর যা কিছু আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে অপরিহার্য, যেমন

সূর্যের আলো, অক্সিজেন বা ভিটামিন, সে সব ওরা সহ্য করতে পারে না।'

বলেই সেই অদ্ভুতদর্শন পোকাটা একটা আশ্চর্যসুন্দর বক্ররেখায় উড়ে বাইরে অন্ধকারের মধ্যে চলে গেল।

অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন ড. দেবগুপ্ত, তারপর যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তাঁর মনে হল যে, যা দেখেছেন সেটা যতই স্পষ্ট হোক না-কেন, স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা। তবে, কি তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন? এরকম অলীক চিন্তা তো তাঁর মতো বৈজ্ঞানিকের মনে আসা উচিত নয়।

হঠাৎ একটি বাচ্চার গলা শুনে সোজা হয়ে বসলেন ড. দেবগুপ্ত। দেখলেন, আধময়লা ছিটের ফ্রক আর পুরোনো লালরঙের একটা গরমজামা পরা একটি মেয়ে বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে একগাল হেসে বলল, 'ডাক্তার দাদু, তোমার নস্যির কৌটোটা যে মাটিতে পড়ে গেছে গো।'

বলে সে একটা কাচের ছোটো শিশি ড. দেবগুপ্তর দিকে এগিয়ে দিল। পরিষ্কার শিশিটা, তার ভেতরে আধখানা ভরে রয়েছে কালো কালো গুঁড়ো গুঁড়ো মতন কিছু। কম্পিত হাতে শিশিটা নিলেন ড. দেবগুপ্ত। চোখের সামনে তুলে দেখলেন গুঁড়োগুলো জীবন্ত। তারা শিশিটার ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছে, পরস্পর ঠেলাঠেলি করছে।

রাত দশটার সময় গ্রামের লোকেরা পঞ্চায়েত অফিসের সামনে এসে দেখল, বারান্দায় চেয়ারটা খালি পড়ে রয়েছে। ভিড়ের মধ্যে কে যেন বলল, 'ডাক্তারবাবুর গাড়িটাও তো দেখছি না।'

আর একজন বলল, 'আসবার সময় যেন ডাক্তারবাবুর গাড়িটা দেখলুম। খুব জোরে হুশ করে বেরিয়ে গেল।'

পিন্টুচরণ ও নাগেন্দ্রবালা

সকাল বেলা খবরের কাগজ পড়ে পাঁচুগোপালবাবু রেগে কাঁই। এসব কী হচ্ছে কী? গভর্নমেন্ট বলে কি দেশে আর কোনো পদার্থ নেই? যে যা খুশি তাই করবে? যতই ভাবেন, ততই রেগে যান পাঁচুগোপাল। তাঁর মুখ বেগনি হয়ে ওঠে, চোখ লাল হয়, আপন মনেই গজগজ করতে থাকেন।

এমন সময় হাফপ্যান্ট, স্পোর্টস শার্ট আর ক্যানভাসের জুতো পরিহিত নৃত্যগোপাল ঘর্মাক্ত কলেবরে বাড়ি ফেরে। নৃত্যগোপাল পাঁচুগোপালের ছেলে, বয়েস কুড়ি। কিন্তু ছেলে বলেই যে তার প্রতি অতিশয় স্নেহ পোষণ করতে হবে, সে কথা মোটেই মানেন না পাঁচুগোপাল। কেমন যেন ছোকরার হাবভাব। বাপের ব্যবসায় মন নেই, কেবল লেখাপড়া করে আর সাতসকালে উঠে না-হোক কিছুটা বনবন করে দৌড়ে আসে। এর নাম নাকি জগিং না কী যেন। কেমন একটা বাউন্ডুলে ভাব, শেষপর্যন্ত সন্নিসি-টন্নিসি হয়ে যাবে না তো? বালতি আর বিড়ির ব্যাবসা করে পাঁচুগোপাল আজ কোটিপতি, কলকাতায় সাতটা, বালিতে দুটো আর হাওড়ায় চারটে করে বাড়ি, তিনটে গাড়ি, সাতটা কুকুর, সে সব কি ভেসে যাবে? তার ওপর হারামজাদা শুয়োর বাপ-চোদ্দোপুরুষের নামটা পর্যন্ত এফিডেভিট করে পালটে দিলে গা! নেত্যগোপাল নামটা না-হয় পছন্দ হয়নি, তাই বলে কুলোপাধী— কাঁড়াদাস নামটা কী দোষ করেছিল? উনি নাকি এখন আর নেত্যগোপাল কাঁড়াদাস নন, ও নামটা শুনলে সবাই নাকি হাসে, বিজনেসে অসুবিধে হয়, তাই উনি এখন দ্যুতিমান রায়! মতিচ্ছন্ন আর কাকে বলে! পাঁচুগোপাল কাঁড়াদাসের ছেলে দ্যুতিমান রায়! সারা পৃথিবী হাসছে না? এসব ভেবে আরও রেগে যান পাঁচুগোপাল। একমাত্র ছেলে, নইলে কবেই ত্যাজ্যপুত্র করে দিতেন।

বারান্দায় উঠে বাড়ির ভেতরে যেতে গিয়েও খবরের কাগজ পাঠরত বাপের

রুদ্রমূর্তি দেখে নৃত্যগোপাল থমকে দাঁড়িয়ে গেল। মুচকি হেসে বলল, 'কী হল, আজকে আবার কী খবর বেরোল? খাটালে খুন না ছোটোনাগপুরে ছিনতাই? আজকেও খুব রেগে গেছ দেখছি? রোজ রোজ এমন রেগে গেলে, শরীর ভেঙে পড়বে যে! তার চেয়ে বরং রোজ সকালে আমার সঙ্গে...'

পাঁচুগোপাল দাত কিড়মিড় করে বললেন, 'থাক, তোমাকে আর আমার শরীরের কথা চিন্তা করতে হবে না। দুনিয়ার খবর তো আর রাখো না। খবরের কাগজ পড়লে যার মাথা ঠান্ডা থাকে, সে একটা... সে একটা গাড়ল!'

নৃত্যগোপাল দন্তবিকাশ করে বলল, 'বেশ, তা না-হয় হল। কিন্তু খবরটা কী?'

পাঁচুগোপাল কাগজের একটা অংশ দেখিয়ে বললেন, 'এই দ্যাখো, পড়ে দ্যাখো।'

খবরটা পড়ে নৃত্যগোপাল ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বলল, 'এতে এত রেগে যাবার কী হয়েছে? দু-জন ভারতীয় বৈমানিক মহাকাশযানে চড়ে মহাশূন্যে যাবার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে। তাতে তুমি রেগে যাচ্ছ কেন?'

পাঁচুগোপাল গলা সপ্তমে তুলে বললেন, 'রেগে যাব না? কে এই চ্যাংড়া দুটোকে নির্বাচিত করলে, শুনি। কত টাকা দিতে পারবে এরা? টাটা বিড়লার ছেলে হলেও বা বুঝতুম।'

নৃত্যগোপাল এবার ধপাস করে বাপের পাশে তক্তপোশের ওপর বসে পড়ল। বলল, 'এরা টাকা দেবে কোন দুঃখে? এদের নির্বাচিত করা হয়েছে এদের বয়েস দেখে। এদের ফিজিক্যাল ফিটনেস...'

পাঁচুগোপাল হাউমাউ করে উঠলেন, 'ওই, ওই, তোমার ফিজিক্যাল ফিটনেস এসে গেছে! মহাশূন্যে যাবে তো ফিজিক্যাল ফিটনেস দিয়ে হবে কী, শুনি? ওখানে গিয়ে তোমার মতো হাফপ্যান্ট পরে জগিং করবে, না হাতের নড়া বেঁধিয়ে মহাশূন্যশ্রী হবে? টাকা দেবে না তো, মাগনা যাবে নাকি?'

'মহাশূন্যে যেতে হলে টাকা দিতে হয়, এরকম কথা তুমি ভাবলে কী করে?' নৃত্যগোপাল হাসবে না কাঁদবে ঠিক করতে পারল না।

'এই তোমার বুদ্ধি? এই তোমার লেখাপড়া? মহাশূন্যে যেতে পয়সা লাগে না? গভর্নমেন্ট কোটি কোটি টাকা খরচা করে চাঁদে রকেট পাঠাবার বন্দোবস্ত করছে, এমনি এমনি লোক নিয়ে যাবার জন্যে? গভর্নমেন্টের বাস, গভর্নমেন্টের ট্রাম, গভর্নমেন্টের ট্রেন সব তাতে পয়সা দিয়ে চড়তে হয়, আর সবচেয়ে বেশি খরচের রকেটে যেতে দিতে হয় না? এত জ্ঞান নিয়ে এই শিখেছ?'

নৃত্যগোপাল বলতে গেল, 'আহা, বিজ্ঞানের অগ্রগতি...' কিন্তু কথাটা শেষ করতে পারল না। পাঁচুগোপাল হাত নেড়ে বললেন, 'বটেই তো। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানেই

পয়সা খরচ। আগে যখন বিজ্ঞান ছিল না, আমার বাবা, ঠাকুরদা দেশের বাড়ি থেকে হেঁটে কলকাতায় এসে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বালতি বিক্রি করতেন। কোনো খরচাই ছিল না। আর এখন? অগ্রগতি হয়েছে, বাস হয়েছে, ট্রেন হয়েছে, লরি-টেম্পো হয়েছে, আর পদে পদে পয়সা গুণতে হচ্ছে। তবে পয়সা খরচটা তো কোনো একটা ব্যাপারই নয়। আমি জানতে চাই, এই দুই ছোকরার মহাশূন্যে যেতে কত টাকা লাগছে। আমি যা দর দিয়েছি, তার থেকে তো বেশি কোনো মতেই হতে পারে না। থুম্বার লোকেরা তাহলে কী করে, কোন আইন মোতাবেক...'

নৃত্যগোপাল খাবি খেতে খেতে বলল, 'দর দিয়েছ? দর দিয়েছ মানে? কাকে কীসের দর দিয়েছ তুমি?'

পাঁচুগোপাল গোমড়া মুখ করে ছাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও, তোমাকে বলা হয়নি। আমি ওই থুম্বার ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র না কী যেন নাম, তার ডিরেক্টরকে চিঠি লিখে বলেছি যে মহাকাশে যখন লোক যাবে, তখন যেন আমাকে নেওয়া হয়। তার জন্যে যত টাকা লাগে, আমি দেব। ঠিকানাটা যদিও ধর্মদাস জোগাড় করে দিয়েছিল, কিন্তু ঠিকই ছিল সেটা। অ্যাকনলেজমেন্ট ডিউ-এর কার্ড স্ট্যাম্প সুদ্ধ ফেরত এসেছে। অথচ তার পরেও...'

নৃত্যগোপাল দু-হাতে নিজের মাথাটা টিপে ধরে বলল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। ব্যাপারটা আগে আমাকে বুঝতে দাও। তুমি মহাকাশে যাবে, আর সে জন্যে থুম্বায় দর পাঠিয়েছ?'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ।'

বলতে না-বলতে নৃত্যগোপাল হঠাৎ হাসতে শুরু করল। হাসতে হাসতে শুয়েই পড়ল তক্তপোশের ওপর। কখনো মাথা চাপড়ায় আর বলে, 'ও বাবা গো, আর পারছি না!' কখনো দু-হাতে পেট খিমচে ধরে চ্যাঁচায়, 'মরে গেলুম, মরে গেলুম!' আর পাঁচুগোপাল ছেলের কাণ্ড দেখে রাগের চোটে একবারে জড়ভরতের মতো হয়ে গেলেন।

'এত হাসি কীসের?'— বলতে বলতে বাড়িতে ঢুকলেন ধর্মদাস কারফর্মা। শুকনো চিমসে-মারা চার ফুট দশ, এই সাতসকালেই চোখদুটি দিব্যি রক্তবর্ণ ধারণ করেছে; কিন্তু ফিটফাট ফুলবাবুটি— বয়েস যদিও পাঁচুগোপালের চেয়ে বছর কয়েক বেশিই হবে।

ধর্মদাসের গলা কানে যেতেই নৃত্যগোপাল হাসি থামিয়ে উঠে বসল। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই পাঁচুগোপাল বললেন, 'এসো হে ধর্মদাস, এসো। সেই যে আমরা থুম্বায় চিঠি লিখেছিলুম, তোমার মনে আছে? সেই কথা শুনেই আমার শ্রীমান হাসতে শুরু করে দিয়েছেন। যেন, এটা একটা মহাহাসির ব্যাপার! একেবারে

উচ্ছন্নে গেছে হে। ওর গর্ভধারিণী মারা গিয়ে ইস্তক, কেমন যেন...'

ধর্মদাস তাঁর ফিনফিনে ধুতিটি গুছিয়ে জুত হয়ে তক্তপোশে বসলেন। একটা প্রাস্তারি হাসি হেসে বললেন, 'অল্পবয়েস তো, এখন হাসবে না তো হাসবে কবে? এতে তোমার রাগ করা উচিত নয়, পাঁচু। তবে হ্যাঁ, বুদ্ধিমান ছেলে, আমাদের পরামর্শ ছাড়াই তোমার ব্যাবসা চালিয়ে তো নিচ্ছে। কাজেই সে যখন হাসছে, তখন তার কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। আমাদের ধৃতিমান...'

নৃত্যগোপাল বাধা দিয়ে বলল, 'ধৃতিমান নয়, দ্যুতিমান।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দ্যুতিমান। তবে যাই বলো, নৃত্যগোপাল নামটা অনেক সহজ ছিল হে। তা সে যাই হোক, এবার তোমার হাসির কারণটা শুনি। তোমার বাবা না-হয় অল্পবয়েসে ব্যাবসা ছেড়ে অবসর জীবনযাপন করতে শুরু করেছেন, তবুও তাঁর কাজে বা কথায় হাসির একটা কারণ থাকা উচিত—'

নৃত্যগোপাল গম্ভীর মুখে বলল, 'কারণ একটা আছে অবশ্যই। তবে সেটা আপনাদের, বিশেষত আপনাকে বোঝাতে পারব কি না সন্দেহ আছে। কিন্তু তার আগে আমার জানা দরকার, ওই মহাকাশে বেড়াতে যাবার আইডিয়াটা বাবার মাথায় ঢোকাল কে?'

পাঁচুগোপাল বললেন, 'ঢোকাবে আবার কে? আমি কি কোনো খবর রাখি নে? যতদিন ব্যাবসা নিয়ে ছিলুম, ততদিন কাগজ-টাগজ বেশি পড়তুম না ঠিকই, কিন্তু এখন আমার চেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল লোক কলকাতায় একটা খুঁজে বের করো দেখি। আমি সব জানি, সব লক্ষ করি। যতদিন মার্কিনি আর রাশিয়ানরা মহাকাশে যাচ্ছিল, চাঁদে-টাদে নামছিল, আমি তো কোনো কথা বলিনি। কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্ট যখন মহাকাশে যাবার চেষ্টা চরিত্তির শুরু করল, তখনই আমি থুম্বায় চিঠি লিখলুম। মহাকাশে যাবার জন্যে অন্য কোনো তরিকা তোমার জানা থাকে তো বলো, সে চেষ্টাও করা যাবে।'

নৃত্যগোপাল কাতরভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু মহাকাশে কেন? পৃথিবীতে কি তোমার যাবার কোনো জায়গা নেই?'

'না, নেই। পৃথিবীতে আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই।'

'সে কী? এই মোটে দু-মাস হল ভারতদর্শন করে ফিরলে। তোমার পাসপোর্টও তৈরি। আগামী বছর ইউরোপ ভ্রমণে যাবার ব্যবস্থা করেছিলুম। এমনকী, যদি বলো তো ওয়ার্ল্ড ট্যুরেরও একটা চেষ্টা করতে পারি। ওই তো আমাদের কংসকাকুর মতো...'

'চুপ করো! কংসকাকুর মতো! বলতে লজ্জা করল না তোমার? পাঁচুগোপাল কাঁড়াদাস ওই ভুঁইফোড় বোম্বেটে কংসনাশন চৌধুরির মতো কাজ করবে? আর

তোমাকেও বলি, ওই হাড়হাবাতে কংসব্যাটার সঙ্গে তোমার এত পিরিত কীসের, হ্যাঁ? সারাজীবন যে তোমার বাপকে বংশ দিয়ে এল...'

'কিন্তু কী করছেন তিনি?'

'করবে আবার কী? কিছু করার হিম্মত আছে? বাঁশের ব্যাবসা করে আবার ফুটানি! কোথায় বাঁশ আর কোথায় বালতি! আমরা হলুম জাত ব্যাবসাদার, এইসব আজেবাজে কারবারির কাজকর্ম দেখে আমাদের চালচলন ঠিক করতে হয় না, বুঝেছ?'

'যাই বলো বাবা, কংসকাকু মোটেই আজেবাজে কারবারি নন।'

'আজেবাজে নয় তো কী? বাঁশের ব্যাবসা করে দুটো পয়সা করেছে। তো হয়েছে কী? বাঁশ বাঁশই, তা কখনো বালতি হয়? তা পয়সাই করুক আর ওর ওই চিমড়ে মারা হাড়জিরজিরে মেয়েটাকে নিয়ে বিলেতই ঘুরে আসুক...'

নৃত্যগোপাল তড়াক করে তক্তপোশ থেকে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল। হাহাকার করে বলল, 'বাবা! কী বলছ তুমি? রাজহংসী হাড়জিরজিরে? রাজহংসী চিমড়ে?'

'চিমড়ে না তো কী? বাঁশের ব্যাবসা করে কংস ব্যাটাচ্ছেলে মেয়েটাকেও বাঁশের মতো তৈরি করেছে। হ্যাঁ, চেহারা ছিল বটে তোমার মার। ঠিক একটা ওলটানো বালতির মতো। হাতলওলা চেয়ারে বসতে পারত না, গলত না কিনা। চোখ ফেরানো যেত না।'— বলে সশব্দে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পাঁচুগোপাল।

নৃত্যগোপাল জেদি গলায় বলল, 'তোমার কথা আমি মানতে পারলুম না, বাবা। কিন্তু কংসকাকু যেমন ওয়ার্ল্ড ট্যুর করে এলেন, তোমারও সেরকম করতে বাধা কোথায়? পৃথিবীতে কোথাও তোমার যাবার জায়গা নেই— একথা বলছ কেন?'

ধর্মদাস হাত নেড়ে বললেন, 'আমি বলছি। বাধা আছে। তোমার বাবা একজন সম্মানিত ব্যক্তি, সমাজে তাঁর একটা প্রতিষ্ঠা আছে, প্রতিপত্তি আছে। সাধারণ লোক যা করে, তা তো আর তিনি করতে পারেন না। মানে, করলে ভালো দেখায় না, আর কী। মানে, তাঁর এমন কাজ করা কর্তব্য যা দেখে লোকে বলবে, হ্যাঁ, এই তো পাঁচুগোপালের উপযুক্ত কাজ, পাঁচুগোপাল ছাড়া একাজ আর কে করতে পারে?'

নৃত্যগোপাল মাথা নেড়ে বলল, 'হুঁ, এতক্ষণে বুঝলুম। কংসকাকু ওয়ার্ল্ড ট্যুর করেছেন, তাই তাঁকে টেক্কা মারার জন্য বাবার মহাকাশ ভ্রমণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, এই তো?'

'হ্যাঁ, কতকটা তাই বটে। তবে তোমার ওই টেক্কা মারা কথাটায় আমার একটু আপত্তি আছে। পাঁচুগোপাল টক্কর দিতে হলে যাবে তার চেয়ে বড়ো কারোর কাছে, কংসনাশনের মতো একজন...'

'ব্যাস, ব্যাস। কংসকাকুর সম্পর্কে বাবা যা খুশি তাই বলতে পারেন, কারণ

দু-জনে বাল্যবন্ধু, একসঙ্গে পড়াশুনো করেছেন, যদিও আজ দু-জনে দু-দিকে চলে গেছেন, কিন্তু আপনি পারেন না। তবে একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে, বাবা মহাকাশ ভ্রমণে গেলে আপনার কী সুবিধে হবে? যতদিন উনি মহাকাশে থাকবেন, ততদিন সকাল বেলা এখানে লুচি-মোহনভোগটাও যে বাদ পড়বে।'

পাঁচুগোপাল চোখ পাকিয়ে বললেন, 'চোপ! ধর্মদাসের সব কাজে স্বার্থ খোঁজা তোমার একটা বদভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। আমি মহাকাশ ট্যুরে গেলে যখন দেশসুদ্ধ লোক ধন্যি ধন্যি করবে, তখনও কি তুমি তার মধ্যে ধর্মদাসের স্বার্থ খুঁজবে? আমি স্থির করেছি যখন, তখন আমি মহাকাশে যাবই। দেখি, তুমি আমায় কী করে ঠেকাও।'

নৃত্যগোপাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমি তোমাকে ঠেকাতে যাব কোন দুঃখে? তবে যাই করো, আমাকে একটু জানিয়ে রেখো। এখন তবে অফিসে চললুম। আজ ম্যাদাগাস্কার থেকে একটা ট্রেড ডেলিগেশন আসছে, পঞ্চাশ হাজার অ্যালুমিনিয়াম আর তিরিশ হাজার প্লাস্টিকের বালতির জন্যে নিগোশিয়েট করতে। এর পরেরটাই হয়তো মঙ্গলগ্রহের ডেলিগেশন হবে। তখন তোমাকে আবার অফিসে নিয়ে যাব, এক্সপার্ট হিসেবে।'

সন্ধে বেলা বাড়ি ফিরে মিস্টার দ্যুতিমান রায় ওরফে নৃত্যগোপাল নিজের ঘরে না-গিয়ে প্রথমেই তার বাবার ঘরে চলে গেল। দু-হাত ঘষতে ঘষতে বলল, 'বাবা, জোর খবর! তিরিশ লাখ টাকার এক্সপোর্ট অর্ডার ফাইনালাইজড হয়ে গেল। প্রথম শিপমেন্ট— ছ-মাস বাদে।'— কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখল যে শ্রোতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠা তো দূরস্থান, কোনো রেখারও পরিবর্তন হল না সেখানে।

ভাবলেশহীন মুখে পাঁচুগোপাল বললেন, 'বাঃ, ভালো কথা। কিন্তু শোনো, একটা জরুরি কাজ আছে। এই বিজ্ঞাপনটা দিচ্ছি, আগামী রোববারের দুটো ইংরেজি আর দুটো বাংলা কাগজে বেরোনো চাই।'

ক্ষুণ্ণমুখে নৃত্যগোপাল কাগজটা নিল। বলল, 'পড়ে দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

মনোযোগ দিয়ে বিজ্ঞাপনটা পড়ে নৃত্যগোপাল বলল, 'ওঃ, এই ব্যাপার!'

'তার মানে?'

'মানে অত্যন্ত পরিষ্কার। থুম্বা তোমার অনুরোধে কান দিল না বলে তুমি এখন নিজেই মহাকাশযান বানিয়ে বেড়াতে যেতে চাও। তার জন্যে যত টাকা লাগে, তাও তুমি দিতে প্রস্তুত। সেই জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছ। বয়ানটা অবশ্য লিখে দিয়েছেন ধর্মদাস। ভালো কথা। কিন্তু কোনো ঠগজোচ্চোর যে এক্সপার্ট সেজে এসে

তোমার টাকাগুলো হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেবে না, সেটা স্থির করবে কী করে? কে এক্সপার্ট আর কে এক্সপার্ট নয়, সেটা বুঝবে কী করে? এ ব্যাপারে তুমি তো কিছুই জানো না, ধর্মদাসও তথৈবচ। আর, কোনো জানাশুনো বিখ্যাত পণ্ডিতকে কনসালট্যান্ট হিসেবে নিয়োগ করবে, সে আশারও গুড়ে বালি। এ ব্যাপারে কেউ নাক গলাতে রাজি হবেন না, সে কথা আমি বাজি ফেলে বলতে পারি।'

'হুঁ, কথাটা তুমি নেহাত মন্দ বলোনি। ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনাটা একদম উড়িয়ে দিতে পারছি না। পাঁচুগোপাল কাঁড়াদাসকে আজ পর্যন্ত কেউ ঠকাতে পারেনি সেটা ঠিকই, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, সত্যিই আমি তো এ ব্যাপারে কিছুই জানি না।'

'শুধু তুমি কেন, আমাদের চেনাশুনোদের মধ্যেও কেউই কিসসু জানে না।'

'তুমি তবে কী করতে বলো? বিজ্ঞাপনটা দেব না?'— হতাশ, বিমর্ষ মুখে প্রশ্ন করলেন পাঁচুগোপাল।

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে নৃত্যগোপাল সত্যি কথাটা আর বলে উঠতে পারল না। বলল, 'না, না, দেবে না কেন? বিজ্ঞাপনটা দিয়েই দাও।'— বলে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'তবে ওটার সঙ্গে আরও কয়েকটা কথা জুড়ে দাও।'

'কী কথা?

'এক, যিনি মহাকাশযান বানাবেন, তাঁকে তাঁর ফি ছাড়া অন্যকোনো টাকাপয়সা দেওয়া হবে না। তাঁর যা যা দরকার হবে, তিনি লিস্টি করে দেবেন, আমাদের কোম্পানির পারচেস ডিপার্টমেন্ট থেকে তা খরিদ করে দেওয়া হবে। বিদেশি জিনিসের দরকার হলেও কোনো অসুবিধে নেই। আমাদের এক্সপোর্ট এজেন্টকে দিয়ে আনিয়ে দেওয়া হবে। কারণ এক্সচেঞ্জের বোধ হয় কোনো অসুবিধে হবে না।

দুই, আমাদের বালির দু-নম্বর বাড়িতে থেকে কাজ করতে হবে। পেছনের বড়ো মাঠটায় দরকার হলে শেড তুলে দেওয়া হবে। আমাদের কারখানাটাও ওখান থেকে কাছে। কাজেই, ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইংয়ের দরকার হলে ওখান থেকেই করানো যাবে। আর শুনেছি, প্লেনই বলো আর রকেটই বলো, যেসব যন্ত্র ওড়ে, তাদের তৈরি করতে অ্যালুমিনিয়াম আর প্লাস্টিকই বেশি দরকার হয়। তাহলে, ড্রইং পেলে সেইমতো মাল তৈরি করবার জন্যে আমাদের কারখানাই যথেষ্ট হবে। বালতি তৈরি করতে পারি, আর রকেট বানাতে পারব না?

তিন, যতদিন কাজ চলবে, ততদিন যিনি তৈরি করবেন আর তাঁর লোকজনের বাড়ির বাইরে যাওয়া চলবে না। যে ফি উনি চাইবেন তার শতকরা দশভাগ অ্যাডভান্স হিসেবে দেওয়া হবে, ষাট ভাগ চারটে ইক্যুয়াল ইনস্টলমেন্টে দেওয়া হবে, পনেরো ভাগ কাজ শেষ হলে আর বাকি পনেরো ভাগ মহাকাশ থেকে ফিরে আসার পর।'

ছেলের কথা শুনে পাঁচুগোপালের বিমর্ষ মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, 'বাঃ, বাঃ, এই তো বেশ ভালো হয়েছে! তাহলে কাগজটা তুমি রাখো। তোমার শর্তগুলো জুড়ে দিয়ে বিজ্ঞাপনটা যাতে রোববারেই বেরোয়, সেটা একটু দেখো।'

ধর্মদাস কাটলেট চিবুতে চিবুতে বললেন, 'কীহে পাঁচু, আর কতদিন অপেক্ষা করে থাকবে? দশ দিনের ওপর তো হয়ে গেল, কেউ এল? না, কোনো চিঠি বা টেলিগ্রাম পেলে? তখনই বলেছিলুম, কিসসু হবে না। নেত্যগোপালের বিজ্ঞাপন তো নয়, যেন আদালতের সমন। ও দেখলে কোনো ভালো লোক এগোতে সাহস পাবে? তোমাকে বলি শোনো, নেত্য ছেলেমানুষ, ও যা বলে বলুক, তুমি আগামী রবিবারে আমাদের বানানো মুসাবিদটা কাগজে পাঠাও। নইলে এমন হাঁ করে বসে থাকাই সার হবে।'

পাঁচুগোপাল মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে হে। ভাবছি, আজকের মধ্যে যদি কিছু না-হয়, তাহলে অন্যরকম করেই বিজ্ঞাপনটা দিতে হবে।'

বলতে বলতেই সদর দরজায় কলিংবেল বাজল। আর সঙ্গেসঙ্গে পাঁচুগোপালের সাতটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর তারস্বরে চিৎকার করতে শুরু করল।

পাঁচুগোপাল ব্যসসমস্ত হয়ে ডাকলেন, 'দামোদর, ওরে এই হারামজাদা দামোদর! কুকুরগুলোকে ভালো করে বাঁধ, নইলে কে এসেছে তাকে ছিঁড়ে না-ফ্যালে।'

দরজার পর্দা সরিয়ে দামোদর দন্তবিকাশ করল। বলল, 'ভয় নেই গো বড়োবাবু। তেনারা সব খাটের নীচে সেঁইধেছেন, আর সেখান থেকেই চিৎকার পাড়তেছেন।'

পাঁচুগোপাল আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'খাটের নীচে সেঁইধেছেন? বলিস কী রে? যাই হোক, ওদের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দে, আর দ্যাখ কে এল।'

একটু পরেই ঘরে যে ঢুকল, তাকে দেখে পাঁচুগোপাল আর ধর্মদাস দু-জনেই খুব হতাশ হলেন। দু-জনেই আশা করেছিলেন, একজন স্যুট-ট্যুট পরা লোক এসে কড়মড় করে ইংরেজিতে কথা বলবে। নিজেদেরও সেইভাবে প্রস্তুত রেখেছিলেন। তার বদলে এ কে? নেহাত গোবেচারা চেহারার পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা একটা লোক, ডিগডিগে শরীরের ওপর একটা মস্তবড়ো মাথা, তাতে আবার শুয়োরের কুচির মতো ছোটো ছোটো চুল, ড্যাবডেবে চোখ, থ্যাবড়া নাক। বয়েস তিরিশ থেকে বত্রিশের ভেতর। পরনে একটা সদ্য কেনা খদ্দরের পাঞ্জাবি আর একটা আধময়লা চুড়িদার পাজামা। বাঙালি না হিন্দুস্থানি বোঝা দায়। দেখলে হাসিও পায়, কান্নাও আসে।

ধর্মদাস কড়া গলায় বললেন, 'কে হে তুমি? এখানে কী দরকার?'

লোকটা খুব মিহি গলায় বিনীতভাবে বলল, 'আজ্ঞে, আমি আপনাদের বিজ্ঞাপন দেখে আসছি। আমি চমৎকার মহাকাশযান বানাতে পারি কিনা।'

শুনে প্রথমে ধর্মদাস, তারপর পাঁচুগোপাল খ্যাক খ্যাক করে হাসতে শুরু করলেন। ধর্মদাস হাসতে হাসতেই বললেন, 'তুমি মহাকাযান বানাতে পারো? বলো কী হে? তা, এখানে এলে কী করে? মহাকাশযানে করে নাকি?'

লোকটা বলল, 'আজ্ঞে না, হেঁটে এসেছি। হাওড়া স্টেশনে আমার ব্যাগ-ট্যাগ সব চুরি হয়ে গেল কিনা। টাকাপয়সা সব তার মধ্যেই ছিল। তাই...'

'হাওড়া স্টেশনে কেন? রাঁচি থেকে এলে বুঝি?'

'আজ্ঞে না, বম্বে থেকে। প্রায় সাতদিন আগে রওনা হয়েছিলুম। হিউস্টন থেকে নিউইয়র্ক, সেখানে থেকে লন্ডন, সেখান থেকে বম্বে, তারপর কলকাতা।'

ধর্মদাসের হাসি এবার বন্ধ হল। বললেন, 'নিউইয়র্ক? তার মানে আমেরিকা? তুমি আমেরিকা থেকে আসছ? তা, আমাদের বিজ্ঞাপনটা তোমার নজরে পড়ল কোথায়? আমেরিকায় না লন্ডনে?'

'আজ্ঞে, লিলুয়ায়। ওখানে ট্রেনটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তো। তখন ট্রেন থেকে নেমে এক ঠোঙা জিলিপি কিনেছিলুম। তখনই তো আমার ব্যাগটা খোয়া গেল! তা, সেই ঠোঙাতেই আপনাদের বিজ্ঞাপনটা নজরে পড়ল।'

'অ, ঠোঙা! বেশ, এবার বলো তো বাপু, তুমি আমেরিকাতে কী করছিলে?'

'আজ্ঞে, ওই আমেরিকার টেকসাসে হিউস্টন শহরে নাসা বলে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, যার নামের বাংলা করলে দাঁড়ায়— জাতীয় উড্ডয়ন বিজ্ঞান এবং মহাশূন্য পরিচালন সংস্থা। আমি সেই সংস্থার মহাকাশযান সংক্রান্ত গবেষণাগারের মহাকাশযানের গঠনতত্ত্ব বিভাগের প্রধান পরিচালক ছিলুম।'

ইতিমধ্যে কখন যেন পেছনে এসে নৃত্যগোপাল দাঁড়িয়েছে। সে এবার সামনে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'অর্থাৎ আপনি নাসার স্পেস রিসার্চ সেন্টারের একজন ডিরেক্টার ছিলেন?'

লোকটা ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল, 'আজ্ঞে, ঠিক ধরেছেন। আমি ওখানে স্পেস ক্রাফটের স্ট্রাকচারাল অ্যানালিসিস করতুম।'

পাঁচুগোপাল এতক্ষণ অবাক হয়ে এই কথোপকথন শুনছিলেন। এখন প্রশ্ন করলেন, 'একজন বাঙালিকে আমেরিকানরা ডিরেক্টারের চাকরি দিলে?'

লোকটা ফিক করে হেসে বলল, 'দেবে না কেন? ওরা তো আর বাঙালি কী জাপানি দেখে চাকরি দেয় না। দেয় বিদ্যেবুদ্ধি দেখে। কত বাঙালি ওখানে আমার চেয়েও উঁচু পদে চাকরি করছেন।'

ধর্মদাস বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'তা, তোমার বিদ্যে কতদূর?'

'আজ্ঞে, আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাধারণ স্নাতক। তারপর

আমেরিকায় গিয়ে হাতে-কলমে কাজ শিখে খানিকটা ভাগ্য আর বাকিটা পরিশ্রমের জোরে ওপরে উঠি। খুব ভারী ডিগ্রি আমার নেই, ওদেশে তার বড়ো দরকারও হয় না। তবে, পৃথিবীর বড়ো বড়ো সব বিশ্ববিদ্যালয়েই রচনা পাঠ করবার এবং বক্তৃতা দেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।'

নৃত্যগোপাল বলল, 'আপনি যা বললেন, তা প্রমাণ করতে পারবেন?'

লোকটা মাথা নাড়ল। বলল, 'না। পারব না। প্রথমত, আমার কাছে কাগজপত্র যা ছিল, তা সে সবই খোয়া গেছে। আর সেসব থাকলেও বিশেষ কিছু প্রমাণ করা যেত না, কারণ আমি যে পদে চাকরি করতুম, সেটা একটা খুবই গোপনীয় ব্যাপার। সে বিষয়ে আমি কখনো মুখ খুলব না, বা বিশদভাবে কিছু জানাব না, এই প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করে তবে ছাড়া পেয়েছি।'

'ছাড়া পাওয়ার দরকার কী ছিল?'

'মানে, দেশের জন্যে বড্ড মন কেমন করছিল। বহু বছর দেশ ছাড়া। মনে হল, নম নম নম, সুন্দরী মম...'

ধর্মদাস হাত নেড়ে বললেন, 'থাক, থাক। আসল কথা হল, তোমার বিদ্যেবুদ্ধির কোনোই প্রমাণ নেই। তা, তোমার নিজের নামটা মনে আছে তো? নাকি সেটা লিলুয়ায় খোয়া গেছে?'

লোকটা আবার ফিক করে হেসে বলল, 'না, না, কী যে বলেন! আমার নাম পিন।'

'পিন!'

'হ্যাঁ, মানে ইয়ে, আমার পুরো নামটা হল, পিন্টুচরণ রায়। আমার বন্ধুরা আমায় আদর করে পিন বলেই ডাকে।'

ধর্মদাস ভয়ানক ভ্রূকুটি করে বললেন, 'ডাকুক। আমরা তো আর তোমার বন্ধু নই। আমরা তোমাকে পিন্টুচরণ বলেই ডাকব। পিন্টুচরণ! এঃ, কী অদ্ভুত নাম!'

নৃত্যগোপাল ধমক দিয়ে বলল, 'আঃ, আপনি চুপ করুন তো! পিন্টুবাবু, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'— বলে লোকটাকে নিয়ে নৃত্যগোপাল তার লাইব্রেরি ঘরে চলে গেল।

নৃত্যগোপাল বলল, 'লোকটার মাথায় একটু গোলমাল আছে, কিন্তু প্রচণ্ড পণ্ডিত। অবিশ্যি, সব প্রতিভাবান লোকেরাই অল্পবিস্তর ছিটগ্রস্ত হয়।'

ধর্মদাস বললেন, 'লোকটা পণ্ডিত, তুমি বুঝলে কী করে?'

'দেখুন, এমএসসি পাশ করেছি, প্লাস্টিক টেকনোলজিতে স্পেশাল ট্রেনিং নিয়েছি— অতএব একজন পণ্ডিত কী পণ্ডিত নয়, সেটুকু বোঝবার মতো ক্ষমতা

আমার আছে। আর সেই ক্ষমতার জোরেই বলছি, লোকটা প্রচণ্ড পণ্ডিত। তা ছাড়া অনেকগুলো ইউনিভার্সিটির ফটোগ্রাফ দেখালুম, দেখেই নাম বলে দিল। হাইডেলবার্গ, ইয়েল, লুমুম্বা, জওহরলাল নেহেরু— সব ক-টা। প্ল্যাঙ্ক, ফার্মি, হয়েল, হার্শেল— প্রত্যেকের ছবি দেখে চিনতে পারল। অদ্ভুত!'

'এতই যদি জ্ঞান তো আমেরিকায় চাকরি ছেড়ে এখানে মরতে ফিরে এল কেন?'

'বোধ হয় ছিটগ্রস্ত বলেই। আমাকে তো বলল যে বিদেশে আর ভালো লাগছিল না বলেই এদেশে চলে এসেছে। পয়সাকড়ি যা এনেছে, তাতে বাকি জীবনটা নিশ্চিন্তে কাটবে। এখন, আমাদের বিজ্ঞাপনটা নজরে পড়ায় আবার রক্ত চনমন করে উঠেছে। লোকটার নাকি অনেকদিন যাবৎ একটা ছোট্ট মহাকাশযান বানাবার ইচ্ছে, যেটা মোটরগাড়ির মতো চালিয়ে মঙ্গলগ্রহ কী চাঁদে চট করে বেড়িয়ে আসা যাবে। এর একটা ডিজাইনও নাকি ওর আছে। মার্কিন সরকারকে ও এই কাজে ওকে টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতে অনুরোধ করেছিল, তারা কোনো পাত্তাই দেয়নি। এখন আমরা যদি সাহায্য করি, তাহলে আখেরে আমাদেরও লাভ হয়, লোকটারও থিয়োরি সত্য বলে প্রমাণিত হয়।'

পাঁচুগোপাল বলে উঠলেন, 'তবে আর দেরি কেন? লোকটাকে কাজ শুরু করতে বলো! পুজোর আগেই যদি শেষ করতে পারে, তাহলে বড়ো ভালোই হয়। পুজোটা মহাশূন্যে কাটিয়ে এলুম, ভাবতেই রোমাঞ্চ হচ্ছে।'

নৃত্যগোপাল মাথা নেড়ে বলল, 'একটা জায়গায় আটকাচ্ছে।'

'আটকাচ্ছে? আটকাচ্ছে কেন?'

'পিন্টুচরণ তার বিমানের সত্ব ছাড়তে রাজি নয়।'

'তার মানে? বিমানই তৈরি হল না, তার আবার সত্ব কী?'

'আহা, ধরো যদি সত্যি তৈরি হয়, তখন? তার পেটেন্ট নিতে পারলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়, বুঝতে পারছ? একটা ছোটো মহাকাশযান, বাড়ির ছাদেই হয়তো পার্ক করে রাখা যাবে, যখন খুশি পৃথিবীর বাইরে বেড়িয়ে এলেই হল, তার কী ডিমান্ড হবে ভাবতে পারছ? এখন সেই বিমানের প্রথমটা যদি আমাদের টাকাতেই হয়, তাহলে তার পেটেন্ট নেওয়ার অধিকারও আমাদের।'

'কেন?'

'তার কারণ, যদি তৈরি না-হয়, তাহলে আমাদের সমস্ত টাকাটাই তো জলে যাবে। কত বড়ো একটা রিস্ক নিতে যাচ্ছি, অন্ধকারের মধ্যে পা বাড়াচ্ছি, তার যদি কোনো সুফল ফলে সেটা আমরা ভোগ করতে পারব না, এ কখনো হয়?'

'কিন্তু যে লোকটা মাথা খাটিয়ে জিনিসটা বানাল, সে কিছু পাবে না?'

'নিশ্চয়ই পাবে! সে মোটা রয়্যালটি পাবে, লভ্যাংশ পেতে পারে, কিন্তু পেটেন্ট রাইট আমাদের থাকতেই হবে।'

ধর্মদাস মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল! তুমিও যে এমন ক্ষ্যাপা, তা আগে জানতুম না বাপু। তোমার ওই পিন্টুচরণ বানাবে মিনি মহাকাশযান আর তার থেকে তুমি পয়সা পিটবে— ওই আনন্দেই থাকো।'

পাঁচুগোপাল ধমকে উঠলেন। বললেন, 'আঃ, ধর্মদাস, থামো তো! তা, তুমি কি লোকটাকে ভাগিয়েই দিলে নাকি?'

নৃত্যগোপাল বলল, 'না, না, তা কখনো পারি। ওকে আমার গাড়িটা দিয়ে পাঠিয়েছি হোটেল সুভদ্রায়। ড্রাইভারকে বলে দিয়েছি, এক সেট ভালো জামাকাপড় কিনে দিতে আর হোটেলের ম্যানেজারকে বলতে যে সে যেন বিলটা আমার অফিসে পাঠিয়ে দেয়। আর লোকটাকে বলে দিয়েছি, আজ সারা রাত চিন্তা করে কাল সকালে আসতে। ন-টার সময় হোটেলে গাড়ি পাঠাব বলে দিয়েছি।'

'হোটেলে কেন, লোকটার বাড়িঘর নেই নাকি?'

'বলল তো আছে, তবে কলকাতায় নয়। বাঁকুড়ায়। অজ পাড়াগাঁয়ে।'

নৃত্যগোপালের কথা শুনে ধর্মদাস আবার মুখ বাঁকালেন। বললেন, 'বাঃ, চমৎকার! আমেরিকানরা যাকে পাত্তা দিল না, সেই আধপাগলা পাড়াগেঁয়েটার পেছনে পয়সা ঢালবে তুমি!'

নৃত্যগোপাল সহাস্যে বলল, 'ব্যাপারটা আপনাদের কাছে যতটা অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে, আসলে তা অতটা একেবারেই নয়। আমেরিকান গভর্নমেন্টের কাছে দিনে গড়ে হয়তো কয়েক লক্ষ উদ্ভট প্রস্তাব আসে। তাদের মধ্যে ক-টা পাগলে পাঠায়, আর ক-টা সত্যিকারের প্রতিভাশালী লোক পাঠায়, তার বিচার করবার সময় কোথায় তাদের? কাজেই সব ক-টাই নাকচ হয়ে যায়। আমাদের তো তা নয়। আমরা দেখেশুনে বিচার করে তারপর কাজে হাত দেব। অর্ধেক কাজ করার পর যদি দেখি পিন্টুচরণ আসলে পাগলই, তাহলে তাকে তৎক্ষণাৎ ভাগিয়ে দিলেই হবে। ইতিমধ্যে আপনি যদি পারেন তো না-হয় একজন আসল ভালো লোক জোগাড় করে আনবেন!'

পরদিন সকালে পিন্টুচরণের নতুন পোশাক দেখে ধর্মদাস আর পাঁচুগোপাল নৃত্যগোপালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেই আবার খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে শুরু করলেন। গাঢ় নীল রঙের জামা তার ওপর সোনালি রঙের বড়ো বড়ো বুটি আর কালো ডোরাকাটা ক্যাটকেটে কমলা রঙের ট্রাউজার্স।'

ধর্মদাস হাসতে হাসতে বললেন, 'এঃ, এমন জামাকাপড় কে কিনে দিলে হে তোমায়? গুণনিধি বুঝি? ব্যাটার গুণের ঘাট নেই দেখছি!'

পিন্টুচরণ লাজুক হেসে বলল, 'না, আপনাদের ড্রাইভার নয়, আমি নিজেই কিনেছি। কেন, বেশ ভালো হয়েছে, না?'

নৃত্যগোপাল হাত নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভালো হয়েছে। এবার কাজের কথায় আসা যাক। কী স্থির করলেন?'

পিন্টুচরণ মাথা চুলকে বলল, 'দেখুন, আমার আবিষ্কারের সত্ব আমি ছাড়তে পারব না। তবে তা দিয়ে টাকা বানানোর ইচ্ছেও আমার নেই, কারণ টাকার কোনো প্রয়োজন আমার নেই। আমার উদ্দেশ্য, যন্ত্রটা বানানো এবং প্রমাণ করা যে আমার থিয়োরি সঠিক। এখন আপনারা টাকা দিচ্ছেন এবং তার থেকে স্বভাবতই আপনারা একটা রিটার্ন আশা করবেন। এ ব্যাপারে আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে আপনাদের সঙ্গে আমার একটা চুক্তি হবে যার দ্বারা, যদিও আমিই পেটেন্ট নেব, আমার যন্ত্রের উৎপাদন এবং বিক্রির সমস্ত অধিকার থাকবে আপনাদের। আমি লভ্যাংশের শতকরা চল্লিশ ভাগ নেব এবং এই চুক্তি প্রতি তিন বছর অন্তর রিনিউ করতে হবে।'

নৃত্যগোপাল মাথা নেড়ে বলল, 'শতকরা চল্লিশ ভাগ অত্যন্ত বেশি। আজকালকার বাজারে যাই আপনি তৈরি করুন না-কেন, তাতে কখনো বেশি লাভ রাখা সম্ভব নয়। আর সেই লাভের চল্লিশ ভাগই যদি আমাদের ছেড়ে দিতে হয়, তাহলে ব্যাবসা চলে কী করে?'

'বেশ, আপনারা কত দিতে প্রস্তুত?'

'দশ।'

'দশ? বড্ড কম হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা বেশ, আপনার কথাও থাক, আমার কথাও থাক। শতকরা পঁচিশ। রাজি?'

নৃত্যগোপাল একটু ভেবে বলল, 'রাজি। আসুন, হাত মেলান।'

হাত-টাত মেলানো হয়ে গেলে পর পাঁচুগোপাল লজ্জা লজ্জা মুখ করে বললেন, 'ইয়ে হয়েছে যে রকেটটা তৈরি হবে, তার নাম কিছু ঠিক করেছ নাকি?'

নৃত্যগোপাল বলল, 'হ্যাঁ, করেছি। বিমান তো, তাই তার নাম দেব রাজহংসী।'

পাঁচুগোপাল ব্যাজার মুখ করে বললেন, 'দূর, দূর, এটা একটা নাম হল! আমি বলি, নাম দাও নগেন্দ্রবালা— তোমার মায়ের ওই নাম ছিল কিনা।'

মাস দুয়েক পরের কথা।

ধর্মদাস মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'একটা আধপাগলা গেঁইয়া যে তোমাদের এরকম

বুদ্ধু বানাবে, আমি একদম আশা করতে পারিনি। এক লাখ টাকা ফি চাইল, তাইতেই তোমরা রাজি হলে। এককথায় তার টেন পার্সেন্ট দশ হাজার টাকা দিয়ে দিলে। এখন দ্যাখো, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।'

নৃত্যগোপাল চিন্তিত মুখে চা খাচ্ছিল। বলল, 'লোকটাকে রকেট বানাতে দিয়ে বুদ্ধু বনেছি, এটা আমি স্বীকার করতে রাজি নই। তবে লোকটাকে যতটা বোকাসোকা ভেবেছিলুম, ততটা সে মোটেই নয়। বরং অত্যন্ত ধড়িবাজ।'

পাঁচুগোপাল জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করে বুঝলে? টাকা নিয়ে কেটে পড়ার ধান্দা করছে নাকি?'

'না, তা নয়। কাজ শুরু করে দিয়েছে। তবে যে সব ড্রইং বানাচ্ছে, সেগুলো এমন একটা মোটা তেলতেলে কাগজে করছে যে, তার থেকে না-উঠছে কোনো প্রিন্ট, না-করা যাচ্ছে সেগুলো ট্রেস। অথচ ওয়ার্কিং ড্রইং হিসেবে ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধে নেই।'

'তাতে তোমার আপত্তি কোথায়?'

'আপত্তি ঠিক নেই। মানে, ভেবেছিলুম ড্রইংগুলো কপি করে একটা সেট নিজেদের কাছে রেখে দেব, যাতে পরে যদি ব্যাটা কখনো চুক্তিভঙ্গ করে তাহলে নিজেরাই বিমানটা যেন তৈরি করে নিতে পারি। এই আর কী!'

'হুঁ! সেটা যখন সম্ভব হল না, তখন আর ভেবে লাভ কী? তা, কাজ কদ্দুর এগোল?'

'এগিয়েছে কিছুটা। বেশ কিছু কম্পোনেন্টের কাস্টিং হচ্ছে, অনেকগুলো মালেরও অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। তবে যা বুঝতে পারছি, বিদেশি কোনো মালের দরকার হবে না আর যে যন্ত্রটা তৈরি হতে যাচ্ছে সেটার চেহারাটা রকেটের মতো হবে না, হবে পিরিচের মতো। মানে, যাকে বলে ফ্লাইং সসার।'

শুনে ধর্মদাস খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা করে হেসে, বিষম খেয়ে, কেশে একাকার।

আরও প্রায় চারমাস বাদে।

ধর্মদাস বললেন, 'কীহে পাঁচু, এই সাতসকালে সিল্কের পাঞ্জাবি পরে চললে কোথায়? ছেলের বউ দেখতে নাকি?'

পাঁচুগোপাল রুমালে মুখ মুছে বললেন, 'আরে, না, না। যাচ্ছি অন্য একটা জায়গায়। তুমিও যাচ্ছ আমাদের সঙ্গে। এতক্ষণ তোমার অপেক্ষাতেই ছিলুম।'

'বেশ, তা না-হয় যাওয়া হবে। কিন্তু কোথায় যাচ্ছ, জানাতে আপত্তি আছে কি?'

'না, না, আপত্তি কীসের? যাচ্ছি বালি। নগেন্দ্রবালাকে দেখতে।'

'নগেন্দ্রবালা? ওহো, তোমার সেই মহাকাশযান। তার কদ্দূর হল? রেডি?'

'হ্যাঁ, রেডি।'

'অ্যাঁ, বলো কী হে! ছ-মাসের মধ্যে একটা মহাকাশযান রেডি? তোমার ওই পিন্টুচরণ না কী যেন নাম, তার কি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ-টদীপ আছে নাকি? আমেরিকা, রাশিয়ার মতো দেশে এক-একটা রকেট বানাতে বছরের পর বছর লেগে যায়, আর বলা নেই কওয়া নেই, ছ-মাসের মধ্যে তোমার মহাকাশযান রেডি! তাও বালির মতো জায়গায়!'

'দ্যাখো, ব্যাপারটা আমারও একটু কেমন কেমন লাগছে। চলো, গিয়ে দেখেই আসি। পিন্টুচরণ ছোকরা খেটেছে খুব, নেত্যও লেগেছিল পেছনে, কাজেই মনে হয় কিছু একটা হয়েছে।'

'ছাই হয়েছে! যত তাড়াতাড়ি কিছু একটা খাড়া করতে পারবে, তত তাড়াতাড়ি ইনস্টলমেন্টের পয়সা হাতাতে পারবে তো। শেষটা টুক করে কেটে পড়বে। তখন তুমি আর তোমার ছেলে ওই ফ্লাইং সসারে ঢেলে ঢেলে চা খাবে। এই আমি বলে দিলুম।'

ধর্মদাসের কথার মধ্যে নৃত্যগোপাল ঘরে ঢুকেছিল, কিন্তু তার কথা শুনেও চটে উঠল না। নার্ভাস, কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আপনার কথা সত্যি হলেও আজ অখুশি হব না, কাকাবাবু। আজ মনে হচ্ছে, এর মধ্যে না-গেলেও হত।'

পাঁচুগোপাল চোখ পাকিয়ে বললেন, 'তার মানে?'

'মানে, কাজটায় যখন হাত দিয়েছিলুম, তখন কখনো অন্তর থেকে বিশ্বাস করিনি যে পিন্টুচরণ সত্যি সত্যি কিছু একটা বানাতে পারে। ভেবেছিলুম, এটা একটা খেলা। কিছুটা টাকার শ্রাদ্ধ হবে বটে, কিন্তু বাবার ছেলেমানুষি...'

পাঁচুগোপাল তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন, 'ছেলেমানুষি! কী বলতে চাও তুমি? আমি মহাশূন্যে বেড়াতে যাব, সেটা ছেলেমানুষি? জানো, এটা আমার একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার? আর আমার প্রেস্টিজ হল সবার ওপরে। সম্মান খোয়াতে রাজি নই কিছুতেই।'

'আহা, তুমি বুঝতে পারছ না। পিন্টুচরণ যেটা বানিয়েছে সেটা প্রথম বার যদি ঠিকমতো ওড়েও, দ্বিতীয় বার বিগড়োতে পারে। তখন কী হবে?'

'কী আবার হবে? আটাশ বছর বয়সে পিতৃহীন হবে। তাতে ভারি বয়েই গেল। একটু ভালো করে শ্রাদ্ধ করলেই সব গোল চুকে যায়। দ্যাখো বাপু, জীবনের পরোয়া আমি করি না। বললুম তো, আমার কাছে প্রেস্টিজ হল গে সবার ওপরে।'

ধর্মদাস সহাস্যে বললেন, 'আঃ, ঘাবড়াও কেন, ধুতিমান? আমি লিখে দিতে পারি, তোমার মহাকাশযানও উঠবে না, তোমার বাবারও বিপদ-আপদ কিছু হবে না।'

নৃত্যগোপাল বলল, 'আপনার কথাই যেন সত্যি হয়।'

পাঁচুগোপাল আবার গর্জন করলেন, 'চোপ! কক্ষনো সত্যি হবে না। ওই

পিন্টুচরণের মহাকাশযান উড়বে আর আমিও বেড়িয়ে আসব। দেখি, তোমরা আমাকে ঠেকাতে পারো কি না। আর হ্যাঁ, পিন্টুচরণের যন্ত্র যদি তৈরি হয়ে গিয়েই থাকে তো সেটা ওড়েনি কেনো এখনও?'

'তার কারণ তিন-শো কুইন্টাল পারা এখনও এসে পৌঁছয়নি। ওই যন্ত্রের ফুয়েল নাকি পারা!'

শুনে ধর্মদাস আবার হাসতে শুরু করলেন। বললেন, 'পারা? পারা দিয়ে প্লেন চলবে? পেট্রোল নয়, ডিজেল নয়, নিদেন কেরোসিনও নয়— পারা? এমন অদ্ভুত কথা জীবনে শুনিনি কখনো। তোমার ওই পিন্টুচরণের হাবভাব আমার কিন্তু ভালো লাগছে না বাপু। লোকটার উদ্দেশ্য কী?'

পাঁচুগোপাল দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, 'উদ্দেশ্য যদি আজও না বুঝতে পেরে থাকো ধর্মদাস, তবে আর কোনোদিনও বুঝতে পারবে না। এখন চলো তো, নগেন্দ্রবালাকে দেখে আসি।'

'তা তোমার পেয়ারের কুকুরগুলোকে নিয়ে যাবে না?'

'নাঃ, কী যেন হয়েছে বটাচ্ছেলেদের। কেমন যেন ম্যাদামারা হয়ে গেছে ইদানীং। বেড়ালের মতো ম্যাও ম্যাও করছে আর কাক দেখলে পর্যন্ত চমকে উঠে দৌড়ে ঘরের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। ভাবছি, কালই ওদের ডাক্তার দেখাব। নেত্য, তুমি কালই ডাক্তারকে ফোন করবে তো। ও, ভালো কথা মনে পড়ল। তোমার কংসকাকুকেও ফোন করে সে হতভাগাকে বালিতে আসতে বলো এখন। ব্যাটা দেখুক আমার মহাকাশযান। আর যেদিন উড়ব, সেদিনও আসতে বলবে। সে সময় আমি ওর মুখটা দেখতে চাই। হিংসেয় আবার হার্টফেল না-করে।'

নৃত্যগোপাল বিড়বিড় করে বলল, 'সে তুমি বলার আগেই ফোন করে দিয়েছি।'— ভাগ্যিস কথাগুলো পাঁচুগোপালের কানে যায়নি।

বালির বাড়িটা বাইরে থেকে দেখলে, নেহাতই একটা সাদামাটা দোতলা বাড়ি বলে মনে হয়। তার পেছনে যে প্রকাণ্ড মাঠ, আমবাগান, কলাবাগান ইত্যাদি রয়েছে বোঝাই যায় না। দশ ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এই বাড়িটার একমাত্র বাসিন্দা রামঅবতার সিং আর তার গিন্নি লছমি। তারাই বাগানটার দেখাশুনো করে আর বাবুর বাড়ি ভেট পাঠায়। এখন অবশ্য একজন অতিথি আছে, তর নাম পিন্টুচরণ রায়।

নৃত্যগোপালের গাড়ির হর্ন শুনে গেট খুলে দিল রামঅবতার। তারপর গাড়ি থেকে বড়োবাবুকে নামতে দেখে বিশাল শরীরটা বিনয়ে বেঁকিয়ে সভক্তি নমস্কার করল। খুব কষ্ট হল, সন্দেহ নেই।

প্রাথমিক কুশল প্রশ্নাদির পর পাঁচুগোপাল সদলবলে পেছনের মাঠের দিকে রওনা হলেন। সামনের বড়ো ঘরটা পেরিয়ে উঠোনে পা দিয়ে সামনে তাকিয়েই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। ধর্মদাসও হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

মাঠের ঠিক মাঝখানে একটা বিচিত্রদর্শন যন্ত্র রাখা আছে। যন্ত্রটা অনেকটা একটা আঠেরো থেকে বিশ ফুট ব্যাসের অ্যালুমিনিয়ামের ডিসের ওপর আর একটা ওই মাপের ডিস চাপা দিলে যেমন দেখতে হয়, তেমনই দেখতে। তিনটে সরু লম্বা পায়ার ওপর এই ডিসজোড়া রাখা, মাটি থেকে প্রায় ফুট দুয়েক ওপরে। ডিসদুটো যেখানে জোড়া লেগেছে, সেখানে কতগুলো গোল গোল জানলা, আর ওপরের উপুড় করা ডিসের ওপর একটা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ডোম। সেটাই যন্ত্রটার ভেতরে ঢোকার রাস্তা, কারণ সেখান থেকে একটা অ্যালুমিনিয়ামের মই মাটি পর্যন্ত নামানো আছে। ডোমটা ফুট চারেক উঁচু আর মাটি থেকে ডোমের শীর্ষ আবার উনিশ ফুট হবে।

প্রথম কথা বললেন ধর্মদাস। বললেন, 'পিন্টুচরণ, পিন্টুচরণ কোথায়?'

সরু মিনমিনে গলায় পেছন থেকে উত্তর এল, 'আজ্ঞে, এই যে আমি।'

সবাই পেছন ফিরে দেখলেন, কখন যেন পিন্টুচরণ তাঁদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মুখে একটা বিনয়, গর্ব আর অহংকার মিশ্রিত হাসি। বলল, 'এই আপনাদের নগেন্দ্রবালা। কেমন দেখছেন, স্যার?'

পাঁচুগোপাল বললেন, 'অপূর্ব! এই যন্ত্রটা তুমি একা হাতে বানিয়েছ? কী করে পারলে?'

পিন্টুচরণ দু-হাত ঘষতে ঘষতে বলল, 'না, না, আমি একা হাতে করব কেন? তা কি কখনো সম্ভব? আমি ড্রইং করে দিয়েছি, দ্যুতিমানবাবু তাই দেখে মাল তৈরি করিয়ে দিয়েছেন, তাঁর কারখানার লোকজন দিয়ে সব ফিট করিয়ে দিয়েছেন। এমনকী ইলেকট্রিক ওয়্যারিংয়ের কাজও আমাকে পুরোটা করতে হয়নি, ওঁর ইলেকট্রিশিয়ান অনেকটাই করে দিয়েছেন। মানে, কৃতিত্ব যদি কিছু থাকে, তবে দ্যুতিমানবাবু তার সমান অংশীদার।'

পাঁচুগোপাল ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললেন, 'না, না, সব কৃতিত্ব তোমার। তোমার মাথা থেকেই তো সব বেরিয়েছে। আর আমরা ভেবেছিলুম কিনা যে তুমি একটা...'

পাঁচুগোপাল কথাটা শেষ না-করেই কটমট করে ধর্মদাসের দিকে তাকালেন।

ধর্মদাস বিশেষ ঘাবড়ালেন বলে মনে হল না। বললেন, 'সব প্রশংসাটা এখনই খরচ করে ফেলো না হে পাঁচু। যন্ত্রটা আগে উড়ুক, তার পরে না-হয় বাকিটা খরচা কোরো।'

এমন সময় গেটের কাছে গাড়ির হর্ন বাজল। একটু বাদেই উঠোনে এসে উপস্থিত হলেন কংসনাশন চৌধুরি। তাঁর পেছনে তাঁর মেয়ে রাজহংসী। কংসনাশন চেহারায়, চালচলনে একেবারে পাঁচুগোপালের বিপরীত। ইনি রোগা, লম্বা, বুশশার্ট আর

ট্রাউজার্স পরা, চঞ্চল চলাফেরা, মৃদুভাষী, কেবল মাথার চুলগুলো তাঁর বন্ধুর মতোই সব পেকে গেছে। আর রাজংসী তার বাবার মতোই রোগাটে লম্বা গড়নের, চোখে স্টিল ফ্রেমের চৌকো চশমা তাঁর তরুণ সুকৌমার্যকে চাপা দিয়ে রাখতে পারেনি।

কংসনাশন এসেই কোনো দিকে দৃকপাত না-করে নীচু গলায় বললেন, 'এই যে পাঁচু! এ সব কী আরম্ভ করেছিস, শুনি? মহাশূন্যে বেড়াতে যাবি নাকি? তার জন্যে যন্তরপাতির দরকার কী? গলায় দড়ি দিলেই তো পারিস। সস্তায় তাড়াতাড়ি হবে।'

পাঁচুগোপাল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গলায় চিৎকার করে বললেন, 'তা আর বলবি না? বাঁশের কারবার করলে এমনই হয়। যন্তরটা আগে দ্যাখ, তার পরে কথা বলিস।'

কংসনাশন কিছু বলার আগেই রাজহংসীর বিস্মিত কণ্ঠ শোনা গেল, 'ওমা! এই তোমার মিনি স্পেস শিপ! দ্যুতি, ইটস ফ্যান্টাস্টিক। ইটস মার্ভেলাস!'

পাঁচুগোপাল এতক্ষণে রাজহংসীকে দেখতে পেলেন। বললেন, 'আরে, নেংটি তুইও এসেছিস। বেশ করেছিস। কেমন দেখছিস এটা?'

রাজহংসী লাজুক হেসে বলল, 'দুর্দান্ত, মেসোমশাই। কিন্তু আপনি আমাকে এখনও নেংটি বলে ডাকবেন?'

'তো কী বলতে হবে? কুইন ভিক্টোরিয়া? বলি, কোন ক্লাস হল?'

'ক্লাস কী মেসোমশাই, আমি এখন এমএ পড়ি।'

পাঁচুগোপাল কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই আবার গেটের কাছে হর্ন বাজল। ট্রাকের হর্ন। সেই আওয়াজ শুনেই পিন্টুচরণ হন্তদন্ত করে বেরিয়ে গেল।

পাঁচুগোপাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকালেন। নৃত্যগোপাল কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'পারা এল বোধ হয়।' তার মুখ ছাইয়ের মতো সাদা।

ধর্মদাস বললেন, 'ঘাবড়াও কেন? পারা দিয়ে কোনো কিছু চলে, শুনেছ কখনো?'

এইসব কথার মধ্যেই, একটা ছোটো ঠ্যালাগাড়িতে একটা মাঝারি সাইজের ড্রাম ঠেলতে ঠেলতে এল পিন্টুচরণ। একগাল হেসে নৃত্যগোপালকে বলল, 'ব্যাস, লাস্ট আইটেমও এসে গেল।'— বলে ঠ্যালাগাড়িটা মাঠের ওপর দিয়ে তার যন্ত্রটার দিকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যেতে যেতে সবাইকে ডেকে বলল, 'আসুন আপনারা। নগেন্দ্রবালাকে দেখে যান।'

রাজহংসী আশ্চর্য হয়ে বলল, 'নগেন্দ্রবালা?'— পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে বলল, 'ওঃ মাসিমা।'— বলেই সকলের আগে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

পিন্টুচরণ ততক্ষণে নগেন্দ্রবালার কাছে পৌঁছে গেছে। রাজহংসী তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা ভেতরে যেতে পারি?'

পিন্টুচরণ বলল, 'নিশ্চয়ই।'

আর বলতে না-বলতেই রাজহংসী তরতর করে মই বেয়ে ওপরে উঠে প্লাস্টিকের ঢাকাটা সরিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেই দৃশ্য দেখে কংসনাশন কিছু বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন বটে, কিন্তু একটু বাদেই ওলটানো ডিসের ওপর দিয়ে রাজহংসীর মুণ্ডুটা দেখা গেল। উত্তেজনায় প্রায় লাফাচ্ছিল রাজহংসী। চেঁচিয়ে বলল, 'বাবা, শিগ্‌গির উঠে এসো। ইটস ফ্যাবিউলাস ইন হিয়ার। য়্যু'ভ নেভার সিন এনিথিং লাইক দিস বিফোর।'

ভেতরটা সত্যিই দেখবার মতো। আসলে সমস্তটাই একটা গোল ঘর, মাঝখানে খানিকটা ফুট সাতেক উঁচু, তারপর চারিদিক থেকে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে জানালাগুলো পর্যন্ত। ঘরের মাঝখানে একটা প্ল্যাটফর্ম মতো, তার ওপর দুটো দারুণ আরামপ্রদ নরম গদিমোড়া চেয়ার। বোঝা যায়, সেটা হল অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্ম, কারণ সেখানে বসলে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ভেতর দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা যায়। যন্ত্রটাকে চালাবার আসল জায়গা কিন্তু তার নীচে। জানলাগুলোর ওপরে ঘরটায় চারিদিকের দেওয়ালে অসংখ্য যন্ত্রপাতি আর তারের জাল আটকানো। আর জানলাগুলোর নীচে সারা ঘরটার চারিদিকে গোল করে লাগানো সানমাইকা বসানো টেবিল। সেই টেবিলের ওপরেও আছে নানা রকমের যন্ত্রপাতি। আর ঘরের মেঝেয়, প্ল্যাটফর্মের দু-পাশে দুটো খাট।

কংসনাশন একটা খাটের ওপর বসে বললেন, 'পাঁচু, তোর এই পিন্টুচরণ লোকটার দেখছি সব দিকে নজর। মহাশূন্যে বেড়াতে গেলে যদি ওভার নাইট জার্নি করতে হয়, তার জন্যেও ব্যবস্থা রেখেছে। আর কী আরামের খাট। এমন খাট কোত্থেকে পেলে হে, নেত্য?'

নৃত্যগোপাল করুণ চোখে তাকিয়ে বলল, 'কাকাবাবু!'

কংসনাশন চমকে উঠলেন। বললেন, 'ওঃ হো! ভুলেই গিয়েছিলুম। অ্যাই পাঁচু, তোর পাগলামি আর গেল না। এসব বন্ধ কর তো।'

পাঁচুগোপাল তেড়েফুঁড়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই ভেতরে নেমে এল পিন্টুচরণ। লাজুক হেসে নৃত্যগোপালকে বললে, 'ফুয়েল ভরে নিয়েছি। এবার আপনারা বাইরে যান, আমি টেস্ট ফ্লাইটের ব্যবস্থা করি।'

পাঁচুগোপাল হাত নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমরা সব বাইরে যাও তো।'

নৃত্যগোপাল বলল, 'আর তুমি?'

পাঁচুগোপাল মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি যাচ্ছি না।'

'সে কী! এখন তো টেস্ট ফ্লাইট হবে। তোমার তো এতে যাবার কথা নয়।'

পাঁচুগোপাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছেলেকে বললেন, 'এদিকে এসো তো একবার।

তোমাকে দুটো কথা বলি'— বলে তাকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'তোমার ব্যাবসা-বুদ্ধি হবে কবে? লোকটা যদি এখন নগেন্দ্রবালাকে নিয়ে কেটে পড়ে? তখন? তোমার সঙ্গে তো মোটে তিন বছরের চুক্তি। এই তিন বছর কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থেকে তারপর যদি বেরিয়ে আসে, তখন তোমার চুক্তির কোনো মূল্য থাকবে? তোমার টাকাকে টাকা তো যাবেই, ঘরে যা তুলবে ভাবছিলে, তার এক কানাকড়িও পাবে না। কিন্তু আমি যদি সঙ্গে থাকি তো, সে তো আর সম্ভব হবে না।'

নৃত্যগোপাল কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'তোমার কথা ঠিক। কিন্তু লোকটা তো তোমাকেও গুম করে দিতে পারে।'

পাঁচুগোপাল দুঃখের হাসি হাসলেন। বললেন, নিজের বাপকে এখনও চিনতে পারলে না, নেত্য! তাকে গুম করতে পারে, এমন মানুষ এখনও পৃথিবীতে জন্মায়নি।'

নৃত্যগোপাল মাথা নেড়ে বলল, 'তা না-হয় হল। কিন্তু উড়তে গিয়ে যদি যন্ত্রটা ভেঙে পড়ে, যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়?'— বলতে বলতে গলা ধরে এল।

'হলে হবে। এমনিতে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে না? যারা গাড়িতে চড়ে, তারা অ্যাক্সিডেন্টে মরে না? প্লেন, ট্রেন বাসের কথা না-হয় বাদই দিলুম। আর তা ছাড়া আমার তো বাপু পিন্টুচরণের যন্ত্রটা দেখে বেশ শক্তপোক্তই বলে মনে আছে। আমার মন বলছে, কিচ্ছু হবে না। তোমরা যাও, নিশ্চিন্ত মনে যাও।'

নৃত্যগোপাল চোখ মুছে বলল, 'ঠিক আছে, তোমার কথা কোনোদিন অমান্য করিনি, আজও করব না। চলুন, কাকাবাবু আমরা নীচে যাই। বাবা এখানেই থাকবেন।'

কংসনাশন গভীর ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে পাঁচুগোপালের দিকে তাকিয়ে রওনা হলেন। তাঁর মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোচ্ছিল না। এমন সময় পাঁচুগোপাল পেছন থেকে তাঁর জামার হাতা ধরে টানলেন। বললেন, 'দ্যাখ কংস, যদি সত্যি সত্যি আমার কিছু হয়, তুই নেত্যকে দেখিস। আমি জানি, তুই একটা বুদ্ধু, তাও বলছি...'

কথাটা পিন্টুচরণের কানে গেল। একগাল হেসে বলল, 'আপনার কিচ্ছু হবে না পাঁচুগোপালবাবু। আমি বলছি, আপনি এঁদের সকলের চেয়ে বেশি দিন বাঁচবেন, অনেক বেশি দিন বাঁচবেন।'

পাঁচুগোপাল সহাস্যে বললেন, 'তুমি থামো তো, ডেঁপো ছোকরা।'

সবাই নেমে এসে কিছু দূরে একসঙ্গে দাঁড়ালেন। ধর্মদাসের মুখে বিদ্রূপের হাসি, নৃত্যগোপালের চোখে জল। অ্যালুমিনিয়ামের ঝোলানো সিঁড়িটা আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গেল। প্লাস্টিকের ডোমটা একটা পাক খেয়ে বন্ধ হয়ে গেল। জানলাগুলোর মধ্যে দিয়ে দেখা গেল, পিন্টুচরণ শান্ত অবিচলিতভাবে এদিক-ওদিক ঘুরে কলকব্জা

নাড়াচাড়া করছে। একটু পরে সে ভেতরে চলে গেল। আর তাকে দেখা গেল না। তারপর নগেন্দ্রবালার ভেতর থেকে একটা ক্ষীণ মৌমাছির গুঞ্জনের মতো শব্দ শোনা গেল। আর প্রায় সঙ্গেসঙ্গে তার শরীরটা কাঁপতে শুরু করল। কাঁপুনিটা অবশ্য চোখে দেখা গেল না, কিন্তু পায়ের নীচে মাটির স্পন্দনে টের পাওয়া গেল।

হঠাৎ স্পন্দনটা বন্ধ হয়ে গেল। উপস্থিত দর্শকরা বিস্ফারিত চোখে দেখলেন, নগেন্দ্রবালার পায়া তিনটে আস্তে আস্তে গুটিয়ে তার পেটের মধ্যে ঢুকে গেল, অথচ তার শরীরটা যেখানে ছিল সেখানেই নিরলম্ব অবস্থায় রয়ে গেল। বোধ হয় কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই হঠাৎ সেই আঠেরো ফুট ব্যাসের ঝকঝকে গোলাকার বস্তুটি চক্ষের নিমেষে উল্কার মতো ওপরে উঠে গেল, আর দেখতে না-দেখতে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে হতে একটা বিন্দুর মতো হয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল।

পাঁচুগোপালবাবুর ঘোর কাটতে পাঁচ মিনিটটাক সময় লাগল। যখন পুরো সম্বিত ফিরে পেলেন, দেখলেন উনি অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্মের ওপর চেয়ারে সেফটি বেল্ট বাঁধা অবস্থাতেই বসে আছেন, মানে যে অবস্থায় উনি রওনা হয়েছিলেন আর কী। বাইরে তাকিয়ে দেখলেন, আকাশটা আর নীল নেই, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। সেই আকাশের একদিকে একটা নীলাভ সবুজ রঙের গোলাকার জিনিস ঘুরতে ঘুরতে দূরে সরে যাচ্ছে। উনি বিস্মিত হয়ে জিনিসটা দেখছিলেন, এমন সময় পিন্টুচরণের গলা শুনতে পেলেন।

পিন্টুচরণ বলছিল, 'পাঁচুগোপালবাবু, বলুন তো ওটা কী?'

পাঁচুগোপাল মাথা নেড়ে বললেন, 'বুঝতে পারছি না তো, ওটা কী!'

'ওই হল পৃথিবী। ওই দেখুন ভারতমহাসাগর আর ভারতবর্ষের উপকূল। চিনতে পারছেন? দেখুন, দেখুন কেমন সাদা সাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছে।'

পাঁচুগোপালবাবু ভালো করে দেখে বললেন, 'আরে, তাই তো! ভুগোলের ম্যাপে অমনই দেখায় বটে। ও পিন্টুচরণ, আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? আমরা সত্যি সত্যি মহাশূন্যে এসে গেছি?'

পিন্টুচরণ হাসল। বলল, 'মহাশূন্য আপনি কাকে বলেন, জানি না। তবে, পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে চলে এসেছি বটে। ওই দেখুন, চাঁদ। কেমন রুক্ষ, এবড়োখেবড়ো।'

'সত্যি তো। আমরা তাহলে সুন্দর মুখকে চাঁদপানা বলি কেন?'— বলে পাঁচুগোপাল মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন।

আরও প্রায় দশ মিনিট বাদে পাঁচুগোপাল চেঁচিয়ে বললেন, 'দ্যাখো, দ্যাখো পিন্টুচরণ, একটা লাল মতন গ্রহ আসছে। ওটা কী?'

পিন্টুচরণ বলল, 'ওটা মঙ্গলগ্রহ। ওটাতেও জনপ্রাণী নেই। রুক্ষ মরুভূমি। তবে ওটার বাতাসে সামান্য জল আছে। হয়তো শ্যাওলা জাতীয় কোনো কিছু থাকলেও থাকতে পারে। এবার ওই দূরের গ্রহটাকে দেখুন। কি বিশাল দেখেছেন? এর ব্যাস আপনার পৃথিবীর ব্যাসের দশ গুণের চেয়েও বেশি। ইনিই বৃহস্পতি। আর মিনিট পনেরোর মধ্যে আমরা ওঁর কাছে পৌঁছে যাব। তবে বেশি কাছে যাব না অবশ্য, গেলে উনি আবার আমাদের আদর করে টেনে নিতে পারেন। তাহলে কিন্তু বিপদ।'

পাঁচুগোপাল ছেলেমানুষের মতো বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ছিলেন, পিন্টুচরণের সব কথা তাঁর কানে ঢুকল কি না সন্দেহ। বললেন, 'কী অদ্ভুত রং বৃহস্পতির। আর ওটা কী? ওই যে লাল রঙের একটা মস্ত বড়ো কী এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে?'

ওটা বৃহস্পতির গ্যাসের আবরণের ওপর ভাসমান কঠিন পদার্থের একটা জমাট স্তর। ওটা পৃথিবী থেকেও দূরবিন দিয়ে দেখা যায়। ওটার নাম বৃহস্পতির রেড স্পট বা লাল দাগ। বেশি নয়, লম্বায় ওই দাগটা হল গে মাত্র তিরিশ হাজার মাইল আর চওড়ায় মাত্র সাত হাজার মাইল।'

শুনে পাঁচুগোপালের চোখ আরও গোলপানা হয়ে গেল। খানিকটা চুপ করে থেকে বললেন, 'এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এত বড়ো? আর আমরা? ছোটোর থেকে ছোটো, আর দ্যাখো, আমাদের বড়াইয়ের অন্ত নেই, অহংকারের অন্ত নেই, নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটিরও অন্ত নেই। নাঃ, তুমি আমার চোখ খুলে দিলে হে পিন্টুচরণ! ভাবছি, এত দিন কী বোকাই না ছিলুম! নিজেকে কত বড়োই না ভাবতুম!'

পিন্টুচরণ বলল, 'কেবল সৌরজগতের বৃহস্পতিকে দেখেই যদি এ কথা বলেন, এরপর যখন আপনাকে দেখাব মহাকায় কোয়াসার, যার কাছে এই গ্রহটি একটি ছোটো তিলের চেয়েও ছোটো, বা দেখাব দৈত্যাকৃতি যমজ তারা যারা পরস্পরকে ঘিরে ঘুরছে, তখন যে আপনি কী ভাববেন, কে জানে।'

'কী আর ভাবব? আমার ভাবনা করার ক্ষমতা চলে গেছে। আমি চুপ করে বসে শুধু দেখব। এত সৌন্দর্য, এত বিরাটত্বের কতটা নিজের ভেতরে নিতে পারব জানি না— আমি তো তোমার মতো লেখাপড়া বেশি করিনি। তা, এত সব দেখাবে কখন? আমাদের বাড়ি ফিরতে হবে না?'

পিন্টুচরণ হাসল। বলল, 'বাড়িই তো ফিরছি পাঁচুগোপালবাবু। ফেরার পথেই সব দেখাব আপনাকে।'

'বাড়ি ফিরছি কী হে? আমার তো মনে হচ্ছে, আমরা পৃথিবী থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। তাই না?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। বাড়ি আমরা ফিরছি বটে— তবে আপনার বাড়ি নয়, আমার বাড়ি।'

'তোমার বাড়ি? কোথায় তোমার বাড়ি? তুমি কে?'

'আমার বাড়ি আপনাদের ছায়াপথ নীহারিকার বাইরে অন্য এক নীহারিকায়। আপনারা তাকে বলেন অনুরাধা, আমরা বলি অ্যামিকি। সেই অ্যামিকি নীহারিকায় আপনাদেরই মতো এক সৌরজগৎ আছে। সেইখানে এক গ্রহে আমার বাড়ি। আমাদের গ্রহের নামের বাংলা করলে দাঁড়ায় শান্তি। আমি সেই শান্তি গ্রহের রাজকুমার পিন।'

'ও, তাই বলো। তাই তো বলি, পিন্টুচরণ কখনো কারও নাম হয়? তুমি নাম জিজ্ঞেস করাতে প্রথমে পিন বলে ফেলে তার পরে সামাল দিতে পিন্টুচরণ বানিয়েছিলে, তাই না?'

পিন্টুচরণ লাজুক হাসল। বলল, 'হ্যাঁ। ব্যাপারটা সেরকমই বটে।'

'তা, বাপু পিন। তুমি আমাদের পৃথিবীতে কী করছিলে?'

আমাকে আমাদের বৈজ্ঞানিক সংঘ পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল বুদ্ধিমান প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করতে। আমার মতে আরও অনেকেই নানা দিকে গেছে। কিন্তু আমার বেলা একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আমার মহাকাশযানটা পৃথিবীতে নামতে গিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর হঠাৎ বিকল হয়ে পড়ে ডুবে গেল। আমি অবশ্য নিরাপদেই বেরিয়ে এসেছিলুম, কিন্তু পড়ে গেলুম বিপদে। এখন দেশে ফিরি কী করে? একবস্ত্রে বেরিয়ে এসেছি— প্রায় অসহায়ই বলা চলে। তখন মনকে চালিয়ে টের পেলুম আমেরিকা আর রাশিয়া মহাকাশযান তৈরি করার তোড়জোড় করছে। রাশিয়াতে ভেড়া কঠিন, তাই আমেরিকার মহাকাশযানের কেন্দ্রে গিয়ে ভিড়ে গেলুম। তারা আমার জ্ঞান দেখে মুগ্ধ। আসলে, সেটা কিছুই নয়। দেখলুম, আমাদের দেশের ইশকুলের বাচ্চা ছেলেদের যা জ্ঞান, আপনাদের তাবড় তাবড় পণ্ডিতদের জ্ঞান তার চেয়েও ঢের ঢের কম।

ভিড়ে তো গেলুম, কিন্তু কিছুতেই সুবিধে করতে পারছিলুম না। যে সব ঢাউস ঢাউস মহাকাশযান তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে, তাতে কিসসু হবে না। সৌরজগতের বাইরে যেতেই আপনাদের বহু প্রজন্ম কেটে যাবে। তা আমার কথা কেউ কানেই তোলে না। তাই চুপচাপ কাজ করি আর এদিক-ওদিক মনকে চালাই। এই সময়ে মনের মধ্যে হঠাৎ টের পেলুম, আপনার বিজ্ঞাপনটার কথা। সঙ্গেসঙ্গে কলকাতায় রওনা দিলুম।

পাঁচুগোপাল বললেন, 'বেশ করলে। তারপর আমার ঘাড়ে বন্দুকটি রেখে একটি মহাকাশযান বানিয়ে ফেললে। তাতে অবশ্য ক্ষতি বিশেষ কিছু হয়েছে, তা বলতে পারছি না। কারণ, যে অভিজ্ঞতা হল, তা আমি জীবনে কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি। কিছু দিয়েই এর মূল্য ঠিক করা যায় না।'

পিন্টুচরণ হাত নেড়ে বলল, 'এ কিছুই নয়, পাঁচুগোপালবাবু। আমি বলছি,

আপনার জন্যে আরও বিস্ময়, আরও সৌন্দর্য অপেক্ষা করে আছে! যাওয়ার পথে আমরা প্রথমে যেখানে থামব, সেই গ্রহটি স্ফটিকের। তার আকাশে সাতটি সূর্য, সেখানে আপনি যা রং দেখতে পাবেন, তা আপনি কখনো দেখেননি। তারপরে যেখানে থামব...'

পাঁচুগোপাল বাধা দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন আমায় বলো দেখি, তুমি কি আমাকে ওই নমুনা না কী বললে, সেই বলে নিয়ে যাচ্ছ নাকি?'

পিন্টুচরণ ঘাড় নাড়ল। বলল, 'হ্যাঁ, পাঁচুগোপালবাবু। কিন্তু আপনার কোনোরকম অসম্মান করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তা ছাড়া আপনার চেয়ে ভালো নমুনা পাবই বা কোথায়? মানুষের যতরকম ইমোশান আছে, মানে রাগ, অভিমান, স্নেহ, ঈর্ষা, অনুরাগ সবই আপনার মধ্যে বেশি পরিমাণে আছে, অথচ আপনি সরল বলে সেসব মনের মধ্যে চেপে না-রেখে প্রকাশ করে ফেলেন। কাজেই আমাদের বৈজ্ঞানিকদের কাছে আপনি একটি অত্যন্ত মূল্যবান নমুনা হবেন, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। আপনি যদি স্বেচ্ছায় আজ আমার সঙ্গে না-আসতেন, তাহলে আমাকে শূন্য হাতেই ফিরতে হত সন্দেহ নেই, কিন্তু আপনাকে না-নিতে পারার দুঃখটা সারাজীবন রয়ে যেত।'

পাঁচুগোপাল বললেন, 'থাক, থাক, বুঝতে পেরেছি। তা তোমার গ্রহে যেতে কতদিন লাগবে?'

'আপনার ঘড়ি মতে ছ-মাস। মাঝে অবশ্য কয়েক জায়গায় থাকব। রসদ জোগাড় করতে হবে।'

'তারপর, তোমাদের বৈজ্ঞানিকরা কতদিন নেবেন?'

'বছর খানেক।'

'বেশ। তারপর দেশে, মানে পৃথিবীতে ফিরতে পারব তো?'

'হ্যাঁ, তা পারবেন। কিন্তু ফিরতে চাইবেন কি?'

'নিশ্চয়ই চাইব। তোমরা আমাকে যতই আরামে রাখো না-কেন, আমার নিজের বাড়ির আরামের মতো আরাম আমার কাছে আর কিচ্ছু নেই।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই। তবে কিনা, আপনি যখন পৃথিবীতে ফিরবেন, তখন দেখবেন আপনার বাড়িটা আর নেই।'

'কেন? নেই কেন? যাবে কোথায় বাড়িটা? জানো, এমন বাড়ি বানিয়েছি যে এক-শো এক-শো বছরেও তার কিছু হবে না?'

'জানি। কিন্তু এক-শো হাজার মানে এক লক্ষ বছরে কি হবে?'

'সে আবার কী?'

'আপনি যখন পৃথিবীতে ফিরবেন পাঁচুগোপালবাবু, তখন পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ

বছর পার হয়ে গেছে। আমরা এখন যে গতিতে চলেছি, তাতে আপনার ঘড়ির তুলনায়, পৃথিবীর ঘড়ি অনেক বেশি জোরে বনবন করে ঘুরে চলেছে। আপনি জানেন কি না জানি না, মহাজাগতিক সময় আর পার্থিব সময় এক নয়। আপনাদের শাস্ত্রকাররা কিন্তু এটা জানতেন। সেইজন্যে মহাভারতে আছে যে, ব্রহ্মালোকের এক অহোরাত্র পৃথিবীর বহু কল্পান্তের সমান।'

'বলো কী হে? এই যে আমরা মাত্র ঘণ্টাখানেক হল চলেছি, তার মধ্যেই পৃথিবীর অনেক সময় কেটে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'নেত্য যে কী করছে, কে জানে। ছেলেমানুষ।'

পিন্টুচরণ হাসল। বলল, 'দাঁড়ান, বলে দিচ্ছি'— বলে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইল। তারপর বলল, 'এই মুহূর্তে আপনাদের বাড়িতে বিরাট উৎসব হচ্ছে। শ্রীযুক্ত দ্যুতিমান রায়ের বড়ো ছেলে জমদগ্নি রায়ের নাতির আজ মুখে ভাত।'

পাঁচুগোপাল বিস্ময়কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'সে কী! একেবারে ছেলের ঘরে নাতি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বললুম যে, ওদের ঘড়ি আমাদের তুলনায় অনেক বেশি জোরে চলছে।'

'কেমন আছে নেত্য?'

'ভালোই আছেন। বয়সের তুলনায় বেশ শক্তপোক্তই আছেন। কিন্তু ওঁর স্ত্রী ভয়ানক মোটা হয়ে পড়েছেন। যে রাজহংসীকে আপনি কাঠির মতো রোগা দেখে এসেছিলেন, তিনি আজ অসম্ভব স্থূলকায়া হয়ে বাতে প্রায় পঙ্গু হয়ে শয্যাশায়ী! অবশ্য সেখান থেকেই তিনি গোটা সংসারটা চালাচ্ছেন। ছেলের বউরা সবাই তটস্থ হয়ে আছেন।'

পিন্টুচরণের কথা শুনতে শুনতে পাঁচুগোপাল তাঁর চেয়ারের ওপর আয়েস করে বসলেন। তাঁর মুখে একটা বিস্ময়মিশ্রিত তৃপ্তির হাসি। বললেন, 'এতক্ষণে বুঝলুম, কেন তুমি বলেছিলে আমি সকলের চেয়ে বেশি দিন বাঁচব। পিন, তুমি রাজপুত্তুর হতে পারো, কিন্তু একনম্বরের ডেঁপো।'

ভূত ভবিষ্যৎ

আমাদের পাড়ায় বাড়ি করা ইস্তক নিয়মিত আমাদের ক্লাবে আসেন এককালে এম পি আর বিখ্যাত উকিল চিত্তপ্রসাদ রায়। খিটখিটে বুড়ো, সারাজীবন রাজনীতি করে আর চোর-জোচ্চর ঘেঁটে ঘেঁটে মনে হয় সারা পৃথিবীটার ওপরেই হাড়ে হাড়ে চটে আছেন। কথাবার্তা প্রায় বলেনই না। সন্ধে বেলা এসে আর এক বুড়ো, ডাক্তার চন্দ্রমাধব চৌধুরির সঙ্গে দাবা খেলেন আর আমরা বেশি হইহল্লা করলে অত্যন্ত বিরক্ত চোখ করে তাকিয়ে থাকেন।

আমার বড়োমামাও উকিল। একদিন আমার কাছে আমাদের ক্লাবের গল্প শুনতে শুনতে চিত্তপ্রসাদ রায়ের নাম করতেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'চিত্ত উকিল তোদের ক্লাবে যান আর তোরা তাঁর জীবনের গল্পগুলো শুনিসনি এখনও? কী গাধা রে তোরা। উনি তো এখনও বার লাইব্রেরিতে গেলে সবাই আমরা সব কাজ ফেলে ওঁকে ধরি গল্প বলার জন্য।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'কিন্তু আমরা তো জানি বুড়ো ভয়ানক খিটখিটে। কথাই বলেন না প্রায়।'

বড়োমামা বললেন, 'খিটখিটে তো বটেই। কিন্তু ভালো করে যদি চেপে ধরিস, দেখবি কীসব অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ওর জীবনে ঘটেছে। সেগুলো সত্যি কী মিথ্যে জানি না, কিন্তু শুনতে বড়ো মজা লাগে।'

ভালো কথা। পরদিনই রায়মশাইকে চেপে ধরা হল। প্রথমটা দাবা খেলায় বাধা পড়ায় চটে গিয়েছিলেন খুব, কিন্তু পরে রাজি হলেন।

বললেন, 'কীসের গল্প আপনারা শুনতে চান?' উনি আমাদের সবাইকেই আপনি করে সম্বোধন করতেন।

আমরা সমস্বরে বললুম, 'ভূতের।'

উনি বললেন, 'বেশ। ভূতের গল্পই বলছি—'

অনেক দিন আগে, তা প্রায় পঞ্চাশ বছর তো হবেই, আমার সঙ্গে একটি ভূতের সাক্ষাৎ হয়েছিল। আজ্ঞে না, আমি গাঁজা খাই নে, তবে হ্যাঁ, আমার অভিজ্ঞতার কথাটা এতদিন কাউকেই বলে উঠতে পারিনি বটে। যদিও সাহস করে তখন বলে উঠতে পারলে আর সকলে সে কথাটা বিশ্বাস করলে, এ নিয়ে যে মহাহাঙ্গামা হয়েছিল সেসব কিছুই হত না। কিন্তু বলতে পারিনি, কারণ আমি ভালো করেই জানতুম যে আমার কথা কস্মিনকালেও কেউ বিশ্বাস করবে না, লালমুখো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তো না-ই। সে যুগে আমরা ভূতকে ভয় পেতুম না, যত-না পেতুম এইসব মহাপ্রভুদের। কাজেই চুপ করে ছিলুম।

তাহলে সে গল্প আজকে বলছি কেন? এ গল্প তো সেদিনও কেউ বিশ্বাস করত না, আজও কেউ করবে না। কিন্তু এর মধ্যে একটা তফাত আছে। আজ আমার কোনো কথাই কেউ বিশ্বাস করে না, বুড়োর মাথায় ভীমরতি হয়েছে বলে উড়িয়ে দেয়। এই তো সেদিন বড়ো ছেলেরে বউকে বললুম, 'বউমা, এই যে হরদম সিনেমা দেখে আর হোটেলে খেয়ে খোকার পয়সার শ্রাদ্ধ করছ, তা না-করে এবার কিছু কিছু জমাতে আরম্ভ করো! ওই তো তিনটে রক্ষেকালীর মতো মেয়ে, সকলেই তো বাপের রূপ আর তোমার গুণ পেয়েছেন। ওদের বিয়ে দিতে যে ভিটেমাটি বন্ধক দিতে হবে— সে কথাটা ভেবে দেখেছ?' বলতেই সে কী হুলুস্থুল বেধে গেল। পাশের ঘর থেকে শুনলুম আমার শ্রীমান বলছেন, 'আহা, অত আপসেট হওয়ার কী হয়েছে! বাবার ভীমরতি হয়েছে বই তো নয়! না-হলে নিজের অমন ফুটফুটে নাতনিদের কেউ অমন কথা বলে?' অর্থাৎ বাপের সুপুত্তুর আমার শ্রীমাই যখন সত্যি কথা বললে মেনে নেয় না, তখন আর অন্যে পরে কা কথা? কাজেই এখন আর ভয় পাইনে, যা বলব নির্ভয়ে বলব।

বলছিলুম, আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে আমার সঙ্গে একটি ভূতের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেটা ছিল কার্তিক মাস, সন্ধের দিকে ঘোর-ঘোর করে এসেছে, এমনি সময় ঠাকুরগঞ্জের বড়ো হাটের একটা চায়ের দোকানে— না, না, আমরা দু-জনে যে সেখানে চা খেতে ঢুকেছিলুম, তা নয়। ব্যাপারটা তাহলে একটু খুলেই বলি।

আমার তখন বছর চব্বিশ বয়েস। কলকাতা থেকে ওকালতি পাশ করে আমাদের গ্রাম দুসুতিতে এসে বসেছি। সকাল বেলা বারো মাইল দূরে জেলাসদর মাখলাগঞ্জে যাই, জজ কোর্টের বাইরে গাছতলায় বসে বসে মাছি তাড়াই। সন্ধে বেলা ফিরে এসে বাপের হোটেল। দু-একটা যা কেস আসে, তাই নিয়েই সারদিন মেতে থাকি।

আর করি কংগ্রেস। দেশের দুঃখদুর্দশা তখন মনকে বড়োই পীড়া দিতে শুরু করেছে, চিত্তে আর সুখ নেই। কাগজে কাগজে সাধারণ মানুষের দুরবস্থার কথা লিখি, কেউ ছাপে, কেউ ছাপে না। মোটামুটি নিস্তরঙ্গ জীবন, তবে মনে সব সময়েই আশা, কিছু একটা ঘটবে, এমন একটা কিছু যা জীবনটাকে উলটোপালটা করে দেবে।

সেইটেই ঘটে গেল সেই কার্তিক মাসে, ঠাকুরগঞ্জের বড়ো হাটে। সেই ভূতের সঙ্গে যদি দেখাটা না-হত, তাহলে আজ আমার কী অবস্থা হত, কে জানে।

যার ভূত, সে-ও বোধ হয় বুঝতে পারেনি যে ব্যাপারটা এরকম ঘটবে। বুঝতে পারলে হয়তো অন্যরকম ব্যবহার করত। তবে সে বেচারি বুঝবেই বা কোত্থেকে? সে তো ভূত, ভবিষ্যতের কথা তার জানার কথা নয়।

আসলে, তার সঙ্গে তো আমার শত্রুতা ছিল না, বরং আমি তার মানে তার ইহলোকের আত্মীয়দের উপকারই করতে গিয়েছিলুম। আর সেকথা যে সে জানত না, তাও নয়।

সে লোকটা যখন বেঁচেছিল, তখন তার সঙ্গে আমার বেশ ভাবই ছিল। লোকটার চেহারা ছিল দশাশই, মাথায় ঝাঁকড়াঝাঁকড়া চুল, চোখ দুটো দিনে-রাতে ভগবান জানেন কীসের ঘোরে লাল হয়েই থাকত; কুচকুচে কালো মুখে সেই লাল চোখ যেন জ্বলন্ত আগুনের ভাঁটা। ওর আসল নাম ছিল নকুল; কিন্তু সবাই ওকে ডাকত ভীমে বাগদি বলে। কিন্তু মানুষটা ছিল অত্যন্ত নিরীহ, কারোর সাতে-পাঁচে থাকত না। গাঁয়ের শ্মশানের পাশে তার বিঘে দুই জমি ছিল, নেহাত শ্মশানের পাশে বলেই বোধ হয় জমিদারবাবুর সেদিকে হাত পড়েনি, আর তার এক ধারে ছিল তার কুঁড়ে ঘর। ওই জমি থেকে সে যা পেত তাতে তার একার পেটই চলত না তো সংসার। বাকিটা সে এর-ওর মাল বয়ে, জমিদারবাবুর ফাইফরমাশ খেটে ভাগচাষ করে পুষিয়ে নিত।

কিন্তু লোকটার একটা দোষ ছিল। সে সবসময় সত্যি কথা বলত। অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করত, আমাদের মতো কাগজে ছদ্মনামে লিখে নয়, চিৎকার করে। সে কারণে সবাই তাকে অল্পবিস্তর সমঝে চলত। জমিদারবাবুর লাঠিয়ালরাও ভীমে বাগদিকে আসতে দেখলে রাস্তা ছেড়ে দিত। ওদের মুখেই শুনেছিলুম যে ভীমে নাকি একাই খালি হাতে পঁচিশটা লোকের মহড়া নিতে পারত। ক্ষ্যাপা মোষ আর ক্ষ্যাপা ভীমে নাকি একই স্তরে ভয়াবহ ব্যাপার ছিল।

ভীমের বউ কিন্তু হিড়িম্বা ছিল না মোটেই। সে ছিল শান্ত, নরমসরম, ভীরু প্রকৃতির মেয়ে। ভীমের সঙ্গে যে তার বয়সের বিরাট তফাত ছিল তা নয়, কিন্তু তাকে দেখাত অনেক কমবয়েসি। সে এত নীচু গলায় কথা বলত যে, মা-মাসিমারা বলতেন, 'ময়না বউ এত আস্তে কথা বলে যে অনেকসময় বোঝা যায় না সে কথা বলছে না-সুপুরি চিবুচ্ছে।' দুই ছেলে, এক মেয়ে আর স্বামীটিকে নিয়ে শান্তিতেই ছিল।

আমার কিন্তু খুব ছোটোবেলা থেকেই কেমন ধারণা ছিল যে ভীম হচ্ছে ডাকাত। পাড়ার সব ছেলেরই বোধ হয় সেরকম ধারণাই ছিল। কাজেই, ভীম যখনই আমাদের বাড়িতে আসত, আমি সুযোগ বুঝে তার কাছে গিয়ে আবদার ধরতুম, 'ভীমদা, একটা গল্প বলো না। তুমি রণ-পা চড়তে পারো?' ভীম ইঙ্গিতটা বুঝত। তারপর বানিয়ে বানিয়ে রোমহর্ষক সব

ডাকাতির গল্প বলত। গল্পের খোঁজ পেয়ে পাড়ার আরও ছেলেমেয়েরা জুটে যেত। আস্তে আস্তে আমাদের মনে ভীমে বাগদি একজন মহাবীর হিরোয় পরিণত হয়ে গেল।

বড়ো হয়ে যখন বুঝতে শিখলুম যে ভীম আসলে অত্যন্ত সৎ লোক, ডাকাতি তো দূরস্থান, না-খেপলে কোনো মারদাঙ্গার মধ্যেও থাকে না পর্যন্ত, তখন বোধ হয় একটু দুঃখই হয়েছিল। শত হোক একটা হিরো, সে কিনা জমিদারের কথায়ও লাঠি সড়কি ধরে না! কিন্তু তাকে কোনোদিন অশ্রদ্ধা করতে পারিনি। ভীমের এমন একটা ঋজু সারল্য অথচ দৃঢ় চরিত্রবল ছিল যে তাকে ভয় হয়তো আর করিনি, কিন্তু সম্ভ্রম করেছি।

আমার পিতৃদেব ছিলেন ডাক্তার, হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসা করে বেশ নাম করেছিলেন, ভালো পসার ছিল, অনেক দূরের গ্রাম থেকেও রুগিরা আসত। ফলে, প্রায় সারাবছরই আমাদের বাড়িতে দীয়তাং ভুজ্যতাং লেগেই থাকত। দুঃস্থ, নিরাশ্রয় আত্মীয়স্বজন সবসময় বাড়ি ভরতি থাকত। অনেক সময় তো আমাদেরই বাইরের ঘরে ফরাশ পেতে রাত কাটাতে হত। সেটা যে খুব মন্দ লাগত তা নয়, কিন্তু পড়াশুনোর বেজায় ক্ষতি হত।

তখন আমি একটা উপায় বের করলুম। ছুটিছাটার দিন হলেই বইপত্তর বগলে করে শ্মশানঘাটে চলে যেতুম। সেখানে নির্জন ঘাটে বসে পড়াশুনো করতুম। একেবারে তিনদিনের পড়া হয়ে যেত।

সেইসময় মাঝেমাঝে ভীম এসে আমার কাছে বসত। তখন পাশার দান উলটে গেছে। আমি তখন তাকে নানা দেশবিদেশের কথা, বড়ো বড়ো মনীষীদের কথা বলতুম, সে চুপ করে বসে বসে শুনত আর মাঝে মাঝে বিস্ময়মুগ্ধ চোখ তুলে আমার দিকে তাকাত।

আমি ওকে জিগ্যেস করেছিলুম, 'আচ্ছা ভীমদা, তোমার গায়ে এত শক্তি, তুমি সেটাকে কাজে লাগাও না কেন? এই জন না-খেটে তুমি যদি বাবুদের বাড়ি লেঠেলের কাজ নাও, তাহলে তো কত পয়সা রোজগার করতে পারো, জমিজমা করতে পারো। কিন্তু তা করো না কেন?'

ভীম শুনে মৃদু হাসত। বলত, 'দাদা, জীবনে পয়সা আর জমিজমাই কী সব? আমার যা দরকার সে তো ভগবান জুটিয়েই দেছেন, এর বেশি নিয়ে আমার কী হবে বলো তো? তার চেয়ে এই তো সুখে আছি। আর লেঠেলের চাগরি? সে আমার পক্ষে করা সম্ভবই লয়। বড়ো লোংরা কাজ গো দাদা! তুমি ছেলেমানুষ, জানবে কোথেকে। ওরা করে না দুনিয়ার হেন দুষ্কর্ম লেই।'

'আহা, ওরা তো নিজের ইচ্ছেয় করে না। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। জমিদার বলছে তাই করছে। দুষ্কর্মে পাপ যদি কিছু হয় তো সে জমিদারের, ওদের কী?'

'দাদা, জমিদার আমার জমির মালিক, সে তো দু-ছটাক মাটি বই লয়। কিন্তু, আমার মালিক অন্য। সে সবার মালিক, জমিদারেরও মালিক। যে জমিদার তার আপন মালিকের

কথাই শোনে না, সে জমিদারের কথা আমি শুনব কেনে? অমন জমিদারের চাগরি করতে আমার বয়ে গেছে।'

তা, এমন লোকের সে-যুগে, এবং এ-যুগেও, সমাজে নিশ্চিন্তে বাস করা সম্ভব ছিল না। যে কুসংস্কার আর অশিক্ষার নারকীয় আগুন সমাজকে ঘিরে পরমানন্দে জ্বলছিল, তাকে বুক ফুলিয়ে অমান্য করে গা বাঁচিয়ে থাকতে পারা কি সম্ভব? সে আগুনে হাত পুড়তে বাধ্য। আর হলও ঠিক তাই।

সেই আগুন যে বহন করে এনেছিল, সে দুসুতির জমিদার পঞ্চানন মল্লিকের ছোটোছেলে হরচন্দ্র মল্লিক। হরচন্দ্র আমার চেয়ে ছ-বছরের ছোটো ছিল, কিন্তু দুনিয়াদারিতে আমি ছিলুম তার কাছে শিশু। ষোলো বছর বয়সে তিনি মদ ধরেছিলেন, আঠারো বছর বয়েসে মণ্ডল পাড়ার সতীশখুড়োর কচি নাতবউটাকে ফুসলিয়ে বের করে কলকাতা পালিয়ে গিয়েছিলেন। হরচন্দ্রর মা কনকশশী যে কী মন্ত্রে সতীশখুড়োর মুখ বন্ধ করেছিলেন তা জানি না, তবে দু-মাস না-পুরোতেই সতীশখুড়ো আবার ধূমধাম করে নাতির বিয়ে দিলেন, তারপরে আবার হরচন্দ্র গাঁয়ে এসে উদয় হল। এল কিন্তু একাই; সঙ্গে যে মেয়েটি ছিল সারা গাঁ তার কথা একবার মনেও করল না। যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবেই হরচন্দ্র বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আর গাঁ-সুদ্ধ লোক আগুনে পুড়তে পুড়তেও চুপ করে বসে রইল, যেন সর্বস্ব না-পুড়ে যায় সেই আশায়।

ভীম কিন্তু খেপে গিয়েছিল। হরচন্দ্রর কান ধরে উঠোনে দশ পাক দৌড় করানো উচিত, সে-কথা দুমদুম করে গিয়ে বলে এল কনকশশীকে। কনকশশী বললেন, 'নিশ্চয়ই, দৌড় তো করানোই উচিত। তুই কিছু ভাবিসনি নকুল, আমি ওকে এমন শাস্তি দেব যা ও জীবনেও ভুলতে পারবে না।' ভীম শুনে খুশি হয়ে ফিরে চলে এল।

কনকশশী যে কী শাস্তি দিয়েছিলেন তা অবশ্য কেউ জানে না, তবে হরচন্দ্র বেশ দাপটের সঙ্গেই ঘোরাফেরা করতে লাগল। কিন্তু হরচন্দ্রের হাসিটা যেন আর আগের মতো লাগছিল না, কোথায় একটা গোলমাল হয়ে গেছে বলে নজরে পড়ছিল। তবে হরচন্দ্র গাঁয়ের কোনো ছেলের সঙ্গেই কথা বলত না আর আমরা সকলেই ওকে এড়িয়ে চলতুম বলে ব্যাপারটা কী হয়েছে তা তখুনি জানা গেল না।

জানা গেল মাসতিনেক বাদে।

সেদিন রাত অনেক হয়েছে। আমাদের খাওয়াদাওয়া শেষ। সকলেই শুয়ে পড়েছে, কেবল আমি জেগে জেগে একটা মামলার ব্রিফ তৈরি করছিলুম আর বাবা ভেতরের উঠোনে মোড়া পেতে বসে তামাক খেতে খেতে মার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। এমন সময় শুনতে পেলুম আমাদের চাকর তুলসী এসে বাবাকে বলছে, 'জমিদারবাবুর ছোটোছেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এয়েচেন।'

বাবার বিস্মিত গলা শুনলুম, 'জমিদারবাবুর ছেলে? এত রাতে!' বলে পায়ে খড়ম জোড়া গলিয়ে উঠে গেলেন।

অনেকক্ষণ বাদে খড়মের আওয়াজেই বুঝলম যে বাবা ফিরে এসে আবার মোড়ায় বসলেন।

মা-র গলা পেলুম, 'কীগো জমিদারবাবুর ছেলে এসেছিল কেন?'

বাবা চুপ।

মা আবার সেই প্রশ্নই করলেন, বাবা তখনও চুপ।

আমি আর থাকতে পারলুম না, জানলা দিয়ে উঁকি মারলুম। হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলোয় দেখি বাবার মুখ ঘৃণায়, লজ্জায় এবং বোধ হয় বিবমিষায় বিকৃত হয়ে গিয়েছে। কোনো প্রচণ্ড অন্তর্দাহে মুখ দিয়ে আর কোনো কথা সরছে না।

আমার বুকের ভেতরটা ধ্বক করে উঠল। হরচন্দ্র কী খবর নিয়ে এসেছিল? বাবা শান্তিপ্রিয়, ভীরু প্রকৃতির লোক ছিলেন; যেকোনোরকম গোলমাল সযত্নে এড়িয়ে চলতেন। জমিদারের সঙ্গে কাজিয়া করার কথা তো চিন্তাই করতেন না। তাঁকে জমিদারের ছেলে স্বয়ং গভীর রাত্রে এসে কী কথা বলে গেল, যাতে তাঁর মুখের ভাব এমন হতে পারে?

এর উত্তর পেলুম আরও সাতদিন পরে।

সেদিন ভোর বেলা অন্যান্য দিনের মতো সদরে রওনা হয়েছি। গ্রাম ছাড়িয়ে একটুখানি যেতেই দেখি উলটোদিক থেকে একটা ছোটোখাটো শোভাযাত্রা আসছে। রীতিমতো বাদ্যভাণ্ড সহকারে। দুটো ঢাকি, একটা সানাই বাজানেওয়ালা, একটা কাঁসি আগে আগে, তার পেছনে জমিদারের খাস লেঠেলদের একটা দল আর তাদের মাঝখানে নায়েব দেবনারায়ণ মিত্তির আর একজন দশাশই কাপালিক সন্ন্যাসী। নায়েব দেবনারায়ণকে দেখলে চিরকাল আমার ছুঁচোর কথা মনে পড়ে। বিনয়ে কুঁজো হয়েই আছেন, চিঁচিঁ করে ছাড়া কথা কন না, কিন্তু সুযোগ পেলেই গলায় দাঁত বসাতে কিছুমাত্র দ্বিধা নেই। কিন্তু সন্ন্যাসীকে দেখে মনে হল যেন সাক্ষাৎ যমদূত, ভক্তি হওয়া তো দূরস্থান, এঁকে দেখলে পুলিশ ডাকতে ইচ্ছে করে। এরকম ভয়াবহ, কদর্য, উৎকট চেহারা বড়ো একটা দেখা যায় না।

আমি রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়ালুম। ইতিমধ্যে দেবনারায়ণ আমাকে দেখতে পেয়েছেন। এগিয়ে এসে বললেন, 'এই যে বাবা চিত্তপ্রসাদ, সদরে চললে বুঝি?'

অনাবশ্যক প্রশ্ন। আমি উত্তর না-দিয়ে ঘাড় নাড়লুম।

নায়েবমশাই বলে চলেছেন, 'বেশ বাবা, এসো গিয়ে। তবে বেশি দেরি করো না যেন। একটু তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

আমি একটু বিস্মিত হয়ে জিগ্যেস করলুম, 'কেন?'

'বাঃ, আজ যে তোমাদের বাবুর বাড়ির নেমন্তন্ন।'

'কেন? কীসের নেমন্তন্ন?'

'বাঃ জানো না বুঝি? হরচন্দ্র বাবাজি যে আজ দীক্ষা নেবেন, তাঁর ধর্মকর্মে মতি হয়েছে। এই তো গুরুদেবকে নিয়ে যাচ্ছি। মস্ত বড়ো তান্ত্রিক সাধু, সম্প্রতি হিমালয় থেকে নেমে এসেছেন।'

হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো আমার কাছে সব রহস্য দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। হরচন্দ্র যে কী সংবাদ নিয়ে এসেছিল এবং কেন বাবার মুখ অমন বিকৃত দেখেছিলুম সে প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেল। আর সঙ্গেসঙ্গে আমার সর্বাঙ্গ একটা অসহ্য ঘৃণায় কন্টকিত হয়ে উঠল।

হরচন্দ্র যে সংবাদ নিয়ে এসেছিল, তা তার নিজের রোগের— সে রোগ উপদংশ। আর এ-ও বুঝলুম দীর্ঘস্থায়ী হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসার ওপর নির্ভর না-করে দ্রুত আরোগ্য হওয়ার আশায় সে যে পথ গ্রহণ করতে যাচ্ছে তার চেয়ে জঘন্য নারকীয় পথ আর দ্বিতীয় আছে বলে জানা নেই। সেইজন্যেই এই ধর্মকর্ম, সেইজন্যেই এই তান্ত্রিক বাবাজি।

আসলে, হরচন্দ্র যে পথ নিতে যাচ্ছিল সেটা কোনো একটা চিকিৎসাই নয়, সেটা আমাদের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত একটা বীভৎস কুসংস্কার। সেই কুসংস্কার বলে যে, উপদংশ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কোনো একটি নিষ্পাপ কুমারী মেয়ের সতীত্বনাশ করে তাহলে সে ওই রোগমুক্ত হতে পারে। কিন্তু সেটা ইংরেজ আমল, কথা নেই বার্তা নেই একটি কুমারীকে ধরলেই তো হল না। ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব ব্যাপারটা রোগের চিকিৎসা বলে নাও ধরতে পারেন; তা ছাড়া, লোক জানাজানিরও একটা সম্ভাবনা রয়েছে। তার বদলে যদি ধর্মের ভেক নিয়ে তার আড়ালে এই কুৎসিত অভিচার করা যায় তাহলে সাহেবকে বোঝানো যেতে পারে, লোকের সভক্তি শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করা যেতে পারে।

ভাবতে ভাবতে আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। এর কি কোনো প্রতিকার নেই? এই ভণ্ডামি, দুর্বৃত্ততা, ধর্মের নামে মহাপাপ বন্ধ করার কি কোনো উপায় নেই?

আমার এই প্রশ্নের মূর্তিমান উত্তর হয়ে সেদিন বিকেলে বাবা তাঁর পরিবারের সবাইকে নিয়ে মাখলাগঞ্জে এসে হাজির। জজ কোর্টে আমাকে খুঁজে বের করে বললেন, 'শোনো চিত্তপ্রসাদ, আমার শরীরটা ইদানীং ভালো যাচ্ছে না। তাই ভাবছি কিছুদিনের জন্য তোমাদের মামাবাড়ি থেকে ঘুরে আসব। জলবায়ুর একটা পরিবর্তন দরকার। তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে। তোমার জামাকাপড় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।'

বুঝতে পারলুম, এই দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটা যে কী সেটা বুঝতে বাবার বিন্দুমাত্রও অসুবিধে হয়নি এবং সেই কলুষিত অনুষ্ঠান বন্ধ করার কোনো উপায় না-পেয়ে তিনি

সেটা বর্জন করাই মনস্থ করেছেন। শরীর তাঁর বহুদিনই খারাপ, হঠাৎ আজকেই জলবায়ুর পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ল?

তবু আমি একটু আপত্তি করতে গিয়েছিলুম, কিন্তু বাবার রক্তচক্ষু দেখে আর কথা কইবার সাহস হল না।

মামাবাড়ি থেকে গ্রামে ফিরে এসে শুনি হুলুস্থুল কাণ্ড। ভীম খুন হয়ে গেছে, পুলিশ হরচন্দ্রকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের কথা শুনে হরচন্দ্রকে দায়রায় সোপর্দ করে দিয়েছেন, তবে তাকে জামিনও দিয়েছেন।

আমি ঘটনা শুনেই ছুটলুম ভীমের বাড়িতে।

গিয়ে দেখলুম ময়না বউ একেবারে পাথর; এমনিতেই আস্তে কথা বলে, তখন তো গলা দিয়ে কোনো শব্দই বেরুচ্ছে না। ময়নার দুটো ছেলে বাইরে বসেছিল, তাদের জিগ্যেস করলুম, 'কী হয়েছিল রে?'

তারাও চুপ। মনে হল, কেউ যেন তাদের গলা টিপে রেখেছে।

আমি আবার চাপাচাপি করতেই এবার ঘরের পেছন থেকে একটা পুরুষের গলা শুনতে পেলুম। যে লোকটি বেরিয়ে এল, তাকে আমি চিনতুম। সে ভীমের শালা, সুবল। জমিদারবাড়িতে সুবল লেঠেলের কাজ করত।

সুবল বলল, 'তুমি ঘরে যাও দাদা, কিচ্ছু হয়নি। ওরা ছেলেমানুষ, ওদের ওপর জুলুম করছ কেন?'

আমি বললুম, 'সুবল, আমি উকিল, তোমার ভগ্নীপোতের বন্ধু। সে খুন হয়েছে। সে খুনের কিনারা করার বা কেন খুন হয়েছে সেকথা জানার হক আমার আছে।'

সুবল মাথা নেড়ে বলল, 'তুমি উকিল হও আর যাই হও, তোমাকে তো এখানে কেউ ডাকেনি। তুমি তোমার নিজের কাজে করগে যাও। নকুল বদামি করতে গিয়ে ছোটোবাবুর ত্রিশূলে গেঁথে মারা গেছে। ছোটোবাবু শ্মশানে তপিস্যে করছিলেন, তাঁর ভৈরবীকে নকুল তুলে নিতে গেছল।'

সুবলের কথা শুনে আমার মাথায় রক্ত উঠে এল। চিৎকার করে বললুম, 'সুবল, তোর মুখ যে খসে যাবে রে, হারামজাদা। নিজের ভগ্নীপোতের সম্বন্ধে এত বড়ো মিথ্যে কথাটা বললি কী করে?'

সুবল হলদে ছোপধরা দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'সত্যি-মিথ্যে আদালতে প্রমাণ হবে গো দাদা। তুমি তো উকিল, সাক্ষী বোঝো? আমরা গাঁ সুদ্ধ লোক সাক্ষী, ছোটোবাবু দেবতুল্য মানুষ। আর নকা ব্যাটা তো ছোটোলোক, সে তাড়ি খেয়ে বে-এক্তেয়ার হয়ে বদামি করবে না তো করবে কে?'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'তোর বোনটা যে বিধবা হল, তার কথা ভেবেও কি তোর মিথ্যে কথাগুলো বলতে আটকাল না, সুবল?'

'হেঃ, আমার কথা কে ভাবে তার নেইকো ঠিক, তো বোন। তবে বোনের কথা ভেবেছি বলেই এতগুলো কথা বললুম। আর তুমিও তোমার নিজের কথা ভাবো গো দাদা, অন্যের বোন, অন্যের বিধবা বউয়ের কথা অত চিন্তা করোনি। বিপদে পড়বে।'

সেকথা আমারও অজানা ছিল না। কাজেই ভীমের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেলুম দুসুতি থানায়।

থানার অফিসার ইনচার্জ মহেশ ধর দেখি অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষ হয়ে বসে রয়েছেন। আমি গিয়ে ভীমের কথা পাড়তেই ফেটে পড়লেন। মহাচেঁচামেচি করে বললেন, 'যান মশাই, আপনারা মানুষ না অন্য কিছু? ভীমেকে আমি খুব ভালো করে চিনতুম আর ওই হরচন্দ্রকেও চিনি। সেই হরচন্দ্রকে বাঁচাতে আপনারা সকলে মিলে মিথ্যে সাক্ষী দিতে যাচ্ছেন? আপনাদের মশাই নরকেও স্থান হওয়া উচিত নয়।'

মহেশ ধরের তখন নিতান্তই অল্পবয়স, আমারই সমান হবেন, সদ্য চাকরিতে ঢুকেছেন। কাজেই তখনও তিনি ভয়ানক অন্যায় দেখলে বিচলিত হয়ে পড়তেন, অসংগত ব্যাপার দেখলে শোধরাবার চেষ্টা করতেন। এরকম একটা ব্যাপারে যে তিনি একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়বেন তাতে আর আশ্চর্য কী।

অনেক কষ্টে মহেশকে শান্ত করে জিগ্যেস করলুম, 'কী হয়েছিল, বলুন তো?'

গোমড়া মুখে মহেশ বললেন, 'কী আবার হয়েছিল। ওপারের চালতাডাঙা গাঁয়ের গোষ্ঠ ভটচাযের তেরো বছরের মেয়ে ছায়াকে তুলে এনে শ্মশানে ভৈরবী করে বসিয়েছিলেন হরচন্দ্র আর তার গুরুদেব। বুঝতেই পারছেন মেয়েটাকে বলি দেওয়ার কথা। সে বোধ হয় গোড়ায় সে কথাটা ধরতে পারেনি, পরে ব্যাপার বুঝে চান করার ফাঁকে দে দৌড়। কিন্তু সেই অজানা জায়গা, তার ওপরে শ্মশান, কতদূরে আর যাবে। ধরা পড়ে গেল, যখন ওকে জোর করে আবার ধরে নিয়ে যাচ্ছিল গুরু-শিষ্যে মিলে, মেয়েটা তখন চ্যাঁচাতে শুরু করে। ভীমে সেই চিৎকার শুনে মূর্তিমান বেরসিকের মতো সেই ভৈরবী-চক্রে এসে উপস্থিত। মেয়েটাকে নিয়ে ভীমে হয়তো চলে যেতেও পারত, কিন্তু বোধ হয় হরচন্দ্রকে একটু উপদেশ দেওয়ার আশায় এক মুহূর্তের জন্য ফিরে দাঁড়িয়েছিল, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই হরচন্দ্র ধুনির মধ্যে পড়ে থাকা লাল হয়ে ওঠা ত্রিশূলটা এক ঝটকায় ভীমের বুকে আমূল বসিয়ে দেয়। ভীমে এক হাতে মেয়েটাকে ধরে ছিল, তাই পুরো বাধাও দিতে পারেনি। সঙ্গেসঙ্গে মারা যায়।

ভীমের পেছনেই ছিল ওর বড়ো ছেলে মদন। সেই দৌড়ে এসে আমাকে খবর দেয়। আমি গিয়ে দেখি বাবাজি আর হরচন্দ্র ভাগলবা। ময়না সেই মেয়েটা আর ছোটো

ছেলেকে দু-হাতে আগলে স্বামীর দেহ পাহারা দিচ্ছে। দেখে আমার চোখে জল এল, জানেন, সেই ধুনির আগুনে সেদিন সেই নীচু জাতের গরিব মেয়েটার ভঙ্গিতে যেন সাক্ষাৎ ভগবতীর চেহারা দেখেছিলুম। সে দৃশ্য কোনোদিন ভুলব না।

ওদের কাছে সবকথা শুনে আমি তৎক্ষণাৎ জমিদার বাড়ি গিয়ে হরচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করলুম। কনকশশী ঠাকুরণ অনেক ভজানোর চেষ্টা করেছিলেন, এমনকী জড়োয়ার হারও অফার করেছিলেন, কিন্তু আমি ফিউরিয়াস। ধরে পরদিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সামনে খাড়া করে দিলুম। সাহেবও কেস দায়রায় পাঠিয়ে দিলেন।'

আমি জিগ্যেস করলুম, 'তারপর?'

'তারপর? তারপর আর কী? কনকশশী তাঁর ভেলকিবাজি দেখাতে শুরু করেছেন। গোষ্ঠ ভটচাযের কাছে গিয়েছিলুম। সে তো আকাশ থেকে পড়ল। বলল, আমার মেয়ে তো তার কনকপিসির বাড়ি বেড়াতে গেছে। সেখানে কিছুদিন থাকবে বলে। ইতিমধ্যে একদিন সে তার হারাদাদার সঙ্গে শ্মশানে বেড়াতে গিয়েছিল, সেখানে এক ব্যাটা মাতাল বাগদি তাকে আক্রমণ করে। ভগবানের অসীম দয়া যে সে ব্যাটা পা পিছলে একটা ত্রিশূলের ওপর পড়ে মারা যায়। তা না-হলে যে কী হত!

বুঝতেই পারছেন, কনকশশী আমার আগেই ওখানে পৌঁছে গেছেন। বাপের দরখাস্তের ওপর ছায়াকে ছেড়ে দিতে হল। সে এখন কনকশশীর কাছেই আছে। আর গোষ্ঠকে যদি দেখেন! তার গোয়ালে নতুন গোরু এসেছে, বাড়ির চালে নতুন খড় লাগছে, বউয়ের অঙ্গে নতুন শাড়ি! আবার শুনছি, কনকশশী নাকি তাঁকেই বাড়ির পুরোহিত করবেন।

কাজেই কিচ্ছু হবে না মশাই, কিচ্ছু হবে না। তবু, আমি লড়ে যাব। পাবলিক প্রসিকিউটার রমণীমোহন দস্তিদার কেস ওপন্ করবেন, তবে তাঁরও বিশেষ কোনো আশা নেই। সাক্ষী কোথায়? গাঁ-সুদ্ধ লোক সাক্ষী দেবে যে ভীমে ছিল পাজির পা ঝাড়া, কয়েক জন হয়তো প্রত্যক্ষদর্শীও জুটে যাবে।'

আমি জিগ্যেস করলুম, 'ময়না? সে কিছু বলবে না?'

'কোত্থেকে বলবে? দুই ছেলের গলায় তো শড়কি ঠেকান দেওয়া রয়েছে। আর, আপনি তো নিজেই দেখে এলেন। এ অবস্থায় সে কখনো সত্যি কথা বলতে পারবে মনে হয় আপনার? একমাত্র মদন আছে, ডাকাবুকো ছেলে। কিন্তু সে তো বাচ্চা ছেলে, হরচন্দ্রের ব্যারিস্টার রামজীবন মুখুজ্জের জেরার সামনে দাঁড়াতে পারবে?'

তা কি কখনো পারে? রামজীবন মুখুজ্জে হাসতে হাসতে কেসটাকে তছনছ করে দিলেন, সবাই অসহায়ভাবে বসে বসে তাই দেখল। মদনের দু-চোখ দিয়ে আগুন ঝরতে

লাগল, কিন্তু বৃথাই। ময়নার মুখ দেখে মনে হতে লাগল যেন একটু একটু করে তার প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। কারণ হয়তো তার মনেও ক্ষীণ একটা আশা ছিল, তা না-হলে সে রোজ এতটা পথ ভেঙে মামলা শুনতে আসবে কেন? আর, তার আরও কষ্ট হচ্ছিল বোধ হয় এই জন্যে যে এতগুলো লোকের সামনে তাকে মিথ্যে কথাগুলো বলতে হল যখন তার সমস্ত মন প্রাণ বোধ হয় হাহাকার করে সত্যি কথাগুলোই বলতে চাইছিল।

সাক্ষীসাবুদ শেষ হলে জজসাহেব যখন জুরিদের কেসটা বুঝিয়ে দিতে শুরু করলেন, তখনই বুঝতে পারলুম জুরিদের উত্তর কী হবে। আমি আর সেকথা শোনবার জন্যে অপেক্ষা না-করে বাড়ির দিকে রওনা দিলুম।

ঠাকুরগঞ্জ মাখলাগঞ্জ থেকে মাইল ছয়েক দূরে, আমাদের বাড়ি যাওয়ার রাস্তায় পড়ে। জায়গাটা খুব ছোটো, কয়েকটা মাত্র বাড়ি ছিল। তবে হপ্তায় দু-বার এখানে মস্ত হাট বসত রাস্তার ধরে, সে হাট বেশ বিখ্যাত ছিল। আর একটা জিনিস ছিল যেটা সে-যুগে এখনকার মতো দেদার দেখা যেত না, তা হচ্ছে একটা পার্মানেন্ট চায়ের দোকান। অবিশ্যি দোকান বলতে সাইনবোর্ড টাঙানো, চেয়ার টেবিলওয়ালা ঝকঝকে ঘর কিছু নয়, একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় ছোটো একটা খড়ের চালা আর তার সামনে দুটো লম্বা বাঁশের বেঞ্চি—এই। তবে হাটের দিন ছাড়াও, রোজই দোকানটা খোলা থাকত। কয়েকটি আধা-শহুরে খদ্দের ছিল, কখনো-সখনো দু-একজন গ্রাম্য ভদ্রলোক এখানে এসে বসতেন।

এই চায়ের দোকানেই আমার সেই অদ্ভুত অভিজ্ঞতাটা হয়েছিল।

আগেই বলেছি, তখন কার্তিক মাস, সন্ধে হয়ে এসেছে। আমি হাঁটতে হাঁটতে যখন দোকানটার সামনে এসে পড়েছি, হঠাৎ মনে হল কে যেন আমাকে ডাকল, 'চিত্ত দাদা গো!' গলার স্বর একেবারে ভীমে বাগদির মতো।

আমার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল।

ফিরে দাঁড়িয়ে যে দৃশ্য দেখলুম, তাতে শাস্ত্রমতে দাঁতকপাটি লাগা উচিত ছিল, নিদেনপক্ষে রাম নাম জপতে জপতে ভড়কানো ঘোড়ার মতো দৌড় লাগানো উচিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, স্পষ্ট মনে পড়ে, আমি মোটেই ভয় পাইনি। অবাক হয়েছিলুম, কিন্তু পালানোর কথা মনেই হয়নি।

দেখলুম, চায়ের দোকানের সামনের দুটো বেঞ্চির একটার ওপর ভীমই বসে রয়েছে। আধো অন্ধকারে ভুল দেখেছিলুম, তা নয়। কারণ ভীমের গায়ের কুচকুচে কালো রং কেমন যেন ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে লাগছিল, আর একটা অদ্ভুত নীলাভ রূপোলি আভায় তার সর্বাঙ্গ খুব অল্প চকচক করছিল। কাজেই তার মুখ-চোখ সবই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম, ভুল

হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। তা ছাড়া, তার উলটোদিকের বেঞ্চিতে যে তিন-চারজন খদ্দের বসেছিলেন তাদেরও চিনতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না।

আমি ফিরে দাঁড়াতেই ভীম বা ভীমের প্রেত হেসে উঠল। গলাটা চেরা চেরা আর ট্রাংককলে টেলিফোনের মধ্যে যেমন শোনায় তেমনই, কিন্তু ভীমের গলা তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হাসতে হাসতে ভীমে বলল, 'কী গো দাদা, মন খারাপ করে কোথায় চললে?'

আমি অবাক হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি দেখে ভীম আবার বলল, 'কী হল গো, দাদা? মদনের কষ্ট দেখে দুঃখ হয়েছে? ময়নার চোখে জল দেখে বুকে বেজেছে? দুঃখ করো কী দাদা! জগৎটা বড়ো সহজ লয় গো, তুমি ছেলেমানুষ, এতগুলো বদমাইশের সঙ্গে পারবে কেনে?'

আমি বলতে গেলুম, 'তোমার আর কী? তুমি তো মরে ভূত হয়েছ, বেঁচেছ। কিন্তু আমার তো পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়নি। আমার বুকে জ্বালা ধরবেই; তার তুমি বুঝবে কী?'

কিন্তু তার আগেই শুনি ভীম আবার হাসছে। বলল, 'ভাবছ আমার রাগ হয় না? হয় দাদা, হয়। মায়ার বাঁধন কি অত সহজে কাটে? তবে কিছু করিনে কেন? ওই যে, জন্ম-জন্মান্তরের শিক্ষে, ভগমান আছেন। দুষ্টু লোকের শাস্তি দেবেন উনিই, তাই অপিক্ষে করে থাকি। তবে ওঁর শাস্তি তো আমাদের শাস্তির মতো লয়। কোথা দে আসে কোথা দে যায়, অনেক সময় বোঝাই যায় না। লয়তো, এই যে এত বড়ো একটা অন্যায় হল, তার কেষ্ট-বিষ্টুদের একবার দ্যাখো। বাজনা বাজিয়ে নাচতে নাচতে আসছে। আর ওই দ্যাখো, নাটের গুরু হরচন্দর আর তা মা জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে ইদক পানে আসছে। কী ফূর্তি! গাড়ি চালাচ্ছে হরচন্দর নিজে আর চাবুক চালাচ্ছে ঘোড়াগুলোর ওপর অনবরত। লোকটা পশু হে, পশু।'

ভীমের কথা শুনে আমি মাখলাগঞ্জের দিকে তাকালুম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলুম না। আবার শুনি মৃদু হাসির শব্দ। ভীমে বলল, 'একটু মজা করব গো, দাদা। ঘোড়া দুটোকে একটু উসকে দেব। যা চাবুক খেয়েছে, তাতে ওদের একটু বেতালা নাচা দরকার।'

ভীমের কথার মধ্যেই শুনতে পেলুম প্রচণ্ড জোরে ছুটে আসা ঘোড়ার খুরের দূরাগত শব্দ। একটু বাদেই সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দুটো পর্বতাকার ওয়েলার ঘোড়ার অবয়ব ফুটে উঠল। উন্মত্তের মতো ছুটে আসছে তারা, মুখ দিয়ে উঠছে সাদা ফ্যানা আর তাদের সঙ্গে লাগানো জুড়ি গাড়িটার কোচোয়ানের সিটে বসে তাদের পিঠে পৈশাচিক হিংস্র আনন্দে চাবুক চালাচ্ছে হরচন্দ্র। ভেতরে ছিলেন কনকশশী, তাঁকে অবশ্য দেখা যাচ্ছিল না।

গাড়িটা যখন হাটের কাছাকাছি চলে এসেছে, হঠাৎ ভীমে উঠে দাঁড়াল। তারপর গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত হ্যা হ্যা হ্যা আওয়াজ করতে করতে ছুটে গেল গাড়িটার দিকে। আমার

তৎক্ষণাৎ মনে হল, আরে লোকটা তো এখুনি চাপা পড়ে গুঁড়ো হয়ে যাবে; সে যে ভূত সেকথা মনেই পড়ল না। তাই আমিও তার পিছু পিছু 'আরে, আরে, এই, এই' করতে করতে দৌড়লুম। কিন্তু সেটা বোধ হয় কয়েক পা মাত্র।

পরমুহূর্তেই দেখলুম, আমার চোখের সামনে প্রকাণ্ড ঘোড়া দুটো আকাশ ফাটানো ভীষণ ভয়ার্ত চিৎকার করে শূন্যে লাফিয়ে উঠল। তার পরেই গাড়িসুদ্ধ পাশের নয়নাজুলির মধ্যে গিয়ে আছড়ে পড়ল।

হরচন্দ্র আর কনকশশীর তালগোল পাকানো দেহ দুটো যখন গাড়ির তলা থেকে বের করা হল, তখন তাদের আর চেনা যায় না। ওরকম বীভৎস ভয়ংকর মৃত্যু তার পরে বা আগে আর কখনো দেখিনি!

তার পরদিন ভোর বেলা পুলিশ এসে আমাকে গ্রেপ্তার করল। অভিযোগ কী? না, আমি নাকি শত্রুতার বশবর্তী হয়ে ছুটন্ত ঘোড়ার সামনে দৌড়ে গিয়ে তাদের চমকে দিয়েছি আর তারই জন্যে তারা খানায় পড়ে কনকশশী আর হরচন্দ্রের মৃত্যু ঘটিয়েছে। এটা নাকি আমার পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফল। তা না-হলে যে আদালতের শেষ পর্যন্ত রোজ বসে থাকতুম, সেদিন, যেদিন রায় বেরুবার দিন, শেষপর্যন্ত না-থেকে হঠাৎ সাত-তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে আসব কেন? ঠাকুরগঞ্জের চায়ের দোকানের মালিক গুপিকান্ত আর তার চার-পাঁচজন খদ্দের বলেছে যে সেদিন সন্ধে বেলা আমি এসে দোকানের সামনে কিছুক্ষণ চুপটি করে দাঁড়িয়েছিলুম, যেন কারও অপেক্ষা করছিলুম। আর যেই জুড়ি গাড়িটা দেখা দিয়েছে, অমনি 'এই এই, আরে-আরে' করে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে তার সামনে দৌড়ে যাই। তারপরেই ঘোড়া আর গাড়ির খানায় পতন হয়। অতঃপর প্রশ্ন, কনকশশী আর হরচন্দ্রের সঙ্গে আমার কী শত্রুতা থাকতে পারে? তারও উত্তর পাওয়া গেছে। মৃত নকুল বাগদির স্ত্রী ময়নার প্রতি নাকি আমার কু-দৃষ্টি আছে। সুবল সেরকমই ইঙ্গিত দিয়েছে, আর তারই জন্যে ময়নাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যেই আমার এই ভয়ংকর অভিমান।

আমি মহেশ ধরকে বললুম, 'এরচেয়ে হাস্যকর কথা আর কিছু হতে পারে?'

মহেশ বললেন, 'আমি কী বলব বলুন? হাস্যকর অভিযোগ হোক বা না-হোক, আমি নাচার। জমিদারমশাই স্বয়ং সদরে গিয়ে বড়োকর্তার কাছে অভিযোগ লিখিয়েছেন; আমি তাঁর নির্দেশে এসেছি। তবে অভিযোগটা যদি সত্যি হয়, আমি বলব, শাবাশ!'

আমি বললুম, 'বলবেন না, শাবাশটা বাজে খরচা হবে।'

কেস উঠল জেলা জজ সিসিল অ্যামব্লার সাহেবের এজলাসে। অ্যামব্লার সাহেব দুদে সাহেব। প্রকাণ্ড লাল মুখটা যেন সবসময় রেগে টং হয়েই আছে। তাঁকে কেউ

কোনোদিন হাসতে দেখেনি, এমনকী মেমসাহেবের সঙ্গে বেড়াবার সময়ও মুখের ভাব নরম হতে দেখেনি। এ হেন সাহেবের কাছে ভীমের ভূতের কথা বলার কোনো মানে হয়? ফাঁসি তো দেবেই, তার আগে হয়তো পাগলা গারদে পাঠাবে। তার বদলে অন্য কথা ভাবতে হবে।

বাবা আমার উকিল লাগিয়ে ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত সনাতন সিংগিকে।

সনাতন বললেন, 'হুজুর! আমার দু-চারটে ঘোড়া দেখা আছে, আপনারও যে নেই তা নয়। এখন বলুন তো, ছুটন্ত ঘোড়ার সামনে একটা লোক যদি দৌড়ে যায়, সে কি ভয় পেয়ে লাফিয়ে ওঠে, না পিষে ছুটে চলে যায়? আসলে, আমার মক্কেল ঘোড়া দুটোকে লাফিয়ে উঠতে দেখে ছুটে গিয়েছিল গাড়ির আরোহীদের বাঁচানোর জন্যে। ঘটনাটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে যায় যে চায়ের দোকানের খদ্দেররা ঠিক বুঝতে পারেনি যে ঘোড়া লাফানোর পরে সে দৌড়িয়ে ছিল। তারা আবছা অন্ধকারে ভেবেছিল যে সে দৌড়োনোর পরে ঘোড়া লাফিয়েছিল।'

অর্থাৎ ধপ করে পড়েছিল, না পড়ে ধপ করেছিল?

পাবলিক প্রসিকিউটার ব্রজেন্দ্রনাথ দাস বললেন, 'হুজুর, আমার পরম পণ্ডিত বন্ধু ঘোড়া সম্পর্কে যা বললেন, আমি তা মেনে নিতে পারছি না। তিনি যে ঘোড়া দেখেছেন তা কলকাতার ঘোড়া। তারা ছুটন্ত লোক দেখলে ভয় পায় না। কিন্তু নিহতদের ঘোড়া দুটো গ্রাম্য ঘোড়া। তারা ভয় পেতেই পারে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

আদালত ঘোড়ার আলোচনায়, সমালোচনায়, ব্যাখ্যায় যেন আস্তাবলে রূপান্তরিত হল। অ্যামব্লার সাহেবের মুখ লাল থেকে আরও লাল হতে হতে যখন ফাটো ফাটো হয়েছে, তখন দুই উকিল তাঁদের বক্তব্য শেষ করলেন।

পরদিন রায়।

আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল দুটি। প্রথম, ইচ্ছাকৃত নরহত্যা, নিহত হরচন্দ্র। দ্বিতীয়, অনিচ্ছাকৃত নরহত্যা, নিহত কনকশশী। অ্যামব্লার সাহেব প্রথম অভিযোগ থেকে আমাকে অব্যাহতি দিলেন বটে, কিন্তু দ্বিতীয় অভিযোগে সাত বছর শ্রীঘর বাসের আদেশ দিয়ে বসলেন।

বাবা বললেন, 'আমরা আপিল করব।' সনাতনও সজোরে মাথা নাড়লেন।

কিন্তু তখন আমার কীরকম একটা নির্বেদ উপস্থিত হয়েছিল। আমি বললুম, 'কী লাভ হবে আমাদের আপিল করে? আমি এটুকু বুঝেছি যে সমাজে সৎভাবে, অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই করে, বাঁচতে হলে যা দরকার তা হল প্রচুর টাকা। এত টাকা যা অন্যায়কারীর টাকার চেয়েও বেশি। তা তো আপনার নেই। আপনি যদি আরও লড়াই করতে চান, তাহলে আপনার যা অছে সেটুকু তো যাবেই, হয়তো বাড়ি ঘর ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হবে।

তার চেয়ে বরং আমাকে জেলেই যেতে দিন। সাতটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। জীবনে সাতটা বছরের কী দাম আছে?'

বাবার আদালতে সেবার আমার আপিল ডিগ্রি পেয়ে গেল।

কিন্তু, এই জেলে যাওয়াই আমার সমস্ত জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। এখানেই আমার সক্রিয় রাজনীতিতে দীক্ষা, রাজনৈতিক কার্যকলাপের আরম্ভ। আজ যে আমাকে সকলে দেশনেতা বলে মানে, সেই নেতৃত্বের দিকে প্রথম পদক্ষেপ এই জেলেই।

দু-বছর সাজা মুকুব হয়ে পাঁচ বছর বাদে যখন জেল থেকে বের হলুম, তখন আমি একজন শুধু রাজনীতিবিদই নয়, একজন হবু অতিশয় বিখ্যাত আইনজ্ঞও বটে; বলা বাহুল্য, আমার এই দুটো পরিচয়ই ছিল পরস্পর নির্ভরশীল।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। হাতকড়া পরিয়ে যেদিন আমাকে প্রথম জেল গেটে ঢোকানো হচ্ছিল, সেদিন হঠাৎ চোখ পড়ে গেল গেটের ধারে একটা বটগাছের তলায়। দেখি, ভীম দাঁড়িয়ে আছে। সেই ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে রং আর সর্বাঙ্গে একটা চকচকে নীলাভ রুপোলি আভা। করুণ মুখে ভীম আমার হাতকড়ার দিকে তাকিয়ে ছিল, কিন্তু মুখ তুলে যখন আমার মুখের দিকে তাকাল, তখন যেন মনে হল তার দু-চোখে একটা অদ্ভুত আলো চকচক করছে।

দেখে প্রথমে তো রাগে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। কেন বাপু! তোমার জন্যেই তো আমার আজ এই দশা! কিন্তু একটু পরেই রাগটা চলে গেল। মনে মনে ভাবলুম, রাগ করে আর কী হবে? ভীম কী আর জেনে করেছে কিছু? ভূত যদি ভবিষ্যতের কথা জানতই, তাহলে তো কথাই ছিল না।

আজও মাঝে মাঝে সেই অদ্ভুত আলোটার কথা মনে পড়ে আর ভাবি, ভীম কী সত্যিই ভবিষ্যতের কথা কিছু জানত না?

আতঙ্কের অবসান

মাঘ মাসের সন্ধে বেলা এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ফলে ঠান্ডাটা যা পড়েছে তা আর কহতব্য নয়। ক্লাবঘর প্রায় ফাঁকা, কেবল আমাদের মতো গুটিকয় পাঁড় আড্ডাবাজ ছাড়া। কিন্তু যা ঠান্ডা, তার মধ্যে আড্ডাটা ঠিক জমছিল না। এমনসময়, যেন আমাদের সকলের নীরব প্রার্থনার জোরেই, মাংকি ক্যাপ, গ্রেট কোট আর ছাতা সহ চিত্তপ্রসাদবাবু এসে ক্লাবঘরে ঢুকলেন। বৃদ্ধ উকিল, এককালে ইনি প্রচণ্ড দাপটের সঙ্গে ওকালতি আর রাজনীতি দুটোই সমানে চালিয়ে গেছেন। আজ বহুবছর হল, দুটো থেকেই অবসর নিয়েছেন। সকাল বেলা ভাগবত পাঠ আর সন্ধে বেলা আমাদের ক্লাবে দাবা, এই এখন ওঁর নিত্যকর্মপদ্ধতি।

চিত্তপ্রসাদবাবু ঘরে ঢুকেই অসন্তুষ্ট গলায় প্রশ্ন করলেন, 'একী, বাকি সবাই কোথায়? একটু ঠান্ডা পড়েছে কি না-পড়েছে, অমনি লেপের গর্তে গিয়ে সেঁধিয়েছে বুঝি?'

সোমেশ বলল, 'কেন রায়সাহেব, আমাদের কি আপনার যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে না?'

'একেবারেই না। এসেছিলুম দাবা খেলব বলে অথচ...'

আমি বললুম, 'একদিন দাবা না-খেললে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। আপনি বসুন, চা খান আর আমাদের একটা গল্প বলুন।'

চিত্তপ্রসাদ একটা ইজিচেয়ারের ওপর বসতে বসতে বললেন, 'জানতুম, আমি জানতুম।'

'জানবেনই তো। আপনার মতো এমন রোমাঞ্চকর জীবন তো সকলের হয় না। তা, সেসব অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাইব, এতে অন্যায়টা কী?'

'চিত্তপ্রসাদ মাথা নেড়ে মৃদু হেসে বললেন, 'না, অন্যায় নয়। তবে কিনা, বুড়ো হয়ে পড়েছি— সবকথা সবসময় মনে থাকে না। আচ্ছা, ঠিক আছে, বলব গল্প। বলুন, কীসের গল্প শুনতে চান।'

সোমেশ বলল, 'আচ্ছা রায়সাহেব, আমরা শুনেছি আপনার দুর্দান্ত সাহস, কোনো কিছুতেই আপনি ভয় পান না....'

চিত্তপ্রসাদ বাধা দিলেন। বললেন, 'ভুল শুনেছেন। ভয় আমি বহুবার পেয়েছি, প্রচণ্ড ভয়ও পেয়েছি। বুদ্ধিমান লোক মাত্রেই ভয় পেয়ে থাকেন, যখন তিনি বিপদের গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে পারেন। সেই ভয়কে জয় করে বিপদের মুখে এগিয়ে যাওয়ারই নাম সাহস। কোনো কিছু না-বুঝে দুম করে এগিয়ে যাওয়ার নাম গোয়ার্তুমি বা বোকামি।'

সোমেশ বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই। তবে আমি বলছিলুম কী, এমন কোনো ঘটনা কি আপনার জীবনে ঘটেছে, যখন বিপদ কেটে গেছে, ভয়ের কোনো কারণ নেই, তখনই আপনি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন?'

চিত্তপ্রসাদ তাঁর চশমার মোটা লেন্সের ভেতর দিয়ে ঘোলাটে চোখে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে সোমেশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'আপনি কী বলতে চাইছেন আমি যে সঠিক বুঝেছি তা বলতে পারি না। তবে একটা ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছে, যেটা হয়তো আপনি যেরকম বলছেন, অনেকটা সেরকমই হবে। সেই কাহিনিই আপনাদের বলি শুনুন—

আজ থেকে বছর চল্লিশ আগেকার কথা। সালটা উনিশ-শো তেতাল্লিশ কী চুয়াল্লিশ হবে, আমার সঠিক মনে নেই। সেইসময় আমাকে একবার যেতে হয়েছিল মুর্শিদাবাদ আর বীরভূমের বর্ডারে আমলকী বলে একটা গ্রামে। আমার দুটো উদ্দেশ্য ছিল সেখানে যাওয়ার—একটা প্রকাশ্য অন্যটা অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য কারণ ছিল, আমার সিনিয়ার মৃগাঙ্কবাবুর এক মক্কেলের সঙ্গে দেখা করা আর অপ্রকাশ্য কারণটা ছিল একটা রাজনৈতিক কর্তব্য গোপনে সম্পন্ন করা। দ্বিতীয় কারণটা সম্পর্কে আরও একটু বিশদভাবে বলা দরকার।

মৃগাঙ্কবাবুর যে মক্কেলের সঙ্গে আমি দেখা করতে যাচ্ছিলুম, তিনি আমলকী গ্রামের একজন বর্ধিষ্ণু বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর জমিজমা তো ছিলই, তা ছাড়া নানারকম ব্যাবসাপাতিও ছিল। কিন্তু ভদ্রলোক প্রায় নিরক্ষর ছিলেন। ফলে, তাঁর মধ্যে আরও একটা জিনিস জন্মেছিল, যাকে বলতে পারেন, শিক্ষার প্রতি প্রচণ্ড অনুরাগ। তাঁর বাড়ি ভরতি অজস্র বই, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি থাকত, আর তাঁর দুই পুত্রবধূর নিয়মিত কর্তব্য ছিল, দু-বেলা সেইসব বই পড়ে শোনানো এবং তাদের গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করা। বুঝতেই পারছেন, তিনি তাঁর দুই ছেলেকেই উচ্চশিক্ষিত করেছিলেন আর পুত্রবধূদেরও এনেছিলেন লেখাপড়া জানা দেখেই। সেই ভদ্রলোকের নামও হয়তো আপনারা শুনে থাকতে পারেন। কলকাতার প্রভাময়ী গার্লস হাই স্কুল আর বহরমপুরের দিগ্বিজয় বয়েস স্কুল এঁরই প্রতিষ্ঠিত। ভদ্রলোকের নাম দিগ্বিজয় রায়।

আগেই বলেছি, ভদ্রলোকের দু-টি ছেলে। বড়োটি, অজয় রায়, কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন আর ছোটোজন, কাশীনাথ, ছিলেন পাটনার জনসন কলেজের অধ্যাপক। দু-জনেই প্রচণ্ড পণ্ডিত আর ভেতরে ভেতরে তেমনই দেশপ্রেমী। তাঁদের দেশপ্রেম মিটিংয়ে যাওয়া, বক্তৃতা শোনা আর স্লোগান দেওয়ার মধ্যে ছিল না। কাশীনাথ নানারকম বইটই পড়ে নিজের হাতেই পাটনার একটা ছাপাখানা বানিয়ে নিয়েছিলেন। অজয় অগ্নিবর্ষী সব প্রবন্ধ লিখতেন, কাশীনাথ ছাপতেন আর আমাদের পার্টির অফিসে দফায় দফায় সেইসব কাগজ নানা পোস্ট অফিস থেকে ডাকে পাঠাতেন। আমরা প্রথমটা তাঁদের চিনতুমই না, নামও জানা ছিল না। কিন্তু সেসব লেখা পড়ে বাঘা-বাঘা বিপ্লবীরও পিলে চমকে উঠত আর দেখতে-না-দেখতে সব বিলি হয়ে যেত, অফিসে পড়তে পেত না। সেসব লেখার কোনোটা যদি কোনো স্বদেশি কাগজ সাহস করে ছাপত তো তৎক্ষণাৎ পুলিশ এসে মহাহাঙ্গামা বাধিয়ে সম্পাদককে বগলদাবা করে নিয়ে যেত। কাজেই এসব প্রবন্ধের লেখকের সম্বন্ধে আমাদের যে একটা প্রবল কৌতূহল ছিল, তা তো বুঝতেই পারছেন।

এ লেখাগুলো যে মাঝে-মাঝে আমলকী থেকে আসে, সে খবরটা যে কী করে আমরা পেয়েছিলুম সেকথা আজ আর মনে নেই। তবে খবরটা পেতেই আমাদের পার্টির কর্তাব্যক্তিরা আমাকে ডেকে বললেন, 'তুমি পত্রপাঠ ওখানে চলে যাও। খোঁজখবর নিয়ে দ্যাখো যে লেখককে খুঁজে পাও কি না।'

এখন প্রশ্ন উঠল, আমার একা যাওয়া সংগত কি না। যেমন আগুনের মতো লেখা, লেখকের স্বভাবও যদি তেমনই হয় তাহলে তাকে একা মোকাবিলা করতে যাওয়াটা উচিত হবে না বলেই সকলের মনে হল। যদি কোনোরকম ভুল বোঝাবুঝি হয় বা আমার সদুদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর মনে যদি কোনোরকম সন্দেহ জাগে, তাহলে কি সেই ভ্রম বা সন্দেহ নিরসন করার সুযোগ পাওয়া যাবে? তার চেয়ে সঙ্গে আর-একজনকে নিয়ে যাওয়াই ভালো।

কিন্তু, যাবে কে? আর কী হিসেবেই বা যাবে? আমি তো জুনিয়ার উকিল, যাচ্ছি মক্কেল দিগ্বিজয়বাবুর কাছে। এমন কে বেকার বসে আছে যে তস্য জুনিয়ার হয়ে ঘুরে বেড়াতে রাজি হবে?

তা, তেমন একজন লোকও পাওয়া গেল। তার নাম চন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি। শোভাবাজার বোমার মামলার একজন আসামি, জেল ভেঙে পালিয়ে আমাদের পার্টি অফিসে গা ঢাকা দিয়ে বসেছিল। কোনো কাজকর্ম নেই, দিনরাত মুড়ি খায় আর হারমোনিয়াম বাজিয়ে হিজিবিজি গান গায়। সবাই তিতিবিরক্ত। কর্তারা বললেন, তুমি চাঁদুকে নিয়ে যাও।

কিন্তু যাও বললেই তো আর নিয়ে যাওয়া যায় না। চাঁদুর চেহারাটা এমন যে, দিনের

বেলা রাস্তায় বেরোলেই পুলিশ ক্যাঁক করে ধরে ফেলবে। ছ-ফুটের ওপর লম্বা, টকটক করছে ফর্সা গায়ের রং, প্রকাণ্ড চওড়া কাঁধ, আর হাতদুটো যেন দুটো থাবা। একে বাংলাদেশের একটা গণ্ডগ্রামে কোন ছদ্মবেশে নিয়ে যাই? চাকর সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে না, আমার ভাই হিসেবে নিয়ে গেলে কেউ বিশ্বাসই করবে না, মেয়ে সাজাব তার উপায় নেই। শেষপর্যন্ত ঠিক হল, ওকে আমার এক আর্টিস্ট বন্ধু সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। নাম ঠিক হল, অমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এতদিন শহরে বসে বসে ছবি আঁকতেন, এখন গ্রাম বাংলার ছবি আঁকতে চান। অতএব চাঁদুর ওপর আদেশ হল, ছবি আঁকা সম্পর্কে যথাসাধ্য জ্ঞান অর্জন করো আর দাড়ি গজাও।

শুনে চাঁদু কেঁদে অস্থির। বলে, জীবনে কখনো কোনো ছবি আঁকিনি, দাড়ি গজালে গলা কুটকুট করে। কিন্তু কোনো ওজর আপত্তিই শোনা হল না। শেষপর্যন্ত অমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, ঢলঢলে আলখাল্লা, কাঁধে ঝোলার ভেতর ছবি আঁকার সরঞ্জাম, একটা ফ্লিপ ড্যাগার আর একটা ছোটো ছ-ঘরার রিভলভার নিয়ে আমার সঙ্গে আমলকী রওনা হলেন।

দিগ্বিজয় রায়মশাইয়ের বহিরের ঘরে দুটো তক্তপোশ পেতে আমাদের রাত্রে শোওয়ার ব্যবস্থা হল। আমাদের ভাগ্যক্রমে তাঁর দুই ছেলেই তখন বাড়িতে। সকলে মিলে আমাদের যথেষ্ট যত্নআত্তি করলেন। কাশীনাথ ছিলেন আমার সমবয়সি আর অজয় সামান্য বড়ো, কাজেই প্রথম আলাপে ঘনিষ্ঠ হতে বেশি দেরি হল না।

তাতে লাভই হয়েছিল। প্রথমত, দেখা গেল যে অজয় আর কাশীনাথ, দু-জনেই ভারতীয় আর ইউরোপীয় শিল্পের ওপর যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করে বসে আছেন আর চাঁদু যে আবার সে বিষয়ে সবিশেষ অজ্ঞান তা-ও তাঁরা সম্যক উপলব্ধি করে ফেলেছেন। তবু চাঁদু সামলে নিয়েছিল। আর্টের থিয়োরিটিক্যাল দিকটা যে ওর বিশেষ সড়গড় নয়, সেটা প্রায় বুঝিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু সব ভেস্তে গেল রাত্রি বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর।

দিগ্বিজয়বাবু তখন শুয়ে পড়েছেন। আমরাও শোওয়ার ব্যবস্থা করছি। এমন সময় দুই ভাই পান নিয়ে ঘরে এসে উপস্থিত। তখন আবার গল্প শুরু হল। একটু বাদেই কাশীনাথ বললেন, 'দেখুন অমরেন্দ্রবাবু, আমরা যদি আপনাকে চন্দ্রনাথবাবু বা গাঙ্গুলীমশাই বলে সম্বোধন করি, তাতে কি আপনার বিশেষ আপত্তি হবে?'

বলাই বাহুল্য, আমরা দু-জনেই ভয়ানক চমকে উঠলুম।

কাশীনাথ হাত নেড়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'না, না, ভয় নেই। এখানে আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। তবে বড্ড রিস্ক নিয়েছেন, যেকোনো সময় ধরা পড়ে যেতে পারতেন।'

আমি বললুম, 'সম্পূর্ণ নিরাপদ কি না এখনও তো ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে, সম্প্রতি একটা লেখা নজরে পড়েছিল, তার নাম— হু আর ক্রিমিনালস, ইন্ডিয়ান

রেভোলিউশনারিস অর ব্রিটিশ পাইরেটস? তার লেখকের নাম ছিল স্কন্দগুপ্ত। আপনাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে কাকে সেই নামে সম্বোধন করব, সেটা জানতে পারলে তবেই আমরা কতদূর নিরাপদ সেটা বুঝতে পারব।'

আমার কথা শুনে দুই ভাই একসঙ্গে হেসে উঠলেন। অজয় বললেন, 'আপনারা স্কন্দগুপ্তকে খুঁজতেই এখানে এসেছেন, তাই না?'

আমি মৃদু হেসে বললুম, 'সে-কথাটা খানিকটা ঠিক, পুরোটা নয়। আসলে আমরা তো সবসময়েই স্কন্দগুপ্তকে খুঁজছি। ইলিসিয়ম রোর কর্তারাও খুঁজছেন, তবে সে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। তবে আপনারা যদি বলেন, আপনাদের দু-জনের একজনও স্কন্দগুপ্ত নন, আমি সেকথা সানন্দে স্বচ্ছন্দে মেনে নেব। কারণ আমি জানি, হয়তো স্কন্দগুপ্ত আমাদের সকলের বিবেক, সমস্ত পরাধীন জাতির অন্তরাত্মা। সে কার মধ্যে দিয়ে কথা বলছে, সেটা কখনোই বড়ো কথা নয়। তবু আমরা তাকে খুঁজছি, এবং খুঁজব—'

কাশীনাথ সহাস্যে বললেন, ' আপনার কথা বুঝতে পারছি।' বলে স্কন্দগুপ্ত সম্পর্কে সমস্ত কথা আমাদের বললেন।

আমি বললুম, 'আমাদের যে সবকথা খুলে বললেন, ভালো করলেন না।'

কাশীনাথ আগের মতোই হাসতে হাসতে বললেন, 'আমরা আপনাদের সম্পর্কে সবকথাই জানি চিত্তবাবু। এমনি-এমনি বিশ্বাস করে বসিনি। সে ব্যাপারে আমাদের কোনোরকম ভুল হয়নি। কিন্তু আপনারা এখানে এসে ভয়ানক ভুল করেছেন। আপনারা জানেন না যে আপনাদের কতখানি বিপদ।'

আমি উদ্‌বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করলুম, 'তার মানে?'

'তার মানে খুবই সরল। আপনাদের পার্টি যখন খোঁজ পেয়েছে যে আমলকী গ্রাম থেকে স্কন্দগুপ্তের লেখা মাঝে মাঝে ডাকে দেওয়া হয়, তখন সে খবরটি যে এখনও পুলিশের কানে যায়নি, এরকম অনুমান করাটা আপনাদের উচিত হয়নি। কাজেই এ গ্রামের ওপর যে পুলিশের নজর পড়বে, এটা ধরে নেওয়াই আপনাদের স্বাভাবিক ছিল। এ-গ্রামে দু-তিনজন বিপ্লবী ছেলে আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু পুলিশের নজর আমাদের দুই ভাইয়ের ওপরেও যে পড়বেই এটা আপনারা ধরে নেবেন আশা করেছিলুম। কিন্তু তা না-করে, আপনি চন্দ্রনাথবাবুকে নিয়ে একেবারে আমাদের বাড়িতেই উঠলেন— এটা ঠিক হয়নি। আমাদের জন্যে চিন্তা করি না, কারণ আমরা ঠিক বেরিয়ে যাব। কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু? তাঁর নিরাপত্তার কথাটা একবার ভেবে দেখেছেন?'

আমি মাথা নীচু করে বললুম, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে।'

অজয় বললেন, 'অন্যায় আপনাদের কিছু হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। এখন এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হবে। আপনাদের এখান থেকে পালাতে হবে। কিন্তু কলকাতায়

ফিরে যাওয়া চলবে না, কারণ মাঝপথেই ধরা পড়ে যাবেন। তার বদলে কাছে-পিঠে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে, যাতে আমাদের সঙ্গে একটা যোগ থাকে।'

'কোথায় যাব?'

'সেটাও ভেবে রেখেছি। এখান থেকে মাইলচারেক দূরে ময়ূরাক্ষীর ধারে একটা পরিত্যক্ত নীলকুঠি আছে। সেখানে কেউ যায় না, কাছে-পিঠে কোনো গ্রামও নেই। তা ছাড়া, জায়গাটার একটা বদনাম আছে। আপনারা সেখানে থাকবেন, আমি বা কাশী রোজ গিয়ে আপনাদের খাবার সাপ্লাই করে আসব। কোনো চিন্তা করবেন না। ওখানে একটা ঘর পরিষ্কার করাই আছে। আমরা মাঝে মাঝে ওখানে যাই তো। সেখানে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন। গোলমাল কেটে গেলে আপনারা ফিরে যাবেন-খন।'

'গোলমাল তবে একটা বেধেছে?'

'হ্যাঁ। আপনারা আসার পরেই এ-গ্রামের মাতব্বরদের একজন— দয়ালহরি দাস, দু-বার নানা ছুতোয় এ-বাড়ি ঘুরে গেছেন। দয়ালকাকা জানেন না যে তিনি যে গভর্নমেন্টের চর সে সংবাদ আমাদের কাছে অজানা নেই।'

'আমাদের কী করতে হবে?'

'আমাদের বিশ্বাস, পুলিশ কাল অথবা পরশু ভোরে আমাদের বাড়িতে আসবে। অতএব আজ ঠিক মাঝরাতে আমরা বেরিয়ে পড়ব। আপনাদের নীলকুঠিতে ছেড়ে ভোর হওয়ার আগেই আমরা ফিরে আসব। সাইকেল চালাতে পারেন তো দু-জনেই?'

'পারি।'

'তবে তো চিন্তাই নেই। চাঁদের আলো আছে, কোনো অসুবিধে হবে না।'

চাঁদু বলল, 'চিত্তদার যাওয়ার কী দরকার? আমি একাই যাই।'

আমি বললুম, 'না। তোকে এনেছি আমি, ফেরতও নিয়ে যাব আমি। কলকাতায় গিয়ে যা-খুশি করিস, কিন্তু এখানে তোকে আমার কথা শুনে চলতে হবে, মনে থাকে যেন।'

কিছু বাঁশবন, আমবন পেরিয়ে নীলকুঠিতে পৌঁছানো গিয়েছিল। দূর থেকে দেখলে বাড়ি বলে মনে হয়নি, মনে হয়েছিল যেন একটা অতিকায় অশুভ অন্ধকারের স্তূপ। সামনে একটা বেশ বড়ো পাঁচিলঘেরা বাগান। যদিও পাঁচিলের অতি সামান্যই আজ অবশিষ্ট আর বাগানে কয়েকটা ঝাউগাছ ছাড়া বাকি সবই আগাছা। সেই অন্ধকার, কাঁটাঝোপ আর ভাঙা ইট-পাথরের স্তূপ এড়িয়ে অজয় কাশীনাথ অবলীলাক্রমে আমাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন। একটা বাঁশের মই বেয়ে আমরা দোতলায় উঠলুম। চওড়া টানা বারান্দা, একপ্রান্তে একটা ছোট্ট ঘর আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। দেখলুম, ঘরটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখা আছে। দুটো ক্যাম্পখাট, একটা টেবিল, গোটা দুই চেয়ার, কিছু বইপত্র, জলের কুঁজো ইত্যাদি সযত্নে সাজানো আছে। ঘরের পুব দিকে

দুটো প্রকাণ্ড জানলার ফোকর। তার মধ্য দিয়ে দেখলুম, চাঁদের আলোয় ময়ূরাক্ষীর রুপোলি শরীর আর তার দু-পাশে বিশাল বালিয়াড়ি। সমস্ত ব্যাপারটা আমার ভারি পছন্দ হল। কেবল বাঁশের মইটা ছাড়া।

অজয় বললেন, 'এ ছাড়া উপায় নেই। ওরিজিন্যাল সিঁড়ি ছিল কাঠের। আজ তার চিহ্নমাত্র নেই। আর অসুবিধেই বা কী আছে? আমরা চলে গেলে মইটা ওপরে উঠিয়ে নেবেন। কোনো জন্তুজানোয়ার অন্তত ওপরে আসতে পারবে না।'

আমি বললুম, 'না, না, অসুবিধে কিছু নেই। কিন্তু আমরা আসায় এত গোলমাল বাধল কীসের, এবার সেটা যদি বলেন।'

অজয় বললেন, 'দেখুন স্কন্দগুপ্তের কিছু লেখা যে আমলকী গ্রামে ডাকে দেওয়া হয়েছিল, পুলিশ সে খবর জানে। এতদিন স্পাইদের মাধ্যমে গোপনে তদন্ত চলছিল। এখন, এ-গ্রামে হঠাৎ দু-জন আগন্তুক এসে পড়েছে, পুলিশ অবশ্যই তাদের দিকে বেশি নজর দেবে। আর চন্দ্রনাথবাবুর ডেসক্রিপশনও তারা পেয়েছে। আমার ধারণা, সেটুকুই ওঁকে চিনিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।'

চাঁদু এতক্ষণ ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা অজয়বাবু, যদি কিছু মনে না-করেন তো একটা কথা জিগ্যেস করি।'

'করুন।'

'এ ঘর গুছোনোর পেছনে যেন নারীহস্তের স্পর্শ রয়েছে মনে হচ্ছে? এমন চমৎকার করে কোনো পুরুষমানুষের পক্ষে সাজানো কঠিন।'

অজয় ম্লান হাসলেন। বললেন, 'আপনার সন্দেহ ঠিক। একটি মেয়ে রোজ এসে আমাদের এই ঘর গুছিয়ে দিয়ে যায়। কালও সে আসবে, তখন তাকে দেখতেই পাবেন। মেয়েটি একটু রহস্যময়।'

'কীরকম?'

অজয় একটু চিন্তা করে বললেন, 'অনেকগুলো কারণে। প্রথমত, মেয়েটি বেশ সুন্দরী, বয়স ত্রিশের একটু ওপরে হবে। স্থানীয় আদিবাসী লোকেদের মতো চেহারা নয়। দ্বিতীয়ত, সে যে কোথায় থাকে, সেটা আজও বের করতে পারিনি। তাকে জিগ্যেস করে লাভ নেই, কারণ সে বোবা। আমরা এখানে যখন প্রথম আসি, তখন সে এসেছিল একটা ছেঁড়া কানি দিয়ে কোনোরকমে লজ্জা-নিবারণ করে। অঙ্গভঙ্গি করে বুঝিয়েছিল যে সে কাজ করতে চায়। আমরা তাকে কাজ করতে বলি, কিন্তু টাকা দিলে সে নেয় না। শাড়ি দিয়েছি— খুশি হয়েছে। বড়ো একটিন মুড়ি দিয়েছি— তাতে আরও খুশি। কিন্তু এ-বাড়িতে সে থাকে না। সকালে একটু বেলায় আসে, ঘণ্টাদুয়েক বাদে চলে যায়। আমলকী গ্রামের মেয়ে সে নয়, কাছেপিঠে অন্য কোনো গ্রামও নেই। কাউকে জিগ্যেস

করতে পারিনে, পাছে আমাদের গোপন আস্তানাটার কথা জানাজানি হয়ে যায়।'

'আমলকী ছাড়া সবচেয়ে কাছের গ্রাম কতদূরে।'

'বহু দূরে। হেঁটে আসা অসম্ভব। কোনো রাস্তাও তেমন নেই। তেঁতুলতলির মাঠ পেরিয়ে যে রাস্তায় আপনারা এসেছেন, সেটা আমলকীতেই শেষ। তার পরে আর নেই। আর থাকবেই বা কোত্থেকে? এ-জমির ওপর দিয়ে তো মানুষ হাঁটে না। বলে, হাঁটলে নাকি মরণদশায় ধরে।'

'কেন?'

অজয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'দেখুন, এ জায়গাটা এককালে খুবই বর্ধিষ্ণু ছিল, অনেকগুলো গ্রাম ছিল, চাষবাস হত। তারপর এল নীলদানব। শুরু হল নৃশংস অত্যাচার। অতঃপর নীল বিদ্রোহ। এই কুঠির কুঠিয়াল সাহেব আর তার অ্যাসিস্টেন্ট কলকাতা থেকে কিছু সেপাই আর গোরা পল্টন নিয়ে এল। তখন শুরু হল তাণ্ডব। সেই নারকীয় ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। কিছু কিছু পুরোনো গান আমার কালেকশনে আছে, সেখান থেকে কিছুটা আন্দাজ পাবেন। ঝড় যখন থামল তখন দেখা গেল, এই সমস্ত অঞ্চল শ্মশানে পরিণত হয়েছে। কাল সকালে বারান্দায় দাঁড়ালে দেখতে পাবেন সামনে আর পাশে কিছু কিছু ধ্বংসস্তূপ। কেবল আমাদের আমলকী গ্রামটা বেঁচে গিয়েছিল, কারণ সে-সময়কার জমিদার ক্ষেত্রমোহন মজুমদার কলকাতায় মুৎসুদ্দিগিরি করার সুবাদে এই কুঠির সাহেবদের সঙ্গে যথেষ্ট খাতির বজায় রেখেছিল। কাজেই আজও লোকে মনে করে যে এই জায়গাটা অভিশপ্ত।'

কাশীনাথ বললেন, 'মেয়েটি সম্পর্কে আমার একটা থিয়োরি আছে। আমার ধারণা, সে ভদ্রঘরেরই মেয়ে। সে যে বোবা, এটা লুকিয়ে তার বাবা-মা তার বিয়ে দেয়। শ্বশুরবাড়িতে ধরা পড়ামাত্র সে বিতাড়িত হয়। তার মতো সুন্দরী মেয়ে পথে নামলে অবধারিতভাবে অকথ্য অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। তাই সে আজ লোকালয়ে থাকে না, কোনো পোড়ো ভিটেয় লুকিয়ে থাকে। বনের ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করে। আমাদের নেহাতই নিরীহ দেখতে বলে আমাদের কাছে কাজ চাইতে এসেছিল বা হয়তো তার ইন্সটিংক্ট তাকে বলে দিয়েছে যে আমাদের কাছ থেকে কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই।'

অজয় আবার ম্লান হাসলেন। বললেন, 'হয়তো তোর কথাই ঠিক। কিন্তু তাতে সেই রহস্যটা সমাধান হয় না। আমি জানি, তুই বলবি ওটা কাকতালীয় ব্যাপার। হয়তো তাই, কিন্তু না-হতেও তো পারে?'

আমি জিগ্যেস করলুম, 'কোন রহস্যের কথা বলছেন?'

'সেটা আজ বলব না। আপনারা যেদিন যাবেন, সেদিন বলব।'

চাঁদু মাথা চুলকে বলল, 'মেয়েটা ভূতটুত নয়তো?'

অজয় এবার সশব্দে হেসে উঠলেন, 'না, না, ভূত কখনো প্রশস্ত দিবালোকে কারোর বাড়ির ঝিগিরি করতে আসে, শুনেছেন কখনো? তা ছাড়া, আমরা দেখেছি তার বেশ স্পষ্ট একটা ছায়া পড়ে, তার উলটোবাগে পা নয়, মই না-নামালে ওপরে উঠতে পারে না, পা-গুলো তালগাছের মতো লম্বা করার ক্ষমতা বোধ হয় তার নেই। আসলে যে রহস্যের কথা আমরা বলছি, সেটা অন্য ব্যাপার। তাতে আপনাদের বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই। তবে কেন যে আজ সে সম্বন্ধে কিছু বলছি না, সেটাও যেদিন আপনারা যাবেন সেদিনই বলব।'

কাশীনাথ বললেন, 'চলো দাদা, এবার আমাদের রওনা হওয়ার সময় হল। আমাদের একজন কাল মাঝরাতে আসবে খাবার আর জল নিয়ে। দিনের খাওয়াটা মুড়ি আর গুড় দিয়েই সারতে হবে আপনাদের। একটু কষ্ট হবে, তা আর কী করা যাবে। আর ভালো কথা, জানলাটার সামনে যত কম সম্ভব যাবেন, রাত্রি বেলা নদীতে স্নান করে আসবেন, একতলার পেছনের ঢাকা বারান্দায় কাপড় শুকোবেন, দোতলার খোলা বারান্দায় বা পেছনের ছাদে পারতপক্ষে যাবেন না। এইসব উপদেশ দেওয়ার কারণ একটিই— নদীর এপারে কোনো লোক চলাচল নেই ঠিকই, কিন্তু নদীর ওপারে মাঝে মাঝে দু-একজন হাটুরে যাতায়াত করে থাকে। দেখবেন, যেন তাদের কোনোরকম সন্দেহের উদ্রেক করে বসবেন না।'

চাঁদু অত্যন্ত বিমর্ষ মুখে বলল, 'ও বাবা! এর চেয়ে যে ইংরেজের জেল ছিল ভালো।'

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ মেয়েটি এল। চাঁদু অবশ্য তখনও পরমানন্দে সশব্দে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছিল, আর আমি সামনের বারান্দায় একটা মোটা থামের আড়ালে যথাসাধ্য আত্মগোপন করে বসে একটা বই পড়বার চেষ্টা করছিলুম। নীচের বাগানে মচমচ শব্দ শুনে গলা বাড়িয়ে তাকে দেখতে পেলুম।

একটু বাদে মই বেয়ে যে উঠে এল, তাকে দেখে একটু আশ্চর্যই হলুম। মেয়েটির একমাথা লালচে চুল চুড়ো করে মাথার ওপরে বাঁধা। পরনে একটা কালোপাড় ধুতি। খুব লম্বা-চওড়া নয়, তবে বেশ স্বাস্থ্যবতী। গায়ের রং দুধে-আলতায় না-হলেও, ফর্সা অবশ্যই বলা চলে। আর আশ্চর্য তার মুখ। আজও ভুলতে পারিনি। বাঁশির মতো নাক, পদ্মপলাশ দুই চোখ, খোদাই করা দুটি ঠোঁট— আপনারা আজকাল যেরকম মা দুর্গার পটের ছবি দেওয়ালে সাজিয়ে রাখেন, ঠিক সেইরকম। আর মুখে একটা প্রবল ব্যক্তিত্ব আর আভিজাত্য। আমার দেখে মনে হল যেন স্বয়ং মা ভবানী এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছেন।

মেয়েটিও আমাকে দেখে কিছু কম আশ্চর্য হয়নি। আমি তাড়াতাড়ি সব ব্যাপারটা

বুঝিয়ে বললুম। সেসব কথা মন দিয়ে শুনল, কী বুঝল কে জানে, তারপর আমাদের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

এইখানে একটা অদ্ভুত দৃশ্য আমার নজরে পড়ল। মেয়েটি ঘরে ঢুকে চাঁদুকে দেখেই প্রথমে থমকে দাঁড়াল। তার দুই চোখ এক লহমার জন্য বিস্ফারিত হয়ে ধ্বক-ধ্বক করে জ্বলে উঠল, তার পর-মুহূর্তেই, বোধ হয় চাঁদুর গলায় পৈতেটা নজরে পড়ার ফলে চোখ নামিয়ে হাতজোড় করে তার উদ্দেশ্যে একটা প্রণাম করে সে নিজের কাজে মন দিল। আমি পরে চাঁদুকে আমার এই অভিজ্ঞতার কথা বললুম, কিন্তু সে বিশেষ পাত্তা দিল না। বলল, 'হয়তো কোনো পুরোনো শত্রুর সঙ্গে আমার চেহারার মিল খুঁজে পেয়েছিল। পরে ভুল বুঝতে পেরেছে।'

আমি বললুম, 'কিন্তু সে তোর মুখ দেখতে পায়নি।'

'তাতে কী হয়েছে? আমার ফিগার আর গায়ের রঙে মিল থাকতে পারে। তবে একটা বাঁচোয়া— যেই তার শত্রু হোক-না কেন, সে ব্রাহ্মণ-সন্তান নয়।' তারপর আমাকে ঠাট্টা করে বলল, 'তোমার এই বেকারত্ব আর চোখে দেখা যায় না চিত্তদা। এইসব আজেবাজে প্রবলেম নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তোমাকে এখন চিত্তবিনোদন করতে হচ্ছে?'

সত্যি, কিছুদিনের মধ্যেই কর্মহীন দিনগুলো অসহ্য হয়ে উঠল। কাঁহাতক আর বই পড়া যায়? বোবা মেয়েটির সঙ্গে আলাপচারী করার চেষ্টা বৃথা, তাতে কেবল হাত-পা ব্যাথাই বাড়ল। নীলকুঠি এক্সপ্লোরেশন— তাও একদিন শেষ হয়ে গেল। দেখা গেল, বাড়িটার তিন-চতুর্থাংশ একেবারে ধসে গেছে। বাকি যেটুকু আছে, তার মধ্যে ওপরে-নীচে মিলিয়ে গোটা ছয়েক ঘর। সব ক-টাই সাপ আর বিছের রাজত্ব। কোনোটাতেই দরজা-জানলার বালাই নেই। কেবল একটাই কৌতূহলোদ্দীপক জিনিস নজরে পড়ল। সেটা একটা শ্বেত পাথরের প্লাক, দোতলার একটা ঘরের জানলার বাইরে দেওয়ালে গাঁথা। তাতে ইংরেজিতে লেখা আছে, আমার প্রিয়া পত্নী আগাথা এই ঘরে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন— জেমস কার্টার।

আমাদের একমাত্র আনন্দের সময় ছিল শেষরাত্রি, যখন অজয় অথবা কাশীনাথ আসতেন। গল্পগুজব হত, বাইরের জগতের খবরাখবর পাওয়া যেত। অনেক কষ্ট করেছিলেন দু-জন আমাদের জন্যে।

প্রায় দিনদশেক এরকম চলবার পর হঠাৎ একদিন অজয় বললেন, 'কাল রাত্রে আপনাদের এখান থেকে পালাতে হবে। কোথায় যাবেন স্থির করিনি এখনও। কাশীকে পাঠিয়েছি নদীর ওপারে আমার মামার বাড়িতে। যদি সেখানে কোনো অসুবিধে না-থাকে, তাহলে কাল মাঝরাত্রিতে রওনা হলে ঘণ্টাতিনেক সাইকেল চালালে পৌঁছে যাওয়া যাবে।'

আমি জিগ্যেস করলুম, 'কেন, কোনো গণ্ডগোল বেধেছে?'

'হ্যাঁ। আমলকীতে একটা গুজব রটেছে যে নীলকুঠিতে নাকি কুঠিয়াল সাহেবের ভূত দেখা গেছে। এরকম গুজব এর আগেও দু-একবার ঘটেছে, কিন্তু এবারের গুজবটা সত্যি না-হয়ে যায় না। কারণ কালেক্টরেটের চৌকিদার লালতাপ্রসাদ ভরদুপুর বেলা স্বচক্ষে তাকে দেখেছে। সেই সাহেব-ভূত নাকি আবার তাকে দেখেই তালগাছের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে তাড়া করে এসেছিল। সে যদি তখন নদীর ওপারে না-থাকত আর বুদ্ধি করে ঠিক সময়ে তার টাট্টু ঘোড়া ছুটিয়ে না-দিত, তাহলে যে কী হত তা আর না-বলাই ভালো। আসলে সে দেখেছে, ঠিকই, তবে যা দেখেছে তা সাহেব-ভূত নয়, চন্দ্রকান্ত গাঙ্গুলির কিছু অংশ। গাঙ্গুলিমশাই, আপনি নিশ্চয়ই কয়েক দিন আগে খালি গায়ে ওই জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দুপুর বেলার দৃশ্য উপভোগ করছিলেন? মানে, কাশী ঠিক যে কাজটা করতে বারণ করেছিল।'

চন্দ্রনাথ লজ্জিত মুখে মাথা নেড়ে বলল, 'ইয়ে মানে, হ্যাঁ, তা হতে পারে।'

'যাহোক, যা হওয়ার তা তো হয়েছে। গুজবটা আবার রটেছে দিন কয়েক আগে, যদিও আমাদের কানে এসেছে আজ। আশা করি, এখনও বেশি দেরি হয়ে যায়নি। তবে নীলকুঠিতে আর নয়। আমার মামাবাড়িতে যদি না-ও হয়, তা হলেও অন্য কোথাও ব্যবস্থা করা যাবে। কাল রাতের জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকবেন।'

সেই প্রস্তুতির আর দরকার হল না। পরদিন সকালে আমাদের ঘুম ভাঙল ঘরের মধ্যে অনেকগুলো লোকের কথাবার্তায়। চোখ খুলে দেখি, আমাদের খাটের চারপাশে আট-দশজন সেপাই, জানলার কাছে একজন বেঁটেখাটো ইংরেজ পুলিশ অফিসার আর চাঁদুর মাথার কাছে দণ্ডায়মান আর-একজন পর্বতাকার ইংরেজ পুলিশ অফিসার। ইউনিফর্ম দেখে বুঝলুম, প্রথমজন জুনিয়ার আর দ্বিতীয়জন সিনিয়ার।

আমাদের চোখ খুলতে দেখে পর্বতাকার মধুর গলায় আমাদের সাদর সম্ভাষণ করে বলল, 'সুপ্রভাত, সুপ্রভাত। এইসময়ে আপনাদের বিরক্ত করার জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত, কিন্তু কী করব বলুন, চাকরি বজায় রাখতে গেলে এ হেন খারাপ কাজ আমাদের করতেই হয়। তা মিস্টার গাঙ্গুলি, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে পালিয়ে এসে আপনি এই জায়গায় থাকাটাই পছন্দ করলেন? এ জায়গাটায় কি আপনার কোনো বিশেষ আকর্ষণ আছে?'

চন্দ্রনাথ এ প্রশ্নের কোনো জবাবই দিল না। বিকৃত মুখে চুপ করে বসে রইল। পর্বত তখন চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'মিস্টার গাঙ্গুলি, জেমস কার্টার যখন কোনো প্রশ্ন করে, তখন তার উত্তর না-দিয়ে চুপ করে থাকাটা কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ নয়।'

নামটা শুনে আমরা দু-জনেই চমকে উঠলুম এবং প্রায় একইসঙ্গে দু-জনে বলে উঠলুম, 'জেমস কার্টার!'

আমাদের চমকানো দেখে পর্বত একটু আশ্চর্য হল। বলল, 'কেন আমার নামটা কি তোমাদের চেনা-চেনা লাগছে?'

চাঁদু বলল, 'তা একটু লাগছে বই কী! আচ্ছা, তোমার কোনো পূর্বপুরুষ কি ভারতবর্ষে নীলের চাষ করতেন?'

'হ্যাঁ, করতেন। আমার ঠাকুরদার বাবা। তোমরা কী করে জানলে?'

চাঁদু এ প্রশ্নেরও কোনো জবাব দিল না। তবে বলল, 'কী আশ্চর্য যোগাযোগ। তুমি জানো না যে এই বাড়িটা তোমার সেই পূর্বপুরুষের। তাঁর নাম ছিল জেমস। তাঁর স্ত্রী এখানেই মারা যান। তোমার গ্রেট গ্র্যান্ড মাদার।'

পর্বত মাথা নেড়ে বলল, 'না, তিনি অন্য মহিলা। আমার বাবার ঠাকুমাকে তিনি দেশে ফিরে বিবাহ করেন। কিন্তু এ খবরটা তোমরা পেলে কোত্থেকে?'

'এই ঘরের পাশের ঘরের দরজার বাইরে একটা প্লাক আছে।'

'তাই নাকি?' বলে বেঁটে অফিসারকে সম্বোধন করে পর্বত বলল, 'জানো পল, আমি সত্যিই আশ্চর্য হচ্ছি। অবিশ্বাস্য যোগাযোগ, তাই না? সেই বুড়োর কিছু কিছু চিঠিপত্র এখনও আমাদের বাড়িতে আছে, সেখানে আমি তাঁর ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতার কথা পড়েছি। সে প্রায় পর্নোগ্রাফির পর্যায়ে পড়ে। খুব ফূর্তি লুটেছিল তখন। শুধু যে দেদার নেটিভ মেয়েদের ধর্ষণ করেছিল তাই নয়, পুরুষদের ওপর যা অত্যাচার করেছিল, তা আর কী বলব! একেবারে ডিলাইটফুল। তার ওপর গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়েছিল।'

বেঁটে সাহেব মহাপুলকিত হয়ে বলল, 'তোমার পূর্বপুরুষটি বেশ মহাপুরুষ ব্যক্তি ছিলেন দেখছি।'

পর্বত দন্তবিকাশ করে বলল, 'নিশ্চয়ই। চলো প্লাকটা দেখে আসি।'

বেঁটে মাথা নেড়ে বলল, 'চলো।' তারপর একজন সেপাইকে সম্বোধন করে বলল, 'বদ্রি, এদের বাইরে নিয়ে এসো। হাতকড়ি লাগিয়ে একপাশে বসাও। আমরা বাড়িটা দেখে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা হব।'

বদ্রি এবং আর একজন সেপাই আমাদের দিকে বন্দুক তাক করে বলল, 'চলো, বাহর নিকলো।'

আমরা খাট থেকে গড়িমসি করে উঠতে-না-উঠতেই বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল। তখন তাড়াতাড়ি উঠে দরজার বাইরে পা দিতেই দেখি, দু-জন সেপাই আমাদের মা ভবনীকে ধরে নিয়ে আসছে। তারা দু-জনে তার দু-হাত ধরে রেখেছে।

গোলমাল শুনে পাশের একটা ঘরের ভেতর থেকে সাহেব দু-জনও বেরিয়ে এল। অভিনব বন্দিটিকে দেখে তারা এগিয়ে এসে তার আপাদমস্তক ভালো করে দেখল। বেঁটে

সাহেব বাঁকা হাসি হেসে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'বেশ, বেশ, মিস্টার গাঙ্গুলি, এইবার বুঝতে পারছি, তোমার এই জায়গাটা এত পছন্দ হয়েছিল কেন। ব্রিটিশ সরকার অবশ্য তার অতিথিশালায় তোমাকে এইরকম মজাদার মাল সরবরাহ করতে পারবে না। এখানে এরকম খাসা জিনিসটি জোটালে কোত্থেকে?'

চাঁদুর মুখটা ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠল, কিন্তু কোনো জবাব দেওয়ার সুযোগ পেল না। তার আগেই বেঁটে সাহেবের পছন্দসই জিনিসটি অবলীলাক্রমে দুই সেপাইয়ের হাত ছাড়িয়ে বেঁটের ওপরওলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কোমরে হাত রেখে হঠাৎ পরিষ্কার গলায় প্রশ্ন করল, 'তুমি জেমস কার্টার না?'

পর্বত অত্যন্ত খুশি হয়ে একটু সামনে ঝুঁকে মধুর হাস্যবিকাশ করে বলল, 'হাঁ, হামি জেমস কার্টার আছি। তুমি হামাকে চিনো নাকি?'

'আমি তোমাকে চিনি না, শয়তান? এত বছর আমি অপেক্ষা করে আছি। আমি জানতুম তুমি ফিরে আসবে। এইবার আমার পালা!'

বলেই কেউ কিছু বোঝবার আগেই মেয়েটি হঠাৎ হাত বাড়িয়ে এক হাতে কার্টারের বুকের কাছে ইউনিফর্মটা আর অন্য হাতে পেটের ওপর বেল্টটা খিমচে ধরে সেই অতিকায় শরীরটা অনায়াসে মাথার ওপর তুলে মারল প্রচণ্ড এক আছাড়! তারপরই বাঘিনীর মতো এক লাফ দিয়ে গিয়ে সেই ধরাশায়ী দেহটার ওপর চেপে বসল। এই আক্রমণের আকস্মিতায়, যন্ত্রণায় আর বিস্ময়ে কার্টার তখন অনড়।

বেঁটে সাহেবও কয়েক মুহূর্ত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারপরেই যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে, দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে খুব কাছ থেকে মেয়েটির মাথায় পরপর তিনটে গুলি করল।

আমরা স্পষ্ট দেখলুম তিনটে গুলিই মাথা ফুটো করে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল, কিন্তু সেই ক্ষত থেকে কোনো রক্ত বেরোল না। গুলি খেয়েই মেয়েটি ফিরে তাকিয়ে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে খপ করে স্তম্ভিত বেঁটে সাহেবের পা-টা ধরে ফেলল। তারপর তাকে হিড়হিড় করে কাছে টেনে এনে তার গলাটা টিপে ধরল। বেঁটে সাহেব কয়েক মুহূর্ত ছটফট করেই নেতিয়ে পড়ল।

সেই প্রাণহীন দেহটা ঘৃণাভরে একপাশে ছুড়ে ফেলে দিয়ে মেয়েটি এবার একহাতে কার্টারের চুলের মুঠি আর অন্যহাতে গলাটা শক্ত করে ধরে বলল, 'শয়তান, তুই আমার স্বামীকে গুলি করে মেরেছিস, আমাকে বরবাদ করেছিস, আমার তিন বছরের ছেলেটাকে গাছের গায়ে আছড়ে-আছড়ে মেরেছিস! তুই ভেবেছিলি আমি মরে গেছি, না? কিন্তু আমি মরিনি। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বেঁচে থেকেছি— জোর করে বেঁচে থেকেছি। আর দেখেছি তোর পশুর মতো ব্যবহার। সারা গাঁ-টা জ্বালিয়ে শ্মশান করেছিস, তোর নোংরা হাত থেকে কেউ বাঁচেনি!'

এরই মধ্যে শুনি কার্টার গোঙাতে-গোঙাতে বলছে, 'কী বলছে মেয়েটি... কী বলছে? কেউ কি আমাকে বুঝিয়ে দেবে?'

আমার পাশ থেকে চাঁদু চিৎকার করে বলল, 'তোমার ঠাকুরদার বাবার যে সব কীর্তিকলাপে তুমি অহংকৃত বোধ করতে, মেয়েটি তারই বর্ণনা দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, যেভাবেই হোক মেয়েটি সেইসব কীর্তিকলাপের শিকার হয়েছিল আর তার ধারণা যে তুমিই সেই জেমস কার্টার সিনিয়ার। শুনেছি থার্ড জেনারেশনে চেহারা নাকি ফিরে আসে। তোমারও এসেছে। সন্দেহ নেই।

কার্টার কাতরে উঠে বলল, 'ওকে একটু বুঝিয়ে বলো! দয়া করে একটু বুঝিয়ে বলো!'

চাঁদুর মুখ দেখে মনে হল না যে তার বুঝিয়ে বলার কিছুমাত্র বাসনা আছে। আর তার দরকারও হল না। কারণ তার পরেই দেখি মেয়েটি একহাতে কার্টারের ঘাড় আর অন্যহাতে তার থুতনিটা ধরে আস্তে আস্তে টেনে মুণ্ডুটা ধড় থেকে ছিঁড়ে আলাদা করে ফেলল। আর যতক্ষণ ধরে এই অমানুষিক কাণ্ডটা ঘটল, ততক্ষণ ধরে কার্টারের গলা থেকে একটা বীভৎস নারকীয় আর্তনাদ বেরিয়ে এসে সমস্ত নীলকুঠিটাকে থরথর করে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

যখন সেই আর্তনাদ থামল, তখন দেখি রক্তমাখা হাতে মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়েছে। আশেপাশে কেউ নেই। সেপাইরা কেউ বোকা নয়, তারা ব্যাপারটা একটু আঁচ করেই যথাসময়ে ভাগলবা। আমি হাতজোড় করে মেয়েটির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লুম। বললুম, 'কে মা তুমি?'

ভাবলেশহীন গলায় মেয়েটি বলল, 'আমার নাম সালমা। আমার স্বামী মোবারকের বড়ি ছিল ওই দূরে কতগুলো তালগাছ দেখছ, ওইখানে। তিনি চাষি ছিলেন। আমরা ছিলুম গরিব, কিন্তু ছেলে আর স্বামীকে নিয়ে আমার কোনো দুঃখ ছিল না। কিন্তু কীসের থেকে যে কী হয়ে গেল। নীলকুঠি হল, জোর করে নীলের চাষ করা হল। আমার স্বামী বদরাগি মানুষ ছিলেন, আপত্তি জানাতে গিয়ে কয়েক বার চাবুক খেলেন, কয়েদ হল কিছুদিনের। তারপর হঠাৎ একদিন এই শয়তানটা, একদল গোরা সেপাই নিয়ে আমাদের গ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একজনও বাঁচেনি, জানো? বাচ্চা, বুড়ো কেউ নয়। কত কাঁদল সবাই, কিন্তু কাউকে রেয়াত করল না। সে কী অত্যাচার! আমিও বোধ হয় মরে গিয়েছিলুম। কিন্তু কী করে বেঁচে উঠলুম, জানি না। সেই মরার আগে সাহেবকে বলেছিলুম, আমি তোমাকে ছাড়ব না শয়তান, মরে গেলেও তোমার মুণ্ডু আমি নিজের হাতে ছিঁড়ব— তবেই আমার শান্তি। হয়তো সেই জন্যেই বেঁচে উঠেছিলুম। তারপর, কতদিন কেটে গেছে। শেয়াল কুকুরের মতো পোড়ো ভিটের মধ্যে লুকিয়ে থেকেছি কেবল এই দিনটির আশায়। আজ আমার সব কাজ শেষ।'

এই পর্যন্ত বলে মেয়েটি যেন একতলায় নামার মইটির দিকে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ

ঘুরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে তার দিকে এগোতে যাচ্ছিলুম, চাঁদু পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে ফেলল। বলল, 'দাঁড়ান, যাবেন না।'

আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তার আগেই একটা বিকট পচা গন্ধে সমস্ত জায়গাটা ভরে রইল। তাকিয়ে দেখি, মেয়েটির সমস্ত শরীরটা পচে গলে যাচ্ছে। সে কী ভয়ংকর দৃশ্য! ধীরে ধীরে দেহটা কঙ্কালে পরিণত হল, তারপর সেটাও গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে এক স্তূপ ধুলোয় পর্যবসিত হল। তারপর হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এসে সেই ধুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল, হয়তো চারদিকের ধ্বংসস্তূপগুলোর ওপর ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে।

আর ভয়াবহ আতঙ্কে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলুম।

সোমেশ বলল, 'আচ্ছা রায়সাহেব, অজয়বাবু যে রহস্যের কথা বলেছিলেন, সেটা কী তা কি জানতে পেরেছিলেন?'

চিত্তপ্রসাদ বললেন, 'হ্যাঁ, পেরেছিলুম। অজয়বাবুর জ্যাঠামশাই যৌবনকালে কিছুদিন তন্ত্রসাধনা করেছিলেন। সেইসময় তিনি কয়েক বার নীলকুঠিতে গিয়েছিলেন নির্জনতার খোঁজে। সেখানে তিনি এই মেয়েটিকে দেখেছিলেন। তাঁর ডায়েরিতে যা বর্ণনা দেওয়া ছিল, তাতে অজয়ের ধারণা হয়েছিল এই দু-জন অভিন্ন, কিন্তু কাশীনাথ সেকথা বিশ্বাস করেননি। কী করেই বা করবেন? এই দুই ঘটনার মধ্যে যে প্রায় বাহান্ন বছরের তফাত।'

ইন্দ্রিয়ের ওপারে

একালের বিখ্যাত উকিল চিত্তপ্রসাদ রায় অসন্তুষ্ট মুখ তুলে তাকাতে আমরা কলরব করে বলে উঠলুম, 'অনেকদিন পরে আবার আপনাকে বিরক্ত করতে আসছি কিন্তু। রাগ করতে পারবেন না। এমন বর্ষার রাতে যদি আপনার রোমাঞ্চকর জীবনের একটা গল্পই না-শুনতে পেলুম, তাহলে এই বাদলার কোনো অর্থই হয় না।'

রায়মশাই দাবার বোর্ড সরিয়ে রেখে বললেন, 'ভালো ক্লাবের মেম্বার হয়েছিলুম। এই বুড়ো বয়সে যে একটু নিশ্চিন্ত মনে দাবা খেলব, তারও উপায় নেই। তা ঠিক আছে, গল্প শুনবেন আপনারা বলছেন যখন তখন শোনানো যাবে। কিন্তু কীসের গল্প? আমার এই সুদীর্ঘ জীবনে যে কতরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার তো কোনো সীমা নেই। কী ধরনের অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চান, বলুন। সেরকম কিছু যদি আমার ভাণ্ডারে থাকে তো বলা যাবে।'

সমীর বলল, 'আচ্ছা, রায়মশাই, আমরা জানি আপনার জীবনে অনেক ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে যার মধ্যে কতগুলোয় আপনি খুব ভয় পেয়েছেন, কখনো-বা পাননি। কিন্তু এমনকী কোনো কিছু আপনার স্মৃতিতে আছে যা অত্যন্ত সুন্দর কিন্তু আপনাকে আতঙ্কিত করে?'

রায়মশাই তাঁর বিরলকেশ মাথাটি আস্তে আস্তে ওপর-নীচে নাড়লেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আছে। কৌশিকী কানাড়া রাগের নাম শুনেছেন? রাত্রের রাগ, আমাদের মার্গ সংগীতের মধুরতম রাগগুলির একটি। এই রাগ আমি শুনতে পারিনে, শুনলে এখনও ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসে। অবশ্য তার জন্যে কৌশিকী কানাড়া রাগটি দায়ী, তা বলা যায় না। দায়ী সেই রাগের সঙ্গে জড়িত একটা ঘটনার স্মৃতি। সেই ঘটনার কথাই আজ আপনাদের বলব।—

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে আমাকে একবার যেতে হয়েছিল অবিভক্ত বাংলার ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ সাবডিভিশনের থামল নামে একটা ছোট্ট শহরে। অবশ্য

শহর না-বলে থামলকে একটা বড়ো বর্ধিষ্ণু গ্রামই বলা উচিত; কিন্তু শহর বলছি এজন্যে যে ওখানে পাকা বাড়ির সংখ্যা ছিল প্রচুর, পাকা রাস্তা ছিল, দুটো স্কুল ছিল— একটা ছেলেদের, অন্যটা মেয়েদের আর ছিল একটা কলেজ। থামল রাজকলেজ। এখানেই গিয়েছিলুম আমি।

আমি তখন উঠতি উকিল। থামলের জমিদার কুলভূষণ সিংহরায় আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন একটা ছোট্ট মামলার তদারকি করবার জন্যে। তাঁর কাছে আমাকে রেফার করেছিলেন আমার সিনিয়র মৃগেন্দ্র বোস। কুলভূষণ আমি গিয়ে পৌঁছনোমাত্র খুব যত্নআত্তি করলেন। তারপর আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন রাজকলেজের টিচারস্ মেসে। তার একটা কারণ তাঁর গেস্ট হাউসে তখন কিছু বাইরের লোক ছিলেন, আর অন্য কারণ তিনি স্বভাবতই অল্পবয়েস বলে আমাকে স্টেটের গেস্ট হাউসের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেননি। তবে যেখানে ব্যবস্থা করে দিলেন, সেটা যে খারাপ তা কখনোই বলব না; বরং আমার কাছে তখন অত্যন্ত ভালো বলেই মনে হয়েছিল।

মেসবাড়িটা ছিল শাস্ত্রমতে চারতলা। তবে তার মধ্যে প্রথম দুটো তলাতেই মেম্বাররা থাকতেন। তিনতলায় ছাদের ওপর একটা ঘর ছিল আর তার ঠিক ওপরেই আর-একটা ঘর ছিল। এই চারতলার ঘরটায় আবার একটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হত। তিনতলার ঘরটায় আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

আমি ঘর দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। বেশ বড়ো ঘর, তিনদিকে জানলা, কেবল উত্তর দিকটা বন্ধ, কারণ সেই দিকেই ছিল চারতলায় ওঠার সিঁড়িটা। ঘরটার পূবদিকে প্রকাণ্ড ছাদ, পশ্চিমে দিগন্তবিস্তৃত ধান খেত, তার মাঝে মাঝে ঘন গাছপালায় ঢাকা কয়েকটি গ্রাম, আর দক্ষিণে রাজকলেজের খেলার মাঠ। মাঠের ওপারে শহর। এমন একটা ঘরের কথা আপনারা কলকাতার লোক চিন্তাই করতে পারবেন না। আমি তখন যদিও কলকাতায় থাকি, কিন্তু মূলত আমি গাঁয়ের ছেলে। কাজেই, আমি যে অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠব তাতে আর আশ্চর্য কী। কলকাতায় হাঁপিয়ে উঠেছিলুম, এখানে এসে যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

মেসের ম্যানেজার সন্তোষ ঘোষাল আমাকে খুব সমাদর করে ডেকে নিলেন। সন্তোষবাবু ছিলেন রাজকলেজের দর্শনের অধ্যাপক, মধ্যবয়স্ক হাসিখুশি মানুষ। আমাকে প্রথম আলাপেই তুমি সম্বোধন করলেন। এটা সে-যুগে খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল না, অত্যন্ত স্নেহের সম্পর্ক না-হলে চট করে একজন নবপরিচিত ব্যক্তিকে কেউ তুমি বলে সম্বোধন করত না। আসলে সন্তোষবাবু সার্থকনামা লোক ছিলেন, সকলের প্রতিই তিনি ছিলেন সন্তুষ্ট ও স্নেহসম্পৃক্ত। এমন লোকের তত্ত্বাবধানে এসে পড়ে আমিও বেশ আরামবোধ করলুম।

সন্তোষবাবু প্রথমেই আমাকে মেসবাড়িটা ঘুরিয়ে দেখালেন। প্রকাণ্ড বাড়ি, পুব-পশ্চিমে লম্বা, মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে তিনতলা পর্যন্ত। প্রথম দুটো তলায় দক্ষিণ দিক বরাবর চওড়া বারান্দা সিঁড়ির দু-পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, তার গায়ে পর পর ঘর। পুব দিকের উইঙের ঘরগুলো সিনিয়র প্রফেসরদের আর পশ্চিম দিকের উইংটা সদ্য পাশ করা ছোকরা লেকচারারদের। আর আমার ঘরটা কিন্তু সিঁড়ির ঘরের লাগোয়া ছিল না, ছিল ছাদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে।

আমি সন্তোষবাবুকে জিগ্যেস করলুম, 'ঘরটা এমনভাবে তৈরি কেন?'

সন্তোষবাবু মৃদু হাসলেন। বললেন, 'জমিদারের খেয়াল। ওই যে চারতলার ঘরটা দেখছ, ওখানে থাকেন কুলভূষণবাবুর ছোটো ভাই রঙ্গলাল সিংহরায়। ভদ্রলোক গানপাগল মানুষ, জমিদারিতে মন নেই। রাজকলেজে শাস্ত্রীয় সংগীত শেখান আর ওই ঘরে বসে সাধনা করেন। মাথায় কিঞ্চিৎ ছিট আছে, তবে সে দেখতে গেলে তো ওঁদের সমস্ত পরিবারটিকেই ছিটগ্রস্থ বলতে হয়।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'আপনাদের কলেজে শাস্ত্রীয় সংগীত শেখার ছাত্র হয়? মানে, মফস্সল শহর বলে কথা।'

সন্তোষবাবু বললেন, 'তা হয়। শাস্ত্রীয় সংগীতে পুববাংলায় ইন্টারেস্টের তো অভাব নেই। এদিক থেকে বেশ কিছু বড়ো বড়ো শিল্পীও তৈরি হয়েছেন। আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবই তো পুববাংলার লোক। কাজেই কিছু জেনুইন ছাত্র কখনো কখনো জুটে যায়। আর তা ছাড়া কিছু খয়ের খাঁ আছেন, জমিদারবাবুদের খুশি করার জন্যে ছেলেকে গান শেখাতে পাঠান। তাঁদের সংখ্যাই বেশি।'

আমি বললুম, 'বাঃ ভালোই হল। রঙ্গলালবাবুর সঙ্গে আলাপ করা যাবে। শাস্ত্রীয় সংগীতে আমারও কিছু অনুরাগ আছে।'

সন্তোষবাবু হাত নেড়ে বললেন, 'সে হওয়ার যো নেই। আলাপ করতে চাও তো কলেজে যেতে হবে। এখানে ওনার সাধনমন্দিরে কোনো বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধ। কনসেনট্রেশন নষ্ট হয়ে যাবে— এই ভয়। আরে, ওই জন্যেই তো চারতলার ওই কুঠরিটা তৈরি করালেন। প্রথমে তো ও ঘরটা ছিল না। উনি আগে তোমার এই ঘরেই থাকতেন। কিন্তু, মেসের লোকেরা ছাদে এসে গল্পগুজব করত, কেউ কেউ জানলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারত, তাতে ওঁর খুব অসুবিধে হত। তাই এখন এমন কায়দায় ঘর করেছেন যে পাখি না-হলে কারুর পক্ষে জানলা দিয়ে উঁকি মারা সম্ভব নয় আর গভীর রাতে ওই সরু কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওঁর দরজায় টোকা দেওয়ার মতো মারাত্মক শখও কারুর নেই।'

'গভীর রাতে কেন?'

'উনি তো গভীর রাতে ঘরে অসেন। কলেজেই থাকেন রাত সাতটা-সাড়ে সাতটা

পর্যন্ত। তারপর বাড়ি যান, মানে জমিদার বাড়ি। সেখান থেকে খাওয়া-দাওয়া করে এখানে শুতে আসেন যখন, তখন অনেক রাত। কিন্তু মজা কী জানো, উনি যে কখন শোন, সেটা আমরা আজ পর্যন্ত বের করতে পারলুম না।'

'তার মানে?'

'মানে, সারা রাতের মধ্যে যখনই ঘুম ভাঙে, শুনি ওঁর ঘর থেকে কোনো-না-কোনো যন্ত্রের মৃদু সুর ভেসে আসছে। সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করে বাজান, যাতে কারুর বিরক্তি না-ঘটে, তবু শোনা তো যায়। তাই বলছিলুম, মাথায় ছিট আছে। কোনো সুস্থ-মস্তিষ্কের লোক দিনের-পর-দিন না ঘুমিয়ে বেঁচে থাকতে পারে? আমার তো বাপু পাক্কা আট ঘন্টা ঘুম না-হলে পরদিন কলেজে লেকচারের বদলে শুধু হাই।'

সন্তোষবাবুর কথায় একটা কথা বুঝতে পারলুম যে একটি বিচিত্র লোকের সান্নিধ্যে আমাকে এরপর কয়েক দিন কাটাতে হবে।

প্রথম দিন অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলুম। কাজেই বিছানায় শুতে-না-শুতেই ঘুম। ঘুম যখন ভাঙল, তখন ভোর হতে খুব বাকি নেই। আকাশ অন্ধকার বটে, কিন্তু প্রথম আলোর চরণধ্বনি শোনবার প্রত্যাশায় নিদ্রিত পৃথিবী যে আস্তে আস্তে জেগে উঠছে সেটা অনুভব করা যায়। আর তখনই শুনলুম, রঙ্গলালবাবুর ঘর থেকে ভেসে-আসা এসরাজের মৃদু গুঞ্জন। পরিচিত রাগ আশাবরী। কিন্তু কী চমৎকার হাত! দেহমন যেন এক প্রশান্ত আনন্দে ভরে গেল।

আমি বিছানা ছেড়ে উঠে আস্তে-আস্তে ছাদে চলে এলুম। পুব দিকে তখন খুব সামান্য রঙের ছোঁয়া লেগেছে। দু-একটা পাখি ডাকতে আরম্ভ করেছে। সেই নির্জন নিশাবসানের মধ্যে আশাবরীর সুরে আপ্লুত হয়ে আমি স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম।

যখন সুর থেমে গেল তখনও তার রেশ কাটল না। আমি যেমন দাঁড়িয়ে ছিলুম, তেমন দাঁড়িয়েই রইলুম। চমক ভাঙল কাঠের সিঁড়িতে একটি পদশব্দে। আমি মুখ তুলে রঙ্গলালবাবুকে দেখলুম।

রঙ্গলাল সার্থকনামা ব্যক্তি। অমন টকটকে গায়ের রং বাঙালির মধ্যে এর আগে বা পরে আর কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু ভদ্রালোককে খুব একটা সুপুরুষ বলা চলে না। মোটামুটি রোগাই বলা চলে, মাথাজোড়া টাক, কেবল দু-কানের পাশে একগুচ্ছ করে চুল, গর্তে বসা ছোটো ছোটো চোখ, চাপা নাক আর লাল টুকটুকে মোটা মোটা ঠোঁট, দেখলে মনে হয় যেন লিপস্টিক লাগানো। এককথায় দেখলে খুশি হয়ে ওঠার মতো চেহারা নয়।

কিন্তু, সেদিন সেইসময়ে আমার ভদ্রলোকের চেহারার কথা একবারও মনে হয়নি। একটু আগেই যে অসাধারণ সুর শুনলুম, তার শিল্পীকে চোখের সামনে দেখে আমার মনে একটা গভীর শ্রদ্ধার ভাব এল। আমি দু-হাত তুলে তাঁকে নমস্কার করলুম।

কিন্তু রঙ্গলাল প্রতি-নমস্কার করা দূরস্থান, কেমন একটা অদ্ভুত ভ্রূকুটিতে আমাকে অভিষিক্ত করে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলেন। সেটা বিরক্তি না-ভয় বুঝতে পারলুম না।

একটু বেলা বাড়তে আমিও নীচে গেলুম চায়ের সন্ধানে। সেখানে সন্তোষবাবুর সঙ্গে দেখা। ওঁকে রঙ্গলালবাবুর কথা বলতেই বললেন, 'তোমাকে তখনই বলিনি? ওঁর সঙ্গে এখানে আলাপ করার চেষ্টা বৃথা। ভদ্রলোক এমনিতেই একটু বেশি রকমের গম্ভীর। কলেজেও কথা বলেন খুব কম। কিন্তু, এ-বাড়িতে কথা একেবারেই বলেন না। তার অবশ্য কারণও আছে।'

আমি জিগ্যেস করলুম, 'কী কারণ?'

'কারণ দুটো। প্রথম, উনি এখানে আসেন সাধনা করতে। তখন কথা বলে নষ্ট করবার মতো সময় ওঁর থাকে না। দ্বিতীয়, এই মেসে যাঁরা আছেন, তাঁদের সংগীত সম্বন্ধে যা জ্ঞান সে সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভালো। আর একটু বেলা বাড়ুক, সবাই যখন কুয়োতলায় স্নান করতে যাবেন, তখন তাঁদের সংগীতচর্চা একটু শুনো। মানে, শুনতে তোমাকে হবেই। আর তখনই বুঝতে পারবে, কেন রঙ্গলালবাবু এঁদের সঙ্গে কথা বলতে চান না বা কথা বলতে ভয় পান।'

পরের দিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি পশ্চিমের জানলায় দ্বাদশীর চাঁদ হেলে পড়েছে। আমার সমস্ত ঘর একটা উজ্জ্বল কিন্তু বিষণ্ণ আলোয় ভরে রয়েছে। আমার মনে হল, আমার মনটাও যেন কেমন বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে, অনেকটা একটা করুণ অথচ মধুর স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম ভেঙে গেলে যেরকম হয়। যদিও তখন চারদিক নিস্তব্ধ, তবু বুঝতে পারলুম কোনো এক অনির্বচনীয় সংগীতের মধ্যে এতক্ষণ ডুবে ছিলুম, যেটা বন্ধ হতেই আমার ঘুম ভেঙে গেছে। আমার অবচেতন মন তখন তার রেশ বহন করে চলেছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করেছি, ঠিক তখনই ওপরতলার জানলার ভেতর দিয়ে একটি দিলরুবার চাপা অথচ মন্দ্র ঝংকার ভেসে এল। আমি উদগ্রীব হয়ে উঠলুম। আস্তে আস্তে সেই ঝংকার রূপ নিল যোগিয়ায়। আর সে কী অপরূপ রূপ! আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগলুম। বাজনা যখন থামল, তখন পশ্চিম আকাশ অন্ধকার করে চাঁদ অস্ত গিয়েছে, পুবের আকাশ নতুন দিনের সংবর্ধনার জন্যে প্রস্তুত।

আমি রোমাঞ্চিত দেহে মাতালের মতো টলতে টলতে বিছানা ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদের ওপরে এসে দাঁড়ালুম। ভোরের ঠান্ডা হাওয়ায় আমার সমস্ত শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। আমি পশ্চিম দিকের আলসের ওপর ভর দিয়ে দূরের ধান খেতের দিকে চেয়ে রইলুম যাতে আমার পেছনে যাঁর পায়ের শব্দ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে,

তাঁর ভ্রুভঙ্গি এই ভোরের বাতাস আর যোগিয়ার রেশটুকু নষ্ট করে দিতে না-পারে। পায়ের শব্দ ছাদের ওপর এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর নীচে নেমে গেল। বুঝলুম, রঙ্গলাল আমাকে দেখেছেন এবং বোধ হয় কালকের মতো একটা বিনীত নমস্কার আশা করেছিলেন। শুধু বুঝলুম না, নমস্কারটি না-পেয়ে তিনি খুশি হলেন কি না।

সন্তোষবাবু আমাকে দেখেই হই চই করে উঠলেন। বললেন, 'কী হে চিত্তপ্রসাদ, সারারাত ঘুমোওনি নাকি? চোখের তলায় কালি, মুখটা পাঁশুটে হয়ে রয়েছে। ওপরের বাজনায় ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে? তুমি বরং নীচে চলে এসো, আমার ঘরেই না-হয় একটা খাট পেতে দেওয়া যাবে। রাত্রে ঘুম না-হলে সারাদিন আদালতে কাজ করবে কী করে?'

আমি বললুম, 'ঘুম যে কম হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই সন্তোষবাবু, কিন্তু তার বদলে যা পাচ্ছি, সেটার তো কোনো তুলনাই হয় না। কী অসাধারণ হাত আপনাদের রঙ্গলালবাবুর! এমন গুণী লোক এখানে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছেন। কলকাতায় গেলে ওঁকে তো সকলে মাথায় করে রাখবে।'

সন্তোষবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'বটে বটে! তা, তোমার বাপু গানবাজনা সম্পর্কে দিব্যি জ্ঞান আছে দেখছি। তালিম টালিম নিয়েছ নাকি কোনো ওস্তাদের কাছে?'

আমি জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। তারাদাস গোস্বামীর কাছে আমার প্রথম হাতেখড়ি, এখন মাঝে মাঝে ওস্তাদ ওয়াহিদুল্লা খানের কাছে যাই।'

সন্তোষবাবু বেশ আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'তুমি তারাদাস গোঁসাই-এর ছাত্র? বলো কী? আমি যে গানের গ-ও জানিনে, আমিও তো তাঁর নাম শুনেছি। তবে তো তুমি সত্যি-সত্যিই কিছু জানো। ভারি আশ্চর্য ব্যাপার।'

আমি কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হয়ে বললুম, 'কেন? আশ্চর্য কীসের? আমার চেহারা দেখলে মনেই হয় না যে আমি গান সম্পর্কে কিছু জানতে পারি? কেন, আপনাদের ওই রঙ্গলালবাবুর মতো রঙ্গদার চেহারা না-হলে বুঝি সংগীতজ্ঞ হওয়া যায় না?'

সন্তোষবাবু প্রবলবেগে হাত নেড়ে সহাস্যে বললেন, 'আরে না, না। তোমার কথা আমি বলছিই না। আমি আশ্চর্য হচ্ছি অন্য কথা ভেবে।'

'কী কথা?'

সন্তোষবাবু একটু চিন্তা করে বললেন, 'আজ থাক। তোমাকে আর একদিন বলব।'

আমার মনে কেমন একটা ধাঁধা লেগে গেল, বললুম, 'দেখুন সন্তোষবাবু, আপনার মনের কথা এখন না-বলে যদি পরে বলতে চান, না-হয় তাই বলবেন। কিন্তু আপনাদের রঙ্গলালবাবু সম্পর্কে আর একটা প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে। সেটার কিন্তু জবাব চাই।

প্রশ্নটা হল— রঙ্গলালবাবু কি আপনাদের ভয় করেন? আপনাদের যে উনি এড়িয়ে চলেন, সেটা কী অহংকারে না কোনও একটা ভয়ে?'

আমার প্রশ্ন শুনে সন্তোষবাবু ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'এরকম একটা ধারণা তোমার হল কী করে?'

'গতকাল সকালে উনি যখন আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন, তখন আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল ওনার দৃষ্টিতে বিরক্তির চেয়েও ত্রাসটাই বেশি। পরে আবার আপনি বললেন, উনি আপনার মেসের বোর্ডারদের সঙ্গে কথা বলতে ভয় পান। তাইতেই আমার মনে প্রশ্নটা এল। সত্যিই কী উনি ভয় পান না কি? কীসের ভয়?'

সন্তোষবাবুর মুখে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসিটা ফিরে এল না। উনি পূর্ববৎ গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'কিছু মনে করো না চিত্তপ্রসাদ, তোমার এ প্রশ্নের জবাবও আমি দিতে পারলুম না। পরে হয়তো কোনোদিন দিতে পারব।'

'আচ্ছা, এ প্রশ্নটার জবাব দিতে তো আপত্তি নেই? ওঁর ঘরটা পরিষ্কার করে কে?'

'ওঃ, সে জমিদারবাড়িতে পূর্ণ বলে একটা কালা-বোবা চাকর আছে। সে দুপুর বেলা এসে ঝাঁটপাট দিয়ে যায়।'

'কালা-বোবা?' উত্তরটা শুনে আমি হতাশ হয়ে চুপ করে গেলুম।

সেদিন সারাদিনই কাছারিতে চিন্তিত হয়ে রইলুম। রঙ্গলালবাবুর ভেতরে কোথাও একটা রহস্য আছে। সন্তোষবাবু সেটা জানেন, কিন্তু চেপে যাচ্ছেন। কেন? রঙ্গলালাবাবুর পরিবারের কাছে চাকরি পাওয়ার কৃতজ্ঞতা বশত, না অন্য কোনো ব্যাপার? আর রহস্যটাই বা কী? জমিদারের ছেলে, গানবাজনা নিয়ে আছেন, কোনো অন্যায় বা অসামাজিক কাজ নয়, তারমধ্যে গোলমাল কী হতে পারে?

কৌতূহল বড়ো বিশ্রী জিনিস। একবার চেপে ধরলে, তার নিবৃত্তি না-হওয়া পর্যন্ত, চাপ বেড়েই চলে। স্বস্তি দেয় না কিছুতেই। কাজেই স্থির করে ফেললুম, এ রহস্যের সমাধান করতে হবে। তার আগে কলকাতায় ফেরা নেই।

এই স্থির করতে-করতেই চারটে বেজে গেল। কাছারি বন্ধ হওয়ার সময় হয়ে গেল। ভাবলুম, একবার রাজকলেজে যাই। সেখানে গিয়ে সোজাসুজি রঙ্গলালবাবুর সঙ্গে আলাপ জমাব। ভদ্রলোক যদি ভাগিয়ে দিতেও চান, ছাড়ব না। আমি উকিল, নাছোড়বান্দা হওয়া আমার পেশার একটা অঙ্গ।

এই ভেবে রাস্তায় বেরোতেই দেখি সন্তোষবাবু আর একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে দু-জনেই এগিয়ে এলেন। অপরিচিত ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে সন্তোষবাবু বললেন, 'চিত্তপ্রসাদ, ইনি আমাদের রাজকলেজের অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ। এঁকে তোমার

কাছে নিয়ে এলুম একটা কথা আলোচনা করব বলে। আজ সকালে তোমাকে যে কথাটা বলব বলব করেও বলতে পারিনি, সেটাই আর কী।'

আমি বললুম, 'বেশ তো। সে তো খুব ভালো কথা। তাহলে চলুন, ওই বেঞ্চিটাতে গিয়ে বসি।'

বেঞ্চিতে বসে আলাপচারি শুরু হল। সন্তোষবাবু বললেন, 'দ্যাখো চিত্তপ্রসাদ, নৃপেন্দ্রবাবুকে কেন এনেছি সে কথা আগে বলি। আমাদের এই থামলে সিংহরায় পরিবার ছাড়া শস্ত্রীয় সংগীতে এক্সপার্ট বলতে যদি কেউ থাকেন তো তিনি এই ভদ্রলোক।'

বলতেই নৃপেনবাবু প্রবলবেগে হাত নেড়ে প্রতিবাদ করে উঠলেন। বললেন, 'আরে না, না। শাস্ত্রীয় সংগীতের আমি কিছুই জানি না। আমার বাড়িতে একটা ফোনোগ্রাম আছে আর কিছু কে সি দে, ইন্দুমতী, কে মল্লিকের রেকর্ড আছে। তাতেই সকলের ধারণা হয়েছে যে আমি বুঝি মস্তবড়ো বোদ্ধা। ব্যাপারটা তা নয়। এক্সপার্ট হওয়াটা আসল কথা নয়, আসলে গান সম্পর্কে আমার কিছু ধারণা আছে আর সেই সূত্রেই আমাদের আপনার কাছে আসা।'

আমি ভীত হয়ে বললুম, 'কী সর্বনাশ! আমাকে গানটান গাইতে বলবেন না-তো?'

নৃপেনবাবু সহাস্যে বললেন, 'আপনি তারাদাস গোঁসাইজির ছাত্র। আপনাকে গাইতে বলব না, একথা তো জোর করে বলতে পারছি না। তবে, এখন নয়, এখন আমরা এসেছি রঙ্গলালবাবুকে নিয়ে কিছু কথা বলবার জন্যে। আচ্ছা, আপনি কি সন্তোষবাবুকে বলেছেন যে রঙ্গলালের অসাধারণ হাত, তার বাজনা অপূর্ব?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ বলেছি।'

'ঠাট্টা করে বলেছেন, না সত্যি-সত্যি?'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'ঠাট্টা হতে যাবে কেন? আমি তো ওঁর বাজনা শুনেছি। সত্যি, অসাধারণ বাজানোর হাত ওঁর।'

'কী শুনেছেন?'

'প্রথম দিন এসরাজে আশাবরী আর দ্বিতীয় দিন দিলরুবায় যোগিয়া।'

নৃপেনবাবুর মুখে এবার হাসি ফুটল। বললেন, 'ও, এই? আর দুটোই ভোররাতে ঘুম চোখে শুনেছেন তো? তাহলে ঠিকই আছে। আসলে, কথা কী জানেন? রঙ্গলাল ইদানীং কেমন একটু রহস্যময় হয়ে পড়েছে। তাই...'

আমি বললুম, 'আর-একটু খোলসা করে বলুন। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। গানবাজনার মধ্যে রহস্য আসে কোত্থেকে?'

'আচ্ছা, বেশ। আমি তাহলে যথাসাধ্য খোলসা করে বলছি। দেখুন, আমি আর রঙ্গলাল খুব ছোটোবেলাকার বন্ধু। আমরা এক পাঠশালায় পড়াশুনো করি, শেষ করি

একসঙ্গে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। এই সন্তোষ ঘোষাল আমাদের চেয়ে দু-বছরের জুনিয়ার, পরিচয় এই ঢাকাতেই। সন্তোষের সাবজেক্ট ছিল দর্শনশাস্ত্র, আমার ইংরেজি সাহিত্য আর রঙ্গলালের ইতিহাস। ঢাকার জগন্নাথ হলে একসময় আমরা তিনজনে বড়োই আনন্দে সময় কাটিয়েছি।

আমরা যখন পাশ করি, তখন কুলভূষণবাবু কলেজ খুলেছেন। কাজেই আমরা যে সবাই সদলবলে এসে সেই কলেজেই যোগ দেব, তাতে আর আশ্চর্য কী?

এ পর্যন্ত সবই ঠিকঠাক চলছিল। গোলমাল বাধল আজ থেকে বছরআষ্টেক আগে। তখন কুলভূষণবাবুর মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে বেনারস আর লখনউ-এর কিছু ওস্তাদ এসেছিলেন আমাদের এখানে। তাঁদের মধ্যে বুড়ো বীণাবাদক, ওস্তাদ ওরম অল-মালিক আর দুই বাইজি তামিমবানু আর হাফমাবানুর গানবজানা শুনে রঙ্গলাল হঠাৎ খেপে উঠল। এর আগে পর্যন্ত রঙ্গলালের সংগীতের প্রতি অতিরিক্ত রকমের কোনো অনুরাগ আমরা কখনোই দেখিনি, বরঞ্চ সুরজ্ঞানের অভাবই দেখেছি। সেই লোক এখন শাস্ত্রীয় সংগীত শেখবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল। কুলভূষণ স্বভাবতই মনে করলেন যে সুরের চেয়েও দুই বাইজির সুরতই রঙ্গলালকে আকৃষ্ট করেছে বেশি। অতএব, ছোটো ভাই শাস্ত্রীয় সংগীত শেখার প্রস্তাব করামাত্র কুলভূষণ তাকে আচ্ছা করে বকে দিলেন।

কিন্তু বকে কি আর সব সমস্যার সমাধান হয়? মহাসাংসারিক অশান্তি লেগে গেল। শেষপর্যন্ত কুলভূষণ ভাইয়ের প্রস্তাবে রাজি হলেন, কিন্তু এই শর্তে যে সে এখানে থেকেই গান শিখবে, ওই লখনউ-টখনউ যাওয়া চলবে না। অতঃপর রঙ্গলালের গুরু এলেন এখানে, ভগবান জানেন তাঁকে এখানে আনতে কুলভূষণের কত টাকা খরচ হয়েছিল। সেই গুরু আর কেউ নন, বুড়ো ওস্তাদ ওরম অল-মালিক।

ওস্তাদজি তাঁর শিষ্যকে প্রথমেই বীণা শেখালেন না কিন্তু। শুরু করলেন, এসরাজ আর দিলরুবা দিয়ে। আর শিষ্যও প্রবল উৎসাহে শিখতে আরম্ভ করে দিল। কুলভূষণবাবু কলেজের একটি ঘর ছেড়ে দিলেন ওঁদের। কিন্তু এই শেখানোটা বেশিদিন আর সুখপ্রদ রইল না। আমরা প্রায়ই শুনতুম, ওস্তাদজি চিৎকার করছেন, বকাবকি করছেন। যেন উনি যা দিতে চাইছেন, শিষ্য তা নিতে পারছে না।

এইভাবে দু-বছর কাটল। এর মধ্যে রঙ্গলাল চারটে রাগ শিখল— ইমন, জয়জয়ন্তী, যোগিয়া আর আশাবরী। তারপরেই ওস্তাদজি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেই অসুখ থেকে আর উঠলেন না। সারা থামলের লোক মিলে সেবা করেও কোনো লাভ হল না। তবে, সেই অসুখের মধ্যেও ওস্তাদজি শুনতুম বারংবার রঙ্গলালকে বলতেন, আমার দুঃখ রয়ে গেল, আমি তোমাকে তৈরি করে দিয়ে যেতে পারলুম না। আমি তোমাকে শেখাতে

পারলুম না কীভাবে প্রাণ ঢেলে বাজাতে হয়। তুমি খুবই মন দিয়ে বাজাও, তাতে তোমার সুরটা শুদ্ধ হয়, কিন্তু প্রাণ দিয়ে বাজাও না, তাই সেটা সুন্দর হয় না। সংগীতের উদ্দেশ্য— ব্যাকরণ মেনে কতগুলো সুরকে ঠিকমতো পর পর সাজানো নয়, তার উদ্দেশ্য— শ্রোতাকে একটা অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতায় দিয়ে যাওয়া। সেটা করতে হলে তোমার ভেতরের সবটুকু মাধুর্য ঢেলে দিতে হবে যে!

ওস্তাদজির মৃত্যুর পর রঙ্গলাল একদম পালটে গেল। সে গম্ভীর হয়ে গেল, তার ইতিহাসচর্চা, জমিদারি দেখাশুনো, সব বন্ধ হয়ে গেল। সবসময় সে ওই চারটে রাগের রেওয়াজ করে চলল। আমাদের বলত, আমি যেভাবে হোক মনপ্রাণ ঢেলে বাজাবই, গুরুজির সুর আমার কানে লেগে রয়েছে, সেই সুর তুলবই তুলব।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা করা এককথা আর সেটা পালন করা অন্য ব্যাপার। শত চেষ্টা করেও কিন্তু রঙ্গলালের বাজনার কোনো উন্নতি হল না। সেই একঘেয়ে বিরক্তিকর ঘ্যানঘ্যানানি বাজনা। আমি যে সামান্য গান বুঝি, আমার পক্ষেও বলা সম্ভব, যে ওর বাজনা কেবল খারাপ নয়, রীতিমতো অসহ্য।'

আমি নৃপেনবাবুকে এইখানে বাধা দিয়ে জিগ্যেস করলুম, 'তাই যদি হবে, তাহলে উনি শেখান কী করে?'

নৃপেনবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আর কী করে! তিন বছর আগে কুলভূষণবাবু ওই একটা মিউজিক ডিপার্টমেন্ট খুলেছেন মূলত বোধ হয় ভাইকে কিছুটা কাজেকর্মে রাখার জন্যে। নইলে, ভাইটা পাগল হয়ে যাবে, এই ভয় ছিল বোধ হয়। আর ভাইও সেরকমই শেখাচ্ছেন। কোনো ছাত্রই তো দেখলুম পাঁচ-ছয় মাসের বেশি টিকছে না। তবে কী জানেন, রঙ্গলাল ভালো বাজান কী খারাপ বাজান তাতে আমাদের কিছু যায়-আসে না। কিন্তু, মানুষটা যদি পালটে যায়, তবে বন্ধু হিসেবে অবশ্যই যায়-আসে। সেইজন্যেই সন্তোষের কাছে আপনার মন্তব্য শুনে আমি এখানে দৌড়ে এসেছি। তবে কি, রঙ্গলালের সাধনা এতদিনে সফল হল? আমি তো কিছুদিন আগেই শুনেছি, তখন তো কোনো পরিবর্তন লক্ষ করিনি। তবু হয়তো হতেও পারে। তাহলে, এইবার ওকে স্বাভাবিক জীবনে টেনে আনা যেতে পারে। কিন্তু, আপনার কথা শুনে বুঝলুম, আমাদের আশা অমূলক। আধ ঘুমের মধ্যে আপনি যা শুনেছেন সেটা বেশিরভাগই আপনার কল্পনা।

তবে সব রহস্যের যে সমাধান হল, তা নয়। প্রথমত, বছরদুয়েক আগে যবে থেকে রঙ্গলাল ওই চারতলার ঘরটায় আশ্রয় নিয়েছে, তবে থেকে ও কেমন একটা সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে। কীসের যেন ভয়। প্রশ্ন করেও জবাব পাইনি। আর আজকাল তো আমাদের সঙ্গে কথাবলাই বন্ধ করে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সন্তোষের কাছে শুনেছেন নিশ্চয়ই সারারাত ওই ঘর থেকে বাজনার শব্দ

আসে। তবে কি ও একদম উন্মাদ হয়ে গেছে? অথচ কথা যখন বলে তখন তো বেশ স্বাভাবিক মনে হয়।

তৃতীয়ত, আপনি আসার বছরখানেক আগে ওই ঘরে কিছুদিন থেকে গিয়েছেন কুলভূষণবাবুর এক বন্ধু হরিনাথ চাটুয্যে। হরিনাথবাবুর নাম আপনি শুনে থাকবেন, এককালে উনি বেশ ভালো হারমোনিয়াম বাদক বলে পরিচিত ছিলেন। উনি যাওয়ার সময় কুলভূষণকে যা বলে গেছেন, তা প্রায় আপনি যা বলেছেন তাই, কেবল অতিরিক্তের মধ্যে রয়েছে ওই যে চারটে রাগের নাম বললুম, সেগুলো ছাড়াও আরও কিছু দুষ্প্রাপ্য এবং দুরূহ রাগও নাকি তাঁর কানে এসেছিল। তা, হরিনাথ চাটুয্যে তো আবার নেশাটেশা করার ব্যাপারেও কিছু কম যান না। কাজেই অতিরিক্তটুকু বাদ দিলে যা থাকে, তাতে বোঝা যাচ্ছে, তিনিও আপনারই মতো কল্পনার শিকার হয়েছিলেন।'

নৃপেনবাবু যত সহজে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে গেলেন, আমার পক্ষে কিন্তু সেটা সম্ভব হল না। যে সুর আমি শুনেছি, সেটা অর্ধঘুমন্ত মস্তিষ্কের কল্পনা বা হরিনাথ চাটুয্যে শুনেছিলেন সেটা আফিমের নেশা থেকে উদ্ভূত— এটা চট করে মেনে নেওয়া কঠিন। তাহলে, সমস্ত ঘটনাটার একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা থাকা দরকার।

এক হতে পারে রঙ্গলালের খারাপ বাজানোটা একটা বাইরের ধোঁকার টাটি। তিনি একলব্যের মতো নিভৃতে সাধনা করে চলেছেন এবং যতদিন না পারফেকশনে পৌঁছবেন ততদিন তিনি আত্মগোপন করেই থাকবেন। কিন্তু, সেখানে প্রশ্ন থাকে, তাহলে তাঁর এত ভয় কীসের? তিনি যদি ধরা পড়েও যান যে তিনি সত্যি-সত্যি খারাপ বাজান না, তাহলে কি তাঁর কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা আছে? কী ধরনের ক্ষতি? সারারাত ধরে বাজানোই বা কেন? লোকজনের কাছ থেকে এত দূরে-দূরে থাকাই বা কেন?

আর-এক হতে পারে, হয়তো রাত্রের বাজনাটা রঙ্গলাল বাজানই না। বাজায় অন্য কেউ। গানপাগল রঙ্গলাল হয়তো কাউকে এনে আটকে রেখেছেন ওই ঘরে। সে-ই সারারাত বাজায় আর রঙ্গলালের সুরের পিপাশা মেটায়। ব্যাপারটা বেআইনি, তাই রঙ্গলালের এত ভয়। কিন্তু, দু-বছর ধরে একজন লোককে এভাবে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রাখা কি সম্ভব?

এইসব ভাবতে ভাবতে মেসে ফিরছিলুম। আগেই বলেছি, মেসে আসতে গেলে রাজকলেজের মাঠের পাশ দিয়ে আসতে হয়। সেখানে আসতে একটি ছেলে আমাকে ডাকল। বলল, 'আপনিই তো চিত্তপ্রসাদ রায়? মাস্টারমশাই আপনাকে একবার ডাকছেন।'

'কোন মাস্টারমশাই?'

'আমাদের গানের মাস্টারমশাই। তিনি ওই দোতলার কোণের ঘরটায় আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

অর্থাৎ রঙ্গলাল। ভালোই হল। আমিই গিয়ে আলাপ করব ভাবছিলুম, এখন তো দেখছি তিনিই স্বয়ং ডেকে পাঠিয়েছেন। অতএব, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলুম দোতলার কোণের ঘরের উদ্দেশে।

সেটাই মিউজিক ডিপার্টমেন্ট। সারা ঘর জুড়ে গালিচা পাতা, তার ওপর ইতস্তত কিছু সেতার, এসরাজ, হারমোনিয়াম ইত্যাদি পড়ে রয়েছে। একধারে কয়েকটা আলমারি ভরতি কিছু বই আর খাতাপত্র। তাদের সামনে একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গালচের ওপর আড় হয়ে শুয়েছিলেন গতকাল ভোরে মেসের ছাদে দেখা সেই ভদ্রলোক। আমাকে দেখে তিনি সোজা হয়ে বসলেন। একটা হাত অলসভাবে সামনে মেলে দিয়ে বললেন, 'বসুন।'

আমি একটা নমস্কার করে তাঁর সামনে বসে পড়লুম। রঙ্গলাল তার কোনো প্রত্যাভিবাদন না-করে কিছুক্ষণ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখে বললেন, 'আপনি গান কিছু বোঝেন?'

আমি মৃদু হেসে বললুম, 'খুবই সামান্য।'

এবারে রঙ্গলালের দৃষ্টিটা কিছু কঠিন হল। বললেন, 'তাহলে যা বোঝেন না, তার ওপরে মন্তব্য করেন কেন?'

'কোন মন্তব্য?'

'আপনি নৃপেনকে বলেছেন যে রাত্রে আপনি যে বাজনা শুনেছেন, তা অপূর্ব এবং অতুলনীয়? কে আপনাকে এসব বিশেষণ প্রয়োগ করতে বলেছে? যা জানেন না বা যা বোঝেন না, তা নিয়ে আমাদের জমিদারিতে দয়া করে কোনো কথা বলবেন না। আমি কোনোরকম বাচালতা সহ্য করতে রাজি নই।'

অর্থাৎ রঙ্গলাল ভয় দেখিয়ে আমাকে চুপ করাতে চাইছেন। কিন্তু অত সহজে ভয় আমি কোনোদিনই পাইনে। তাই সহজভাবেই বললুম, 'রঙ্গলালবাবু, আপনার বয়েস আমার চেয়ে অনেক বেশি সন্দেহ নেই, কিন্তু যে শাস্ত্রে আপনার শিক্ষা মাত্র দু-বছরের আর সাধনা আট বছরের, সেখানে আমার জমার দিকে পাল্লা কিন্তু অনেক ভারী। আমি তারাদাস গোস্বামীর কাছে ধ্রুপদ আর ধামার শিখেছি আট বছর আর ওস্তাদ ওয়াহিদুল্লার কাছে খেয়াল, তারানা আর ঠুংরির শিক্ষা চলেছে তা-ও কেননা বছর চারেক হবে। সেক্ষেত্রে কোন বাজনার ব্যাপারে আমি কী বিশেষণ প্রয়োগ করব, তার বিচার আপনি বোধ হয় করতে পারেন না, তাই না? আপনি বাচলতা সহ্য করতে পারুন বা না-পারুন, যে সুর আমি গত দু-রাত আপনার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে শুনেছি, তা যে অপূর্ব এবং

অতুলনীয়, তা আমি বলবই। আর সে সুরের সৃষ্টিকর্তা যদি আপনি হন, তাহলে চিরকাল আপনার পায়ে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাব।'

আমি আশঙ্কা করেছিলুম, আমার উকিলি বক্তৃতা শুনে রঙ্গলাল তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবেন। কিন্তু তা হল না। ভদ্রলোক আবার তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আড় হয়ে পড়লেন। বিষণ্ণ হেসে বললেন, 'আচ্ছা, মেনে নিলুম আপনি পণ্ডিত ব্যক্তি। কিন্তু, তাহলে বলুন তো, মাত্র দু-বছরের শিক্ষা যার, সে কি অপূর্ব বা অতুলনীয় সুর সৃষ্টিতে সক্ষম?'

আমি আবার হেসে বললুম, 'আপনার আট বছরের নিরলস সাধনার কথাও আমি জানি রঙ্গলালবাবু।'

'সবই তো জানেন, দেখছি। শুধু এই কথাটাই জানেন না যে এ ব্যাপারে আমি কোনোরকম কথাবার্তা বা আলোচনা পছন্দ করি না। যা আমার একান্ত ব্যক্তিগত, তা আমারই থাক না।'

এবার কিন্তু আমার হাসি বন্ধ হল। রঙ্গলালের বলার মধ্যে এমন একটা অসহায় আর্ত অনুরোধ ছিল যে, আমি কিছুটা অভিভূত না-হয়ে পারলুম না। বললুম, 'বেশ। আপনি যদি এ ব্যাপারে কোনো আলোচনা পছন্দ না-করেন, না-হয় তা না-ই করা যাবে। কিন্তু এভাবে নিজেকে লুকিয়ে রাখছেন কেন? তাতে আপনার লাভ কী?'

রঙ্গলাল এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পালটা প্রশ্ন করলেন, 'আমার বাজনা আপনার ভালো লেগেছে, নয়? কতটা ভালো?'

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'অত্যন্ত ভালো— অসাধারণ! কিন্তু এ প্রশ্ন কেন?'

রঙ্গলাল আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আপনার কৌতূহল নিবারণ করার ক্ষমতা আমার নেই, চিত্তপ্রসাদবাবু। করতে পারলে হয়তো ভালোই হত। কিন্তু তা হওয়ার নয়। যা চলছে, তাই চলাই ভালো। হয়তো তাতে আপনার ঔৎসুক্য কমবে না, কিন্তু আপনার মঙ্গলই হবে।'

এরপর আর কোনো প্রশ্নেরই জবাব পাইনি সেদিন। কেন তিনি আমার কৌতূহল মেটাতে পারবেন না এবং না-মিটলে কেনই বা আমার মঙ্গল, তা আর তখন জানা হল না। যদি জানতুম যে রঙ্গলাল যা বলছে, তা অসত্য বা কোনো কিছু চেপে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, তাহলে হয়তো আর এগোতুম না কিন্তু তা তো হল না। ওঁর গোপনীয়তা, অনাবশ্যক ভয়, কোনো কিছু আশঙ্কা এবং সকলকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা— সবকিছু মিলে আমার মনের মধ্যে একটা অদম্য কৌতূহল জাগিয়ে তুলল। তার ওপর আমার উকিলি সত্ত্বা বারংবার বলতে লাগল, এতসবের পেছনে নিশ্চয়ই কোনো অসামাজিক বা অনৈসর্গিক পাপ লুকিয়ে আছে। আজ ভাবি, আমার উকিল আমিটাকে যদি তখন দমিয়ে রাখতে পারতুম, হয়তো তাহলে ভালোই হত।

সে রাত্রে স্বভাবতই ঘুমোব না বলে স্থির করে ফেললুম। মাথার কাছে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বেলে সখারাম গণেশ দেউস্করের *দেশের কথা* পড়তে শুরু করে দিলুম।

রঙ্গলাল যে কখন ওপরে গেলেন, টেরই পাইনি। হঠাৎ সেতারের ঝংকারে চমক ভাঙল। নৃপেনবাবুর কথা মনে পড়ল, সেতার বাজার তো কথা নয়। আর তারপর সেই ঝংকারের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে রূপ নিল মারোয়া। আমি নেশাগ্রস্তের মতো শুয়ে শুয়ে সেই অপূর্ব সুরের তরঙ্গে ডুবে যেতে লাগলুম। আবার নৃপেনবাবুর কথা মনে পড়ল, যে চারটে রাগের তিনি নাম করেছিলেন— এটি তো তাদের একটিও নয়।

কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার সেদিন আরও বাকি ছিল। কখন যেন মারোয়া শেষ হয়ে গেল। গভীর রাত্রে ওপরের ঘর থেকে গুঞ্জরিত হয়ে এল এক অশ্রুতপূর্ব সুর। আমার মনে হল, কানাড়ার কোনো একটা বিশেষ রূপ, কিন্তু কী রূপ তা বুঝতে পারলুম না। কৌশিকী কানাড়া নামটির সঙ্গে আমার পরিচয় হয় বহু বছর পরে, কলকাতায়।

তবে, নাম না-জানা থাকলেই বা কী? অমন আশ্চর্য সমস্ত অনুভূতি অবশ করা সুর যে হতে পারে, তা আমার আগে জানা ছিল না। আমি আচ্ছন্ন হয়ে সেই সুরের মাধুর্যে ডুবে যেতে লাগলুম।

তারপর সারারাত ধরে চলল আরও কত সুরের বিস্তার। তাদের একটিও নৃপেনবাবুর দেওয়া লিস্টের অন্তর্ভুক্ত নয়। রাত শেষ হল ললিতের মধ্য দিয়ে। আমি তৃপ্ত মুগ্ধ মনে বাইরে এসে দাঁড়ালুম। জীবনে খুব কম সময়ই নিজেকে অমন সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

ভেবেছিলুম, রঙ্গলাল রোজকার মতো সেদিনও আমার সঙ্গে বাক্যালাপ না-করে নীচে চলে যাবেন। তই আলসের ওপর ভর দিয়ে পুবের আকাশে অপসৃয়মাণ অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিলুম। কিন্তু রঙ্গলালের পায়ের শব্দ নীচে যাওয়ার সিঁড়ির দিকে না-গিয়ে আমার পেছনে এসে থামল। আমি ঘুরে দাঁড়ালুম।

রঙ্গলাল একটু কুণ্ঠিত হাসি হাসলেন। বললেন, 'আজ কীরকম শুনলেন?'

আমি বললুম, 'এটা নিতান্তই অবান্তর প্রশ্ন রঙ্গলালবাবু। যা শুনেছি, তা অতুলনীয়। এ এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।'

রঙ্গলাল লোভার্ত অথচ কাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার বাজনা আপনার কাছে অতুলনীয়, অবিস্মরণীয় বলে মনে হয়েছে?'

'হ্যাঁ, রঙ্গলালবাবু। আপনি বিশ্বাস করুন, আপনার মতো ধনী আজ আমাদের দেশে বড়ো বেশি নেই। আপনি এই পরিবেশের বাইরে এসে দাঁড়ান, দেখবেন সমস্ত দেশ আপনাকে কতখানি সম্মান দেয়।'

রঙ্গলাল করুণ হাসলেন। বললেন, 'না তা হয় না চিত্তপ্রসাদবাবু।'

আমি অধৈর্য হয়ে বললুম, 'কেন হয় না?'

রঙ্গলালের মুখে আবার সেই ভীত, সন্ত্রস্ত ভাবটা ফিরে এল। বললেন, 'কারণ এই সুরের স্রষ্টা আমি নই, চিত্তপ্রসাদবাবু। এই সুর আমার ভেতরে আসে। কোত্থেকে আসে জানি না। আমাকে দিয়ে কেউ বাজায়। আমার যন্ত্রটার মতো আমিও তখন একটা যন্ত্র হয়ে যাই।'

আমি মৃদু হেসে বললুম, 'সব স্রষ্টাই এই কথাই বলেন, রঙ্গলালবাবু। শিল্পে-সাহিত্যে-সংগীতে সব সৃষ্টির মূলেই নাকি থাকে কোনো অতীন্দ্রিয় অলৌকিক অনুপ্রেরণা। অনেক বিখ্যাত গায়কই তাঁদের অনন্যসাধারণ সংগীত সৃষ্টির পর বলেছেন যে, তাঁরা যে কী গেয়েছেন, তা তাঁদের মনে নেই। যেন অন্য কেউ তাঁদের ওপর ভর করে এই সংগীতের জন্ম দিয়েছেন— এটা খুবই স্বাভাবিক রঙ্গলালবাবু।'

আমার কথায় রঙ্গলাল খুব একটা সান্ত্বনা পেলেন বলে মনে হল না। কিছুক্ষণ বিষণ্ণ মুখে চুপ করে রইলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'কী যে স্বাভাবিক, আর কী অস্বাভাবিক, তা বোঝবার মতো ক্ষমতা আমার নেই। কীসের ঘোরে চলেছি, কোথায় এর শেষ, জানি না। তবু আপনার কাছে প্রশংসা পেলুম, এটাই লাভ। আমার হাত দিয়ে কখনো-কখনো সুন্দর সুশ্রাব্য বাজনা বেরোয়, সেটা জানতে পারাই তো মস্তবড়ো পুরস্কার।'

বুঝতে পারলুম, রঙ্গলালের কাছে প্রকৃত সমঝদারের প্রশংসা মোটেই সুলভ নয়। এই শহরে তেমন সমঝদারও আসেন না, আর তাঁর বন্ধুবান্ধবের মনে তাঁর খারাপ বাজনার যে স্মৃতি আছে, সেটাও যাবার নয়। কাজেই প্রশংসা-প্রত্যাশী তাঁর শিল্পীমন অতৃপ্তই থেকে যায়। ভাবলুম, সেই প্রত্যাশাটাই বাড়িয়ে তোলা যাক, দেখা যাক ওঁর সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওঁর সামনে বসে বাজনা শোনার অনুমতি আদায় করা যায় কি না। তাতে দুটো লাভ। এক, একজন গুণী শিল্পীর সামনে বসে বাজনা শোনার অভিজ্ঞতা। দুই, রহস্য যদি কিছু থাকে, তবে তার উদ্ঘাটন।

কাজেই রঙ্গলালকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললুম, 'কী যে বলেন, তার ঠিক নেই। আমি কলকাতার লোক, সারা ভারতের হেন বড়ো শিল্পী নেই যাঁর সংগীত আমি শুনিনি। সেই অভিজ্ঞতার জোরেই বলছি, আপনার বাজনা অত্যন্ত সুন্দর। তবে একটা কথা...'

রঙ্গলাল ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলেন, 'কী কথা?'

'মানে, আপনার বাজনা তো শুনেছি, বন্ধ জানলার ভেতর দিয়ে, খাটে শুয়ে শুয়ে। এতে তো ঠিক রস পাওয়া যায় না, যার ফলে বাজনাটা কতদূর ভালো হল, তারও সঠিক মান বের করা যায় না। যদি সামনে বসে শুনতে পেতুম তাহলে...'

রঙ্গলাল প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বললেন, 'না, না, তা হয় না।'

আমি মৃদু হেসে বললুম, 'আমি আপনাকে একটুকুও বিরক্ত করতুম না। আমি অনেক ঘরোয়া আসরে একেবারে সামনে বসে ওস্তাদ মাহফুজ খান, ওস্তাদ ইমরাৎ হুসেন, পণ্ডিত শংকরলাল— এঁদের বাজনা শুনেছি। এতে আমার অভিজ্ঞতা আছে। আপনার কোনো অসুবিধে হত না।'

রঙ্গলালের দুই চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। বললেন, 'এঁদের গান আপনি একদম সামনে বসে শুনেছেন? নিশ্চয়ই সে-অভিজ্ঞতার কথা আপনার চিরকাল মনে থাকবে?'

'অবশ্যই থাকবে এবং সেইসব অভিজ্ঞতার সঙ্গে আপনার সামনে বসে গান শোনাটাও যোগ দিয়ে নিতে চাই রঙ্গলালবাবু।'

উত্তেজনাসংহত গলায় রঙ্গলাল বললেন, 'এঁদের সঙ্গে আপনি আমার তুলনা করছেন চিত্তপ্রসাদবাবু?'

'হ্যাঁ, এবং আমার এতটুকুও ভুল হয়নি, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

হঠাৎ সব সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল। রঙ্গলাল দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'বেশ, তাই হবে। আমি আজ রাত্রি বেলা ঘরে ফেরার সময় আপনাকে ডেকে নেব। আপনি যেন ঘর ছেড়ে কোথাও যাবেন না।'

রঙ্গলালের ঘরে ঢুকতেই মনে হল, এ ঘরের জানলা বোধ হয় কোনোদিন খোলা হয় না। একটা স্যাঁতসেঁতে, বাসি গন্ধ সারা ঘরটাকে একটা অন্ধকূপের মতো করে রেখেছে। ঘরটার একপাশে একটা খাট, তার ওপর সাদা চাদরে ঢাকা বিছানা। খাটের সামনে মোটা কার্পেট বাকি মেঝেটাকে ঢেকে রেখেছে; কার্পেটের ওপর নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র, সেতার, সরোদ, দিলরুবা, বেহালা আরও কত কী। আর এপাশে-ওপাশে ছড়ানো কিছু তাকিয়া।

আমি সন্তর্পণে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলুম। ঘরে অন্য কোনো লোকের অস্তিত্ব টের পেলুম না।

রঙ্গলাল একটা বড়ো ল্যাম্প জ্বালালেন, তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। আমি বললুম, 'জানলাগুলো খুলে দিই?'

বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়ালেন রঙ্গলাল। চাপা গলায় বললেন, 'না। চুপ করে এখানে বসুন।'

জানলা খুলতে বলায় ভদ্রলোক এতটা খেপে উঠবেন বুঝিনি। ভাবলুম, তীরে এসে তরী ডোবে বুঝি। তাই তাড়াতাড়ি বললুম, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে রঙ্গলালবাবু। এই বসছি।'

রঙ্গলাল আমার সামনে কার্পেটের ওপর বসলেন। একটা এসরাজ টেনে নিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বোধ হয় স্বর্গস্থ গুরুকে নমস্কার জানালেন। তারপর ছড় দিয়ে তারের ওপর লাগালেন টান।

যে সুরটা বের হল, সেটা একেবারেই আনন্দবর্ধক নয়। রাগটা যে জয়জয়ন্তী সেটা বুঝলুম, কিন্তু সেটা যতই এগোতে লাগল, ততই আমি বিমর্ষ হয়ে পড়তে লাগলুম। একেবারে শিক্ষানবীশ হাত, যেকোনো গানের ইশকুলের প্রথম শ্রেণির ঘরের পাশ দিয়ে গেলে এরকম শব্দ শোনা যায়।

কিন্তু বাজনা যতই নিম্নমানের হোক না-কেন, আমার কীরকম মনে হতে লাগল, এটা ধোঁকার টাটি, আসল বস্তু ক্রমশ প্রকাশিতব্য। ধৈর্যং, রহু, ধৈর্যং। সবুরে নিশ্চয়ই মেওয়া ফলবে।

বেশিক্ষণ সবুর করতে হল না। রঙ্গলাল বাজাতে বাজাতে মাঝে মাঝে উজ্জ্বল চোখ তুলে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। বোধ হয় আমার মুখের ভাব দেখে, আমার মনের কথা বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে ওঁর চোখের পাতা ভারী হয়ে এল, মাথাটা একটু সামনের দিকে নুয়ে পড়ল। আর সেইসঙ্গে ওঁর শিক্ষানবীশ হাত থেকে জয়জয়ন্তী একটা অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যময় পরিণতির দিকে এগিয়ে চলল। এই পরিবর্তনটা আসতে যে কত সময় লেগেছিল তা বলতে পারব না, কিন্তু হঠাৎ আমি অনুভব করলুম আমি সুরের মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি।

সেইসঙ্গে আরও একটা অনুভূতি আমায় অধিকার করে ফেলল। সেটা কিন্তু আনন্দের নয়, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত। বন্ধ ঘরের হাওয়াটা যেন ভারী হতে হতে জগদ্দল পাথরের মতো আমার বুকের ওপর চেপে বসল। আমার মনে হতে লাগল যেন আমি একটা আলো-বাতাসহীন অন্ধকার কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছি, সেখানে জলের বদলে রয়েছে সুর— আমি তার মধ্যে ডুবে যাচ্ছি। একটু আলো, একটু মুক্ত বাতাসের জন্য আমার সমস্ত সত্ত্বা আকুলিবিকুলি করতে লাগল। মনে হল, এখুনি কিছু না-করতে পারলে আমি বোধ হয় মরে যাব।

প্রাণের দায়ে আমি উঠে দাঁড়ালুম। আমার এই অস্বস্তির মধ্যেই কখন যেন রঙ্গলাল জয়জয়ন্তী শেষ করে কৌশিকী কানাড়া ধরেছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি তাঁর বিরলকেশ মাথাটা আরও সামনে ঝুঁকে পড়েছে, মুদিতচক্ষে বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত হয়ে তিনি বাজিয়ে চলেছেন। ভাবলুম জানলাগুলো খুলে দিই, উনি টেরও পাবেন না। আজ পূর্ণিমা, বাইরের পৃথিবীটা চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। সেই প্রকৃতিকে বাইরে আটকে রেখে এই বদ্ধ ঘরের ক্লেদাক্ত বাতাসে দমবন্ধ হয়ে কষ্ট পাওয়ার কোনো মানেই হয় না।

তাই যথাসাধ্য নিঃশব্দে গিয়ে আমি পশ্চিমের জানলাটা খুলে দিলুম। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত দিগন্তবিস্তৃত মাঠ দেখব এই আশায়। কিন্তু কী দেখলুম? কোথায় তারাভরা আকাশ, কোথায় আদিগন্ত মাঠ, কোথায় জ্যোৎস্না? এ আমি কোথায়? সামনে ও কী?

আসলে, আমি যে কী দেখছিলুম তা আমি নিজেই ভালো করে বর্ণনা করতে পারব কি না জানি না। কিন্তু আজও চোখ বুজলে সেই ভয়ংকর দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসে।

কীরকম জানেন? আমার মনে হল যেন জানলার বাইরে একটা নীলাভ ধূসর ম্লান দ্যুতিময় কুয়াশার স্তর, সেটা নড়ছে-চড়ছে, তালগোল পাকাচ্ছে, কখনো উজ্জ্বলতায় বাড়ছে, কখনো কমছে। আর সেই স্তরের পেছনে কতগুলো আবছায়া শরীর। কী তাদের অবয়ব, কী তাদের রূপ, কিছুই বোঝা যায় না; কিন্তু তারা যে আছে তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। অনেকটা বড়ো স্টেজের ভেতরে বসে সামনে দর্শকদের দিকে তাকালে যেরকম মনে হয়। চোখের ওপর ফুটলাইনের একটা পর্দা মতন পড়ে, তার ওপারে দর্শকদের মুখ দেখা যায় না কিন্তু তাদের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। কিন্তু থিয়েটারের স্টেজের সঙ্গে সেদিনের জানলার বাইরেটা একটা তফাত ছিল। স্টেজের দর্শকরা মানুষ, অভিনয় শুরু হলে তাঁদের অস্তিত্বের সঙ্গে অভিনেতার একটা মানসিক যোগাযোগ শুরু হয়। কিন্তু সেই জানলার বাইরে সেদিন যারা দর্শক বা শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিল, তারা যে রক্তমাংসের মানুষ নয়, সেটা একমুহূর্তেই প্রতীয়মান হল আমার কাছে। শুধু তাই নয়, তারা যে কেবল অপার্থিব তাই নয়, আমি অনুভব করলুম তারা কুৎসিত, অশুভ দূষিত কোনো সত্ত্বা। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত কদর্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন কোনো মালি যেমন বাগানে অসাধারণ ফুল ফুটিয়ে তার সৌন্দর্য উপভোগ করে, তেমনই এরাও রঙ্গলালের হাত দিয়ে সুরসৃষ্টি করে তার রসাস্বাদন করছে। কিন্তু তাই বলে রঙ্গলালের প্রতি তাদের কিছুমাত্র মমতা নেই। শুধু রঙ্গলাল কেন, কোনো কিছুর প্রতিই এদের মমতা নেই। এদের সমগ্র অস্তিত্বটাই অমঙ্গলজনক, ক্লেদাক্ত, ভয়ংকর। সেইসঙ্গে কুয়াশার মধ্যে তাদের সরীসৃপের মতো নড়াচড়া আমি অনুভব করলুম, জানলাটা খুলে দেওয়ায় তাদের মধ্যে বীভৎস উল্লাসও যেন দেখতে পেলুম। আর সেই মনে হল, সেই স্পন্দমান কুয়াশার স্তরটা যেন দুলতে দুলতে ঘরের ভেতরে ঢুকে আসছে।

আমি ভীষণ আতঙ্কে জানলা থেকে ছিটকে এলুম। তখন মনে একটাই চিন্তা এ-ঘর থেকে পালাতে হবে। পেছনে তখন রঙ্গলাল প্রবল জলদে সুর ধরেছেন। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁর কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললুম, 'রঙ্গলালবাবু, শিগগির চলুন, এখান থেকে পালাই।' আর তার পরমুহূর্তেই আর্তনাদ করে আমি দরজাটার ওপর আছড়ে পড়লুম। রঙ্গলালের গায়ে হাত দিয়েই আমি বুঝতে পেরেছিলুম তিনি মৃত। বরফশীতল তাঁর শরীর কাঠের মতো শক্ত। তাতে জীবনের চিহ্নমাত্র নেই। একটা যন্ত্রের মতো তাঁর প্রাণহীন প্রকোষ্ঠ বাজিয়ে চলেছে কৌশিকী কানাড়া।

কী করে যে দরজার খিল খুলেছিলুম জানি না। শুধু মনে আছে দরজাটা খুলতেই চোখের ওপর এসে পড়ল জ্যোৎস্নার আলো আর আমি জ্ঞান হারিয়ে সিঁড়ির ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে গেলুম।

জ্ঞান ফিরল পরদিন সকালে সদর হাসপাতালে। আমার পাশে তখন নৃপেনবাবু আর সন্তোষবাবু বসে। জানতে পারলুম, আমার সিঁড়ির ওপর থেকে পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে কয়েক জন বোর্ডার দৌড়ে ওপরে আসেন। তাঁরা দেখেন রঙ্গলালের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, বাজনা চলছে আর সিঁড়ির নীচে অজ্ঞান আমি। ওঁরা রঙ্গলালকে ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া না-পেয়ে আমাকে নামিয়ে এনে হাসপাতালে পৌঁছে দেন আর সেইসঙ্গে কুলভূষণবাবুকে খবর দেন। কুলভূষণ হাসাপাতালে আমাকে দেখে যখন টিচার্স মেসে গিয়ে পৌঁছোন, তখনও রঙ্গলালের ঘরের দরজা বন্ধ কিন্তু বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে। পুনরায় ডাকাডাকিতে কোনো সাড়া না-পেয়ে কুলভূষণের আদেশে দরজা ভেঙে ফেলা হয় এবং দেখা যায় ঘর শূন্য।

কুলভূষণ সন্দেহ করেছিলেন রঙ্গলাল হয়তো জালনা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও তাঁর মৃতদেহ কোথাও পাওয়া যায়নি। তবে শুনেছি, পুলিশ নাকি আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়েছিল, কিন্তু কুলভূষণ তাঁর প্রভাব বিস্তার করে তাদের নিরস্ত করেন এবং শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও আমাকে কোনোদিন কোনো প্রশ্ন করেননি।

তিনি কি কিছু জানতেন? জানি না। আর আপনাদের মতো সে যুগে অন্য ডাইমেনশান সম্পর্কেও আমাদের কোনো জ্ঞান ছিল না। আমাদের জগতের সঙ্গে অন্য জগৎও যে সম্পৃক্ত হয়ে থাকতে পারে, আমাদের অনুভূতির বাইরেও যে জীবন থাকতে পারে, এসব থিয়োরি আমরা কখনো কল্পনাও করিনি। কাজেই রঙ্গলালের হারিয়ে যাওয়া, প্রতি রাত্রে তাঁর প্রাণহীন শরীরের সুরসৃষ্টি, সেই ক্লেদাক্ত ভয়ংকর কুয়াশার পিণ্ডের দৃশ্য, সেই কুয়াশার পেছনে কদর্য উল্লাস— সবই আমার কাছে একটা ভয়াবহ আতঙ্কের স্মৃতি। আর, তাই যখনই আমি কৌশিকী কানাড়া শুনি, সেই স্মৃতিগুলো আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আমি ভয়ে অবশ হয়ে পড়ি। আমার মনে পড়ে যায়, আমাদের ইন্দ্রিয়ের ওপারে অথচ আমাদের অত্যন্ত কাছে অন্তত একটা এমন জগৎ আছে যা নির্মম, কুৎসিত আর অমঙ্গলজনক।

কালরাত্রি

চিত্তপ্রসাদবাবু নিবিষ্টচিত্তে যথারীতি দাবা খেলছিলেন আমাদের ক্লাবে। আমরা সবাই তাঁর ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে চারদিকে ঘিরে বসে পড়লুম। বললুম, 'অনেকদিন আপনার জীবনের কাহিনি শুনিনি আমরা রায়মশাই, আজ একটা শোনাতেই হবে।'

চিত্তপ্রসাদ বিরক্ত মুখে বললেন, 'উঃ, জ্বালিয়ে মারলেন আপনারা! আপনাদের এই ক্লাবে আসা দেখছি বন্ধ করতে হবে। যাহোক, গল্প শুনতে চাইছেন যখন, শোনাব, কিন্তু এই শেষ।'

আমরা সমবেতভাবে মাথা নেড়ে বললুম, 'না, না, তা কী করে হয়? তবে এইটে শোনার পর আর মাসখানেক কিছু শুনতে চাইব না, কথা দিচ্ছি আমরা।'

চিত্তপ্রসাদ বললেন, 'বেশ। মাসখানেক পরে আমাকে আর ইহজগতে দেখতে পাবেন কি না আপনারা কে জানে। এখন গল্প যে শুনতে চাইছেন, কীসের গল্প শুনতে চান, বলুন? আমার জীবনে অদ্ভুত আর ভয়ংকর অভিজ্ঞতা তো বড়ো কম হয়নি। কাজেই, কী ধরনের গল্প শুনতে চান, জানলে সুবিধে হয়।'

বিকাশ বলল, 'আচ্ছা রায়মশাই, আপনি তো বিখ্যাত উকিল আবার আইনসভার সদস্যও ছিলেন। মানে, আপনি আইনের স্রষ্টা এবং বিখ্যাত, দুই-ই। আপনি জেনেশুনে, ইচ্ছে করে কোনোদিন আইন ভেঙেছেন?'

চিত্তপ্রসাদ গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'আইন আমি অনেকবারই ভেঙেছি। সে জন্যে জেলও খেটেছি। তবে সে আইন ছিল বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীর, আমাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া আইন। আপনি বোধ হয় সেরকম আইনের কথা বলছেন না। আপনি জানতে চাইছেন, আমি এমন কোনো অপরাধ করেছি কি না, যা সর্বদেশে সর্বকালের সামাজিক আইনের বিরোধী, তাই না? হ্যাঁ, করেছি। আমার চোখের সামনে ঘটা একটা হত্যাকাণ্ডের সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ লুপ্ত করেছি এবং হত্যাকারীকে পুলিশের হাতে তুলে দিইনি। এই কাজ কোনো দেশের আইন সহ্য করে না, তা দেশ স্বাধীন বা পরাধীন যাই হোক না-কেন।'

আমরা বিস্ফারিত চোখে সমস্বরে বললুম, 'কী সর্বনাশ! এরকম কাণ্ড করতে গেলেন কেন?'

চিত্তপ্রসাদ দাবার বোর্ড সরিয়ে রেখে বললেন, 'করেছিলুম, সে-কাহিনিই তাহলে শুনুন। তবে সেটা একটা এতই অবিশ্বাস্য ঘটনা যে আপনারা হয়তো সব শুনে বলবেন বুড়োর ডবল ভীমরতি হয়েছে। তা, যা খুশি আপনারা বলতে পারেন, আমার কিছুই যায়-আসে না। আগে এসব অভিজ্ঞতার গল্প বলতে ভয় পেতুম, আজ আর পাইনে। জীবনের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে সমালোচনা, প্রশংসা সবই আমার কাছে তুল্যমূল্য।

উনিশ-শো তিরিশ থেকে উনিশ-শো চল্লিশের মধ্যে আমি অজস্রবার জেল খেটেছিলুম। এই একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলুম, ধরে নিয়ে তিন মাস ঠুকে দিল। আবার বেরিয়ে এসে বিলিতি কাপড়ের দোকানের সামনে পিকেটিং করলুম, দু-মাসের জন্য ঢুকিয়ে দিল— এইরকম চলছিল। এরইমধ্যে আমার ওকালতিও চলছিল, নামও হচ্ছিল।

এই সময় বোধ হয় উনচল্লিশ কী চল্লিশ সাল হবে, হঠাৎ একদিন আমার কাছে আমার বন্ধু চন্দ্রশেখরের জরুরি তলব দিয়ে এক টেলিগ্রাম এসে হাজির। চন্দ্রশেখর ছিল বর্তমান মালদা জেলার বকুলপুর গ্রামের জমিদার, আমার ছোটোবেলাকার বন্ধু। তার আহ্বান অগ্রাহ্য করতে পারিনে। কাজেই, একদিন বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে বকুলপুর রওনা দিলুম।

এখানে বসন্ত সম্পর্কে দু-চার কথা বলে রাখা ভালো। কারণ এই গল্পে তার ভূমিকাই প্রধান বলা চলে।

বসন্তের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। আমি তখন সেখানে রাজবন্দি, বসন্ত আমার দেখাশুনো করত। শ্যামপুকুরের আদিত্য সিংহের বাড়ির লক্ষ টাকা দামের গৃহদেবতার মূর্তি চুরির জন্যে তার লম্বা সাজা হয়েছিল।

তা, সেসময় আমরা মনে করতুম, জাতীয় চরিত্রের উন্নতি না-হলে স্বরাজ আসতে পারে না। কাজেই দেশোদ্ধারের সঙ্গেসঙ্গে মানুষকে, বিশেষত পণ্ডিত মানুষের চরিত্র সংশোধন করতে চেষ্টা চালিয়ে যেতুম আমরা। আর এই কাজের আদর্শ জায়গা তো জেল। আমাদের লেকচার শুনতে শুনতে অনেক চোর বোধ হয় চুরি করা ছেড়ে দিয়েছিল এই ভয়ে যে, ধরা পড়ে জেলে আবার না ওই লেকচার শুনতে হয়।

বসন্তকে এমনই লেকচার দিতে গিয়ে আমার খটকা লাগল। দেখি, লোকটা সাধারণ অপরাধী বলতে যা বোঝায়, তা নয়। লক্ষ করলুম যে, পারতপক্ষে মিথ্যে কথা বলে না, অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করে আর অবসর সময়ে অন্য কয়েদিদের সঙ্গে খিস্তিখেউড় না-করে চুপ করে ধ্যানস্থ হয়ে বসে কীসব ভাবে। তখন তাকে দেখলে রীতিমতো সম্ভ্রম হয়। এমন লোককে উচিত-অনুচিত বা নীতি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে লাভ কী? উলটে আমিই মাঝে মাঝে লেকচার শুনে ফেলতে লাগলুম।

এরকম মানুষটা হঠাৎ চুরি করতে গেল কেন? একদিন বসন্তের আড়ালে আর-এক কয়েদি কার্তিককে ডেকে ব্যাপারটা জানতে চাইলুম। কার্তিকও চোর ছিল কিন্তু সে দেখতুম বসন্তকে শ্রদ্ধাভক্তি করে থাকে।

কার্তিক বলল, 'বসন্তদাদা চুরি করতেই পারে না, রায়বাবু। তাঁকে শ্যামপুকুরের সিঙ্গিরা অন্যায় করে ফাঁসিয়েছে।'

আমি জিগ্যেস করলুম, 'কেন? সিঙ্গিদের সঙ্গে তোর বসন্তদাদার শত্রুতা কীসের?'

সে বলল, 'শত্রুতা নয় রায়মশাই, গেরোর ফের। ব্যাপারটা বলি শোনো। বসন্তদাদা সিঙ্গিদের বাড়ি চাকরের কাজ করত। খোদ বড়োবাবুর খাস চাকর ছিল তিনি। একদিন হঠাৎ সিঙ্গিদের মন্দির থেকে মা দুর্গার সোনার মূর্তি আর যত হিরে-জহরতের গয়না গায়েব হয়ে গেল। চুরিটা হয়েছিল দুপুররাত্রে, কিন্তু হতে না-হতেই এক দারোয়ান মন্দিরের দরজা খোলা দেখে মহা হইচই জুড়ে দিলে। তারপর তো হুলুস্থুল ব্যাপার। পুলিশ এসে তার ওপর তাণ্ডব জুড়ে দিলে। আর দেবে না-ই বা কেন? বড়োবাবু পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেবে বলেছিল, সেটি তো বড়ো কম টাকা নয়।

আর সবার সঙ্গে পুলিশ এসে বসন্তদাদাকেও ধরলে। জেরার পর জেরা। বসন্তদাদা সত্যি কথাই বলে, আমি চুরি করিনি। সে ঘরে বড়োবাবুও ছিল। তিনি দরোয়ানকে বলল, বসন্তকে আমি চিনি, ও কখনো মিথ্যে বলে না। বলে, হঠাৎ কী খেয়াল হল, বড়োবাবু বসন্তদাদাকে জিগ্যেস করে বসল, আচ্ছা, তুমি চুরি করোনি, তা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু কে চুরি করেছে তুমি জানো?

ব্যস, বসন্তদাদা চুপ। আর কথা কয় না। পুলিশে বড়োবাবুতে কত চেষ্টা, কাকুতি, কাকুতি-মিনতি, ভয় দেখানো, বসন্তদাদা কোনো কথাই বলে না। তখন বড়োবাবুই আবার জিগ্যেস করল, চোরাই মাল কোথায় আছে, তুমি জানো? বসন্তদাদা বললে, জানি। বড়োবাবু জিজ্ঞাসা করল, কোথায়? বসন্তদাদা বললে, ছোটোরানিমার সিন্দুকে বেনারসি শাড়ির তলায়।

মাথায় বাজ পড়লেও বোধ হয় বড়োবাবু এত আশ্চর্য হত না, রায়বাবু। সঙ্গেসঙ্গে বাড়ির ভেতরে খবর গেল। আর চোরাই মাল যেখানে বসন্তদাদা বলেছিল, সেখানেই পাওয়া গেল।

রাগে-দুঃখে-অপমানে বড়োবাবুর মাথায় রক্ত উঠে গেল। আর সেই সবটুকুর ঝালটা গিয়ে পড়ল বসন্তদাদার ওপরে। বড়োবাবু বসন্তদাদার গলা টিপে ধরে বলল, তোমাকে বলতেই হবে কে চুরি করে ওখানে মালটা রেখেছে। ছোটোখোকার মহলে তুমি কোনোদিন যাওনি, ছোটোরানির ঘরে ঢোকা তো দূরস্থান, তুমি কী করে জানলে যে মালটা ওখানে আছে? বসন্তদাদা কিছুতেই বলবে না। তখন বড়োবাবু হান্টার দিয়ে

বসন্তদাদাকে পিটতে শুরু করল। যখন আর সহ্য করতে পারে না, তখন বসন্তদাদা বলেই ফেলল, চুরি করেছে ছোটোবাবু। মদে, জুয়ায়, মেয়েমানুষে এত দেনা যে এমন একটা কিছু-না করলে আর মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না। বড়োবাবু জিগ্যেস করল, তুমি কী করে জানলে, নিজের চোখে দেখেছ? বসন্তদাদা বলল, হ্যাঁ।

ছোটোবাবুকে ডেকে আনা হল। ছোটোবাবু বলল, সব বাজে কথা। যদি আমি চুরি করেই থাকি, ও নিজের চোখে দেখল কী করে? কারণ বসন্ত তো সেদিন রাত্রে দাদার শ্বশুরবাড়িতে কী কাজে সন্ধে বেলা গিয়ে পরদিন সকালে ফেরে। তাহলে, সে মিথ্যে কথা বলছে। আসলে সে রাত্রে বসন্তই গোপনে ফিরে এসে চুরি করে মাল সিন্দুকে রেখে আবার ফিরে গিয়েছিল।

কথাটা মন্দ নয়। বড়োবাবু বসন্তদাদাকে জিগ্যেস করল, তুমি সে-রাত্রে বেলেঘাটায় ছিলে? বসন্তদাদা বলল, ছিলুম। বড়োবাবু বলল, তাহলে তুমি দেখলে কী করে? বসন্তদাদা বলল, আমি মাঝে মাঝে দেখতে পাই।

আচ্ছা, একথা কে বিশ্বাস করবে, রায়মশাই? পুলিশ ছোটোবাবুর কথাই মেনে নিল। তারা বলল, বসন্তদাদা তাদের জেরায় নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে গেছে। বলে তাকে চালান করে দিল। বড়োবাবুও তাদের কষে পেট ভরে খাইয়ে দিল।। পরিবারের সম্মানটা তো বাঁচল। একটা বসন্ত গেলে পাঁচটা বসন্ত পাওয়া যাবে, কিন্তু ইজ্জত একবার খোয়ালে তাকে ফিরে পাওয়া বড়ো শক্ত, না কি বলেন রায়বাবু?'

আমি বললুম, 'দ্যাখ কার্তিক, লালবাজারের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তো এমন কিছু মধুর নয়, কিন্তু তবুও আমি বলব পুলিশ বোধ হয় খুব অন্যায় করেনি এক্ষেত্রে। তোর বসন্তদাদা বেলেঘাটায় বসে শ্যামপুকুরের চুরি দেখতে পায়, এ-কথা আমাকে স্বয়ং ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির এসে বললেও আমি বিশ্বাস করতুম না।'

কার্তিক হাত নেড়ে বলল, 'তা বিশ্বেস করবে কেন? আপনারা তো লেখাপড়া শিখেছ, ইংরিজিতে কাগজ পড়ো, ফটফট করে বক্তৃতা দাও যার কোনো মাথামুণ্ডু হয় না, আপনারা বিশ্বেস করবে কেন? বসন্তদাদার তো ভর হয়। তখন বসন্তদাদা অনেক কিছু দেখতে পায়। আপনি শুনলে আশ্চর্য হবে রায়বাবু, বসন্তদাদার পরিবার তান্ত্রিকের পরিবার। তাদের কত যুগের সাধনা। আজ তো আর সে সবের কোনো মূল্য নেই। পেটের দায়ে বসন্তদাদা চাকরের কাজ করে। চোর বলে জেল খাটে'। বলে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল কার্তিক।

তাতে অবশ্য কিছুমাত্র বিচলিত বোধ করিনি আমি। আজকালকার দিন হলে স্বতন্ত্র কথা ছিল, হয়তো কৌতূহলী হয়ে উঠতুম। কিন্তু আজকের মতো সে যুগে তো আমরা এই একস্ট্রা সেনসরি পারসেপশন বা ক্লেয়ারভয়েন্স বা টেলিপ্যাথি ইত্যাদির নাম শুনিনি।

তখন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নব্যযুবক আমরা এসব তন্ত্রমন্ত্র, ভূত-প্রেত, ভর-হওয়া ইত্যাদি সমস্তই বুজরুকি বলে উড়িয়ে দিতুম। পাত্তাই দিতুম না।

আর বসন্তও কোনোদিন আমাকে তার কোনো অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার গল্পও করেনি, বা তার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টাও করেনি। কেবল একদিন ছাড়া। সে কথায় পরে আসছি।

চন্দ্রশেখরের যেদিন টেলিগ্রাম এল, তার কিছুদিন আগেই আমি আর বসন্ত একসঙ্গে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি। আমি তখন রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে একটা ঘরভাড়া করে থাকি। বসন্তও এসে আমার সঙ্গে জুটে গেল। আমি ব্যাচেলার লোক, বসন্তের মতো অ্যাসিস্ট্যান্ট পেয়ে বেঁচে গিয়েছিলুম।

সে যুগে বকুলপুর যাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। কিছুটা ট্রেনে, কিছুটা বাসে আর শেষটুকু গোরুর গাড়িতে করে যেতে হত। বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ায় বেশ সুবিধেই হয়েছিল। এতটা দীর্ঘ পথ, সঙ্গে একজন সঙ্গী থাকলে পথের কষ্ট অনেকটা লাঘব হয়, বিশেষ করে যদি বসন্তের মতো সঙ্গী হয়, যে সাহায্য করার জন্যে উন্মুখ হয়েই আছে।

চন্দ্রশেখর আমাকে নেওয়ার জন্য স্টেশন পর্যন্ত এসেছিল। সে কিন্তু দেখলুম, বসন্তকে দেখে যেন একটু অসন্তুষ্টই হয়েছে। বুঝলুম, বাসে আর গোরুর গাড়িতে যেতে যেতে তার আমাকে কিছু বলবার ছিল, বসন্ত সঙ্গে থাকায় ব্যাপারটায় একটু অসুবিধে হয়ে গেল। সারাটা রাস্তাই দেখলুম, চন্দ্রশেখর কেমন যেন একটু গম্ভীর আর সন্ত্রস্ত হয়ে রইল।

চন্দ্রশেখর আজ বেঁচে নেই, থাকলে দেখতে পেতেন, তার মতো দিলখোলা আমুদে ফুর্তিবাজ মানুষ খুব কম দেখা যায়। তার চেহারাটা ছিল ছোটোখাটো, কিন্তু অন্তরটা ছিল মস্ত বড়ো। আজকের মতো সে যুগে ক্লাস-স্ট্রাগল বা ক্লাস-হেটেরেড ব্যাপারটা খুব চালু হয়নি, তাই জমিদার হলেও তাকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতুম।

এ হেন একটা মানুষকে গম্ভীর আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখলে একটু অস্বস্তি হয়-ই। আমি আর ওকে সারা রাস্তা ঘাটালুম না।

যখন বকুলপুরে এসে পৌঁছলুম, তখন প্রায় মাঝরাত। গ্রামের রাস্তা স্বভাবতই অন্ধকার জনমানবহীন। কিন্তু আপনারা শহুরে লোক বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, মাঝরাত্রেও গ্রামের রাস্তার কতগুলো শব্দ আছে, যারা তার সঙ্গে পরিচিত তাদের কানে সেই শব্দ ধরা পড়ে। আমি গ্রামের ছেলে, আমারও হঠাৎ মনে হল, কী অদ্ভুত শব্দহীন গ্রাম, মনে হয় যেন এখানে কোনো জীবিত প্রাণী বাস করে না। লণ্ঠনের আলোয় দেখলুম, চন্দ্রশেখরের মুখ বিবর্ণ, বোধ হয় খানিকটা আতঙ্কিত।

হঠাৎ সেই নির্জনতা ভেঙে গাড়ির সঙ্গে আসা চারজন পাইক সমস্বরে চিৎকার করে কথা বলতে আরম্ভ করল। 'ওহে পঞ্চানন, ঠিক আছ তো হে?' বা 'মামু হে, কথা কও

না-কেন?' প্রভৃতি চিৎকার যার অর্থ স্পষ্টতই এরা সবাই ভয় পেয়েছে।

গাড়ি যখন প্রকাণ্ড জমিদার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, দেখি তার সামনে চত্বরে একগাদা হ্যাজাক জ্বালিয়ে একদল পাইক বসে আছে। আমরা ঢোকামাত্র তারা আলো নিয়ে সামনে এগিয়ে এসে আমাদের মালপত্র নামাতে শুরু করল।

বাড়ির ভেতরেও দেখি বারান্দায়, সিঁড়িতে আলো জ্বলছে। ওপরে উঠতে উঠতে চন্দ্রশেখর জিগ্যেস করল, 'তোমার সঙ্গে লোকটি কি তোমার চাকর?'

আমার তখন ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছে। বললুম, 'না, চাকর নয়, ভ্যালে বলতে পারো।'

চন্দ্রশেখর হাসল না। বলল, 'ও কি নীচে আমাদের চাকরদের মহলে শুতে পারে?'

আমি বললুম, 'পারে।'

'বেশ।' বলে চন্দ্রশেখর একজন পাইককে বলল, 'এঁর সঙ্গে যে লোকটি এসেছে, তাকে তোমাদের মহলে নিয়ে যাবে।'

বসন্ত আমার ব্যাগটা নিয়ে পেছনেই আসছিল। চন্দ্রশেখরের কথা শুনে দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমি রায়বাবুর ঘরের বাইরেই শোব। আমার কেমন যেন গোলমাল লাগছে।'

চন্দ্রশেখর ভয়ানক গম্ভীর হয়ে বলল, 'না। ঘরের বাইরে শোওয়া চলবে না। ওই মহালেই শুতে হবে তোমায়।'

বসন্ত ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি তর্কাতর্কি থামানোর জন্যে বললুম, 'ঘরের বাইরে শুলে তোমার আপত্তি। ভেতরে শুতে পারে?'

চন্দ্রশেখর স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, 'পারে, যদি তোমার কোনো আপত্তি না-থাকে।'

আমি বললুম, 'আমার আবার আপত্তি কীসের? এসব ব্যাপারে আমার কোনোই প্রেজুডিস নেই, তুমি তো জানো।'

চন্দ্রশেখর বলল, 'বেশ। তাহলে সেই ভালো।' তারপর যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, 'সমস্ত দরজা-জানলা ভালো করে বন্ধ করে শোবে, ভোর হওয়ার আগে দোর খুলবে না, কেউ ডাকলেও না, এমনকী আমি ডাকলেও না।'

এইবার আমার ঘুম ছুটে গেল। বললুম, 'তার মানে? এসব রহস্যের মানে কী? আর জানলা না-খুলে আমি ঘুমোতেই পারি না।'

চন্দ্রশেখর ম্লান হেসে বলল, 'রহস্যটা কাল শুনো। আর জানালা খুললে তোমারই অসুবিধে হবে, কারণ তোমার জানলার নীচেই পাইকরা আগুন জ্বেলে বসে বাকি রাতটুকু গল্পগুজব করবে। তুমি ঘুমুতে পারবে না।'

আমি প্রতিবাদ করে বললুম, 'আমার জানলার নীচে পাইক? কেন? এসব তো আগে কখনো দেখিনি। বলি, ব্যাপারটা কী?'

চন্দ্রশেখর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'কাল শুনো।'

বসন্ত ঘরের কোণায় দাঁড়িয়েছিল। আমি ওকে জিগ্যেস করলুম, 'কিছু বুঝলে? ডাকাতি-ফাকাতির ব্যাপার নাকি?'

বসন্ত ঘাড় নাড়ল। বলল, 'না রায়বাবু ডাকাতির ব্যাপার নয়। ব্যাপার অনেক খারাপ। এই গ্রামে কালরাত্রি নেমেছে, আমি তার গন্ধ পাচ্ছি।'

কালরাত্রি নেমেছে, তার আবার গন্ধ? বুঝলুম, এতটা রাস্তার ধকল আর এতসব রহস্য একসঙ্গে হজম করা আমার দুঃসাধ্য। অতএব আমি আর বাক্যব্যয় না-করে লম্বা হলুম।

রাত্রে ঘুম বড়ো মন্দ হল না। ভোর বেলা উঠে হাত মুখ ধুয়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দেখি চন্দ্রশেখর একটা চেয়ারে বসে আছে, তার সামনের টেবিলে দু-কাপ চা। আমাকে দেখে মৃদু হেসে বলল, 'এসো চিত্তপ্রসাদ, চা তৈরি।'

আমি বললুম, 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু হে জমিদারনন্দন, তুমি কি শ্রেফ আমাকে চা খাওয়াবে বলেই এই সাতসকালে বিছানা ছেড়ে উঠে বসে আছ?'

চন্দ্রশেখর স্মিতমুখে ঘাড় নাড়ল। বলল, 'না, তোমার সঙ্গে কথা বলব বলে বসে আছি। বেলা বাড়লে কথা বলার সুযোগ নাও পেতে পারি।'

আমি একটা চেয়ার টেনে ওর মুখোমুখি বসে বললুম, 'ব্যাপারটা কী বলো তো? গোলমাল যে একটা পেকেছে, সেটা তো বুঝতেই পারছি। আমাকে ডেকেছ কি বন্ধু হিসেবে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে, না, উকিল হিসেবে কনসালটেন্সির জন্যে?'

চন্দ্রশেখর বলল, 'দুই-ই। ব্যাপার কী তোমাকে তা পুরোপুরি বোঝাতে পারব কি না জানি না, তবে চেষ্টা করতে হবে। ব্যাপারটা এতদূর অবিশ্বাস্য যে আমার তোমাকে বলতে অস্বস্তি হচ্ছে।'

আমি বললুম, 'দ্যাখো চন্দ্রশেখর, ধানাইপানাই কোরো না। আমি উকিল, আমাকে নিঃসংকোচে তোমার মনের কথা খুলে বলো। ভণিতা যদি করো তো বলো, উঠে চলে যাই।'

চন্দ্রশেখর হাত নেড়ে বলল, 'না, ভণিতা করব না।' বলে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে মাটির দিকে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে আমাকে জিগ্যেস করল, 'ভ্যামপায়ার কাকে বলে, তুমি জানো?'

এমন একটা অদ্ভুত আকস্মিক প্রশ্নের জন্যে আমি একদম প্রস্তুত ছিলুম না। থতমত খেয়ে বললুম, 'হ্যাঁ, জানি, দক্ষিণ আমেরিকার একরকম রক্তচোষা বাদুড়।'

চন্দ্রশেখর ফ্যাকাশে মুখে বলল, 'হ্যাঁ, তাই বটে, তবে পুরোটা নয়। যেকোনো রক্তচোষা জীবকেই ভ্যামপায়ার বলা হয়। জাপানি উপকথায় একরকম ভ্যামপায়ার ক্যাট বা রক্তচোষা বেড়ালের কথা আছে, তেমনি ইউরোপে রক্তচোষা মানুষই শুধু ভ্যামপায়ার, যেমন কাউন্ট ড্রাকুলা।'

আমি বললুম, 'সেসব উপকথা বা আষাঢ়ে গল্প। তা, আমাকে এতটা পথ ডেকে এনেছ কি তোমার ভ্যামপায়ার কথামৃত শোনাবার জন্যে নাকি?'

চন্দ্রশেখর মাথা নেড়ে বলল, 'চিত্তপ্রসাদ, এতদিন আমিও তোমার মতো ভাবতুম যে ভ্যামপায়ার একটা কুসংস্কার বা আষাঢ়ে গল্প। কিন্তু আজ আর তা ভাবি নে। আমাদের এই বকুলপুর গ্রামে এমন একটা কিছুর আবির্ভাব হয়েছে, যেটাকে ভ্যামপায়ার ছাড়া আর অন্য কোনো বিশেষণেই অভিহিত করা চলে না।'

আমি চন্দ্রশেখরের কথা শুনে হাসতে শুরু করেছিলুম, কিন্তু সে একটা উজ্জ্বল স্থির দৃষ্টি দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে চলল, 'তোমার খুব হাসি পাচ্ছে, নয়? তুমি থাকো কলকাতায়, সেখানে সন্ধে হলে হাজার আলোর রোশনাই, ট্রাম-বাসের ঘড়ঘড়ানি, সিনেমা আর থিয়েটারে মাঝরাত পর্যন্ত সরগরম। আর ওই সামনের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। ওখানে শুধুই অন্ধকার, পদে পদে ভয়। দারিদ্র আর অশিক্ষা, অসুখ-বিসুখ আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়, হিংস্র জানোয়ার আর বিষাক্ত সাপ, মৃত্যু যেন সবসময় ওঁত পেতে বসেই আছে। এখানে বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্তই মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার জন্যে খরচ হয়। আমার বাবা, ঠাকুরদা তাঁদের গ্রামের দিকে তাকাননি, তোমাদের কলকাতা তাঁদের টেনে নিয়ে চলে গেছল। কিন্তু আমি যেতে পারিনি। আমার সামান্য ক্ষমতায় আমার গ্রামের জন্যে কিছু করব, এই আশায় রয়ে গেছি এইখানে। দেখেছি, এখানকার প্রায় সব সমস্যাই মানুষের বিশেষত কলকাতার মানুষেরই সৃষ্টি। এখানে থেকে অবিচলভাবে চেষ্টা চালিয়ে গেলে হয়তো একদিন এই সবেরই সমাধান সম্ভব হবে। কিন্তু চিত্তপ্রসাদ, আজ যে সমস্যার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, তা তোমাদের আলোকোজ্জ্বল কলকাতায় আসতে পারে না, এই অন্ধকার গ্রামই তার আশ্রয়, আর এই সমস্যার মোকাবিলা করা বোধ হয় আমার সাধ্যের বাইরে।'

আমি ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'তুমি যে রীতিমতো সিরিয়াস হয়ে উঠলে হে! এত লেখাপড়া শিখে শেষপর্যন্ত এরকম একটা কুসংস্কারে বিশ্বাস আরম্ভ করলে? কী হয়েছে কী? গ্রামের কিছু লোক রক্তহীনতায় মারা গেছে আর গণকঠাকুর গুনে দিয়ে বলেছেন গ্রামে রক্তচোষা এসেছে, এই তো? ওটা যে অ্যানিমিয়া...'

চন্দ্রশেখর প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'থামো চিত্তপ্রসাদ, এবার তুমি আমাকে হাসালে। একটা সুস্থ জোয়ান লোক রাত্রি বেলা ঘরের বাইরে বেরোল আর তার পরদিন তার রক্তহীন ছিবড়ে হয়ে যাওয়া দেহটা পাওয়া গেল গ্রামের বাইরে ধান খেতের পাশে—এটা অ্যানিমিয়া, না? আর এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠিক গুণেগুণে একুশ দিন পর পর—এটাও কি অ্যানিমিয়ার লক্ষণ?'

আমি বললুম, 'তুমি কি নিজের চোখে এ-ঘটনা একটাও দেখেছ, না সবই তোমার শোনা কথা?'

চন্দ্রশেখর বলল, 'শেষ ঘটনাটা ঘটেছে আজ থেকে ষোলো দিন আগে আমারই বাড়িতে। আমার ধাইমাকে তোমার মনে পড়ে? তাঁর মৃত্যু ঘটে এমনিভাবেই আমাদের পেছনের উঠোনে।'

এইবারে আমাকে সামলে নিতে হল। বললুম, 'কী সর্বনাশ! বলো কী? একেবারে তোমার বাড়ির ভেতরে? ব্যাপারটা আমাকে একটু বিশদভাবে বলবে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চন্দ্রশেখর বলল, 'আর কী বলব? রাত্রি বেলা ধাইমা যখন শুতে যান, তখন তিনি দিব্যি সুস্থ, আমাকে একটা পান খাওয়ালেন, সুমিত্রাকে একটা দিলেন, কোনো গোলমাল নেই। সকাল বেলা উঠোনের ওপর তাঁর মৃতদেহ প্রথম আবিষ্কার করল আমাদের রাঁধুনি ঠাকুরণ। সেই একইরকম মৃত্যু। গলার ওপর দু-টি রক্তের ফোঁটা, যেন কিছু দাঁত ফুটিয়েছে আর শরীরের সমস্ত রক্ত জল।'

আমি জিগ্যেস করলুম, 'তার মানে? রক্ত বের করে নেওয়া হয়নি?'

চন্দ্রশেখর মাথা নাড়ল। বলল, 'না। মানে, ব্যাপারটা কীরকম জানো? অনেকটা অ্যানিমিয়ার মতোই। যেন রক্তের সমস্ত লাল কণিকাগুলো কোনো অজ্ঞাত কারণে ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে। আর সেটা হয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। ফলে অ্যানিমিয়ার যেসব লক্ষণ, যেমন হাত-পা ফোলা, পেট ফুলে ওঠা, সেসব কিছু নেই। মৃত্যুর অব্যবহিত কারণ অক্সিজেনের অভাবে অ্যাজফিকসিয়া।'

'এরকম হওয়ার কারণ?'

'জানি না। গলার দাগ দু-টি দেখে মনে হয়, এই গ্রামে কোনো একটি নিশাচর জীবের আবির্ভাব হয়েছে, যে গলায় কামড়ালে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে এমন একটা বিষ ঢুকে যায় যা সঙ্গেসঙ্গে রক্তের লাল কণিকাগুলো মেরে ফেলে। ফলে তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।'

'কী বিষ?'

'তা-ও জানি না। কোনো কেমিক্যাল বিষ হতে পারে, তবে তার সম্ভাবনা কম। কারণ সেক্ষেত্রে একজন দুর্বত্ত বা হত্যাকারী বা ক্রিমিন্যাল থাকার সম্ভাবনা। আবার সেইসঙ্গে এই অপরাধের একটা উদ্দেশ্য থাকা দরকার। কিন্তু এই হত্যাগুলো এতই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন যে, কোনো একটা উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব। তাই মনে হয়, বিষটা জৈববিষ যেমন সাপের বা কাঁকড়াবিছের বিষ এবং নিহত লোকেদের এমনই বিষধর কোনো প্রাণীর কামড়েই মৃত্যু হয়েছে।

'আর-একটা সম্ভাবনা হল, ভ্যামপায়ার জাতীয় কোনো প্রাণী এদের রক্ত চুষে খেয়ে তাদের শরীরের ভেতরে কোনো অজ্ঞাত একটা তরল পদার্থ ঢুকিয়ে রেখে যায়। কিন্তু সেখানে একটা অসিবিধে আছে।'

'কী অসুবিধে?'

'দ্যাখো, আমাদের এখানে প্রথমে মানুষ মরতে শুরু করেনি। সব রিপোর্ট তো পাইনি, তবে প্রথম মারা যায় একটা গোরু। আমাদের পাশের গ্রাম যদুতলির এক গাড়িওয়ালা অন্তা কাহার বলে একজনের গোরু ছিল সেটা। তারপর মরে আর-একটা গোরু, ওই যদুতলিরই আর এক গোয়ালার। এখন, গোরু মরা গাঁয়ের মানুষের কাছে সহজ ব্যাপার নয়। গোরু তাদের একটা সম্পদ। কাজেই হইচই পড়ে যায়। আমার কানেও কথাটা আসে। আমি তখন ভেবেছিলুম গোমড়ক লেগেছে বুঝি। তাই এ-গাঁয়ের লোকেদের ডেকে সাবধান করে দিই। কিন্তু তারপর অদ্ভুত অদ্ভুত সব খবর কানে আসতে লাগল। শুনলুম, ওরা নাকি এক গোবদ্যি ধরে এনেছে, সে বলছে অসুখ-বিসুখ কিছু নয়, গোরুগুলো মরেছে রক্তচোষার কামড়ে।

তোমারই মতো আমি ব্যাপারটা কুসংস্কার বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু এর পরের আঘাতটাই এল যদুতলির পণ্ডিতমশাই নগেন ভট্টাচার্যি মশায়ের বাড়িতে। পণ্ডিতমশায়ের গোরু মঙ্গলা একইরকমভাবে মারা যায়। পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে যা শুনলুম, তাতে তো আমার চক্ষুস্থির। গোবদ্যির কথা শুনে তিনি মঙ্গলাকে গোয়ালঘর থেকে বের করে এনে বাড়ির ভেতরের উঠোনে বেঁধে রেখেছিলেন আর নিজে শুতেন বারান্দার ওপর। যেদিন মঙ্গলা মরে, সেদিন তিনি অনেক রাত অবধি পড়াশুনো করে আলোটা নিয়ে বাড়ির পেছনে কুয়োতলায় গিয়েছিলেন হাত-পা ধুতে। সেখান থেকে মঙ্গলাকে দেখা যায় না। হঠাৎ তিনি একটা ধপ করে আওয়াজ শোনেন এবং তার পরেই তাঁর মনে হয় কিছু একটা রাঙচিতার বেড়া ভেঙে প্রচণ্ডবেগে ছুটে বাইরে চলে গেল। তিনি দৌড়ে এসে দেখেন, মঙ্গলা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং আস্তে আস্তে তাঁর চোখের সামনে গড়িয়ে মাটির ওপর পড়ে যায়।

এখন, এর থেকে দুটো জিনিস প্রমাণ হয়। এক, রক্তচোষাই হোক বা যাই হোক, যে জীবটি বেড়া ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছিল, সে মঙ্গলার রক্ত চুষে খায়নি। কারণ একটা গোরুর শরীরে কত সের রক্ত থাকে আমি জানি না, কিন্তু দুনিয়ায় বোধ হয় কোনো শক্তি নেই যা সেই পরিমাণ রক্ত এক মুহূর্তের মধ্যে চুষে খেয়ে সেই পরিমাণ তরল পদার্থ শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ মঙ্গলার মৃত্যু হয়েছে কোনো বিষে। দুই, জীবটি সাপ জাতীয় কোনো প্রাণী নয়, কারণ বেড়ার মধ্যে যে গর্ত হয়েছিল, তার মধ্যে দিয়ে কোনো বড়ো জানোয়ারই বেরিয়ে যেতে পারে, কোনো সরীসৃপ নয়। আর ধপ করে শব্দটাও তাই প্রমাণ করে।'

আমি জিগ্যেস করলুম, 'তোমাদের পণ্ডিতমশাই লোক কেমন?'

'অতিশয় সজ্জন। গাঁজা-ভাং তিনি খান না, কদাচ মিথ্যে কথা বলেন না, শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান, শাস্ত্রজ্ঞব্রাহ্মণ। তা ছাড়া, আমি নিজে মঙ্গলাকে দেখেছি, ভাঙা বেড়াটা দেখেছি। বীভৎস ব্যাপার।'

'অন্যান্য মৃত্যুগুলো দেখোনি?'

'দেখেছি। তবে সবগুলো নয়।'

'তাদের সম্পর্কে কিছু বলো।'

'দ্যাখো, পণ্ডিতমশাইয়ের ব্যাপারটার পর যদুতলির চণ্ডীমণ্ডপে আমি একটা মিটিং ডেকেছিলুম। ওখানে একটা নাইট ওয়াচের জন্যে ভলান্টিয়ার পার্টি তৈরি করেছিলুম, প্রত্যেক গোয়ালের সামনে যাতে সারারাত আগুন জ্বলে আর কেউ-না-কেউ জেগে পাহারা দেয়, তারও বন্দোবস্ত করেছিলুম। ফলে হিতে বিপরীত হল। অন্যদিকের গ্রাম পাখনায় গোরু মরতে আরম্ভ করল। পাখনায় লোকেরা যখন ভলান্টিয়ার পার্টি বানাল, তখন মানুষ মরতে শুরু করল।'

'কীরকম?'

'প্রথমে তো ভলান্টিয়ার পার্টির লোকই মরতে আরম্ভ করল। কেউ একটু একা হয়ে গেছে বা একটু অন্ধকারের দিকে চলে গেছে বা গাছতলায় বসে ঢুলুনি এসেছে, ব্যস, মরণ ছোবল তাকে একেবারে বৈতরণী পার করে দিয়েছে। এই সময়েই আমরা আবিষ্কার করলুম, এই ছোবলটা আসে প্রতি কুড়ি থেকে বাইশ দিনের মধ্যে।

'ফলে, ভলান্টিয়ার পার্টি বন্ধ হয়ে গেল। গাঁয়ের লোক তাদের গোরুছাগল নিয়ে সন্ধে হতে-না-হতেই ঘরের মধ্যে ঢুকে আগল আটকে দিতে লাগল। কিন্তু সারা রাতে একবারও ঘরের বাইরে বেরোবে না, এ তো হয় না। যে বের হয়, সেই মরে। 'কিন্তু তারপরে যা শুরু হল, তা আরও অবিশ্বাস্য।'

'কী?' আমি জিগ্যেস করলুম।

চন্দ্রশেখর আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, 'নিশির ডাক।'

আমি আকাশ ফাটিয়ে অট্টহাস্য হেসে উঠতে যাচ্ছিলুম। চন্দ্রশেখর আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'হেসো না চিত্তপ্রসাদ, হেসো না। তিনটে গাঁয়ের লোক যখন পেট খারাপ হলেও ঘরের বাইরে বেরোনো বন্ধ করল, তখন যার মরণ ঘনিয়ে এসেছে, তাকে একটা অদ্ভুত সুরেলা কণ্ঠ নাম ধরে ডেকে বাইরে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল। আর এখনও সেই রকমই চলছে। সেই ডাক নাকি অপ্রতিরোধ্য। যাকে ডাকে, তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলেও সে নাকি সব ছিঁড়ে বেরিয়ে চলে যায়।'

'যখন বেরিয়ে যায়, তখন তার আত্মীয়স্বজন তাকে অনুসরণ করে না— কেন?'

'দ্যাখো, যারা আতঙ্কে অর্ধমৃত হয়ে আছে, তাদের কাছ থেকে তুমি এরকম বীরত্ব আশা করতে পারো না, পারো কি? আর অনুসরণ করেই বা কী হবে? গ্রামের পথ নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি। সেই অন্ধকার কি হারিকেন লণ্ঠনের আলো ভেদ করতে পারে?'

'ওই নিশির ডাক কি তুমি শুনেছ?'

চন্দ্রশেখর অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'না শুনিনি।'

এরপর আর কথা এগুল না। ভেতর বাড়ির থেকে ডাক এল চান করতে যাওয়ার, চন্দ্রশেখরের কাছারি যাওয়ার সময় হল। আমার কিন্তু মনের মধ্যে একটা সন্দেহ খচখচ করতে লাগল। চন্দ্র যা বলেছে সেটা সত্যি কী মিথ্যে জানিনে, কিন্তু সে সত্যি ভেবেই বলেছে। তবে সেটাও বড়ো কথা নয়। আমার সন্দেহ হল, সে কিছু কথা গোপন করে যাচ্ছে, আমাকে প্রাণ খুলে সবটা বলছে না। অর্থাৎ রহস্যটা যে কেবল বাস্তব তাই নয়, ওপর থেকে যা মনে হয়, তার চেয়েও গুরুতর।

চন্দ্রশেখর কাছারি চলে গেল, আমি গ্রামটা ঘুরতে বের হলুম। বকুলপুর গ্রাম আমার বহুদিনের পরিচিত। ছোটোবেলায় অনেকবার এখানে এসেছি, বড়ো হয়েও বেশ ক-বার। শেষবার এসেছিলুম চন্দ্রশেখরের বিয়েতে বছরতিনেক আগে বরযাত্রী যাব বলে। তবে যাওয়া হয়নি, সন্ধে বেলা পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল। তাই নিয়ে মহাহাঙ্গামা হয়েছিল। তা সে অন্য কথা।

চন্দ্রশেখরের বিয়ে হয়েছিল মালদা জেলারই গঙ্গাযমুনা গ্রামের জমিদার ঘনশ্যাম রায়ের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে। ঘনশ্যামের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল কলকাতায়। লোকটি যেন কেমন অদ্ভুত বলে তখন আমার মনে হয়েছিল। কখনো সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন না, চেপে চেপে প্রতিটি কথা বিচার করে করে বলেন। আমার প্রথমেই ধারণা হয়েছিল লোকটি অত্যন্ত ঘুঘু।

তবে চন্দ্রশেখরের স্ত্রী সুমিত্রা অবশ্য তার বাপের মতো নয় বলেই শুনেছি। সে জমিদারবাড়ির বউ, অসূর্যম্পশ্যা, কিন্তু তার গৃহিনীপনার গল্প আমাদের কানে এসেছিল। আর কানে এসেছিল তার অসাধারণ সৌন্দর্যের কথা। তাকে নিয়ে আর তার জমিদারিটি নিয়ে কত সুখেই না থাকতে পারত চন্দ্রশেখর। তা নয়, কোত্থেকে কী এক ভয়াবহ একটা প্রাণী এসে সব ছারখার করে দিলে। এইসব ভাবতে ভাবতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, চন্দ্রশেখর আমার বন্ধু, কেবল বন্ধু বলব কেন, আমার অনেক বিপদে-আপদে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে। আমার সেই বন্ধুর এই দুঃসময়ে, সেটা সত্যি বা কাল্পনিক যাই হোক না-কেন, তার পাশে আমি দাঁড়াব, তাকে উদ্ধার করব।

এমন সময় হঠাৎ শুনি কে আমার নাম ধরে ডাকছে, 'চিত্তবাবু, ও চিত্তবাবু!' তাকিয়ে দেখি, বকুলপুরের বর্ধিষ্ণু চাষি সন্ন্যাসী কৈবর্তর ছেলে বিষ্ণুপদ কৈবর্ত। বিষ্ণুপদ কলকাতায় লেখাপড়া করতে গিয়েছিল, বেশিদূর সেটা চালাতে পারেনি বটে, তবে নিজের গ্রামের প্রতি অশ্রদ্ধাটা পুরোপুরি রপ্ত করে ফেলেছিল। হেদোর কাছে একটা ওষুধের দোকানে চাকরি করত আর গোয়াবাগানে একটা মেসে থাকত। মানিকতলার বাজারে তার সঙ্গে মাঝেমধ্যে আমার দেখা হত।

বিষ্ণুপদ বলল, 'একী চিত্তবাবু, আপনি এখানে কী করছেন?'

আমি বললুম, 'আমি তো এখানে আসতেই পারি বিষ্ণুপদ, এখানে আমার বন্ধুর বাড়ি। বরং তুমি এখানে কী করছ বলো তো? তোমার সঙ্গে তো যখনই দেখা হয়, তুমি বলো, গ্রামে নাকি ভদ্রলোকের থাকা অসম্ভব। তা, তুমি কি আবার ছোটোলোকদের দলেই ভিড়লে নাকি?'

বিষ্ণুপদ মাথা নীচু করে বলল, 'ওসব কথা বাদ দিন, চিত্তবাবু। বাবা মারা গেছেন, এত জমিজমা ফেলে কোথায় থাকব? কলকাতায় পড়ে থাকলে তো পাঁচভূতে লুটে নেবে।'

আমি দুঃখিত হয়ে বললুম, 'সন্ন্যাসীদা মারা গেছেন নাকি? কবে? কী হয়েছিল?'

বিষ্ণুপদ বলল, 'বাবা মারা গেছেন মাসছয়েক হল। আর কী হয়েছিল? কেন, জমিদারবাবু আপনাকে কিছু বলেননি?'

আমি বললুম, 'রক্তচোষা?'

বিষ্ণুপদ মৃদু হেসে বলল, 'হ্যাঁ, লোকে তাই বলে বটে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনে।'

'তুমি কী বিশ্বাস করো?'

'আমার ধারণা, এটা একটা কোনো নতুন ধরনের ছোঁয়াচে রোগ, যা জীবজন্তু মানুষকে রক্তশূন্য করে ফেলে। আর এই রোগটা এমন একটা জীবাণু থেকে হয়, যা কোনো মানুষ বা জন্তুর শরীরে ঢুকলে কুড়ি-বাইশ দিন সময় নেয় তৈরি হওয়ার। যেমন, ধরুন ম্যালেরিয়া।'

'ম্যালেরিয়া? না বিষ্ণুপদ, তোমার উপমাটা ঠিক হল না, তবে তুমি যে কী বলতে চাইছ, তা বুঝতে পারছি। তার মানে, ও-গাঁয়ের পণ্ডিতমশাই যা দেখেছেন বা এই তিনটে গাঁয়ের লোক যে নিশির ডাক-টাকের কথা বলছে, সেগুলো তুমি মনে করো মিথ্যে।'

'ঠিক মথ্যে নয়, বলব কুসংস্কার। আর এসবের জন্যেই তো আমি গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে থাকি।'

আমাদের কথাবার্তা হতে দেখে ইতিমধ্যে চারপাশে কয়েক জন গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তাঁদের মধ্যে চন্দ্রশেখরের খাজাঞ্চি নিমাই পাটোয়ারির ছোটো ভাই গোবিন্দও ছিলেন। গোবিন্দ লেখাপড়া বেশি করেননি, কিন্তু সৎ সজ্জন লোক বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি বিষ্ণুপদর কথা শুনে হঠাৎ চটে উঠলেন। বললেন, 'তোমার ওখানে গিয়েই থাকা উচিত বিষ্ণু। তোমার মতো অপদার্থ গাধার এ-গাঁয়ে ঢোকাই উচিত নয়।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'কী হল গোবিন্দদা? এত চটে উঠলেন কেন?'

গোবিন্দ হাত নেড়ে বললেন, 'চটব না? যেখানে আমাদের জীবন-মরণের সমস্যা, সেখানে উনি বলছেন কিনা, এটা আমাদের কুসংস্কার? এমন লোককে জুতোপেটা করতে ইচ্ছে করে কিনা তুমিই বলো চিত্তপ্রসাদ।'

আমি বললুম, 'আপনি এই নিশির ডাক শুনেছেন?'

গোবিন্দর মুখের ভাবটা কেমন একরকম হয়ে গেল। কথা বলতে গিয়ে একবার ভয়ে ভয়ে চারদিক চেয়ে বললেন, 'হ্যাঁ শুনেছি।'

'কীরকম শুনলেন?'

ফ্যাকাশে মুখে গোবিন্দ বললেন, 'কীরকম? কীরকম আবার? অনেকটা এই মেয়েছেলের গলার মতো। আমাদের পাশের বাড়ির জগন্নাথকে ডাকলে, তখন শুনেছি। জগন্নাথ নেই, মরে গেছে।'

গোবিন্দর কথা শুনে আমার এইবার আর হাসি পেল না। গোবিন্দর কথা বলার মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিকতা ছিল যে তার কথা অবিশ্বাস করা সম্ভব হল না। আমি বলতে যাচ্ছিলুম, 'আপনি তো ভুলও শুনে থাকতে পারেন।' কিন্তু তার আগেই ভিড়ের ভেতর থেকে অতুল মণ্ডল বলল, 'হ্যাঁ গোবিন্দদা, মেয়েছেলের গলাই বটে। যেদিন বাঁদর কামড়ালে, সেদিন শুনেছিলুম। ইস্! তখন যদি ছুটে বেরোতুম!'

আমি বললুম, 'বাঁদর কামড়ালে মানে? কাকে বাঁদর কামড়াল? কী হয়েছিল?'

অতুল মণ্ডল মাথা নেড়ে বলল, 'বাঁদর কাউকে কামড়ায়নি গো। তিনিই বাঁদরকে কামড়াল। সেই গতবার তো জমিদারবাবুর ধাইমা মারা গেল, তার আগের বার। সেদিন ছিল ঝড় বৃষ্টির রাত, আর তাঁর আসবারও সময় হয়েছিল। তাই গাঁ-সুদ্ধ লোক দু-দিন ধরে জেগে বসেছিল। আর নিশির ডাক শুরু হয়েছে তো, তাই সবাই চিৎকার করছিল, কোনো-কোনো বাড়িতে খানিক অন্তর অন্তর শাঁখ বাজছিল আর বৃষ্টি নেমেছিল বটে। নিশি ডাকলেও শোনা যেত কি না সন্দেহ।

তা, আমার বাড়ির পাশে একটা ঝুপসি বটগাছ আছে। কিছুদিন হল সেখানে একদল বাঁদর আশ্রয় নিয়েছিল। সে রাতে যখন বৃষ্টিটা একটু ধরেছে, হঠাৎ শুনি গাছের ওপর একটা ঝুটোপাটির আওয়াজ। আর তার পরেই ধপ! মনে হল যেন একটা ভারী কিছু ওপর থেকে পড়ল। তারপর আবার একটা ধপ! আর সঙ্গে সঙ্গে একটা মেয়েমানুষের গলায় চিৎকার। মানে ব্যথা পেলে তারা যেমন ককিয়ে ওঠে, তেমনি। আমি শুনে ছুটে বেরুতে যাচ্ছিলুম, আমার পরিবার আমার কাছা চেপে ধরলে, বেরুতেই দিলে না।'

আমি জিগ্যেস করলুম, 'তারপর?'

অতুল বলল, 'তারপর আর কী? পরদিন সকালে গাছতলায় গিয়ে দেখি একটা গোদা বানর মরে পড়ে আছে আর বটগাছ খালি। ভোর হতে-না-হতেই পুরো দলটা গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গেছে।'

শুনতে শুনতে আমার কেমন যেন মনের মধ্যে সব গোলমাল পাকিয়ে যেতে লাগল। এতগুলো শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা সম্পূর্ণ নিরক্ষর লোক একসঙ্গে জোট পাকিয়ে অনবরত

মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে? কার স্বার্থে? আমাকে বোকা বানিয়ে মজা পাওয়া এর উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর পেছনে কোনো একটা সত্য লুকিয়ে আছে, অশিক্ষা আর কুসংস্কারের গোলকধাঁধায় পড়ে হয়তো তা এমন একটা হাস্যকর রূপ তৈরি হয়েছে। সেই সত্যটা কী? এতগুলো প্রাণ গেছে, সেটা তো রসিকতা নয়। তা ছাড়া কাল শুতে যাওয়ার আগে বসন্ত একটা কথা বলেছিল, তার মানেই বা কী?

আমি হঠাৎ গোবিন্দদার দিকে ফিরে বললুম, 'আচ্ছা গোবিন্দদা, কালরাত্রি কী?'

গোবিন্দ গম্ভীর মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'হুঁ, তুমিও শুনেছ কথাটা। পণ্ডিতমশাই বললেন, কালরাত্রি মানে যে রাত্রে মানুষের ঘরে মৃত্যু নেমে আসে। যে রাত ভীষণ বিপদের রাত। আমাদের গাঁয়ে সেই কালরাত্রি নেমেছে চিত্তপ্রসাদ, কেউ আমাদের উদ্ধার করতে পারবে না। একে-একে আমরা সবাই যাব। তবে হ্যাঁ, মৃত্যুটা বোধ হয় খুব তাড়াতাড়ি আসে। বেশি কষ্ট পেতে হয় না। সেটাই যা বাঁচোয়া।'

আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম, 'কালরাত্রি নেমেছে আর আপনারা সবাই মহানন্দে তার ছোবলের মুখে গলা বাড়িয়ে দেবেন? বাঁচবার চেষ্টা করবেন না? সবাই একজোট হয়ে দাঁড়িয়ে এই বিপদের মোকাবিলা করবেন না?'

গোবিন্দ মৃদু হেসে ঘাড় নাড়লেন, 'কোনো লাভ নেই চিত্তপ্রসাদ। চেষ্টা কি আমরা করিনি? কিন্তু দৈব বড়োই প্রবল হে, তার সঙ্গে লড়াই করার সাধ্য আমাদের নেই।'

আমি বললুম, 'দৈবকে হারানো যায় না, আমি তা বিশ্বাস করি না গোবিন্দদা। একটু চেষ্টা, একটু মনের জোর থাকা চাই। আর সাধ্য? টাকাপয়সা? আমি কলকাতায় গিয়ে আপনাদের এই বিপদের কথা বলে আন্দোলন করব, দেখবেন সমস্ত দেশের মানুষ আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। টাকাপয়সার যা দরকার আমি তার ব্যবস্থা করব। আর চন্দ্রশেখর তো আছেই।'

আমি চন্দ্রশেখরের নাম করতেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। স্তম্ভিত হয়ে দেখি, চন্দ্রশেখরের নাম শুনেই সেই ভিড়ের প্রায় প্রত্যেকটি লোক মুখ বিকৃত করল। আমি তো অবাক। এতদিন আমার ধারণা ছিল বকুলপুর গ্রামের প্রত্যেকটি লোক চন্দ্রশেখরকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে। কিন্তু, এ কী হল? আমি এত আশ্চর্য হয়েছিলুম, যে বোধ হয় আমার মুখ দেখে সেটা সবাই বুঝতে পেরেছিল।

গোবিন্দ তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা সামলানোর জন্যে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই। জমিদারবাবু আছেন, তুমি আছ, দেশের আর পাঁচজন আছেন। দ্যাখো, যদি কিছু করে উঠতে পারো।'

আমি ততক্ষণে বিস্ময়টা কাটিয়ে উঠেছি। আর এ-ও বুঝেছি যে গোলমালটা অনেক গভীরে পৌঁছেছে। কাজেই সাবধানে বললুম, 'নিশ্চয়ই করব গোবিন্দদা। আর আপনাদের

সঙ্গে পরামর্শ করেই করব। আজ সন্ধে বেলা আপনারা আসুন না চন্দ্রশেখরের বাড়িতে, একটা আলোচনা করা যাবে।'

গোবিন্দ বললেন, 'আলোচনা? আলোচনা তো অনেক হল চিত্তপ্রসাদ, তাতে আর লাভ কী হবে? এর আগে পরামর্শ করে যা কিছু করা হয়েছে, তাতে সুরাহা তো কিছু হয়নি, উলটে কতগুলো প্রাণ বেঘোরে গেছে। তার চেয়ে এখন আমরা যেমনভাবে চালাচ্ছি, তেমনিভাবেই চলুক। তাঁর আসবার তো সময় হয়ে এসেছে। এখন সন্ধে হলেই যে-যার ঘরে দোর দিয়ে সারারাত জেগে শাঁখ আর কাঁসর বাজাবে, চিৎকার করবে যাতে বাইরের কোনো শব্দ শোনা না-যায়, আর কেউ যেন বাইরে না-থাকে। তা হলেই হবে। আর নতুন করে পরামর্শের কোনো দরকার দেখি না চিত্তপ্রসাদ। যদি তুমি নিজের বিবেচনায় কিছু করতে পারো তো করো।' বলে গোবিন্দদা আস্তে আস্তে চলে গেলেন। ভিড়ের লোকজনও যে-যার চলে গেল। দেখে হতবাক আমি আর বিষ্ণুপদ কেবল দাঁড়িয়ে আছি।

বিষ্ণুপদ মৃদু হেসে বলল, 'দেখলেন তো চিত্তবাবু, এই আমাদের গাঁয়ের লোক।'

আমি চটকা ভেঙে বললুম, 'গাঁয়ের লোককে দোষ দিও না বিষ্ণুপদ। ওরা যে একটা ভয়ংকর বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে আছে, এতে তো কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। ওদের সহানুভূতি দেখাতে না-পারো ঠাট্টা কোরো না। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার ভীষণ খটকা লাগছে। এরা চন্দ্রশেখরের ওপর অসন্তুষ্ট কেন? কী করেছে সে?'

বিষ্ণুপদ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'আপনি ওদের ওপর সহানুভূতি দেখাতে বললেন, না? কোত্থেকে সহানুভূতি আসবে বলতে পারেন? এমন একটা অকৃতজ্ঞ জাত! যে জমিদারবাবু নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে এখানে পড়ে থেকে এদের জন্যে এত কিছু করলেন, আজকে এরা তাঁকেই ...' বলতে-বলতে বিষ্ণুপদ থেমে গেল।

আমি বললুম, 'থেমো না বিষ্ণুপদ। কী হয়েছে বলো। এরা চন্দ্রশেখরকে সন্দেহ করছে? ভাবছে, এই মৃত্যুগুলোর পেছনে চন্দ্রশেখরের হাত আছে?'

বিষ্ণুপদ নীরবে ওপরে-নীচে ঘাড় নাড়ল।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম, 'কিন্তু কেন? তার অপরাধ?'

বিকৃত মুখ করে বিষ্ণুপদ বলল, 'অপরাধ? প্রথমত, তিনি যেসব নাইট ওয়াচ বসিয়েছিলেন, তাদের অনেকেই মারা গেছে। দ্বিতীয়ত, যদিও তিনি প্রায় প্রত্যেক রাত্রে গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় বন্দুক হাতে টহল দিয়ে বেড়ান, কিন্তু যেদিন মৃত্যুগুলো ঘটে সেদিন আর তাঁকে দেখা যায় না।

আচ্ছা, আপনিই বলুন, এসব কি কোনো যুক্তি? আরে, ওদের কথাই যদি মেনে নিতে হয়, তাহলে জমিদারবাবুকে তো সন্দেহ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।'

আমি জিগ্যেস করলুম, 'ওদের কী কথা?'

বিষ্ণুপদ তিক্ত হাসি হেসে বলল, 'জানেন না? সেই যে তিনি, মানে যিনি কামড়ে থাকেন, তাঁকে তো দু-তিনজন দেখেছে। তাঁর বর্ণনার সঙ্গে আর যার মিলই থাকুক, জমিদারবাবুর নেই।'

আমি উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম। বললুম, 'বলো কী বিষ্ণুপদ? তাকে কেউ দেখেছে? বর্ণনাটা কীরকম?'

'ওঃ, সে ভারি মজার! বর্ণনাটা মোটে কোনো গোটা মানুষেরই না। মানে, আধখানা মানুষের আর আধখানা গিরগিটির। মানে, একটা গিরগিটি যদি পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ায় তাহলে যেমন দেখাবে তেমনি। এমনকী একটা মোটা ল্যাজও আছে।' বলে বিষ্ণুপদ হাসতে লাগল।

আমিও হেসে ফেললুম। বললুম, 'তবু লোকে চন্দ্রশেখরকে সন্দেহ করে? কী ভাবছে তারা, এটা ওর ছদ্মবেশ?'

'হ্যাঁ, তাই বটে।'

'কারা কারা দেখেছে?'

'এ-গাঁয়ের দু-জন, শ্যামচরণ আর নীলু আর পাখনার একজন, চৌকিদার গুপিচরণ।'

'তাদের সকলের বর্ণনাই এক?'

'হ্যাঁ, প্রায় এক।'

যখন বাড়ি ফিরলুম তখন বেশ বেলা হয়েছে। দেখি, বৈঠকখানা ঘরে আমাদের খাওয়ার জায়গা করছে বসন্ত। আমাকে আসতে দেখে বসন্ত বলল, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলেন রায়বাবু? জমিদারবাবু অনেকক্ষণ থেকে আপনাকে খুঁজছেন। আপনি চান করে আসুন, আমি কাছারি বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে আসি।'

আমি স্নান সেরে খাওয়ার জায়গায় এসে দেখি, চন্দ্রশেখর বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে মাথা নীচু করে আসনে বসে আছে। আমার পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলে বলল, 'এসো চিত্তপ্রসাদ। কোথায় গিয়েছিলে?'

আমি ওর পাশে বসে বললুম, 'এই, গ্রামটা একটু ঘুরতে গিয়েছিলুম।'

চন্দ্রশেখর একটু চুপ করে থেকে জিগ্যেস ককরল, 'কিছু শুনলে?'

আমি চুপ করে রইলুম।

চন্দ্রশেখর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'শুনেছ, না? এবার বুঝেছ, কেন আমি তোমাকে ডেকে এনেছি? তুমি আইনজ্ঞ, বুদ্ধিমান, আর আমার বন্ধু। এ-বিপদ থেকে তুমিই আমাকে উদ্ধার করতে পারো। আমার প্রজাদের জীবন আমি রক্ষা করতে পারিনি, আমার সংসার ভেঙে যাচ্ছে, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি চিত্তপ্রসাদ।'

আমি জিগ্যেস করলুম, 'সংসার ভেঙে যাচ্ছে কেন?'

'ওই যে। প্রজারা আমার নামে যে সন্দেহ করে, তা সুমিত্রার কানে পৌঁছেছে। তারপর থেকে সে আর এ-বাড়িতে থাকতে চায় না। সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, রাত্রে একঘরে থাকতে চায় না। তার ওপর, বাড়ির ভেতরে ধাইমা মারা যাওয়ার পর, সে তো প্রায় নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করেছে। আমি বেশি কাছে গেলেই ভয়ে সাদা হয়ে যাচ্ছে। আর মুখে শুধু ওই এককথা, আমাকে বাপের বাড়ি রেখে এসো, আমি এখানে এক মুহূর্ত থাকতে চাই না। তুমি বলো চিত্তপ্রসাদ, আমি কী করতে পারি?'

'ঘনশ্যাম রায়কে খবর দিয়েছ?' আমি জিগ্যেস করলুম।

'হ্যাঁ, শ্বশুরমশাইকে খবর দিয়েছি। তিনি আসবেন বলেছেন। কিন্তু তিনি ব্যস্ত লোক, চট করে চলে আসা তো সহজ নয় তাঁর পক্ষে। এদিকে সময় এগিয়ে আসছে। আর যতই সময় এগিয়ে আসছে, সুমিত্রা ততই আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়ছে।'

আমি বললুম, 'তা, তুমি সুমিত্রাকে নিয়ে বাইরে কোনো জায়গা থেকে কিছুদিন ঘুরে এসো না। সুমিত্রার সন্দেহও কাটবে, তুমিও একটু বিশ্রাম পাবে।'

মাথা নেড়ে চন্দ্রশেখর বলল, 'না চিত্তপ্রসাদ, তা হয় না। আমি যে এ কথাটা চিন্তা করিনি, তা নয়। কিন্তু মনে করো, আমার যেমন দুর্ভাগ্য, হয়তো বাইরে গেলুম, আর সেবারেই কিছু হল না। তখন কী হবে? আমি কি আর কোনোদিন এ-গাঁয়ে ঢুকতে পারব? ঢুকলে সবাই আমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে না?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, তা বটে। তাহলে তুমি ঘনশ্যাম রায়কে একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম পাঠাও!'

'তা-ও পাঠিয়েছি। আশা করছি, কাল-পরশুর ভেতরেই উত্তর পাব।'

'কিন্তু চন্দ্রশেখর, সুমিত্রা যদি আর না-ফিরে আসে?'

চন্দ্রশেখর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, 'ও নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। তুমি দেখো। এ রহস্যের জাল ছিঁড়ে ফেলে ও নিশ্চয়ই নিজের ভুল বুঝতে পারবে। কিন্তু কত দিনে?'

এ-প্রশ্নের উত্তর আমার জানা ছিল না। কাজেই চুপ করে রইলুম।

রাত্রি বেলা শুতে যাওয়ার সময় বসন্ত বলল, 'রায়বাবু, গন্ধটা বাড়ছে, টের পাচ্ছেন?'

আমি মাথা নেড়ে বললুম, 'কোন গন্ধটা বসন্ত? আমার নাকে তো নানারকম গন্ধ আসছে।' বসন্ত স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'কালরাত্রির গন্ধ, মৃত্যুর গন্ধ।'

আমি শুয়ে পড়ে বললুম, 'মৃত্যুর গন্ধ যে কেমন, তা তো আমার জানা নেই বসন্ত। কাজেই সেটা বাড়ছে না-কমছে, তা বলব কী করে?'

বসন্ত আমার কথার খোঁচাটা বুঝল কি না কে জানে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

তারপর আমার যখন প্রায় ঘুম এসে গেছে, তখন হঠাৎ আমাকে ডেকে বলল, 'রায়বাবু, আমার চোখটা একটু দেখবেন।'

আমি একটু চটেই গেলুম। বললুম, 'কী পাগলামো হচ্ছে, বসন্ত! শুয়ে পড়ো।' আর বলতে-বলতেই ওর দিকে চোখ পড়ায় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। দেখি ওর চোখ দুটোর মধ্যে মণি নেই, পুরোটাই সাদা! কোনোরকমে বললুম, 'কী করছ, বসন্ত? এমন চোখ কপালে তুলে বসে আছ কেন?'

বসন্ত চোখ বন্ধ করে মৃদু হাসল। বলল, 'চোখ কপালে তুলিনি রায়বাবু। মণিদুটো দেখতে পাননি, না? যাক, ভালোই হয়েছে।'

'ভালো হয়েছে মানে? কী ভালো হয়েছে? মণি না-দেখতে পাওয়ার মধ্যে ভালোটা কোথায়?'

'আছে, রায়বাবু। একে আমরা বলি চক্ষুক্ষীর। এটা চোখের ওপর এলে, তখন চোখ আর দেখতে পায় না, দেখতে পায় বোধ হয় মন। কীভাবে হয় জানি না, তখন অনেক কিছু দেখতে পাই যা সাদা চোখে কখনো দেখা যায় না। সবসময় তো এটা আসে না, কখনো-সখনো কালেভদ্রে আসে। যখন আসে, তখন পৃথিবীর রূপই পালটে যায়। মনে মনে বড্ড চাইছিলুম, এটা যেন আসে। প্রার্থনা করছিলুম যদি কোনো পুণ্যফল আমার থাকে, তাহলে এই ভীষণ বিপদের দিনে যেন এটা পাই।'

আমি আবার লম্বা হয়ে বললুম, 'দ্যাখো বসন্ত, সারাদিন ধরে নানারকম ভয়ংকর-ভয়ংকর সব কথা শুনতে হয়েছে, তার ওপর তুমি এলে তোমার চক্ষুক্ষীর না চক্ষুস্থির, কীসব নিয়ে। আর সহ্য করতে পারছি না। এবার ঘুমোতে দাও। কাল আবার সকাল বেলা বেরোতে হবে মোটা ল্যাজওয়ালা আধখানা মানুষ আর আধখানা গিরগিটির সন্ধানে। কী যে সব হচ্ছে কে জানে। বুঝতে পারছি না যে, আমি কি একটা পাগলা গারদের মধ্যে এসে পড়লুম না সবাই আসলে সুস্থ, কেবল আমিই পাগল হয়ে গেছি।'

বসন্ত বলল, 'পাগল কেউই হয়নি রায়বাবু। কেবল একটা কথা মনে রাখা দরকার, আমরা রোজ যা চোখে দেখি বা কানে শুনি, তার বাইরেও অনেক কিছু হয় বা আছে, যা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব।'

আমি বললুম, 'হুঁ, শেক্সপিয়রও এরকমই কী একটা কথা যেন বলেছিলেন বটে।'

পরদিন ভোর বেলা উঠে বারান্দায় গিয়ে দেখি, চন্দ্রশেখর বসে আছে। কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে আমি স্তম্ভিত। কী এক প্রচণ্ড অন্তর্গূঢ় বেদনায় সে মুখ বিকৃত হয়ে রয়েছে। আমি জিগ্যেস করলুম, 'কী হয়েছে?'

চন্দ্রশেখর ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল, 'সুমিত্রা আমাকে আল্টিমেটাম দিয়ে দিয়েছে গতকাল।

যেভাবেই হোক, আজ রাত্রের মধ্যে ও চলে যাবেই। আমি যতক্ষণ ব্যবস্থা না-করছি, ততক্ষণ সে অন্নজল স্পর্শ করবে না বলে দিয়েছে।'

আমি বললুম, 'বলো কী? এ তো মহাবিপদ দেখছি। ঘনশ্যামবাবুর কাছ থেকে কোনো খবর পেলে?'

মাথা নেড়ে চন্দ্রশেখর বলল, 'নাঃ। আজ আসবেন হয়তো।'

'তবে তুমি ভেতরে গিয়ে বউঠানকে বলো যেন আজকের দিনটা অপেক্ষা করেন, তারপরে কাল না-হয় অন্য ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।'

'কী ব্যবস্থা নেবে তুমি? ধাইমা মারা গেছেন আজ সতেরো দিন হল। আর-একটা মৃত্যু আসছে আর দিন তিন-চারেকের মধ্যে। গাঁয়ের লোক রাত্রে বেরোনো বন্ধ করেছে। পাইকদের বা বেহারাদের কাউকে বললেও কেউ এখন বেরোবে না। কেটে ফেললেও না।'

'দিনে দিনে যাবে, দিনে দিনে চলে আসবে। কী আছে তাতে?'

'আরে, তুমি শুধু তাদের নিরাপত্তার কথা ভাবছ। তাদের তো পরিবার রয়েছে। তারা তো তাদের কথা ভাবছে।'

'হুঁ! সে কথা ঠিক। তাহলে কী করবে?'

'তাই তো বুঝতে পারছি না। সুমিত্রা আমাকে যা-ই সন্দেহ করুক না-কেন, তার জন্যে যদি নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করে ভয়ের চোটে একটা ভালো-মন্দ করে বসে, তাহলে আমি কোথায় যাব বলতে পারো?'

আমি বললুম, 'সত্যি তো! এ তো মহা অসুবিধে দেখতে পাচ্ছি! তা এমন কেউ নেই, যার পরিবার-টরিবার নেই?'

চন্দ্রশেখর চিন্তিত মুখে বলল, 'আছে। তার গোরুর গাড়িও আছে। আমাদের রামকেষ্ট গাড়োয়ান। কিন্তু সে ব্যাটা বদ্ধ মাতাল। অন্তত দুটো পাইক ছাড়া সুমিত্রাকে তার হাতে ছাড়ি কী করে? দু-দিনের পথ।'

'তুমি সঙ্গে যাও না?'

'না, চিত্তপ্রসাদ, তা হয় না। বললুম না, সময় হয়ে এসেছে।'

আমার বুকের ভেতরটা কেমন ছ্যাঁক করে উঠল। বললুম, 'তুমি এখন কিছুতেই যেতে পারো না?'

দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে চন্দ্রশেখর বলল, 'না, অন্তত এই ক-টা দিন নয়।'

কেমন যেন ধাঁধা লেগে গেল আমার! কোথায় একটা গোলমাল লাগছে মনটা স্থির করে কিছুতেই একটা পরিষ্কার মীমাংসায় আসতে পারছি না। চন্দ্রশেখর কাছারি চলে গেল, অন্যমনস্কভাবে আমি বের হলুম শ্যামচরণ আর নীলুর খোঁজে।

নীলুর একটা মুদির দোকান ছিল। তাকে সেখানে গিয়ে ধরলুম; জিগ্যেস করলুম, 'তুমি নাকি কীসব দেখেছ? কী দেখেছ?'

নীলু বা নীলকণ্ঠ আধবুড়ো মানুষ, আমার কথা শুনে কেঁপে-ঝেঁপে অস্থির। প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বলল, 'না, না, আমি কিছু দেখিনি রায়বাবু। বুড়ো লোক আমি, অন্ধকারে কত ছায়া দেখি। সেসব কি ধরতে আছে?'

আমি বললুম, 'আমাকে ভাঁওতা দিও না নীলকণ্ঠ। কী দেখেছ, বলো।'

কিছুতেই বলবে না। শেষটা হঠাৎ মাথায় একটা আইডিয়া এসে গেল। ওর পাশে রাখা হিসাব লেখার শ্লেটা আর পেনসিলটা তুলে নিয়ে বিজ্ঞান বইয়ে যে ডাইনোসোরের ছবি আঁকা থাকে সেরকম একটা মোটামুটি স্কেচ এঁকে ওকে দেখালুম। মুহূর্তের মধ্যে নীলকণ্ঠের মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল। ফিসফিস করে আমাকে জিগ্যেস করল, 'তবে তুমিও দেখেছ রায়দাদা?'

আমি কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, 'হ্যাঁ দেখেছি। তবে অনেকদূর থেকে তো, কতটা উঁচু বুঝতে পারিনি। তুমি বলতে পারো?'

নীলকণ্ঠ বলল, 'আমি তো খুব কাছ থেকে দেখিনি। আর এক লহমার জন্যে তো! তবে মনে হয় এক মানুষ কী তার চেয়ে একটু বেশি উঁচু হবে।'

শ্লেটটা ধার নিয়ে গেলুম শ্যামাচরণের কাছে। সে মাঠে কাজ করছিল। আমার ছবি দেখে সে আমার শিল্পপ্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল। আর তারও মত দেখলুম সেটা এক-মানুষ সমান উঁচু হবে। আর চক্ষের পলকে ছুটে বেরিয়ে যায়। শরীরটা যতই ভারী দেখাক না-কেন, অবিশ্বাস্য তার গতিবেগ।

শ্যামচরণের কাছ থেকে ফিরে আসতে আসতে দেখলাম মনটা কেমন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। এটা কি দুঃস্বপ্ন? এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে নীলকণ্ঠ আর শ্যামাচরণ আলাদা আলাদা সময়ে সাদা চোখে, অবশ্য আবছায়া অন্ধকারে, একটা অতিকায় সরীসৃপের অবয়ব দেখেছে। তারা মিথ্যে কথা বলছে না কারণ আমার মতো ঘাঘু উকিলকে এরকম পর্বতপ্রমাণ ধাপ্পা দেওয়া তাদের সাধ্যাতীত। তা ছাড়া, এতে এদের কোনো স্বার্থও থাকতে পারে না।

তাহলে, এরকম একটা জীব দিন কুড়ি-বাইশ কোথায় লুকিয়ে থাকে? চারদিকে যে জঙ্গল আছে, সেগুলো এমন কিছু মারাত্মক গভীর বা সেখানে একদম কোনো লোকজন চলাচল করে না, এমন নয়। আর জঙ্গলের দিকে যারা থাকে তারা তো তেমন মরেনি, বরং বেশি মারা গেছে তারা যারা গ্রামের ভেতরের দিকে থাকে। অতএব, ধরে নিতে হয়, সে প্রাণীটি গ্রামের ভেতরেই কোথাও লুকিয়ে থাকে।

কিন্তু, সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে সে থাকে কোথায়? কেউ কি তাকে লুকিয়ে রাখে? আর দিন কুড়ি-বাইশ অন্তর অন্তর সে ক্ষুধার্ত হলে তাকে ছেড়ে দেয়? তাহলে নিশির ডাক? সেটা যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে হবে কেউ সেই সরীসৃপটি সঙ্গে নিয়ে বেরোয়, তাকে শিকার ধরে নিতে সাহায্য করে। সে কে? আর, এরকম একটা অতিকায় সরীসৃপ লুকিয়ে রাখার মতো জায়গাই বা কোথায়? জমিদার বাড়ি?

অসম্ভব নয়। ও-বাড়ির তো মাত্র একটা অংশে চন্দ্রশেখর থাকে। আর বেশিরভাগ অংশই তো তালাবন্ধ হয়ে পড়ে থাকে। ওদিকে কি কিছু আছে?

দুপুর বেলা খেতে বসে চন্দ্রশেখরকে আমার গবেষণার কথা বললুম। চন্দ্রশেখর স্থির উজ্জ্বল দৃষ্টিতে সবকথা শুনল। কিন্তু কোনো মতামত প্রকাশ করল না। খাওয়া শেষ হলে অন্দরের ভেতরে গিয়ে একটু বাদেই বেরিয়ে এল এক হাতে একটা রাইফেল আর অন্য হাতে একটা চাবির গোছা নিয়ে। বলল, 'চলো, অন্য মহলগুলো একটু খুঁজে দেখি।'

আমি বললুম, 'চলো।' বসন্ত কাছেই ছিল। সে-ও জুটে গেল। কেবল জুটে গেল নয়, আঠার মতো আমার সঙ্গে সেঁটে গেল বলা যায়।

কিন্তু কোনো লাভ হল না। কিছুই পাওয়া গেল না। আমরা হতাশ হয়ে ফিরে এলুম।

বৈঠকখানা ঘরে এসে বসতেই একজন পাইক একটা টেলিগ্রাম দিল চন্দ্রশেখরের হাতে। সেটা পড়ে চন্দ্রশেখরের মুখটা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

আমি ব্যস্ত হয়ে জিগ্যেস করলুম, 'কী হল?'

ভগ্ন কণ্ঠে চন্দ্রশেখর বলল, 'শ্বশুরমশাইয়ের তার। উনি আসছেন, তবে আরও সাতদিন বাদে।'

সেদিন সন্ধে বেলা চন্দ্রশেখর আমাকে ওর অন্দরমহলের বসবার ঘরে ডেকে পাঠাল।

ঘরে ঢুকে দেখি ঘরের মাঝখানে চন্দ্রশেখর দাঁড়িয়ে রয়েছে, মুখটা লাল টকটক করছে আর এককোণে পেছন ফিরে ঘোমটা টানা একটা মেয়ে, বুঝলুম সুমিত্রা। আর এ-ও বুঝতে পারলুম, দাম্পত্যকলহে কিছুতেই জিততে না-পেরে চন্দ্রশেখর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে সাহায্যের জন্যে।

চন্দ্রশেখর আমাকে দেখে চাপা গলায় বলল, 'তোমার বউঠানকে একটু বুঝিয়ে বলো তো চিত্তপ্রসাদ যে আজ রাত্রে তার পক্ষে এ-গ্রাম ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কোনোমতেই সম্ভব নয়।'

ঘোমটার আড়াল থেকে সরোষ প্রশ্ন এল, 'কেন সম্ভব নয়? সম্ভব করলেই সম্ভব।'

সরোষ প্রশ্ন বললুম বটে, কিন্তু কী গলা! মনে হল যেন একটা সেতার বেজে উঠল। এমন একটা আশ্চর্য মিষ্টি সুরেলা গলা আজ পর্যন্ত আর শুনিনি।

আবার সেতার বেজে উঠল, 'কারোর সাহায্যেরও দরকার হত না। পা-টা যদি না-মচকাত, তাহলে আমি একাই হেঁটে চলে যেতাম।'

চন্দ্রশেখর বলল, 'তোমার পা মচকায়নি, হাড় ফেটে গেছে। এ অবস্থায় গোরুর গাড়ি করে এই অন্ধকারে কখনো কি কারোর যাওয়া সম্ভব? মেয়েমানুষের কথা বাদ দাও, কোনো পুরুষমানুষই কি এরকম অবস্থায় যেতে পারে? কেন তুমি এরকম করছ? তুমি আমাকে বিশ্বাস না-করো, ঘরে খিল দিয়ে থাকো, বাইরে দশটা পাইক বসিয়ে দিচ্ছি।'

'না, না, না। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না, তোমার পাইকদের বিশ্বাস করি না, কাউকে না। ধাইমা মারা গেছেন, এবার আমার পালা। এমনভাবে পড়ে পড়ে আমি মরতে পারব না। আমি চলে যাব, আজই চলে যাব।'

চন্দ্রশেখর আমার দিকে ফিরে বলল, 'আতঙ্কের এমন ভয়ংকর রূপ এর আগে কখনো দেখেছ চিত্তপ্রসাদ?'

আমি কিন্তু তখন অন্যকিছু দেখছিলুম। মনে মনে একটা কুৎসিত ছবি এঁকে ফেলেছিলুম। আমি মোটামুটি শিক্ষিত লোক, ভদ্র সন্তান, একটা আদর্শের অনুগামী, যে আদর্শের একটা প্রধান ভিত্তি হচ্ছে সচ্চরিত্রতা, কিন্তু সেই আমার মনের মধ্যে অদ্ভুত কুলষিত চিন্তা অবচেতনের ক্লেদাক্ত গহ্বর থেকে সাপের মতো ফণা তুলে দাঁড়াল। সুমিত্রার গলা শুনে আমার মাথার মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। আমি ভাবলুম, সুমিত্রা শুনেছি অপরূপ সুন্দরী, এমন কণ্ঠস্বর যার সে অসাধারণ না-হয়ে যায় না, তার ওপর তার পা ভাঙা, অতএব প্রায় চলচ্ছক্তিহীন বলা চলে। একটা মাতাল গাড়োয়ানের গাড়িতে একে নিয়ে অন্ধকার পথ দিয়ে যাওয়ার সুযোগ একটা পুরুষ মানুষের জীবনে দু-বার আসে না। চন্দ্রশেখর জাহান্নামে যাক, এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করব না এমন নির্বোধ বন্ধু আমি নই।

আমি বললুম, 'ঠিক আছে, বউঠান যখন এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তখন আমিই না-হয় ওঁকে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

চন্দ্রশেখর অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বলল, 'তুমি যাবে? বেশ, তাই হোক। তবে সঙ্গে বসন্তকে নিয়ে যাও।'

আমার মাথায় চড়াৎ করে রক্ত উঠে গেল। কোনোরকমে সামলে নিয়ে বললুম, কেন বসন্ত কেন? তুমি কি মনে করো, আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারি না?'

চন্দ্রশেখর স্থির গলায় বলল, 'না, তা নয়। যদি তোমাদের কেউ আক্রমণ করে, তাহলে একজন পালিয়ে গিয়ে খবর দিতে পারবে। সুমিত্রা বা রামকেষ্টর পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না। আর তুমি যদি বিপদের মোকাবিলা করতে থাক, তাহলে বসন্ত পালিয়ে তো যেতে পারবে।'

আমি আবার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু সুমিত্রার গলা শুনতে পেলুম আবার, 'আপনি আপত্তি করবেন না, চিত্ত ঠাকুরপো। চলুক না আপনার বসন্ত আমাদের সঙ্গে।

অসুবিধে কিচ্ছু হবে না, দেখবেন।'

সঙ্গেসঙ্গে আমার মনের মধ্যে অনেকগুলো চিন্তা দ্রুত খেলে গেল। এক, যদি বসন্তকে নিয়ে গোলমাল পাকাই, হয়তো যাওয়াটাই বন্ধ হয়ে যাবে। দুই, যদি বসন্ত যায়ও, ওকে তাপ্পি দিয়ে সরিয়ে দেওয়া অসুবিধে হবে না। তিন, বসন্ত যদি গোলমাল করে, ওকে না হয় খুনই করে ফেলা যাবে। পরে এসে বলব, রক্তচোষা মেরেছে।

কাজেই বললুম, 'ঠিক আছে, বসন্ত চলুক আমাদের সঙ্গে।'

চন্দ্রশেখর বলল, 'বেশ, তাহলে তৈরি হয়ে নাও। আর অস্ত্রশস্ত্র কিছু সঙ্গে আছে, না একটা বন্দুক দিয়ে দেব সঙ্গে?'

আমি বললুম, 'আমি তৈরিই আছি। আর অস্ত্রের দরকার কী? তোমার মতো অত ভয় আমার নেই। তা ছাড়া, আমি বন্দুক চালাতেই জানি না।'

চন্দ্রশেখর বলল, 'না, অস্ত্র ছাড়া আমি তোমাদের কিছুতেই যেতে দেব না। তুমি না-নাও, বসন্ত নিক। ওকে ডাকো, দেখি অন্তত শড়কি চালাতে জানে কি না।'

বসন্ত ঘরে ঢুকেই একটা ঝাঁকানি দিয়ে শরীর শক্ত করে দাঁড়িয়ে গেল। চন্দ্রশেখর একটু বিস্মিত হয়েই জিগ্যেস করল, 'কী হল বসন্ত?'

বসন্ত একটা অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বলল, 'গন্ধটা বড্ড বেশি!'

চন্দ্রশেখর আবার কী একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'তোমার ওই ন্যাকামো বন্ধ করো তো বসন্ত! জমিদারবাবু যা প্রশ্ন করছেন, তার জবাব দাও। গন্ধ-গন্ধ করে মাথা খারাপ করে দিল একেবারে।'

আমার রূঢ়তায় বসন্ত চমকে উঠল। আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'কী প্রশ্ন?' বলতে বলতে দেখি ওর চোখের ওপর একটা অস্বচ্ছ ঘন তরল আবরণ নেমে এসে মণিদুটোকে আড়াল করে দিচ্ছে। দেখে রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল, ওকে চিৎকার করে গালাগালি করতে ইচ্ছে হল।

কিন্তু আমি কিছু করার আগেই চন্দ্রশেখর জিগ্যেস করল, 'তুমি কি বন্দুক চালাতে জানো, বসন্ত?'

বসন্ত মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

'শড়কি চালাতে পারো? বা বর্শা?'

'হ্যাঁ পারি। শড়কির খেলায় আমি গুরু যাদবচন্দ্র পালের শিষ্য।' বলে দু-হাত জোড় করে মাথায় ঠেকাল বসন্ত।

চন্দ্রশেখর একটা দেওয়াল আলমারির ভেতর থেকে একটা রুপো-বাঁধানো লাঠি বের করে নিয়ে এল। সেটার মাথাটা খুলতেই ভেতর থেকে প্রায় একহাত লম্বা একটা

চকচকে ইস্পাতের ফলা বেরিয়ে এল। সেই প্রাণঘাতী অস্ত্রটাকে বসন্তের হাতে ধরিয়ে দিয়ে চন্দ্রশেখর জিগ্যেস করল, 'এটা ব্যবহার করতে পারবে? এটা আমার ঠাকুরদাদার গুপ্তি, তাঁর বংশের মর্যাদা রেখেছে অনেকবার।'

বসন্ত গুপ্তিটা ভক্তিভরে নাড়াচাড়া করে বলল, 'হ্যাঁ, এ অস্ত্র ব্যবহার করতে পারব। কিন্তু কেন? কোথায় ব্যবহার করতে হবে?'

এবার আমি কথা বললুম, 'বউঠাকুরানি আজ এখুনি বাপের বাড়ি যাবেন। গোরুর গাড়িতে যাবেন, সঙ্গে আমি থাকব। তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে।'

বসন্ত দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়ল। বলল, 'না, আপনার যাওয়া হতে পারে না, রায়বাবু। গন্ধটা আজ বড্ড বেশি আর আপনার ভেতরে... সেকথা থাক। আমি আপনাকে কিছুতেই যেতে দেব না।'

বসন্তের কথায় রাগে আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। আমি চিৎকার করে বললুম, 'তুমি আমায় যেতে দেবে না? কোথাকার লাটসাহেব তুমি? তুমি না-যাও, ওই গুপ্তি নিয়ে আমি একাই যাব। ওটা দাও আমাকে।'

বসন্ত বিনা বাক্যব্যয়ে অস্ত্রটা আমার হাতে দিয়ে দিল, কিন্তু আমি সেটা ভালো করে ধরার আগেই চন্দ্রশেখর আমার হাত থেকে টেনে নিল সেটা। বলল, 'না, না, চিত্তপ্রসাদ, এ জিনিস চালানো বড়ো সহজ নয়। কায়দা জানা না-থাকলে, নিজেই আহত হয়ে পড়বে, এমনকী কোনো গুরুতর বিপদ কিছু ঘটে যাওয়াও অসম্ভব নয়।' তারপর বসন্তের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাও না বসন্ত, আমি বউঠাকুরানিকে কথা দিয়েছি যে তাঁকে আজ বাপের বাড়ি রওনা করিয়ে দেবই।'

বসন্ত ঘাড় নীচু করে বলল, 'না জমিদারবাবু, সেটা অসম্ভব।'

তখন ঘরের কোণ থেকে আবার সেই শততন্ত্রী বীণা বেজে উঠল, 'কিন্তু যেতে যে আমাকে হবেই বসন্ত। তুমি না-নিয়ে গেলে আমি যাব কী করে?'

ঘরে যে একজন তৃতীয় ব্যক্তি রয়েছে, সেটা এতক্ষণ বসন্ত বুঝতে পারেনি। সুমিত্রার গলা শুনে পূর্ববৎ ঘাড় নীচু করেই একটু অস্বস্তিভরা গলায় বলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন মা, আমি বুঝতে পারিনি আপনি ঘরেই আছেন। তবে ছেলের বেয়াদবি মাপ করবেন, আমি কিছুতেই যাব না, রায়বাবুকে যেতে দেব না। মানে, আমি জীবিত থাকতে উনি যেতে পারবেন না।'

শুনে আমি বলতে গেলুম যে জীবিত তুমি থাকবে না, কিন্তু তার আগেই সুমিত্রা বলে উঠল, 'আমার অনুরোধ তুমি রাখবে না বসন্ত?' বলতে বলতে এসে বসন্তের সামনে দাঁড়াল।

বসন্ত যথারীতি চোখ নীচু করে বলল, 'না বউ ঠাকরুন, আমাকে মাপ করতে হবে। আজ গন্ধটা বড্ড বেশি।'

তখন সুমিত্রা একটা অদ্ভুত কাজ করল, এমন কাজ যা সে-যুগে কোনো জমিদারবাড়ির

বউয়ের পক্ষে করা শুধু অদ্ভুত নয়, অসম্ভব ছিল। বসন্তের সামনে সে মুখের ঘোমটা সরিয়ে পিঠের ওপর ফেলে দিল। বলল, 'আমার মুখের দিকে তাকাও বসন্ত। বলো, আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করবে না?'

আমি আর চন্দ্রশেখর স্তম্ভিত বিস্ময়ে সুমিত্রার দিকে চেয়ে রইলুম। সে কী আশ্চর্য রূপ! একজন সীতার জন্যে যে লঙ্কা ধ্বংস হতে পারে, একজন হেলেনের জন্যে নিশ্চিহ্ন হতে পারে ট্রয় বা একজন দ্রৌপদীর জন্যে নির্বংশ হতে পারে কুরুরাজবংশ, তাতে আজ আর আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সেই রূপ আমার সর্বাঙ্গে বাসনার আগুন জ্বালিয়ে দিল। ইচ্ছে হল এই দেবভোগ্য সৌন্দর্যে অধিকার শুধু আমার, চন্দ্রশেখর আর বসন্ত দু-জনকেই গলা টিপে মেরে একে বুকে নিয়ে অন্ধকারে পালিয়ে যাব, কেউ বাধা দিতে এলে শেষ করে দেব তাকেও।

আমার এই চিন্তার মধ্যেই সুমিত্রা আবার বীণায় ঝংকার তুলল, 'তাকাও বসন্ত, আমার দিকে তাকাও।'

নতনেত্র বসন্ত আস্তে আস্তে মুখ তুলে ঘোলাটে চোখ রাখল সুমিত্রার মুখে। এক মুহূর্ত। তার পরেই মাতালের মতো তীক্ষ্ণ-তীব্র চিৎকার করে উঠল, 'কে তুমি? কে তোমাকে এখানে এনেছে?'

চন্দ্রশেখর এক পা এগিয়ে বিস্ময়-কম্পিত গলায় বলল, 'উনিই বউ ঠাকুরানি বসন্ত। উনিই বাপের বাড়ি যাবেন।'

'বাপের বাড়ি! কোথায় বাপের বাড়ি?'

'ওঁর বাপের বাড়ি গঙ্গাযমুনা গ্রামে। এখান থেকে দু-দিনের রাস্তা।'

'গঙ্গাযমুনা গ্রামে? দু-দিনের রাস্তা?' হা-হা করে হেসে উঠল বসন্ত। 'ওর বাপের বাড়ি নরকে জমিদারবাবু, পৃথিবীর পেটের মধ্যে,পাতালে— যেখানে গনগন করে আগুন জ্বলছে। এই পিশাচিরা উঠে আসে সেখান থেকে। এরা যা কিছু ছোঁয় তা-ই অপবিত্র হয়, যার দিকে তাকায় সে-ই অপবিত্র হয়ে যায়। এদের বেসাতি লালসার, এদের তৃপ্তি মৃত্যু আর ধ্বংসে। এদের গলার মধ্যে বিষ জমে ওঠে, সেই বিষ ঢেলে একটা প্রাণ না-নিলে এরা নিজেরাই সেই বিষের জ্বালায় জ্বলে মরে। তোর তো সেই বিষ ঢালার সময় হয়ে এল, না শয়তানি? এই বাড়ির মধ্যে পাইক পেয়াদায় আটকা পরে, ঠ্যাং ভেঙে অসুবিধে হচ্ছে, নয়? তাই ভেবেছিস বাইরে গিয়ে একজনের ওপর বিষ ঢালবি। তাই এত আকুলিবিকুলি, এত ছটফটানি?'

আমি বসন্তের কথা শুনে রাগে দিশেহারা হয়ে সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছিলুম ওকে মারব বলে, চন্দ্রশেখর আমাকে পেছন থেকে টেনে ধরল। নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে সুমিত্রার পায়ের দিকটা দেখাল। যেখানে একটু আগে দেখেছিলুম একজোড়া রাঙা পদ্মের মতো পা, সেখানে... কী দেখলুম!

বসন্ত তখনও বলে চলেছে, 'আর তা হতে দিচ্ছিনে। আমি তোকে কিছুতেই বেরুতে দেব না। তুই নিজের বিষে জ্বলে পুড়ে মরবি, তাই আমি দেখব।'

সুমিত্রার গলা শুনলুম, 'আমি মরব না রে... মরবি তুই। মর, তুই মর।'

বলতে-বলতেই ফড়ফড় করে কাপড় ছেঁড়ার শব্দ হল। আমি যে বিভীষিকা দু-টির দিকে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে ছিলুম তারা ঢেকে গেল কতগুলো ছেঁড়া শাড়ি জামা আর ভাঙা গয়নায়। তারপর একসঙ্গে দুটো শব্দ শুনলুম, একটা বসন্তের ক্ষীণ হাহাকার আর-একটা খ্যাক করে আওয়াজ। মুখ তুলে দেখলুম, সেই ভয়ংকর আকৃতি, যেটা একটু আগে ছিল পরমা রূপসী সুমিত্রা, তার বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করব না; কারণ তাহলে আপনারা বলবেন বুড়ো বয়সে আমার কেবল ভীমরতিই ধরেনি, আমি গাঁজাও ধরেছি। কাজেই সেটা থাক। সেই ভীষণাকার একটা শরীর মৃত্যু-যন্ত্রণায় আছড়িপিছাড়ি খাচ্ছে। তার গলায় চন্দ্রশেখরের হাতের গুপ্তিটা আমূল গাঁথা। আমি সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম আর দেখতে লাগলুম সেই অতিকায় দংস্ট্রাকরাল বীভৎস মুখটা আকাশের দিকে উঁচু হয়ে খাবি খেতে খেতে আস্তে আস্তে স্থির হয়ে নেতিয়ে পড়ল। শেষ সংক্ষোভে শরীরটা বার কয়েক ঝাঁকানি খেল। তারপর সব স্তব্ধ।

তবে বিস্ময়ের এখানেই শেষ ছিল না। আবার আমাদের চোখের সামনে সেই নারকীয় দুঃস্বপ্নের একটা পরিবর্তন ঘটতে লাগল। বোধ হয় পাঁচ মিনিট। তার পরেই দেখি বসন্তের রক্তহীন মৃতদেহের পাশে পড়ে আছে আর একটি নিরাবরণ শরীর, মৃত্যুযন্ত্রণায় বিকৃত হলেও সেই অসাধারণ রূপের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু, আশ্চর্য এই যে, সেই রূপ দেখে এবার আমার মনের মধ্যে যে ভাব জেগে উঠল তা আতঙ্কের। মনে হল, এক্ষুনি পালিয়ে যাই। যদি ওটা আবার বেঁচে ওঠে, যদি গলায় বেঁধা গুপ্তিটা খুলে ফেলে উঠে দাঁড়ায়।

চন্দ্রশেখরের দিকে তাকিয়ে দেখি সে তখনও আতঙ্ক, অবিশ্বাস, ঘৃণা, বিস্ময় মেশানো বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মৃতদেহ দু-টির দিকে তাকিয়ে আছে। তখন আমার সম্বিত ফিরে এল। আমার আইনজীবির মস্তিষ্ক দ্রুত কাজ শুরু করে দিল। আমি এগিয়ে গিয়ে সুমিত্রার গলা থেকে গুপ্তিটা টেনে বের করে একটা চাদর দিয়ে দেহটা ঢেকে দিলুম। তারপর চন্দ্রশেখরের কাছে গিয়ে তাকে স্পর্শ করলুম। সঙ্গেসঙ্গে সে সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেল।

চন্দ্রশেখরের যখন জ্ঞান ফিরে এল, তখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল যেন সে দীর্ঘকাল কোনো দুরারোগ্য অসুখের পর সদ্য সুস্থ হয়েছে। ক্লান্ত অবসন্ন গলায় বলল, 'ব্যাপারটা যে এরকমই কিছু সে-সন্দেহ আমার বেশ অনেক দিনই হয়েছিল। মৃত্যুগুলো যে রাত্রে ঘটত সেই রাত্রিগুলোর কোনো স্মৃতিই আমার থাকত না। সেই রাত্রিগুলোর

দু-একদিন আগে থেকেই সুমিত্রা কেমন অদ্ভুতভাবে ছটফট করে বেড়াত। ওর গায়ে আমি কতগুলো কাটা এবং আঁচড়ের দাগ দেখেছি যেগুলোর কোনো উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও দিতে পারেনি। আর, যেদিন বাঁদরটা মারা পড়ল সেদিন ওর পায়ের হাড় ভাঙার কোনো কারণই খুঁজে পাচ্ছিলুম না। বাথরুমে পড়লে ওরকম হতে পারে না। তারপর যখন ধাই-মা মারা গেলেন তখন আমি প্রায় নিঃসন্দেহ হয়েছিলুম। অন্তত এটুকু বুঝেছিলুম যে আমার বিয়ের পর থেকেই এখানে যে কাণ্ড শুরু হয়েছে তার শেকড়টা রয়েছে আমারই বাড়িতে। তবে ব্যাপারটা যে এমন ভয়ংকর, তা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। আর কিছু করতেও পারছিলুম না। কেমন যেন সম্মোহনের মধ্যে ছিলুম। তবে আমার অবচেতন বোধ হয় তৈরি হচ্ছিল। তাই আজ চোখের সামনে ওই দৃশ্য দেখেই আমার হাত গুপ্তিটা ছুড়ল লক্ষ্যস্থলে, কিন্তু তাকে আমার বোধশক্তি চালায়নি, চালিয়েছে আমার মগ্নচৈতন্য। আসলে আমার চিন্তা করার শক্তিই বোধ হয় চলে গিয়েছিল।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিগ্যেস করল, 'এবার আমরা কী করব চিত্তপ্রসাদ? পুলিশে খবর দেব?'

আমি ততক্ষণে মনস্থির করে নিয়েছি। বললুম, 'না। পুলিশে খবর দিলে তারা এসে তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে, আমরা যা দেখেছি তার শতাংশের একাংশও বিশ্বাস করবে না। করতে পারেও না। তুমি মানুষের কল্যাণ করে খুনি বলে পরিচিত হবে— এ আমি হতে দিতে পারি না, কেবল তোমার বন্ধু বলে নয়, একজন মানুষ বলে।'

'তবে আমরা কী করব?'

'তুমি এখুনি গাঁয়ের লোককে খবর দাও। বলো, এবার রক্তচোষার শিকার দু-জন, বউ ঠাকুরানি আর তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে বসন্ত। বসন্তের মৃতদেহ দেখলে সবাই নিশ্চিন্ত হবে। সুমিত্রাকে তুমি স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে দাও আর ঘোমটা আর কাপড় দিয়ে যতটা সম্ভব মুখ ঢেকে দাও। সবাইকে বলে দাও, যত শীঘ্র সম্ভব দাহ শেষ করে যেন চলে আসে। কেউ কোনো সন্দেহ করবে বলে মনে হয় না। মৃত্যুভয় তার পরেও থাকবে। থাকুক। যখন অপঘাত মৃত্যুগুলো বন্ধ হবে, তখন আতঙ্কটা আস্তে আস্তে কেটে যাবে।'

'তুমি আমার কাছে থাকবে তো?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। অন্তত যতদিন ঘনশ্যামবাবু না আসছেন।'

ঘনশ্যাম এসে নাক কুঁচকে বললেন, 'রক্তচোষা মেরেছে? আমি এসবে বিশ্বাস করিনা। তোমরা ওকে খুন করেছ। আমি পুলিশে যাব, আমার মেয়েকে খুন করার জন্যে তোমাদের হাঁড়ির হাল করে ছাড়ব। ওই ফচকে উকিল সামনে ধরে তুমি পার পাবে না চন্দ্রশেখর।'

আমি বললুম, 'ঘনশ্যামবাবু, আপনি অনেক মামলা-মোকদ্দমা লড়েছেন, আমি জানি। অতএব একথা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে খুনের মামলা বড়ো বিষম বস্তু, তাতে অনেক কিছু নিয়েই টান পড়ে। সে টানাপোড়েন সইতে পারবেন তো?'

ঘনশ্যাম রায় আমার দিকে অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে বললেন, 'আমার কী নিয়ে টান পড়বে, উকিল মহাশয়?'

'আপনার স্ত্রী তো বেঁচে আছেন? ডাক্তারি পরীক্ষায় ধরা পড়ে যদি তিনি নিঃসন্তান? সুমিত্রা আপনার মেয়ে নয়?'

'তাতে কী হল? আমার মেয়ে না-হলেই তাকে খুন করতে হবে?'

'আপনার কুলপুরোহিত শুনেছি দু-বার আপনার প্রায়শ্চিত করেছিলেন। এ-ও শুনেছি, শিশুহত্যা করতে গিয়েছিলেন তাই। কথাটা সত্যি নাকি?'

'তাতে কী প্রমাণ হয়?'

'কিছুই না, কিছুই না। তবে শুনেছি, সুমিত্রার এগারো বছর হওয়ার সময় থেকে আর তার বিয়ে হওয়া পর্যন্ত আপনার গাঁয়ের মুসলমান প্রজাদের ঘরে অনেকগুলো মৃত্যু হয়েছে, যেগুলোর সঙ্গে এখানকার অপঘাত মৃত্যুগুলোর অনেক মিল। তারা নাকি শপথ করেছে যে এ মৃত্যুগুলোর জন্যে যে বা যা কিছুই দায়ী হোক না-কেন, জান দিয়েও তারা তাকে শেষ করে ছাড়বে। এখন কেউ যদি তাদের গিয়ে এখানকার মৃত্যুগুলোর কথা বলে, তাহলে তারা কী ভাববে বলুন তো?'

ঘনশ্যাম গুম হয়ে গেলেন। বললেন, 'কী ভাববে?'

'ভাববে, আপনি জেনেশুনে তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন। তারা ভাববে, আপনি ইচ্ছাকৃত নরহত্যাকারী, তাদের আত্মীয় পরিজন পরিবারের সর্বনাশের মূল কারণ। তখন, তাদের বিচারে আপনার কী শাস্তি হবে, তা ভেবে দেখেছেন?'

'তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। আপনি অতিজঘন্য অপরাধী। আপনাকে ভয় দেখানোর নীতিগত অধিকার আমার আছে। আপনার দুর্ধর্ষ লাঠিয়ালরা আপনার ওই মুসলমান প্রজারাই। আপনি তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এখন এসেছেন চন্দ্রশেখরের হাঁড়ির হাল করতে?'

'তুমি এত কথা জানলে কোত্থেকে?'

'ঘনশ্যামবাবু, আমি ফচকে উকিল হতে পারি, কিন্তু নির্বোধ নই। আপনাকে চিনতে আমার একটুও ভুল হয়নি এবং আপনি যে এরকমই একটা কাণ্ড করবেন, তা আগেভাগে বুঝে নিয়ে, সুমিত্রার মৃত্যুর পরদিনই আমি আপনার গ্রামে চলে গিয়েছিলুম। সেখান থেকে সব খবরই নিয়ে এসেছি। আর খানিকটা ছেড়েছি আন্দাজে। তবে আমার ভুল হয়নি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘনশ্যাম বললেন, 'না, তা হয়নি। ঠিক আছে। যা করেছ বেশ করেছ।

আমি তাহলে এখন চলি।'

আমি বললুম, 'দাঁড়ান। সুমিত্রা আপনার নিজের মেয়ে নয় তাতে সন্দেহ নেই, কার মেয়ে সে?'

ঘনশ্যাম বললেন, 'আমি তার পরিচয় জানি না। আজ থেকে বছর কুড়ি আগে একদিন একটা ভবঘুরে এসেছিল আমাদের গাঁয়ে তার ভেলকি দেখাতে। অতি অদ্ভুত ছিল তার খেলা। কিন্তু তার খেলার চেয়েও যেটা আমার সবচেয়ে অবাক করেছিল তা হচ্ছে তার খেলার চুবড়ির পাশে ছেঁড়া ন্যাকড়ায় শোয়ানো একটি প্রায় সদ্যোজাত শিশু। অবাক করেছিল, কারণ লোকটি ছিল অবিশ্বাস্য রকমের কুৎসিত, এত কদাকার যে তাকে দেখলেই ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে আর মেয়েটি ছিল তেমনই সুন্দর, ফুটফুটে। আমার নিজের সন্তান ছিল না। তাই লোকটিকে ডেকে বাচ্চাটা কিনে নিতে চাইলুম। পঞ্চাশ টাকায় রফা হয়েছিল।

পরে বাচ্চাটার স্বরূপ বুঝতে পারি। তাকে দু-বার মারতেও গিয়েছিলুম। কিন্তু কেমন যেন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলুম যে শেষ মুহূর্তে আর পারিনি।'

চন্দ্রশেখর কাতর কণ্ঠে জিগ্যেস করল, 'তাহলে আপনি তার বিয়ে দিলেন কেন? আমি তো আপনার কোনো ক্ষতি করিনি। আমার এমন সর্বনাশটা করলেন কেন?'

ঘনশ্যাম কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'ভেবেছিলুম, বিয়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন দেখছি ভুল করেছিলুম। তা সে যাক তো। সব তো চুকেবুকে গেছে। এখন আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

চন্দ্রশেখর ক্লান্ত গলায় বলল, 'হবে কী? বসন্ত যা বলে গেছে তা যদি ঠিক হয়, তবে তো এরা আবার উঠে আসবে আর আপনার মতো লোক যদি পায়, তবে তাকে আশ্রয় করে আবার এরা নিয়ে আসবে কালরাত্রি। তবে বসন্তের মতো লোকও নিশ্চয়ই থাকবে যারা কেবল চোখ দিয়েই দেখবে না, মন দিয়েও দেখবে। সেটাই ভরসা। তা না-হলে সুন্দর পৃথিবীটা তো কবেই বিষের জ্বালায় জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যেত।'

অঙ্ক পরীক্ষা

ভোররাতে ডাক্তার সামন্ত জবাব দিয়ে চলে গেলেন। বললেন, 'আমার আর কিছু করার নেই। আপনারা এবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন। কিছু করবার থাকলে একমাত্র তিনিই করতে পারবেন।'

প্রতিবেশী কাশীনাথ ভট্টাচার্য রোজ কাকভোরে উঠে গঙ্গাস্নান করতে যান। ডাক্তার সামন্তকে মুখার্জির বাড়িতে ঢুকতে দেখে তাঁর পেছনে পেছনে ভেতরে এসেছিলেন। তিনি মৃদুলাকে বললেন, 'যাও মা, তুমি একটু বিশ্রাম করে নাও। গত তিনদিন দু-চোখের পাতা এক করোনি। এখন একটু শুয়ে নাও। আমি বরং বিজনের পাশে বসছি। ওর কানে তারক ব্রহ্ম নাম জপ করি। শেষমুহূর্ত যখন আসবে, আমি তোমাকে ডেকে দেব।'

মৃদুলা রাজি হচ্ছিল না। বিজনের ছোটোভাই সুজন প্রায় জোর করেই ওকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। মৃদুলা খুব শক্ত মানুষ। চীৎকার চেঁচামেচি না-করে স্বামীর নিথর নিস্তব্ধ দেহটা দেখতে দেখতে পাশের ঘরে চলে গেল। সেখানে একটা ক্যাম্পখাটের ওপর ওর এগারো বছরের ছেলে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছিল। তার দিকে তাকিয়ে গলার মধ্যে ঠেলে ওঠা কান্না কোনোরকমে সামলে মৃদুলা বলল, 'বড়ো অল্পবয়সে পিতৃহারা হল গৌতম, তাই না ঠাকুরপো? এখন কে ওকে ভালোবাসা দেবে, কে-ই বা শাসন করবে? ওর বাবাও অল্পবয়সে তার বাবাকে হারিয়েছিল, আজ ওরও তাই হল।'

সুজন অশ্রুসিক্ত গলায় বলল, 'তুমি কিচ্ছু ভেব না, বউদি। আমার তো আছি। দিদিও আজ দুপুরের মধ্যে পৌঁছে যাবে। ওর যাতে কোনোরকম অভাব না-থাকে, তা আমরা সবাই মিলে দেখব, দেখো তুমি।'

মৃদুলা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই হঠাৎ খাটের ওপর উঠে বসল

গৌতম। তারপরেই একটা ভরাট গম্ভীর বয়স্ক গলায় বলল, 'বিজন কোথায়?' বলে খাট থেকে নেমে দাঁড়াল।

ওর গলা শুনে ঘরের বাকি দু-জনেই স্তম্ভিত। সুজন কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'একী কাণ্ড! অবিকল বাবার গলা।'

গৌতম পূর্ববৎ তার কাকাকে সম্বোধন করে বলল, 'বিজন কোন ঘরে আছে, সুজন?'

বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ সুজন একটা কম্পিত আঙুল তুলে পাশের ঘরটা দেখিয়ে দিল। হাফপ্যান্ট আর হাতকাটা গেঞ্জি পরা গৌতম দৃঢ় পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পেছনে পেছনে সন্ত্রস্ত পায়ে ওর নির্বাক মা আর কাকা বেরিয়ে এল। গম্ভীর গলায় গৌতম বলল, 'বিজন, উঠে আয়। আমি তোকে নিতে এসেছি।'

ব্যাপার দেখে কাশীনাথ জোড়হাতে কম্পিতদেহে উঠে দাঁড়াল। বিড়বিড় করে বললেন, 'বিজন, নিখিলবাবু এসেছেন তোমাকে নিয়ে যেতে।'

আস্তে আস্তে চোখ তুলে বিজন ঘাড় ঘুরিয়ে দৃশ্যটা দেখল তারপর কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসল। গৌতম আবার বলল, 'দেরি করছিস কেন, বিজন? চল, আমাদের যাবার সময় হল।'

এইবার বিজন খাট থেকে নেমে দাঁড়াল। দু-পা হেঁটে ছেলের সামনে গিয়ে টেনে তার গালে একটা বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় কষিয়ে বলল, 'হারামজাদা ছেলে! সক্কালবেলা বাপের সঙ্গে ফাজলামো হচ্ছে! নাম ধরে ডাকা আবার তুইতোকারি করা? ইশকুলে পড়ে এইসব শিক্ষা হচ্ছে? হতভাগা! পরশু না তোর অঙ্ক পরীক্ষা? ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে না-কেঁদে যা, পড়তে বোস নইলে চাবকে পিঠের চামড়া তুলে দেব, বলে দিচ্ছি! উজবুক, বাঁদর!'

আনন্দবাজার পত্রিকা

কলকাতার কড়চা, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮, সোমবার

রোমাঞ্চকর

■ বিশ শতকের সত্তর দশক থেকে টানা কুড়ি বছর 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় রহস্য, অলৌকিক, বিজ্ঞানভিত্তিক, রূপকথা ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় আড়াই হাজার পাতা ছোট ও বড়দের উপযোগী কাহিনি লিখেছেন। ১৯৯২ সালে 'রোমাঞ্চ' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর প্রায় এক দশক লেখা বন্ধ। শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়-ও অনীশ দেবের উৎসাহে নতুন শতকে আবার নানা পত্রপত্রিকায় লেখা শুরু করেন মনোজ সেন (জন্ম ১৯৪০)। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। স্কটিশ চার্চ স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ, বি ই কলেজে পড়াশোনা। প্রচারের আড়ালে থাকা এই প্রবীণ লেখকের একটিমাত্র সঙ্কলন প্রকাশিত হয় বছর দশেক আগে, তাও নিজের উদ্যোগে। এ বার বুকফার্ম প্রকাশ করল '৫x৫=২৫' (পাঁচমিশেলি সঙ্কলন)। ভূতের গল্প, থ্রিলার ইত্যাদির সঙ্কলনও প্রকাশের পথে। অন্য দিকে 'ক্যামেরাজি' নামের এক অলাভজনক ভিডিয়োগ্রাফি সংস্থা সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউবে মনোজ সেনকে নিয়ে প্রকাশ করেছে একাধিক প্রোমো-ভিডিয়ো।

'বুক ফার্ম'-এর প্রয়াস নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন

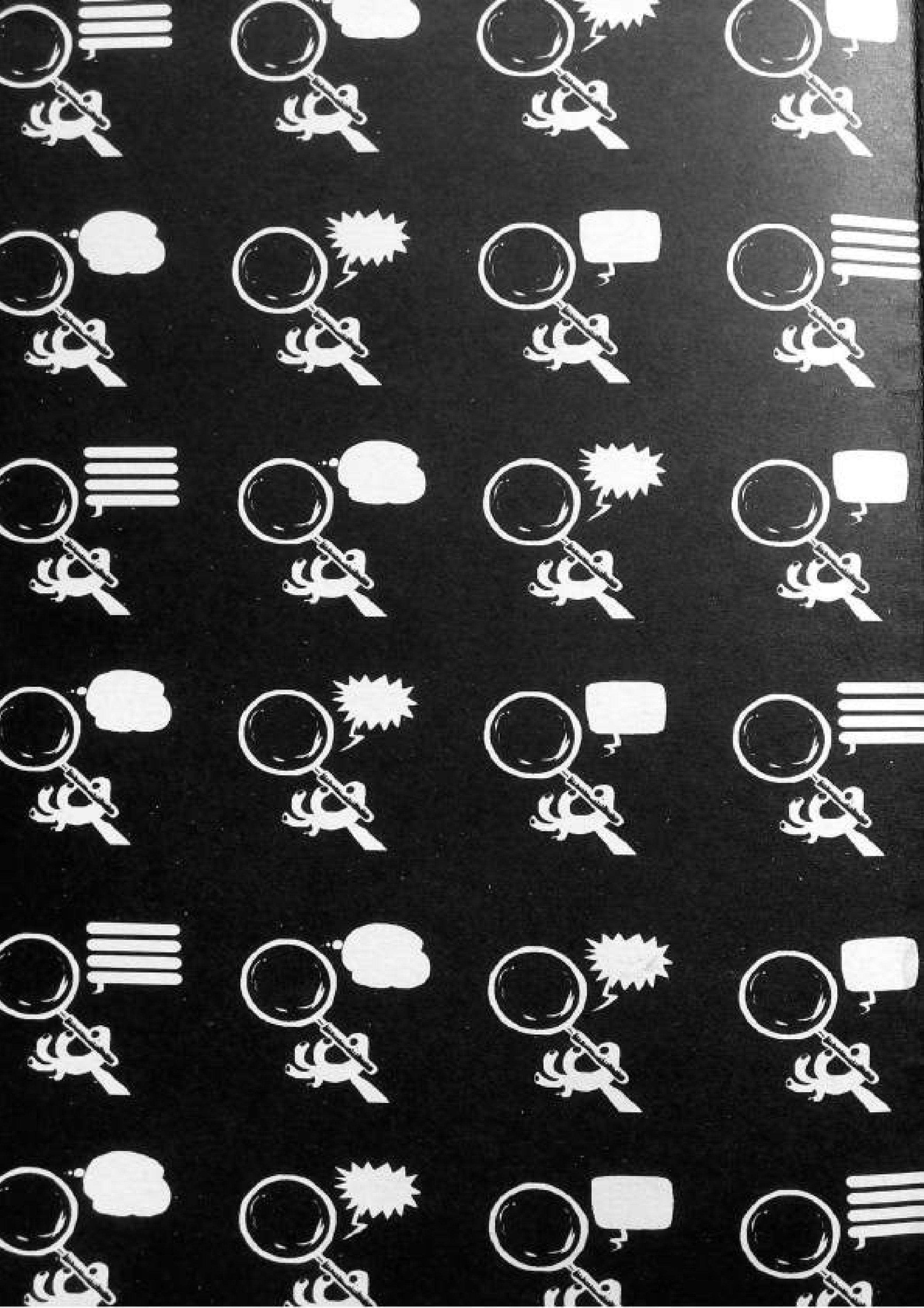

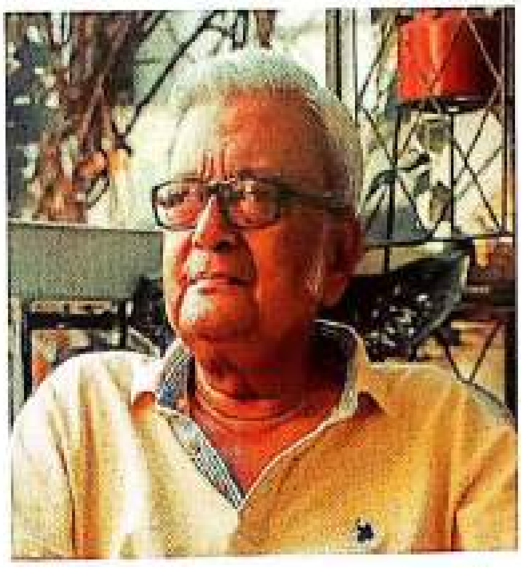

মনোজ সেন-এর জন্ম ১৯৪০। ছেলেবেলা আর কৈশোর কেটেছে কলকাতার বেলেঘাটায়, বেঙ্গল কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির ভেতরের কোয়ার্টার্সে। পড়াশোনা শুরু স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে। সেখান থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স। অতঃপর বি ই কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে বি ই পাশ করে চাকরি জীবনের শুরু। প্রথম কাজ ভারী নির্মাণ সংস্থা হেড রাইটসনে, শেষ কাজ টানকী ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়ায় ডিরেক্টর পদে। ১৯৯৭ থেকে অবসর জীবন, মাঝে মাঝে ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সি।

প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে স্কুল ম্যাগাজিনে, সেটা ছিল কবিতা। বি ই কলেজের সাহিত্য পত্রিকা 'সাহিত্যিকা'-য় লেখালেখি করেছেন। ১৯৭২ সালে প্রথম সাহিত্য পত্রিকা 'রোমাঞ্চ'-তে গল্প প্রকাশিত হয়। এরপর টানা কুড়ি বছর (১৯৭২-১৯৯২) 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় রহস্য, অলৌকিক, বিজ্ঞানভিত্তিক, রূপকথা ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় হাজার দেড়েক পাতা ছোটো ও বড়োদের উপযোগী কাহিনি লিখেছেন। ১৯৯২ সালে 'রোমাঞ্চ' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দশ বছর লেখা বন্ধ ছিল। শ্রীশান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড অনিশ দেব আবার লেখা শুরু করান ২০০১ সালে। 'রোমাঞ্চ' ছাড়া লিখেছেন 'সাপ্তাহিক বর্তমান', 'নবকল্লোল', 'শুকতারা', 'কিশোর ভারতী', 'সাহানা', 'পরমা' ইত্যাদি পত্রিকায়। মহিলা গোয়েন্দা চরিত্র দময়ন্তী দত্ত গুপ্ত ও খুদে গোয়েন্দা সাগর রায় চৌধুরী-কে নিয়ে লিখেছেন অনেক কাহিনি।

সাহিত্যের অনুপ্রেরণা আগাথা ক্রিস্টি, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। ঘোর নাস্তিক হলেও ইতিহাসের সন্ধানে পড়তে ভালোবাসেন ধর্ম সংক্রান্ত বই। এককালে ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবলের মতো সব খেলাতেই ছিলেন পারদর্শী। এ ছাড়া ভালোবাসেন ক্লাসিক গান, ভ্রমণ ও আড্ডা।

২০০৮ সালে প্রথম প্রকাশিত বই কালরাত্রি-র প্রকাশক ছিলেন নিজেই। এরপর দীর্ঘ কয়েক বছরের নীরবতা কাটিয়ে 'বুক ফার্ম' থেকে প্রকাশিত হতে চলেছে তাঁর একাধিক 'একক সংকলন'।

মনোজ সেন দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছর ধরে লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও লিখেছেন মাত্র ষাটের কাছাকাছি গল্প ও উপন্যাস। কিন্তু লেখনীর গুণে তাঁর সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সুপরিচিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, যেমন ‘রোমাঞ্চ’, ‘নবকল্লোল’, ‘শুকতারা’, ‘সাপ্তাহিক বর্তমান’-এর পাশাপাশি তাঁর কাহিনি স্থান পেয়েছে ‘সানডে সাসপেন্স’-এর মতো জনপ্রিয় বেতারনাট্যেও। লেখকের একুশটি অপার্থিব কাহিনিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই সংকলনে। এর মধ্যে কয়েকটি কাহিনির বিষয়বস্তু বড়োদের উপযোগী।